শ্রেষ্ঠ গল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ গল্প

আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত

অবসর

©
কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 415 - 059 - 0

MANIK BANDYOPADHAYA SHERSTHA GALPO (A Collection
of stories) by Manik Bandyopadhaya. Published by ABOSAR.
46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
Reprint : August 2011. Price : Taka 250.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

সূচি

ভূমিকা সাত

প্রাগৈতিহাসিক ১
টিকটিকি ১১
আত্মহত্যার অধিকার ১৭
সরীসৃপ ২৭
কুষ্ঠ–রোগীর বৌ ৫০
হলুদ পোড়া ৬১
সমুদ্রের স্বাদ ৬৮
বিবেক ৭৪
আপিম ৮৩
আজ কাল পরশুর গল্প ৯০
যাকে ঘুষ দিতে হয় ১০১
নমুনা ১০৪
দুঃশাসনীয় ১১০
কংক্রিট ১১৬
শিল্পী ১২৪
হারানের নাতজামাই ১৩০
বিচার ১৩৮
ছোট বকুলপুরের যাত্রী ১৪৬
কে বাঁচায়, কে বাঁচে! ১৫২
সাড়ে সাত সের চাল ১৫৬
মাসি–পিসি ১৫৯
টিচার ১৬৬
ছিনিয়ে খায় নি কেন ১৭২
খাত না কান্না ১৭৯
কেরানির বৌ ১৮৩
জুয়াড়ির বৌ ১৯০
শৈলজ শিলা ১৯৭
গাজনের মেলা ২০৬
হোমাগ ২১৬
ধারা ২২৩
স্বামী–স্ত্রী ২৩৪
কালোবাজারের প্রেমের দর ২৩৯
বাগদি–পাড়া দিয়ে ২৪৩
অতসীমামি ২৪৮
নেকী ২৬৪
ছেলেমানুষি ২৮৩
সখী ২৯০
সিঁড়ি ২৯৬
একান্নবর্তী ৩০৩

পরিশেষ
জীবনপঞ্জি ৩১৩
গ্রন্থপঞ্জি ৩১৬

ভূমিকা

১. উপক্রমণিকা

> ...ছোটগল্প রচনায় রোমাঞ্চ আছে। এতে গভীর মনঃসংযোগ করতে হয়। এত দ্রুত তালের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলতে হয় বলেই মন কখনো বিশ্রাম পায় না। ছোটগল্প লেখার সময়ে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ বোধ করি।
>
> —*সাক্ষাৎকার : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৬।*[১]

১৯৪৪ সালে "কেন লিখি" নামে একটি সংকলন বেরিয়েছিলো ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের পক্ষে। সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দী' এই ঘোষণা থাকলেও সংকলনটিতে কথাশিল্পীদের সঙ্গে কবিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। "কেন লিখি" সংকলনে লিখেছিলেন : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শাহাদাৎ হোসেন, গোপাল হালদার, জীবনানন্দ দাশ, সরোজ বসু, শচীন সেনগুপ্ত, আবুল মনসুর আহমদ, অমিয় চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দে। ঐ সংকলনের জন্যে অন্যদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৯০৮–৫৬) একটি লেখা লিখেছিলেন। নিতান্তই ফরমাশি রচনা। কিন্তু কী অসাধারণ সেই রচনা! বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পৃষ্ঠার ঐ রচনাটিই ছিলো ঐ সংকলনের তীক্ষ্ণতম রচনা। তার মধ্যে প্রতিভাসিত হয়েছেন শিল্পী মাত্রেই, কিন্তু বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। 'লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই যে–সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।' এই অসামান্য বাক্যটি ছিলো রচনাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি। অর্থাৎ লেখক মাত্রেই উপায়হীন লেখক। 'আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।' এই উক্তির মধ্য দিয়ে মানিকের সমস্ত শিল্পকর্মের যে–সচেতন বুদ্ধিবাদী প্রয়াস তা–ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কেন লিখি'–র তিন বছর পরে, ১৯৪৭ সালে, শারদীয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রতিভা' নামে আরেকটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখলেন। ঐ প্রবন্ধে মানিক দেখালেন প্রতিভা কোনো 'ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিশ' নয়। দেখালেন : 'প্রতিভা আসলে এক। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভায় মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই—পার্থক্য শুধু বিকাশ আর প্রকাশে।' এখানে 'কবি' অর্থে লেখক শিল্পী মাত্রকেই বুঝিয়েছেন মানিক। আর প্রতিভা জিনিশটা কী ?—না, 'দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। আর কিছুই নয়।' ১৯৫১ সালের দিকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য–সম্পাদিত 'পূর্বাশা'

পত্রিকা তৎকালীন কয়েকজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস-ভাবনা প্রকাশ করে। অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আপনাপন উপন্যাসচিন্তা পরিব্যক্ত করেছিলেন কয়েকটি সংখ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন প্রসঙ্গত : 'আমার বিজ্ঞান–প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্রবয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক!' মানিক কবিতা লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন; কিন্তু মূলত তিনি কথাশিল্পী—ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার।

যতোদূর জানা যাচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছাপার হরফে দেখা দিতে থাকে তাঁর ২০/২১ বছর বয়সে। ১৯২৮ সালে লিখতে শুরু করেন গল্প—প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অতসী মামী'। ১৯২৯ সালে প্রথম উপন্যাস "দিবারাত্রির কাব্য"–র আদি রচনা শুরু হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে যেন ঔপন্যাসিক হিশেবেই পরিচিহ্নিত করা হয়—অন্য কিছু নন তিনি, তিনি ঔপন্যাসিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিন্তু আমরা বলতে চাই একইসঙ্গে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর ঔপন্যাসিক সাফল্যের চেয়ে গল্পকার হিশেবে সাফল্য কোনো অংশে কম নয়। এমনকি সুকুমার সেন–এর মতো ইতিহাসবিদ্ মনে করেন, 'ছোটগল্পগুলিতেই শিল্পী মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত।'[২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় তিন দশক (১৯২৮–৫৬) ধরে লিখেছিলেন ৪০টির মতো উপন্যাস, ৩০০–র মতো গল্প। যিনি লিখেছিলেন 'লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর।' ('কেন লিখি') তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ৪৮–বছরের জীবন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন সাহিত্যে। পিতার চাকরিসূত্রে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অনেক এলাকা দেখা হয়েছিলো। প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি. পর্যন্ত পড়েছিলেন, লেখাপড়া শেষ করেননি, কিন্তু সারাজীবন এক বিজ্ঞান-মানসতা অর্জন ও বহন করেছেন। 'অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি. পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করছিলাম যে সাহিত্যজগতে একটা বড়রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্য কাজে সময় নষ্ট করা যায় না।' (মানিকের চিঠি, ২ আগস্ট ১৯৫২)[৩] এমনকি লেখা ব্যতীত অন্য জীবিকার জন্যেও সময় নষ্ট করা যায় না। তাই মানিক 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিশেবে বছর দুয়েক (১৯৩৭–৩৮) আর ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের পাবলিসিটি অফিসার হিশেবে কয়েক মাস (১৯৪৩)—সাকুল্যে এটুকু সময় চাকরি করেছেন। আর-একবার স্বাধীন ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করে (১৯৩৯), অনুজ সুবোধকুমারের সহযোগিতায়; চলেনি; মানিকের "বৌ" গল্পগ্রন্থটি এই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রথম প্রকাশিত (১৯৪০)। ১৯৪৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৬ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি এমন একটি বছরও যায়নি, যে–বছর তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, একটি উপন্যাস, "জননী", ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত। জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থটিও উপন্যাস, "মাশুল", ১৯৫৬-র অক্টোবরে বেরিয়েছিলো। ঐ ১৯৩৫ ও ১৯৫৬ সালে তাঁর গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিলো : প্রথম গল্পগ্রন্থ "অতসী মামী" আর সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ "স্বনির্বাচিত গল্প"। মৃত্যুর পরেও অনেক গল্প, উপন্যাস, ডায়েরি ও চিঠিপত্র, কিশোরতোষ রচনা, গ্রন্থাবলি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে পুস্তকাকারে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

"অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" (যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত, ১৯৭৬) এবং তেরো খণ্ড "মানিক-গ্রন্থাবলী" (১৯৬৩-৭৬)। এসবের বাইরেও অনেক রচনা পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় ও পাণ্ডুলিপিতে ছড়িয়ে আছে—আজো অগ্রন্থিত। মানিক অবিশ্রাম সাহিত্য রচনা ছাড়া বস্তুতপক্ষে আর-কিছু করেননি। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) আবির্ভাবের সত্তর বছর পরে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব—এবং বাংলা উপন্যাসের প্রধান শিল্পীদের একজন তিনি। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অভ্যুদয়ের চল্লিশ বছর পরে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন—এবং বাংলা ছোটোগল্পের অন্যতম প্রধান শিল্পী তিনি। এইসবই সম্ভব হয়েছে প্রতিভার জাদুবলে—মানিক যাকে 'ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিশ' বলতে নারাজ, যাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা' বলে, তারই কল্যাণে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি কল্লোলীয় ?

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানিককে বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন'।[৪] বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'belated kallolean.'[৫] কল্লোলের সর্বজ্যেষ্ঠ লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) আর সর্বানুজ বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)। দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১)-সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকা বছর সাতেক (১৯২৩-৩০) চলেছিলো। রবীন্দ্রোত্তর তরুণ লেখকদের মুখ্যতম মাধ্যম ছিলো এই পত্রিকা। 'কালিকলম', 'প্রগতি' ইত্যাদি আরো পত্রিকা ছিলো তরুণ সাহিত্যের বাহন। কিন্তু 'কল্লোল'-এর নামেই আধুনিক—উত্তররৈবিক আধুনিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তররৈবিক কথাসাহিত্যের আধুনিকতা যাঁদের হাতে সূচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরা হচ্ছেন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৬), গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৬), মনীশ ঘটক (১৯০২-৭৯), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭-৮৩), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) প্রমুখ। 'কল্লোল' সম্পর্কে মানিক ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তার সাক্ষ্য দেবে মৃত্যুর আগে 'নতুন সাহিত্য' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকার। আমরা একটুখানি অংশ উদ্ধৃত করছি :

প্রশ্ন ॥ আপনি তো 'কল্লোল যুগে'র আবহাওয়াকে সমকালীন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সাহিত্য-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে আজ যে বিচার বিশ্লেষণ চলছে সে প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি ? 'কল্লোল' প্রচেষ্টা কি ব্যর্থ ?

উত্তর ॥ বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, 'কল্লোল যুগ' বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লবের যুগ, কল্লোল গোষ্ঠীর বা কল্লোলের আদর্শে আস্থাবান সমসাময়িক কথাশিল্পীরা দুর্দম অপরাজেয় যৌবনের প্রতীক, নতুন আশা-আনন্দ, নতুন জীবনাদর্শের সূত্রধার। সাম্প্রতিক কালের বাংলা কথাশিল্পে গর্ব করার মতো কোনো সম্পদই যদি থেকে থাকে তবে সেজন্যে অধুনাকালীন গল্পকার-ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব যতোখানি, কল্লোলের দাম তার চেয়ে কম নয়। কল্লোলের মাধ্যমে যে নতুন জীবনচেতনা, যে নতুন সাহিত্যাদর্শ জন্মলাভ করেছিল আজকের প্রগতিবাদী সাহিত্য তো সেই নতুন পথেরই অনুসারী।/প্রাক-কল্লোলকালে বাংলা সাহিত্য ছিল বিদগ্ধজনের সাহিত্য।... কিন্তু কল্লোল-তারুণ্য এলো মুষ্টিবদ্ধ 'চ্যালেঞ্জ' নিয়ে। গ্রামের কিষাণী এসে নায়িকা হল সাহিত্যের, ক্ষেতখামারের চাষী সম্মানিত নায়কের আসন পেল গল্প-উপন্যাসের।

> ...একদিন অবশ্য কল্লোলের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি। আজকের সাহিত্য কল্লোলের আদর্শকে স্বীকার করেছে। এখানেই তো কল্লোলের সার্থকতা।.../ কল্লোলের আরেক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নরনারীর সম্পর্কের নতুন মূল্য নিরূপণ, মানুষের প্রেমের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয়।

অন্যত্র, 'সাহিত্য করার আগে'[৬] প্রবন্ধে, মানিক অবশ্য 'কল্লোল যুগ'কে তীব্রভাবে সমালোচনাই করেছিলেন :

> জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।

এই প্রবন্ধে মানিক রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে যেমন তেমনি অব্যবহিত-অগ্রজ প্রেমেন্দ্র মিত্র-শৈলজানন্দকে সমালোচনা করেছিলেন বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ না-করার জন্যে। এখানে তিনি 'কল্লোল যুগ'-কে দেখেছিলেন ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতের রূপদানকারী হিশেবে। নিজের সম্পর্কে দাবি করেছিলেন '...বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়' এই বলে।

বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের ভাষ্য অনুসারে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিলম্বিত কল্লোলীয় বলেই মনে করি। এম্নিতে তিনি ছিলেন কল্লোলের লেখকদের সমসাময়িক, বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮–৭৪) সমবয়সী—যদিও তাঁর সাহিত্যযাত্রা বুদ্ধদেবের বেশ পরে। ১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প বেরিয়েছিলো 'বিচিত্রা' পত্রিকায়—সেদিক থেকে তিনি 'কল্লোল' পত্রিকারও লেখক হতে পারতেন। এছাড়া বহু পত্রিকায় কল্লোলীয়দের সঙ্গে একইসঙ্গে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা-ভবনে' যেতেন মানিক। কবিতা-ভবন থেকে প্রতিভা বসুর সম্পাদনায় যে-গল্পমালা সিরিজ প্রকাশিত হতো, সেখান থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও একটি গল্প—'কে বাঁচায়'—সংবলিত পুস্তিকা বেরিয়েছিলো। এই গল্পমালা সিরিজে স্বতন্ত্র পুস্তিকায় গল্প প্রকাশিত হয়েছিলো পরশুরাম, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের। মানিক সম্পর্কে কল্লোলের অনেক লেখকই মন্তব্য করেছেন। একসময়কার বিখ্যাত তিন নায়কই—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র—মন্তব্য করেছেন, অনুকূল রসগ্রাহী মন্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ কল্লোল যুগের অনেক লেখক সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো মতামত আমার চোখে পড়েনি। মনে হয় না, মানিক "দিবারাত্রির কাব্য", "পদ্মানদীর মাঝি", "পুতুলনাচের ইতিকথা" বা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত আর-কোনো বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। মানিকের স্বভাবপ্রকৃতি ছিলো একটু অন্যরকম। এসব বই পেলে বা পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দ থাকতেন, তাও ভাবা যায় না। ১৯৩৯ সালের ১১ই নবেম্বরে সজনীকান্ত দাস বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-কে এক চিঠিতে লিখছেন : 'তারাশঙ্কর সম্বন্ধেও তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] মত খুব উচ্চ তবে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে তারাশঙ্কর একটু ক্লান্ত হইয়াছে। তিনি রবীন্দ্রপরবর্তী গল্পসাহিত্যে তোমাদের দুইজনকে ছাড়া আর কাহারো নাম করিতে পারেন না। প্রেমেন্দ্রের লেখা তিনি পড়েন নাই, মানিক সম্বন্ধে তিনি হতাশ এবং আধুনিক দলের দ্বন্দ্বে পীড়িত।'[৭] এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চিত নই।

সে যাই হোক, মানিক-নির্দেশিত কল্লোলের দুটি বিশিষ্টতা—নিচুতলার জীবনচিত্রণ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের নতুন মূল্যায়ন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে তো দেখি এই দুটি বিষয়েরই সান্দ্র অনুবর্তন : সত্য বাস্তব জটিল গভীর প্রগাঢ় রূপায়ণ। সময় এবং স্বভাব—দুদিকের বিচারেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা কল্লোলীয় বলেই মনে করি।

২. গল্পভাবনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সৃজনশিল্পী : মূলত উপন্যাস ও গল্পই লিখে গেছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু ভাবনা-ধারণা লিপিবদ্ধও করেছেন। কোনো কোনো গল্পের প্লটের সংক্ষিপ্তসারও লিখে রেখেছেন কয়েক লাইনে। একজন বিপুল সৃষ্টিশীল লেখকের অন্তর্গত যে-প্রবল চাপ ও অস্থিরতা ও অশৃঙ্খলা তারও সাক্ষ্য দেবে তাঁর অজস্র গল্পের সঙ্গে তাঁর ডায়েরিগুচ্ছ, নোটগুচ্ছ, পত্রগুচ্ছ। এরকম একটি নোটবইএ নতুন ছোটোগল্প সম্পর্কে তাঁর ভাবনা তাঁর সমগ্র গল্পের অন্তর্লোকে আলো ফ্যালে :

'ছোটগল্প'

১। গল্প—অনেক পরিবর্তন—ছোটগল্প।

২। ঘটনাপ্রধান ছিল—এখন ঘটনা তুচ্ছ

৩। স্থান কাল পাত্র—

৪। বর্তমান ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ—স্থানের সীমা, কালের সীমা, পাত্রের সীমা—আজ এই ঘটল তারপর দশ বছর পরে, এই ধরনের টেকনিক প্রায় নয়—যত কম সময়ে যত কম চরিত্র এনে জীবনের একটা দিকের ছবি দেওয়া যায়

৫। আমার মতে—ছোটগল্পের এই রূপ সমর্থন করি—
শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প (ক) আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের ছেদ নেই, দু মিনিট হোক দশ মিনিট হোক একটি মনের একটানা চিত্র—ইজিচেয়ারে বসে একজন ভাবছে তা অবশ্য নয়—অন্য চরিত্র ও ঘটনা থাকবে কিন্তু তার মনে যতটা থাকে—

৬। একটির বেশি মনের সাময়িক চিত্র দিলে বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস হয়, ছোটগল্প হয় না—

৭। সময়টুকুর মধ্যে মনে যা নেই তার সামান্য বর্ণনাও থাকবে না—লেখক নিজে বলছে এমন কিছুই থাকবে না—[৮]

অনেকবারই মানিক তাঁর প্রথম গল্প লেখার ইতিবৃত্ত জানিয়েছেন। আমরা জানি, 'অতসী মামী' গল্পটি মানিক লিখেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে। সেই গল্প 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) ঐ গল্পের পারিশ্রমিক স্বয়ং মানিকবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন—এবং আরো গল্প লেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে দেখি না, মানিক স্বয়ং তাঁর লেখার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছেন একাধিক প্রবন্ধে—যেমন 'গল্প লেখার গল্প' প্রবন্ধে।[৯] বলেছেন : 'বারো তেরো বছর বয়সের মধ্যে "বিষবৃক্ষ", "গোরা", "চরিত্রহীন" পড়া হয়ে গিয়েছে।' বলেছেন : 'বড় ঈর্ষা হতো বই যাঁরা লেখেন তাঁদের ওপর।' বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পড়েই—অন্যান্য লেখকদেরও—মানিক যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন লেখক হয়ে ওঠবার, আরো কিছুকাল পরে, তখন বন্ধুদের সঙ্গে তর্কসূত্রেই তিনি দ্রুত অবতীর্ণ হয়েছিলেন লেখক রূপে।

২০–বছর বয়সে গল্পকার হিশেবে আবির্ভূত হলেন। ২৭–বছর বয়সে গ্রন্থকার (একইসঙ্গে গল্পগ্রন্থকার ও ঔপন্যাসিক) হিশেবে আবির্ভূত হলেন। মানিকের প্রথম জীবনের এবং পরবর্তী জীবনের নেপথ্য প্রস্তুতির কথাটা মনে রাখতে হবে। হঠাৎ রাতারাতি লেখক হয়ে গেলেন বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে—এমনটি নয়।

'সাহিত্যের কানমলা'[১০] প্রবন্ধে মানিক ক্রমাগত সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে গল্পের আরেক নতুন রূপ আবিষ্কার করেন। একটি উপন্যাসের ভিতর থেকে গল্প বের করে নিয়ে আসেন—একটু আধটু রদবদল করে। শারদীয়া সংখ্যার গল্পের দাবিতেই মানিকের এই আবিষ্কার। মানিক লক্ষ্য করেন : 'প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক গল্পের উপাদান এবং সংকেত কমবেশি থাকে।' লিখছেন : 'আরোগ্য উপন্যাসটি লিখছিলাম। পূজা আসছে। বইটা লিখতে লিখতে খেয়াল হলো, এই উপন্যাসটিতেই সুন্দর কয়েকটি গল্প আছে। প্রায় একেবারে তৈরি গল্প—একটু অদলবদল ঘষামাজা করলেই সত্যিকারের গল্প হয়ে যাবে।' সুচেতন মানিকের দৃষ্টি এড়ায় না : 'কোনো কোনো গল্পেও আবার উপন্যাসের বীজ থাকে।' কিন্তু তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মে—তাঁর ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় বিখ্যাত দুই পর্যায়েও—মানিক কখনোই যান্ত্রিক নন, সদাসর্বদা শিল্পী, সৃষ্টিশীল শিল্পী। তাই তাঁর চোখ-কান খোলা থাকে সবসময়। এই প্রবন্ধেও তিনি শেষ পর্যন্ত এই আবিষ্কারও গোপন করেন না : 'কোনো উপন্যাসে ছোটোগল্প থাকে, কোনো উপন্যাসে থাকে না।' যুগান্তর চক্রবর্তী উপন্যাস থেকে নির্মিত এরকম ১৪টি গল্পের একটি তালিকা তৈরি করেছেন :[১১]

১. "লাজুকলতা"র 'মীমাংসা' (গল্প) "পাশাপাশি" উপন্যাস থেকে।
২. "লাজুকলতা"র 'বাহিরে ঘরে' (গল্প) "সার্বজনীন" উপন্যাস থেকে।
৩. 'শিল্পী' (গল্প—"পরিস্থিতি" গ্রন্থের নয়, অন্য গল্প) "আরোগ্য" উপন্যাস থেকে।
৪. "ফেরিওলা"র 'লেভেল ক্রসিং' (গল্প) "আরোগ্য" উপন্যাস থেকে।
৫. "লাজুকলতা"র 'চিকিৎসা' (গল্প) "আরোগ্য" উপন্যাস থেকে।
৬. "গল্পসংগ্রহ"–এর 'বড়দিন' (গল্প) "হলুদ নদী সবুজ বন" উপন্যাস থেকে।
৭. "গল্পসংগ্রহ"–এর 'সশস্ত্র প্রহরী' (গল্প) "হলুদ নদী সবুজ বন" উপন্যাস থেকে।
৮. "স্বনির্বাচিত গল্প"–এর 'প্রাক–শারদীয় কাহিনী' (গল্প) "হলুদ নদী সবুজ বন" উপন্যাস থেকে।
৯. "গল্পসংগ্রহ"–এর 'মানুষ হতবাক নয়' (গল্প) "মাশুল" উপন্যাস থেকে।
১০. "গল্পসংগ্রহ"–এর 'হাসপাতালে' (গল্প) "প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান" থেকে।
১১. "শ্রেষ্ঠ গল্প"–এর 'বিচার' (গল্প) "শান্তিলতা" উপন্যাস থেকে।
১২. "গল্পসংগ্রহ"–এর 'শান্তিলতার কথা' (গল্প) "শান্তিলতা" উপন্যাস থেকে।
১৩. "গল্পসংগ্রহ"–এর 'দুর্ঘটনা' (গল্প) "শান্তিলতা" উপন্যাস থেকে।
১৪. 'ঘাসে কত পুষ্টি' (গল্প) পরিকল্পিত ও অসম্পূর্ণ "আশালতা" উপন্যাস থেকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও নোটবই–এ অনেক গল্পের সংক্ষিপ্ত খশড়া আছে। এর কোনো–কোনোটির মানিক গল্পরূপ দিয়েছেন, কোনো–কোনোটি অস্পর্শিত রয়ে গেছে। 'সম্ভবপর গল্পের প্লট' এই নামে মানিক পর–পর ১৮টি গল্পের প্লটের সংক্ষিপ্ত রেখালেখ্য এঁকেছিলেন—এর একাংশ উদ্ধৃত করছি নমুনা হিশেবে [১২] :

'সম্ভবপর গল্পের প্লট'

১। গৃহস্থ পথিক—১৫/২০ বৎসর পৃথিবী ঘুরিয়া একজন ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছে—

২। পথ—অশিক্ষিত দুইটি হিন্দু ও মুসলমান বালকের কলহবিবাদ—
দুজনের শিক্ষালাভের পর স্বাভাবিকভাবেই মিলন
Better—হিন্দু ও মুসলমান—কলহ—একের পাড়া দিয়া অপরের পথ—ভয়ে যাতায়াত বন্ধ—ভীষণ কষ্ট

৩। অকর্মণ্য—অর্থোপার্জন ছাড়া সব কাজ করে তবু লোকে অকর্মণ্য বলে, অর্থোপার্জন করিতে গিয়া সব কাজ বাদ দিল তখন অকর্মণ্য নাম ঘুচিয়া গেল—

৪। একজনের সাতটি মেয়ে—সাতটি মেয়ের বিভিন্ন জীবনের কাহিনী

৫। শহর—গ্রাম হইতে শহরে আসিয়াছে—বড়বাজারের ব্যাঙ্কে চেক্ ভাঙাইতে যাওয়ার সময় গল্প আরম্ভ—অন্যের চেক্—উপন্যাস করা চলিবে।

৬। পাশবিক অত্যাচার—দৈহিক অত্যাচার ছাড়াও যে পাশবিক অত্যাচার করা চলে—দেহ সম্পর্কে অতিরিক্ত ভদ্রতা যে কতকটা পাশবিক অত্যাচারের সামিল হইতে পারে—ইত্যাদি—

৭। সেবক (সেবিকা)—বড় চাকুরে—মনিবের সেবক—বাড়ির লোক তার সেবক—চাকরদাসী বাড়ির লোকের সেবক—ইত্যাদি অর্থাৎ সেবকের সেবক, তার সেবক তারও সেবক ইত্যাদি লইয়া গল্প।

৮। লড়াই—কার সঙ্গে?—গরীবের জীবন যুদ্ধ

৯। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা (অথবা—'স্তন')
শরীরের তুলনায় স্তনের অস্বাভাবিক পরিপুষ্টি—নেশাখোর স্বামী—বেশ্যাবৃত্তি—যে লোক আসিল স্তন দেখিয়া ব্যাপার অনুমান :
সমাপ্তি :—লোকটি বলিবে : 'আমার সামনে ছেলেকে মাই দেও।'
ছেলের ক্ষুধা ও গলাশুকানোর নিবৃত্তি—

১০। ... বৌ : ক্ষুধায় কষ্ট পায়—একদিন সহ্য করিতে না পারিয়া খোকাকে মাই দিতে দিতে মাই নিজের মুখে দিয়া চুষিতে লাগিল : খোকার ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটিলে তার মিটিবে না কেন?

১১। বোকা হাবা কুৎসিত ছেলে—ছেলে মরিয়া গেলে স্বামীর বদলে পরিচিত সুন্দর যুবকের দ্বারা স্ত্রীর সুশ্রী সবল সন্তানলাভ—।

ডায়েরিতে এরকম আরো অনেক গল্পের প্লট লিখে রেখেছেন—মাত্র ৪৮-বছরে মৃত্যু হওয়ায় মানিক সব প্লটের গল্পরূপ দেবার সময় পাননি।

৩. খতিয়ান

(এক)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁর ১৬টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো। গল্পগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল সমেত নামোল্লেখ করা হলো এখানে (মানিকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সংস্করণও উল্লিখিত হলো) :

১. অতসী মামী। ১৯৩৫।
২. প্রাগৈতিহাসিক। ১৯৩৭।
৩. মিহি ও মোটা কাহিনী। ১৯৩৮।
৪. সরীসৃপ। ১৯৩৯।
৫. বৌ। ১৯৪৩। দ্বি সং ১৯৪৬।

৬. সমুদ্রের স্বাদ। ১৯৪৩।

৭. ভেজাল। ১৯৪৪।

৮. হলুদ পোড়া। ১৯৪৫।

৯. আজ কাল পরশুর গল্প। ১৯৪৬। দ্বি সং ১৯৫০।

১০. পরিস্থিতি। ১৯৪৬।

১১. খতিয়ান। ১৯৪৭।

১২. মাটির মাশুল। ১৯৪৮।

১৩. ছোট বড়। ১৯৪৮।

১৪. ছোট বকুলপুরের যাত্রী। ১৯৪৯।

১৫. ফেরিওলা। ১৯৫৩। দ্বি সং ১৯৫৫।

১৬. লাজুকলতা। ১৯৫৪।

এই ১৬টি গল্পগ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় ২০০টি গল্প অন্তর্ভূত হয়েছিলো। এগুলির তালিকা এখানে দেওয়া হলো :

১ অতসী মামী ২ নেকী ৩ বৃহত্তর–মহত্তর ৪ শিপ্রার অপমৃত্যু ৫ সর্পিল ৬ পোড়াকপালী ৭ আগন্তুক ৮ মাটির সাকী ৯ মহাসংগম ১০ আত্মহত্যার অধিকার (অতসী মামী) ১১ প্রাগৈতিহাসিক ১২ চোর ১৩ যাত্রা ১৪ প্রকৃতি ১৫ ফাঁসি ১৬ ভূমিকম্প ১৭ অন্ধ ১৮ চাকরি ১৯ মাথার রহস্য (প্রাগৈতিহাসিক) ২০ টিকটিকি ২১ বিপত্নীক ২২ ছায়া ২৩ হাত ২৪ বিড়ম্বনা ২৫ রকমারি ২৬ কবি ও ভাস্করের লড়াই ২৭ আশ্রয় ২৮ শৈলজ শিলা ২৯ খুকী ৩০ অবগুণ্ঠিত ৩১ সিঁড়ি (মিহি ও মোটা কাহিনী) ৩২ মহাজন ৩৩ বন্যা ৩৪ মমতাদি ৩৫ মহাকালের জটার জট ৩৬ গুপ্তধন ৩৭ প্যাঁক ৩৮ বিষাক্ত প্রেম ৩৯ দিক–পরিবর্তন ৪০ নদীর বিদ্রোহ ৪১ মহাবীর ও অবলার ইতিকথা ৪২ দুটি ছোট গল্প : বোমা ৪৩ : পার্থক্য ৪৪ সরীসৃপ (সরীসৃপ) ৪৫ দোকানীর বৌ ৪৬ কেরানীর বৌ ৪৭ সাহিত্যিকের বৌ ৪৮ বিপত্নীকের বৌ ৪৯ তেজী বৌ ৫০ কুষ্ঠরোগীর বৌ ৫১ পূজারীর বৌ ৫২ রাজার বৌ ৫৩ উদারচরিতানামের বৌ ৫৪ প্রৌঢ়ের বৌ ৫৫ সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ ৫৬ অন্ধের বৌ ৫৭ জুয়াড়ীর বৌ (বৌ) ৫৮ সমুদ্রের স্বাদ ৫৯ ভিক্ষুক ৬০ পূজা কমিটি ৬১ আফিম ৬২ গুণ্ডা ৬৩ কাজল ৬৪ আততায়ী ৬৫ বিবেক ৬৬ ট্র্যাজেডির পর ৬৭ মালী ৬৮ সাধু ৬৯ একটি খোয়া ৭০ মানুষ হাসে কেন (সমুদ্রের স্বাদ) ৭১ ভয়ংকর ৭২ রোমান্স ৭৩ ধন জন যৌবন ২৪ মুখে ভাত ৭৫ মেয়ে ৭৬ দিশেহারা হরিণী ৭৭ মৃতজনে দেহ প্রাণ ৭৮ যে বাঁচায় ৭৯ বিলামসন ৮০ বাস্ ৮১ স্বামী–স্ত্রী (ভেজাল) ৮২ হলুদ পোড়া ৮৩ বোমা ৮৪ তোমরা সবাই ভালো ৮৫ চুরি চুরি খেলা ৮৬ ধাক্কা ৮৭ ওমিলনাইন ৮৮ জন্মের ইতিহাস ৮৯ ফাঁদ ৯০ ভাঙা ঘর ৯১ অন্ধ ও ধাঁধা (হলুদ পোড়া) ৯২ আজ কাল পরশুর গল্প ৯৩ দুঃশাসনীয় ৯৪ নমুনা ৯৫ বুড়ী ৯৬ গোপাল শাসমল ৯৭ মঙ্গলা ৯৮ নেশা ৯৯ বেড়া ১০০ তারপর ১০১ স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই ১০২ শত্রু–মিত্র ১০৩ রাঘব মালাকর ১০৪ যাকে ঘুষ দিতে হয় ১০৫ কৃপাময় সামন্ত ১০৬ নেড়ী ১০৭ সামঞ্জস্য (আজ কাল পরশুর গল্প) ১০৮ প্যানিক ১০৯ সাড়ে সাত সের চাল ১১০ প্রাণ ১১১ রাসের মেলা ১১২ মাসি পিসি ১১৩ অমানুষিক ১১৪ পেটব্যথা ১১৫ শিল্পী ১১৬ কংক্রিট ১১৭ রিকশাওয়ালা ১১৮ প্রাণের গুদাম ১১৯ ছেঁড়া (পরিস্থিতি) ১২০ খতিয়ান ১২১ ছাঁটাই রহস্য ১২২ চক্রান্ত ১২৩ গুণ্ডামি ১২৪ কানাই তাঁতি ১২৫ চোরাই ১২৬ চালক ১২৭ টিচার ১২৮

ছিনিয়ে খায়নি কেন ১২৯ একান্নবর্তী (খতিয়ান) ১৩০ মাটির মাশুল ১৩১ বক্তা ১৩২ ঘর ও ঘরামি ১৩৩ পারিবারিক ১৩৪ ট্রামে ১৩৫ ধর্ম ১৩৬ দেবতা ১৩৭ নব আলপনা ১৩৮ ব্রিজ ১৩৯ আপদ ১৪০ পক্ষান্তর ১৪১ সিদ্ধপুরুষ ১৪২ হ্যাংলা ১৪৩ বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে (মাটির মাশুল) ১৪৪ ভালবাসা ১৪৫ তথাকথিত ১৪৬ ছেলেমানুষি ১৪৭ স্থানে ও স্তানে ১৪৮ স্টেশন রোড ১৪৯ পেরানটা ১৫০ দিঘি ১৫১ হারানের নাতজামাই ১৫২ ধান ১৫৩ সাথী ১৫৪ গায়েন (ছোট বড়) ১৫৫ ছোট বকুলপুরের যাত্রী ১৫৬ মেজাজ ১৫৭ প্রাণাধিক ১৫৮ ঘর করলাম বাহির ১৫৯ নিচু চোখে দু আনা দু পয়সা ১৬০ নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা (ছোটবকুলপুরের যাত্রী) ১৬১ ফেরিওলা ১৬২ সংঘাত ১৬৩ সতী ১৬৪ লেভেল ক্রসিং ১৬৫ ধাত ১৬৬ ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই ১৬৭ চুরিচামারি ১৬৮ দায়িক ১৬৯ মহাকর্কট বটিকা ১৭০ আর না কান্না ১৭১ মরব না শস্তায় ১৭২ এক বাড়িতে (ফেরিওলা) ১৭৩ লাজুকলতা ১৭৪ উপদলীয় ১৭৫ এদিক–ওদিক ১৭৬ এপিঠ–ওপিঠ ১৭৭ পাশ–ফেল ১৭৮ কলহান্তরিত ১৭৯ গুণ্ডা ১৮০ বাহিরে ঘরে ১৮১ চিকিৎসা ১৮২ মীমাংসা ১৮৩ সুবালা ১৮৪ অসহযোগী ১৮৫ স্বাধীনতা ১৮৬ নিরুদ্দেশ ১৮৭ পাষণ্ড (লাজুকলতা)।

এই তালিকায় যে–সব গল্প একবার কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয়ে পরে আবার আরেকটি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলি দ্বিতীয়বার আর উল্লিখিত হয়নি : যেমন, "অতসী মামী"র 'মাটির সাকী' গল্পটি "প্রাগৈতিহাসিক" গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো; 'চালক' "খতিয়ানে" প্রকাশিত হওয়ার পরে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো "ছোট বড়" গ্রন্থে; 'নব আলপনা' ও 'ব্রিজ' "মাটির মাশুলে" প্রকাশের পরে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো "ছোট বড়" গ্রন্থে; 'বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে' "মাটির মাশুলে" প্রকাশের পরে পুনর্মুদ্রিত হয় "ছোটবকুলপুরের যাত্রী" গ্রন্থে ; 'সখী' "ছোট বকুলপুরের যাত্রী"তে প্রকাশের পরে "ফেরিওলা" গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত; 'আপদ' "মাটির মাশুলে" প্রকাশের পরে "লাজুকলতা"য় পুনঃপ্রকাশিত। "মাটির মাশুল" গল্পগ্রন্থের 'ভয়ংকর' একাঙ্ক বলে এই তালিকায় পরিবর্জিত।

মানিকের জীবদ্দশায় তাঁর দুটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয় :

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। ১৯৫০। দ্বি সং ১৯৫৩।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প। ১৯৫৬।

এই দুই গল্পসংগ্রহে পূর্বগ্রন্থিত তালিকার বাইরে আছে এই কয়েকটি গল্প :

১ বিচার (শ্রেষ্ঠ গল্প) ২ প্রাক–শারদীয় কাহিনী ৩ রক্ত–নোনতা (স্বনির্বাচিত গল্প)।

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থভূত গল্প এই ১৯০টি। আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি শ–দুয়েক।

(দুই)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর কয়েকটি গল্পসংগ্রহ। এগুলি হচ্ছে :

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ। ১৯৫৭।

২. উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ। ১৯৬৩।

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (নতুনভাবে সম্পাদিত)। ১৯৬৫।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাছাই গল্প। ১৯৮১।

এইসব সংগ্রহে ইতোপূর্বে অগ্রন্থিত যে-সব নতুন গল্প সংযোজিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে :

১ বড়দিন ২ শান্তিলতার কথা ৩ সশস্ত্র প্রহরী ৪ মাছের লাজ ও মাংসের ঝাঁজ ৫ সবার আগে চাই ৬ হাসপাতালে ৭ জল-মাটি-দুধ-ভাত ৮ খাটাল ৯ দুর্ঘটনা ১০ গলায় দড়ির কেন ১১ কালোবাজারের প্রেমের দর ১২ মানুষ হতবাক নয় ১৩ ঢেউ (গল্পসংগ্রহ) ১৪ একটি বখাটে ছেলের কাহিনী ১৫ উপায় ১৬ কোন দিকে (উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ)।

যুগান্তর চক্রবর্তী মানিকের অগ্রন্থিত রচনার যে-তালিকা তৈরি করেছেন ("অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়", ১৯৭৬), তার অনেকগুলিই গল্প :

১ স্নায়ু ২ মানুষ কাঁদে কেন ৩ চোখ ৪ কলহের জের ৫ সঞ্চয়াভিলাষীর অভিযান ৬ অকর্মণ্য ৭ প্রতিক্রিয়া ৮ গৃহিণী ৯ পুত্রার্থে ১০ অপর্ণার ভুল ১১ ঘটক ১২ সন্ধ্যা ও তারা ১৩ খুনী ১৪ জোতদার ১৫ ব্যথার পূজা ১৬ সাধারণ প্রেম ১৭ জয়দ্রথ ১৮ শীত ১৯ চৈতালী আশা ২০ প্রেমিক ২১ সমানুভূতি ২২ বাজার ২৩ রাস্তায় ২৪ দলপতি ২৫ পশুর বিদ্রোহ ২৬ বাঘের বংশরক্ষা ২৭ দুটি যাত্রী ২৮ বন্ধু ২৯ অন্ন ৩০ ভীরু ৩১ শারদীয়া ৩২ ভোঁতা হৃদয় ৩৩ গোঁয়ো ৩৪ রূপান্তর ৩৫ গোঁয়ো (২নং) ৩৬ বিয়ে ৩৭ শিল্পী ৩৮ মায়া নয়—দায় ৩৯ স্টুডিও ৪০ বিচিত্র ৪১ ছোট একটি গল্প ৪২ রত্নাকর ৪৩ অগ্নিশুদ্ধি ৪৪ বিষ ৪৫ গল্প ৪৬ রোমাঞ্চকর ৪৭ ঘাসে কত পুষ্টি ৪৮ মতিগতি ৪৯ চিন্তাজ্বর ৫০ তারপর ৫১ বিদ্রোহী ৫২ চাওয়ার শেষ নেই ৫৩ মেজাজের গল্প ৫৪ পালাই! পালাই! ৫৫ সংক্রান্তি ৫৬ ডুবুরী ৫৭ জীবনের সমারোহ ৫৮ রফা ও দফার কাহিনী ৫৯ চাপা আগুন।

—তাহলে সব-মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় শ-দুয়েক গল্প গ্রন্থিত হয়েছিলো। লেখকের মৃত্যুর পরে আরো ষোলোটি গল্প গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এর বাইরে পত্রপত্রিকায় ছড়ানো আরো আটটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিশ্চিতভাবে পত্রপত্রিকায় আরো বেশ-কিছু গল্প প্রকাশিত হয়ে আমাদের অগোচর হয়ে আছে আজ। আমরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি, এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম-বেশি শ-তিনেক ছোটোগল্প লিখেছিলেন।

৪. গল্প ১৯২৮-৪৩

১৯৪৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। আমরা এই হিশেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুচ্ছকে ভাগ করবো দুটি পর্যায়ে : ১৯২৮-৪৩—প্রথম পর্যায়; ১৯৪৪-৫৬—দ্বিতীয় পর্যায়। এই বিভাজন কিছুটা কৃত্রিমভাবেই সাধিত হলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের তালিকা প্রকাশিত হলে ১৯৪৪-এর আগে-পরের গল্পগুচ্ছকে চিহ্নিত করা যাবে—তার আগে নয়। গল্পের অন্তর্বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই দুই পর্যায়ের গল্পগুচ্ছ আলোচনা করবো। সেই হিশেবে ১৯৪৪-এর পরে প্রকাশিত "ভেজাল" ও "হলুদ পোড়া"কেও আমরা '৪৪-অন্তর্বর্তী ধারার গল্প হিশেবে ধরছি। গল্পসংগ্রহগুলো বাদ দিয়ে মানিকের ষোলোটি গল্পগ্রন্থের ঠিক অর্ধেকাংশ আটটি গল্পগ্রন্থকে আমরা প্রথম পর্যায়ের আলোচ্য গল্পগ্রন্থ হিশেবে গ্রহণ করেছি ("অতসী মামী" ১৯৩৫; "প্রাগৈতিহাসিক" ১৯৩৭; "মিহি ও মোটা কাহিনী" ১৯৩৮; "সরীসৃপ" ১৯৩৯; "বৌ" ১৯৪৩/১৯৪৬; "সমুদ্রের স্বাদ" ১৯৪৩; "ভেজাল" ১৯৪০; "হলুদ পোড়া" ১৯৪৫)। কার্যত ১৯৪৬-এ প্রকাশিত "বৌ" গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত আমাদের আলোচনাপরিধি

বিস্তৃত। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগ্রন্থ হিশেবে থাকছে বাকি আটটি গল্পগ্রন্থ ("আজ কাল পরশুর গল্প" ১৯৪৬; "পরিস্থিতি" ১৯৪৬; "খতিয়ান" ১৯৪৭; "মাটির মাশুল" ১৯৪৮; "ছোট বড়" ১৯৪৮; "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" ১৯৪৯; "ফেরিওলা" ১৯৫৩; "লাজুকলতা" ১৯৫৪)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুচ্ছকে এই যে দুটি পর্যায়ে বিভাজন করে নিয়েছি (বা কেউ কেউ করেছেন তিনটি স্তরে)[১৩] এর কোনোটাই জল-অচল বিভাজ্য কোনো ব্যাপার নয়। মানিক চিরকালই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের রূপকার। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ "প্রাগৈতিহাসিক"-এর একটি গল্পে প্রাসঙ্গিক যে-কথাগুলি মানিক বলেছেন তা-ই প্রমাণ করে নিম্নবিত্তের জীবনের বিপুল বিচিত্রতা কিভাবে তাঁকে আকর্ষণ করে, তার রহস্য উন্মোচন 'অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে ওরা বেশি চিন্তা করে। জীবনের এমন অনেক সত্যের সন্ধান ওরা পায়, বহু শিক্ষিত সুমার্জিত মনের দিগন্তে যাহার আভাস নাই। কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি।... সংসারে এমন লক্ষ লক্ষ সাধু আছে, যাহাদের লইয়া আমি গল্প লিখিতে পারি না। জীবনে তাহাদের গল্প নাই। প্রেমিকের মতো, অন্যায় অসংগত চুরি-করা প্রেমের ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মতো চোরের জীবন গল্পময়।' ('চোর', "প্রাগৈতিহাসিক") সামগ্রিকভাবে নিম্নবিত্তের জীবন চিত্রণেই মানিকের কুশলতা ও আনন্দ বেশি—ডাকাত থেকে ভিক্ষুকে পরিণত ভিখু-তে যার সূচনা হয়েছিলো। ('প্রাগৈতিহাসিক')

'অতসী মামী' গল্পটি যেন অব্যবহিত-পূর্ব কল্লোল ধারাবাহিকতার চিহ্ন ধরে রেখেছে। এই গল্পের নায়কের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু কল্লোলের গল্প-উপন্যাসের একটি সাধারণ লক্ষণ। "অতসী মামী" গল্পগ্রন্থের অনেকগুলি গল্পের নায়িকাই—পরিষ্কার বোঝা যায়—কল্লোলী নায়িকাদের লক্ষণাক্রান্ত—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা প্রবোধকুমার সান্যালের নায়িকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক টের পাওয়া যায়। মানিকের "দিবারাত্রির কাব্য" (১৯৩৫) উপন্যাসের নায়িকার মতোই রোমান্টিক। মানিকের নায়িকারা ক্রমশ রোমান্টিকতামুক্ত বাস্তব ভিত্তিতে অধিষ্ঠান করে। চরিত্রের কুহেলি-প্রহেলির জায়গায় দেখা যায় একটু-বা মনোবিকলনী আবহ। কিন্তু "অতসী মামী" গল্পগ্রন্থের রচনাকাল অনুযায়ী সজ্জিত গল্পগুচ্ছে দেখা যাবে মানিক ক্রমশ স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। ঐ গ্রন্থের সর্বশেষ গল্পের নাম 'সর্পিল'—মানিক ক্রমশ মনোপৃথিবীর সর্পিলতায় প্রবেশ করছেন এই ইঙ্গিত দ্যায়।

যেটুকু রোমান্টিকতার ফেনা ছিলো তা কেটে গেলো মানিকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থেই। "প্রাগৈতিহাসিক" (১৯৩৭) এমন একটি গল্পগ্রন্থ, যেখানে মানিক নিজেকে দাঁড় করালেন বস্তুভিত্তির উপরে। দরকার ছিলো মধ্যবিত্ত রোমান্টিকতার জগৎ থেকে মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের বস্তুবাদী জগতে মানিকের চলে আসা। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থেই মানিক নিজস্বতা পেলেন।

আশ্চর্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প, 'অতসী মামী' গল্পটাই, চলতি ভাষায় লেখা। "অতসী মামী" গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই লেখা হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তী গল্পগ্রন্থ "প্রাগৈতিহাসিক"-এ, দেখা যাচ্ছে, মানিক কেবলমাত্র সাধু রীতিই অবলম্বন করেছেন। সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই মানিক স্বচ্ছন্দ তা ঠিক, কিন্তু মানিকের সাফল্য সম্ভবত সাধু রীতিতেই উজ্জ্বলতর। "প্রাগৈতিহাসিক" গ্রন্থের সবগুলি গল্পই সাধু রীতির। মানিক যখন স্বভূমিতে উত্তীর্ণ ও অধিষ্ঠিত হলেন, তখন, দেখা যাচ্ছে সাধু গদ্যই তাঁর অবলম্বন। কিন্তু গদ্যভাষার কথা নয়, "প্রাগৈতিহাসিক" বইএর গল্পগুচ্ছে মানিকের অভীষ্ট হয়ে উঠলো মানুষের মনোজগতের রহস্য উন্মোচন। 'ফাঁসি' গল্পে খুনের আসামী গণপতির একবারে ফাঁসির হুকুম হয়ে গেলো, তারপর শেষ-মুহূর্তে ফাঁসির হুকুম রদ হওয়ায়

সে বেঁচে গেলো। অদ্ভুত মানিকের মনোবিশ্লেষণ : 'জীবন ফিরিয়া পাইয়া তার [গণপতির] নিজেরও তেমন উল্লাস হইল কই?' কিন্তু ফাঁসির আসামীর পরিবারে এক ঝড় বয়ে গেছে : সামাজিক লজ্জা, সামাজিক উৎপীড়ন। গণপতির বোনকে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানুষের ঘৃণা ও কৌতূহল কী-পরিমাণ দুর্বহ হয়ে উঠেছিলো গণপতির স্ত্রী রমা যখন গণপতিকে চিরতরে ঐ বাড়ি ছেড়ে যাবার প্রস্তাব করে তখনো বোঝা যায় না। বোঝা যায় গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে : 'পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকিলের বাড়িতে একটা বিরাট হৈ চৈ শোনা গেল। বাড়ির মেজো বৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।' একদিকে এরকম মনোবিশ্লেষণ, অন্যদিকে নিচুতলার মানুষের প্রতি মানিকের যে চিরন্তন আগ্রহ তারও স্বীকৃতি আছে 'চোর' গল্পে। এই গল্পের নায়ক মধু একজন চোর। তার কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মানিক বলছেন, 'সংসারে এমন লক্ষ লক্ষ সাধু আছে, যাহাদের লইয়া আমি গল্প লিখিতে পারি না। জীবনে তাহাদের গল্প নাই। প্রেমিকের মতো, অন্যায় অসংগত চুরি-করা প্রেমের ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মতো চোরের জীবন গল্পময়।' এই চোর-ভিখিরিদের প্রতিই আমরা দেখেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনিবার আগ্রহ। 'চোর' গল্পের মধ্যখানে মধু-র ভাবনার ভাষা এরকম : মধু 'ভাবিল, কিসের পাপ? জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।' মধু-র এই ভাবনাই বাস্তবায়িত হলো যখন রাতে রাখালের বাড়িতে চুরি করে বাড়িতে ফিরে এসে মধু দ্যাখে ঘর শূন্য—কাদু পালিয়েছে রাখালেরই বড়ো ছেলে পান্নাবাবুর সঙ্গে। নিচুতলার জীবনের রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে আদিমতার জয়গান :

> হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

ডি.এইচ. লরেন্স-এর সঙ্গে উচ্চারণের কিছু সাধর্ম্য সত্ত্বেও এখানেই, এবং অন্যত্র, আমরা লক্ষ্য করি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চরিত্রপাত্রের সঙ্গে ওরকম একাত্ম হয়ে যান না, একটি দূরত্ব রক্ষা করেন। এই দূরত্বের ফলেই মানিকের ১৯৪৪এর পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত হতে থাকে মানুষ ও পৃথিবী ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে—এমনকি ঐ প্রথম পর্যায়েও তিনি বহু বিচিত্র জগৎ চিত্রিত করেন। অন্য একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়—'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের মতো মানিকের আরো কোনো কোনো গল্পের উপসংহারে লেখকের মন্তব্য যোজিত হয়। যেমন 'সরীসৃপ' গল্পের শেষে :

> ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

এরকম মন্তব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গল্পেই আছে। "সরীসৃপ" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিত্বশীল গল্পগ্রন্থ, আরেকটি প্রতিভূ গল্পগ্রন্থ "বৌ"। "বৌ" গল্পগ্রন্থের তেরোটি গল্পে বিচিত্র পেশাজীবী মানুষের স্ত্রীদের মনোজগতের বিস্ময়কর চিত্রণ প্রমাণ করে মানিক অন্তর্জগতের কোন্ গভীর স্তরে-স্তরান্তরে প্রবেশ করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "বৌ" গল্পগ্রন্থটি। একশো বছরের বাংলা গল্পসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "বৌ" গল্পগ্রন্থটি।

৫. গল্প ১৯৪৪-৫৬

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের প্রধান লক্ষণ কালচেতনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতার মোহভঙ্গ—অনেক গল্পের পৃষ্ঠপট রচনা করেছে। মধ্যবিত্ত জীবন থেকে তাঁর দৃষ্টি ক্রমশ চলে এসেছে অনেকখানি নিম্নবিত্তে। অন্তর্বাস্তবতা কখনো তিনি পরিবর্জন করেননি, বহির্বাস্তবতা এখন বড়ো জায়গা দখল করেছে। মনোজগতের চিত্রণের চেয়ে বহির্জগতের চিত্রণ হয়ে উঠেছে প্রধান। এক-একটি গল্পে তাই অনেক সময়ই দেখা গেছে ভিড় করে আছে অজস্র চরিত্র। মানিক নিজেই অনেকসময় তাঁর সচেতনতার কথা জানিয়েছেন : 'আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।' ('কেন লিখি'[১৪]) 'ছেলেবেলা থেকে "কেন ?" নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোটো বড়ো সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ।' ('গল্প লেখার গল্প') দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে 'কেন ?'-র স্পষ্ট জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন গল্পের মধ্যেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই গল্পের নাম হয় 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'গলায় দড়ির কেন', 'মানুষ কাঁদে কেন' এরকম। এখন আর গল্পের নাম হচ্ছে না 'সরীসৃপ', 'সর্পিল', 'প্রাগৈতিহাসিক'। এখন নামের মধ্যেই উদ্দেশ্যমূলকতা পরিষ্কার ধরা পড়ছে কখনো কখনো : 'ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই', 'আর না কান্না', 'মরবো না শস্তায়', 'সবার আগে চাই' ইত্যাদি। এই পর্যায়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে মানিক তাঁর বাস্তবতার আরাধনার কথা বলেছেন। একইসঙ্গে তাঁর মধ্যে আদর্শিকতা যে কী প্রবল ছিলো তারও প্রকাশ ঘটেছে : 'লেখক কে ? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান।' ('সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ'[১৫]) বাস্তবিকতা আর আদর্শিকতার সমন্বয় মানিকের দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোটোগল্পের একটি প্রধান বিশিষ্টতা।

সমকালীন দেশ-কাল ধারণের চেষ্টা শুরু হয় মানিকের "আজ কাল পরশুর গল্প" (১৯৪৬) গল্পগ্রন্থ থেকে। এই পরিবর্তনের শুরু আসলে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের কাল থেকে। চিন্মোহন সেহানবীশেরা একটু অবাকই হয়েছিলেন মানিকের কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করায়। প্রথম থেকেই মানিক সমাজের নিচুতলার জীবন যাপনের রূপদাতা। সংবেদী মানিক "পদ্মানদীর মাঝি" (১৯৩৬) উপন্যাসেই কি এই পঙ্ক্তিগুলি রচনা করেননি ?—'ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলনপিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরীবের মধ্যে সে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোট লোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।' "পদ্মানদীর মাঝি"র নায়ক কুবেরের বর্ণনা এই। উত্তরকালে এই কুবেররাই মানিক-সাহিত্যে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী। কুবের যে-জেলেপাড়ার অধিবাসী, তার বর্ণনা এরকম : 'জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। *ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।*' উত্তরকালের যে-পরিবর্তিত মানিক, এখানে কি তাঁকে

আমরা দেখছি না ?—সুতরাং মানিকের কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করা, সাহিত্যদৃষ্টির পরিবর্তন কোনো আকস্মিকতার ফল নয়—ধারাবাহিকতার ফল। প্রথম পর্যায়েই মানিক শুধু অসাধারণ গল্প লিখেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে লিখতে পারেননি এই উক্তি অযথার্থ। 'হারানের নাতজামাই', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'রাসের মেলা', 'একান্নবর্তী'র মতো গল্প লেখেননি মানিক এই পর্যায়ে ? মনে হয়, ১৩৫০ বা ১৯৪৩-৪৪-এর মন্বন্তর মানিকের চেতনায় বড়োরকম ঘা দিয়েছিলো। মন্বন্তর সেদিন চিহ্নিত হয়েছিলো কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নাটকে চিত্রকলায় গানে—ভাস্কর্যে পর্যন্ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) "অশনিসংকেত", তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) "মন্বন্তর", গোপাল হালদারের (১৯০২-৯৩) "পঞ্চাশের পথে", "ঊনপঞ্চাশী" ও "তেরো শো পঞ্চাশ" ত্রয়ী উপন্যাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিন্তামণি" (১৯৪৬) ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের বিখ্যাত উপন্যাস। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের অনেক গল্পকারই দুর্ভিক্ষ নিয়ে গল্প লিখেছিলেন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-৮৩), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪-১৯৬৩), সরোজকুমার রায় চৌধুরী (১৯০৩-৭২), মনোজ বসু (১৯০১-৮৭), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১), ননী ভৌমিক (১৯২২-৯৫), নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭), সুশীল জানা (১৯১৬), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) প্রমুখ। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই দুর্ভিক্ষের শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের কবিতা নিয়ে সংকলন করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭), "আকাল"। ঐ ১৯৪৪ সালেই দুর্ভিক্ষের গল্প-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬)। "মহামন্বন্তর" নামের ঐ সংকলনে গৃহীত হয়েছিলো মানিকের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষের প্রথম ও প্রধান গল্পসংগ্রহ "আজ কাল পরশুর গল্প" (১৯৪৬/জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩)। 'বৈশাখ ১৩৫৩' চিহ্নিত ভূমিকায় মানিক লিখেছেন, 'গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।' সেদিক থেকে মনে হয় মানিকের দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী অধিকাংশ গল্প দুর্ভিক্ষকালের অব্যবহিত পরের রচনা। "পরিস্থিতি" (১৯৪৬), "খতিয়ান" (১৯৪৭), "ছোট বড়" (১৯৪৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলিতেও মানিকের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রী গল্প আছে। মানিকের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রী গল্প এগুলি :

> ১ আজ কাল পরশুর গল্প ২ দুঃশাসনীয় ৩ নমুনা ৪ গোপাল শাসমল ৫ রাঘব মালাকর ৬ কৃপাময় সামন্ত ৭ নেড়ী (আজ কাল পরশুর গল্প), ৮ সাড়ে সাতসের চাল ৯ প্রাণ (পরিস্থিতি) ১০ ছিনিয়ে খায়নি কেন (খতিয়ান) ১১ ধান (ছোট বড়) ১২ কে বাঁচায়, কে বাঁচে! (শ্রেষ্ঠ গল্প) ইত্যাদি।

"আজ কাল পরশুর গল্প" এই নামের মধ্যেই সাম্প্রতিকতা সূচিত। নাম-গল্পটিতে চরিত্রের পর চরিত্র : প্রধান ভূমিকা রামপদ আর তার বৌ মুক্তার; অন্যান্য চরিত্র সুদাম, নিকুঞ্জ, গদা, গোকুল, গদাধর, সুরমা, নন্দী, বনমালী, করালী, কানাই, ভুবন, ফণি, শঙ্কর, গিরির মা, আর ঘনশ্যাম দাস ও গিরি। গল্পটা তুলে এনেছে মন্বন্তরের সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত। রামপদর বৌ মুক্তা অভাবে পড়ে মানসুকিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। এখন মুক্তা ফিরে এসেছে কয়েক মাস পরে। নিয়ে এসেছে কয়েকজন গ্রামকর্মী। মুক্তাকে গ্রহণ করতে রামপদ অরাজি নয়। কিন্তু ঘনশ্যাম দাস আর তার দলবল বাধা দেবার ষড়যন্ত্র আঁটে। এই উপলক্ষে একটা সমাবেশও ব্যবস্থা করে ঘনশ্যাম। কিন্তু ঘনশ্যামের ব্যবহৃতা গিরি আগেই ঘনশ্যামকে বলে রেখেছিলো, 'মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না ? ওর [রামপদর] বৌকে

ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি ? মোকে একঘরে করবে না সবাই ?' সভার মধ্যে গিরি, বনমালী, করালীরা এমন-সব প্রশ্ন তোলে যে সুবিধে করতে পারে না ঘনশ্যাম আর তার লোকেরা। সভা ভেস্তে যায়। অর্থাৎ মুক্তা ঠিকই রামপদর ঘরে পুনর্গৃহীত হয়। কিন্তু মুক্তা আর রামপদর কাহিনী বয়ানই মানিকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য। তাই—গ্রামে-ফেরা গিরিকে চিনতে পারে না গিরির মা। গল্প শেষ হয় গিরির প্রতি গিরির মা-র এই মর্মভেদী মন্তব্যে : 'কে গো বাছা তুমি ? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে ?' 'দুঃশাসনীয়' গল্পেও চরিত্র অনেক : পাঁচী, মানদা, বৈকুণ্ঠ, কাজু, রঙ্কু, ভূতি, রাবেয়া, আনোয়ার, আমিনা, অবিনাশ, ভোলা ইত্যাদি। হাতিপুর গ্রামের এইসব মানুষের বস্ত্রের অভাব সীমা ছাড়িয়েছে। এখানেও লেখকের লক্ষ্য দুর্ভিক্ষের পুরো পরিপ্রেক্ষিত তুলে আনা। গল্পের শেষে তাই এরকম একটি নিরাবেগ দীর্ঘ বাক্য : 'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নিচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইলো।' 'নমুনা' গল্পে দেখানো হয়েছে টাকার খেলা। দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে কেশব চক্রবর্তীর মেয়ে শৈলকে শহরে নিয়ে এসেছে নারীব্যবসায়ী কালাচাঁদ। কেশবের শেষ-অনুরোধে নাম-কে-ওয়াস্তে বিয়ের মন্ত্র পড়ে। কিন্তু কালাচাঁদের বাধে কোথাও—শৈলকে সে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। তার এসব কাজের সঙ্গিনী মন্দোদরী শেষ-পর্যন্ত শৈলকে চালব্যবসায়ী গজেনের হাতে সঁপে দ্যায়। শুনে 'কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল।' কিন্তু মন্দোদরী যখন তার হাতে একতাড়া নোট তুলে দ্যায়, তখন কালাচাঁদ টাকা গুনতে থাকে। 'গোনা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' হিন্দু পুরাণের দ্রৌপদী-দুঃশাসনের রেফারেন্স মানিক নানাভাবে এনেছেন তাঁর দুর্ভিক্ষকেন্দ্রী গল্পগুচ্ছে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি স্মরণীয়। ('দুঃশাসনীয়' শব্দটিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মাণ। মানিক-সাহিত্যে এরকম মানিক-নির্মিত কিছু শব্দপুঞ্জও আছে।) 'রাঘব মালাকর' গল্পের প্রথমেই তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে পাঠকের উদ্দেশে কিছু কথা আছে সরাসরি। কথাগুলি এই : '[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলাদেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন... তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক সেই কথাই বলবেন...]' মানিকের গল্প কখনোই একরৈখিক নয়—সর্বদাই একটু ঘোরানো-প্যাঁচানো। 'রাঘব মালাকর' গল্পে গৌতমের কাছ থেকে কাপড় ছিনিয়ে নেয় রাঘব ও তার গ্রামবাসীরা। গল্পের শেষে এসে আমরা দেখি, পুলিশ যখন রাঘব ও গ্রামবাসীকে কাপড় লুট করবার জন্যে গ্রেফতার করতে যায়, তখন দ্যাখে : গ্রামবাসীদের মধ্যে 'লুট-করা কাপড়ের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দুজন, আহত হয়েছে অনেক। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।' 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পটি দুর্ভিক্ষে গ্রাম উজাড়-হওয়ার কাহিনী। ৪-পৃষ্ঠার ছোট্ট গল্পটি আশ্চর্য বর্ণনার গুণে ভরাট পারিবারিক জীবনের পূর্ণতা থেকে শূন্য হয়ে যাওয়ার জীবন্ত কাহিনী। কয়েকটি উত্তরহীন সংলাপ রাত্রির ছমছমে আবহাওয়াকে এবং অতীতের ভরা সুখের দিনগুলিকে আশ্চর্য কুশলতায়

সামনে এনেছে :

'মনাদা!'

প্রথমবার একটু আস্তেই ডাকলো সন্ন্যাসী। তারপর জোরে।

'মনাদা!'

সাড়া নেই।

'সুবল কাকা!'

সাড়া নেই।

'সুখী পিসি!'

সাড়া নেই।

সন্ন্যাসী একটু দম নিলো।

'সোনা বোঠান।'

সাড়া নেই।

'সোনা বোঠান! সোনা বোঠান!'

গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আরেকটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।

'সাড়া নেই।' এই দুটি শব্দের পুনঃপুনঃ ব্যবহার পুরো পরিবেশটিকে জীয়ন্ত করে তুলেছে। 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পে মানিক জবাব খুঁজেছেন মন্বন্তরে মানুষ না-খেয়ে মরেছে কিন্তু তারপরও তারা ছিনিয়ে খায়নি কেন। যোগী ডাকাত এই প্রশ্নের উত্তর দ্যায় এভাবে : 'সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন। একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ফিরিয়ে যায়।' মানিকের স্বভাবশোভন তির্যকতায় গল্পের শেষাংশ অন্য জায়গায় চলে যায়; যোগী যখন জেলখানায় তখন তার বৌকে চলে যেতে হয়েছিলো মন্দ বস্তিতে, জেল থেকে বেরিয়ে যোগী তাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে। গল্পের শেষ হচ্ছে এভাবে : 'তার পরিবার খেতে না-পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো ? যেভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো ? তারপর আর কোন্ কথা আছে ?' অদ্ভুত গল্প 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!'। অফিসে যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় জীবনে প্রথম অনাহারে মৃত্যু দেখে এমনভাবে আলোড়িত হল যে তার সহকর্মী বন্ধু (নিখিল) বা স্ত্রী (টুনুর মা) তাকে ফেরাতে পারে বিচিত্র এক মনোবিকলন থেকে। অফিস সে করে না আর, তার সিল্কের জামায় ধুলো জমে, ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া তার পরনে, দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোটো একটা মগ হাতে মৃত্যুঞ্জয় কাড়াকাড়ি করে খায় লঙ্গরখানার খিচুড়ি। বলে, 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।'—দুর্ভিক্ষের গল্পগুচ্ছে মানিক দুর্ভিক্ষের নানারকম স্তর-স্তরান্তরের ছবি তুলে রেখেছেন চিরকালের মতো : মানুষের বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগৎ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকটি গল্পে : 'তারপর ?', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'কৃপাময় সামন্ত' (আজ কাল পরশুর গল্প), 'প্রাণ' (পরিস্থিতি) ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী জীবনের ছবি আছে 'রাসের মেলা', 'মাসি-পিসি', 'অমানুষিক' (পরিস্থিতি) ইত্যাদি গল্পে। 'রাসের মেলা' গল্পের নায়িকা দত্তবাড়ির কাজের মেয়ে খাদু—পূর্ববঙ্গ থেকে যে গিয়ে ভিড়েছে কলকাতায়। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের বিপরীত 'অমানুষিক' গল্পটি। বলিষ্ঠ ভিখিরি ভিখুর পরিবর্তে এখানে আছে ভীরু ভিতু পরাজিত ছিদাম। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ মানুষকে বানিয়েছে এরকম। দুর্ভিক্ষের সময় বুড়ি মা, জোয়ান বৌ কুজা আর কচি মেয়েকে ফেলে ছিদাম একা চলে গিয়েছিলো শহরে। সেখানে সে ভিক্ষা করে বেঁচে যায়। তারপর অনেকদিন পরে একদিন গ্রামে ফিরে এসে দ্যাখে, অবাক কাণ্ড : 'তার ভাঙাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো পরিষ্কার, তার কঙ্কালসার বৌটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতী।' কুজার কাছেই ছিদাম জানে, তার মা আর মেয়েটা মারা গেছে, শুধু বেঁচে আছে সে—কুজা, ললিত কাকুর রক্ষিতা হয়ে। কুজা কি সুখী ? ছিদামের মনে হয় 'কেমন যেন হয়ে গেছে কুজা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা।' গল্পের শেষে হঠাৎ-ফিরে-আসা ললিতবাবুর সাড়া পেয়ে 'কুজা নড়েও না, সাড়াও দেয় না, উদাসীনের মতো বসে থাকে।/'খুলে দে।' ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই।' মর্মভেদী মর্মচ্ছেদী অসাধারণ গল্প 'অমানুষিক'—ভয়ংকর পরিস্থিতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের কাহিনী।

সমকালীন এইসব ছবি আঁকতে আঁকতেই মানিক হয়ে উঠলেন ক্রমশ প্রতিবাদী। "পরিস্থিতি" (১৯৪৬) গ্রন্থের 'শিল্পী' গল্পেই ভাষা পেলো সেই প্রতিবাদ। মদন তাঁতী সূক্ষ্ম শিল্পিত কাজ ছাড়া করে না। কাজ নেই তার। দুরবস্থার চরম। মহাজন ভুবনকে পাঠিয়েছে মদনের কাছে, 'সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। মদন নারাজ। শেষ-পর্যন্ত মদন রাজি হয়ে যায়। সুতো এসে যায়। রাতে মদনের তাঁতের শব্দ শুনে লোকে ভেবেছে মদন তাহলে হার মেনেছে। কিন্তু মদন শেষ-পর্যন্ত ভুবনের সুতো ফেরৎ দিয়ে দ্যায়। তাহলে সারারাত তাঁত যে চললো ? তাঁতীপাড়ার অর্ধেক মেয়ে-পুরুষ খোঁজ করতে যায় যখন, তখন মদন বলে, 'চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিচ ধরল পায়ে হাতে, তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত বুনব ? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে ?' এই অপরাজেয় মনোভাবনার প্রকাশ মানিকের উপান্ত অনেকগুলি গল্পে।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ভিত্তিক কিছু গল্প লেখেছিলেন মানিক। ১৯৪৬-এর কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মানিকের ডায়েরির দুএকটি অংশের সামান্য উদ্ধৃতি[১৬] :

> [১৬ আগষ্ট ১৯৪৬। শুক্রবার।]
> কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম।
> [১৭ আগষ্ট ১৯৪৬। শনিবার।]
> বিকালে এ অঞ্চলে শান্তিসভা হবে শুনলাম। খুশি হয়ে নিজে বার হলাম—যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি—মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার—কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বললেন মেরে পুড়িয়ে তারপর এখন মিটমাটের কথা কেন ? অন্যেরা তাঁদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নিচে যেতে এল বিরোধিতা—হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট—মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে! 'ব্যাটা কমিউনিষ্ট' বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।
> [১৮ আগষ্ট ১৯৪৬। রবিবার]
> ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। 'শালা কম্যুনিষ্ট!' 'মুসলমানের দালাল!' রব উঠছিল চারদিকে।

'ছেলেমানুষি', 'স্থানে ও স্তানে' (ছোট বড়)—এসব গল্প ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ভিত্তিতে রচিত। 'ছেলেমানুষি' গল্পের বাড়ির দেয়াল-কেন্দ্রী প্রথম নিরীহ বাক্য 'ব্যবধান

টেকেনি' আসলে গল্পের অন্তর্মূলে আলো ফ্যালে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমেও আবার ফিরে আসে বাক্যটি। পাশাপাশি দুই বাড়ির তারাপদ আর তার বৌ ইন্দিরা এবং নাসিরুদ্দীন আর তার বৌ হালিমা এবং তাদের দুই শিশুসন্তান গীতা আর হাবিব এই গল্পের প্রধান চরিত্র। হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা বড়োদের যখন প্রভাবিত করে, ছোটোরা তখন কী করে ?—

'দাঙ্গা দাঙ্গা খেলবি ?' গীতা বলে।

'লাঠি কই ? ছোরা কই ?' প্রশ্ন করে হাবিব।

গীতা বলে, 'দাঁড়া।'

গীতা চুপি চুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।

গীতা আর হাবিবকে নিয়ে যখন দুই হিন্দু–মুসলমান পরিবারকে কেন্দ্র করে বড়ো আকারে হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা বাধার উপক্রম, তখন দেখা যায় গীতা আর হাবিব চিলেকোঠার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি : 'কখন যে তারা দুজন চুপি চুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল!'

কয়েকটি গল্পে আছে স্বাধীনতা–পরবর্তীকালের মানুষের অপরিবর্তিত ভাগ্যলেখার বিপন্নতার প্রতিচিত্রণ। এরকম একটি গল্প 'সখী' (ছোটবকুলপুরের যাত্রী)। রানী আর বিভা দুই সখী। বিভার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে রানী। কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেলো দুই সখী দাঁড়িয়ে আছে একই সমতলে—চূড়ান্ত অভাবের মধ্যে। গল্প শেষ হয় এক অপরাজেয় প্রতিজ্ঞায় : 'কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করার ? সংসারে কুলি–মজুরও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।' 'একান্নবর্তী' গল্পে মানিক দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক সাম্যই আসল ভিত্তি। চার ভাই বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেনের রোজগার এক একরকম বলে। কেরানী হীরেন (আর তার বৌ লক্ষ্মী) ভাইদের সংসারে তিষ্ঠোতে পারে না—জোট বাঁধে অন্য কেরানীদের সঙ্গে। লক্ষ্মী একদিন দুঃখে বেদনায় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো। এখন সুখী : 'ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনীর মতো বাঁচতে সে রাজি নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।' 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (ছোটবকুলপুরের যাত্রী)–র মতো গল্পে শুধু তৈরি হয়ে উঠেছে একটি রাজনৈতিক মণ্ডলের আশ্চর্য আবহ। 'আর না কান্না' গল্পে কাহিনী থামিয়ে (গল্পের মাঝপথে) মানিকের অদ্ভুত আত্মঘোষণা : 'হে রাত আটটার তারায়–ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে।'

মানিকের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুচ্ছে উঠে এসেছে সমকালীন দেশ–কাল : দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ, 'ঝুটা' স্বাধীনতা, রাজনীতি, মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের সংগ্রামমুখর জীবন, প্রতিবাদ, শ্রেণীসাম্য, জিজীবিষা। কিন্তু একরৈখিক নন এখানেও—বহুমাত্রিক, বহুস্তর, বহির্বাস্তবের সঙ্গে এখানেও দেখা গেছে অন্তর্বাস্তব, শ্রেণীচেতনার কথা বললেও যৌনচেতনাকে অস্বীকার করেননি এখানেও। এখানেও মানিক মানিক।

৬. দুই পর্যায়ের দুটি প্রতিভূ-গল্প : 'সরীসৃপ' ও 'হারানের নাতজামাই'

(এক)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পর্যায়ের—ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয়—দুটি প্রতিভূ-গল্প হচ্ছে 'সরীসৃপ' ও 'হারানের নাতজামাই'। গল্প দুটির বিশদ বিশ্লেষণ আমরা এখানে উপস্থিত

করছি। 'সরীসৃপ' "সরীসৃপ" (১৯৩৯) গল্পগ্রন্থের নাম-গল্প। 'হারানের নাতজামাই' মানিকের "ছোট বড়" (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূত। দুটি গল্পই জগদীশ ভট্টাচার্য ও যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প" (১৯৫০/১৯৭১) এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত "Primeval and Other Stories" (১৯৫৮) সংকলনে স্থান পেয়েছে। দুটি গল্পই বিখ্যাত।

(দুই)

সাধারণ ছোটো গল্পের আয়তনের তুলনায় 'সরীসৃপ' গল্পটি আকারে একটু বড়ো—৩২-পৃষ্ঠার (যে-সংস্করণটি আমি ব্যবহার করেছি তার কথা বলছি : "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প", যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত, ১৩৭৮)। গল্পটি বৃহৎ, বিরতিজ্ঞাপক আটটি অংশে বিভক্ত; আর ঐ আটটি অংশে গল্পটি ধাপে-ধাপে বিকশিত হয়েছে একমুখিতার কারণে, বৃহৎ হ'য়েও গল্পটি শেষ-পর্যন্ত ছোটো গল্পের স্বধর্মই রক্ষা ও উদযাপন করেছে। আর ঐ ৩২-পৃষ্ঠাব্যাপী গল্পটি পড়তে-পড়তে খুলে গেছে—কোনো দ্রুততায় বা মন্থরতায় টাল খায়নি—জৈবনিক স্বাভাবিকতায় শেষ-পর্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে গেছে। একাভিমুখী ও জৈবনিক স্বাভাবিকতায় প্রতিবিম্বিত গল্পটির কাহিনীর সারাৎসার এরকম।—

চারু স্বামী-শ্বশুরের উত্তরাধিকারিণী হিশেবে একটি বিরাট বাগানবাড়ি পেয়েছিলো। শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি ও বাগান সে আর নিজের করায়ত্ত রাখতে পারলো না—শ্বশুর রামতারণের মোসাহেব-পুত্র বনমালীর হাতে চ'লে যায়। চারুর স্বামী ছিলো পাগল, তার ছেলে ভুবনও অপরিণতমস্তিষ্ক। প্রথম যৌবনে বনমালী চারুর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতো; কিন্তু চারু তখন তাকে পাত্তা দ্যায়নি। বিধবা ও অসহায় অবস্থায় চারু বাড়ি রক্ষার্থে ও নিজের পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় যখন বনমালীকে তুষ্ট করতে চায়, তখন সে 'একজন প্রৌঢ়া নারী', তার প্রতি বনমালীর আকর্ষণ ততোদিনে অন্তর্হিত। চারুর ছোটো বোন পরী কিন্তু বনমালীকে প্রশ্রয় দ্যায়—বিশেষত সে যখন বিধবা হ'য়ে ঐ বাড়িতে এসে পড়ে, তখন বনমালীর সঙ্গে শারীর-সম্পর্ক স্থাপন করে। বনমালীকে কেন্দ্রে রেখে দুই বোনের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা চরম বিদ্বেষের রূপ নেয়। চারু পরীকে সুকৌশলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে কলেরার বীজ বহনকারী পাথরের বাটি থেকে প্রসাদ খেতে দ্যায় : কিন্তু কলেরায় নিজেই প্রাণত্যাগ করে। তারপর পরী জড়বুদ্ধি চারুর ছেলেকে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মৃত্যুবরণ করার অবধারিত ব্যবস্থা করে। এদিকে বনমালী ভোগদখলের পর শূন্য পাত্রের মতো পরীকে নামিয়ে দ্যায় 'এ-বাড়িতে যাদের স্থান ঝি-চাকরেরও নীচে' তাদের কাতারে। চারুর মৃত্যুর পর তার ছেলের প্রতি বনমালীর যে-মমত্ব দেখা দিয়েছিলো, তাও দেখা যায় ক্ষণকালীন। তার মা চারুর ছেলের খোঁজ করতে বলায় বনমালী শুধু উচ্চারণ করে, 'আপদ গেছে, যাক।'

গল্পের চরিত্র অনেকগুলো : চারু, পরী, বনমালী, রামতারণ (চারুর শ্বশুর), ভুবন (চারুর ছেলে), খোকা (পরীর ছেলে), কনক (তারকেশ্বরের একটি বৌ), শিশু (কনকের দেওর), কেষ্ট (চাকর), পদ্ম (ঝি), ক্ষেন্তি (ঝি)। এইসব চরিত্রকেই যথাযথ রূপ দেওয়া হয়েছে—হয়তো দু'একটি বাক্যে বা তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপে, তাতেই তারা জীবন্ত। যেমন, রামতারণ সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা 'নিজের পাগল ছেলের বৌ বলিয়া নয়, স্ত্রীজাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত।' আসলে রামতারণেরই চরিত্রহীনতার সূচক। কিংবা চারু যখন পদ্মকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তার অনুপস্থিতিতে ভুবনের সঙ্গে কে কেমন ব্যবহার করেছে,

তখন : 'ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।' পদ্ম–র চরিত্রকেও এইভাবে দ্বিমাত্রিকতা দান করা হয়েছে—কেবল চারুর হুকুমবরদার দাসী হিশেবে নয়। কিন্তু এইসব চরিত্র এই গল্পের পার্শ্বচরিত্র, কেন্দ্রচরিত্র তিনজন : চারু, পরী ও বনমালী।

চারু ও পরীর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও ভালোবাসার টানাপোড়েন পুরো গল্পে বিধৃত। শেষ–পর্যন্ত ভালোবাসার অবলেশমাত্র থাকেনি আর, ঈর্ষা এমন প্রকট আকার ধারণ করেছিলো যে চারু পরীকে হত্যার মতলব এঁটে কলেরা রোগীর ব্যবহৃত পাথরের বাটিতে প্রসাদ খেতে দ্যায়; আর পরী তো বোধহীন ভুবনকে চলন্ত রেলগাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার বুদ্ধিই দিয়ে দ্যায়। এইসব হত্যা ও হত্যার চেষ্টার তুলনায় বনমালীর আচরণের নির্মমতা ও ভয়াবহতা কোনো অংশে কম নয়। বরং বেশি।

প্রথম যৌবনে যুবতী চারুকে পাহারা দিতে গিয়ে বনমালী ভিতরে–ভিতরে শরীরে–মনে প্রচণ্ড আকৃষ্ট হয়েছিলো তার প্রতি। গল্পকার পরিষ্কার বলেছেন : 'চারু তার [বনমালীর] প্রথম বয়সের নেশা; অদম্য অবুঝ বহুকালস্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে, চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহমন দিয়া চাহিয়াছিল।' কিন্তু চারু তাকে পাত্তা তো দ্যায়ইনি, বরং লেখকের ভাষায় 'রীতিমত তাহাকে লইয়া খেলা করিত।' চারু নিজের স্বাভাবিক যৌনচাহিদাকে সংযত রেখেছিলো : 'নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে' লড়াই ক'রে বিজয়িনী হয়েছিলো। বনমালীর মূল আকর্ষণ ছিলো চারু। পরীর প্রতি বনমালী তখনই আকৃষ্ট হয়, যখন সে হঠাৎ খেয়াল করে, '.....বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা।' অতঃপর পরীর প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ জন্মায়—এবং অতিদ্রুত তাদের সম্পর্কের নিম্নাবতরণ ঘটে। বস্তুত পরীর প্রতি বনমালীর কোনো মানসিক সম্মোহ ছিলো না, সম্পূর্ণই ছিলো সম্ভোগবৃত্তি। সুতরাং সম্ভোগের পর পরীকে ক্ষেন্তির পাশের ঘরে যে স্থান নিতে হয়, তা ছিলো একান্ত স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবেই পরীর 'নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল।'

বনমালী ধর্ষকামী পুরুষ। লেখকের বর্ণনাতেই আছে 'বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি'র কথা। বনমালীর ধর্ষকামিতার আরো পরিচায়ক : 'এদিকে বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল।' কিংবা 'পরীকে এখন সে [বনমালী] অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল–তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।' এই ধর্ষকামিতার কারণেই 'পরীর সামনেই' বনমালী চারুর ছেলেকে একটি বাড়ি লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দ্যায়। অবিবাহিত, মধ্যবয়সী পাটের দালাল বনমালীর নির্বিকার ভোগলিপ্সার আরো সাক্ষী ঐ বাড়িতেই আছে।

সম্পর্কের বৃত্ত আর প্রতিবৃত্ত রচনা করে চলেছে মানুষের মন। ছিলো একদিন, যখন 'বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।' আর তারপর একদিন অবস্থা ঘুরে যায় : 'বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।'

গল্পের কোথাও বাস্তবতা লংঘন করা হয়নি। প্রত্যেকটি স্তর পরম্পরাবাহিত। বিবাহিতা, অবিধবা, সন্তানের জননী পরীকে আমরা প্রথমেই দেখেছি বনমালীর প্রতি আকৃষ্টা, বনমালীর অধিকারবোধ নিয়ে চারুর প্রতি ঈর্ষাতুরা। বিধবা হ'য়ে তার ক্ষুধিত অতৃপ্ত যৌবন যেন মুহূর্তমাত্র শামাল দিতে পারে না নিজেকে। বনমালী যখন তরুণী সদ্যবিধবাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই পাউডার মেখেছিস ?' তখন পরীর অগোপন জবাব : 'মেখেছিই তো, একশ'বার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন ?' বিধবা হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পরী বনমালীর সঙ্গে শারীর-সম্পর্ক স্থাপন করে অংশত তার নিজের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধার জন্যে, অংশত তার সন্তানের স্বর্ণমণ্ডিত ভবিষ্যতের আশায়।

দুই বোনই প্রকাশ্যে নব্যধনী বনমালীকে তোষামোদ করে। রূপসী ছোটো বোন সম্ভোগউন্মত্তা পরীরানী বনমালীকে বলে, 'তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধানে থাকব!' আর বড়ো বোন অতৃপ্তকামা চারুদর্শনা বনমালীকে মিনতি করে, 'আমি যদি তোমার মনে কোনো দিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—'

এরকম তমসাচ্ছন্ন গল্পেও মানিক কিন্তু ফর্স্টর-কথিত বৃত্তচরিত্র অংকনই করেন শেষ-পর্যন্ত। ফলে দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই ক'রে বিজয়িনী হওয়ার পরও চারুর এমনও মনে হয় পরীর পরিবর্তে বরং 'সে-ই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভালো ছিলো।' আর ধর্ষকামী, হৃদয়হীন বনমালী? সে 'সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত।' এজন্যেই তার একদা ভোগিনীদের সে একেবারে তাড়িয়ে দ্যায় না—বাড়ির একতলায় বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে দ্যায়। পরীকেও সেখানে সে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যস্বভাব সংক্ষিপ্তিতে, তির্যকভাষণে, ইশারামূলকতায়, গূঢ় বাক্যের প্রয়োগে প্রকাশিত। ছোটোগল্পে এই শিল্পকুশলতা বিশেষভাবে বিজয়ী। 'সরীসৃপ' গল্পেও তাঁর ঐ স্বভাবসম্মত শিল্পকুশলতা প্রযুক্ত হয়েছে। লেখকের যে-বিশিষ্ট নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি—অমেদ, অফেন, অলিপ্ত, বিদ্রূপাক্ত, বিশ্লেষণাত্মক—এখানেও তা যথাযথই আছে। ছোটোগল্পের যা নিয়ম, প্রথম বাক্যেই গল্পের ভিতরে প্রবেশ করা, একটুও কালক্ষেপণ না-ক'রে এখানে এইভাবে রূপ নিয়েছে : 'চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি।' পুরো ঘটনা (তারকেশ্বরে চারুর কয়েকটি দিনযাপন ব্যতীত) এই বাড়িতেই সংঘটিত হয়েছে। এই বাড়ির অধিকার নিয়ে এর প্রধান চরিত্রদের নগ্ন লালসা উদ্দীপিত। এমনকি একথাও বলা যায় : এই বাড়ির মালিক চারুর শ্বশুর রামতারণ থেকে পরবর্তী মালিক বনমালী পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে যা সংঘটিত হ'য়ে যাচ্ছে, তা স্বেচ্ছাচার : মালিক পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত ধারাবাহিক বহমান।

প্রথম থেকেই শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে ভবিষ্যৎজ্ঞাপকতার চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গল্পের দ্বিতীয় অংশে চারুর 'শেষ জীবনে'র কথা বলা হয়েছে—যদিও আমরা জানতে পারি গল্পের বর্তমানকালে চারুর বয়স চল্লিশ। 'শেষ জীবনের' প্রমাণ পরে পাওয়া যায়, যখন মৃত্যু হয় চারুর। তারকেশ্বর থেকে ফিরে মৃত্যুর দিন, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে, চারু পদ্মঝি-কে খামোকাই বলেছিলো, 'আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কী হবে ?' পরীকে যখন স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা করেছে বনমালী, তখনই আমরা জানতে পারি : 'এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।' গল্পের শেষে পরীকে কোথায় পাঠানো হলো, তা আমরা দেখতে পাই। এই ক্রমাগত ভবিষ্যৎজ্ঞাপকতায় গল্পটি ভরপুর।

গল্পের তির্যকতা, অব্যক্ততার ভিতরে ব্যক্ততা মানিক ক্ষণে-ক্ষণে সঞ্চার করেন। যেমন 'বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে [পরী] জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।' কিংবা 'বনমালী তাহার [পরীর] আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।'

অপ্রয়োজনীয় নিসর্গবর্ণনা মানিক চিরকালই বর্জন করেছেন। এই গল্পেও। বর্ষণরাত্রি এই গল্পে দমিত-ক্ষুধিত যৌনতার পৃষ্ঠপট রচনা করেছে। আর 'গাছের ডাল হইতে টপ-টপ জল পড়িতেছিল। কতগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' এসব কি নিছক বর্ণনাই? আমাদের মনে থাকে, আগের রাতে পরীকে বনমালীর সঙ্গে সংগত হ'তে দেখেছে চারু। ঐ বর্ণনায় কি তার মানসলোকের প্রতিবিম্ব পড়েনি ?

চিত্রকল্প-উপমা-প্রতীক এই গল্পে লেখক 'সংগত নির্মমতায়' (মানিকের এই গল্পেরই বাক্যবন্ধ ব্যবহার ক'রে বলছি) ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোথাও এগুলি অলংকার নয়; সর্বদাই গল্পের আত্মার দিকে আঙুল নির্দেশ করছে। যেমন : 'আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।' দীর্ঘ বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্চর্য ব্যবহার : 'এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া লইয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাঁহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।' পাঁচটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদাংশ উদ্ধৃত করি : 'এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শান্ত হইয়া একসময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়া শব্দ দেয় না।' এই অনুচ্ছেদাংশের পাঁচটি বাক্যই আত্মসম্পূর্ণ। কোনো বাক্যই পুনরুক্তি নয়—সব সময়ই প্রাগ্রসর। তৃতীয় বাক্যের উপমাটি অলংকার নয়—প্রকৃত অবস্থার দ্যোতক, বর্ষণঘন রাতে তৃষ্ণার্ত রমণীর চিত্র। 'সাশ্রু নিশ্বাস'-এর বিশেষণটি একতিল নিরর্থক নয়। চতুর্থ বাক্যের উপবাক্যগুলি ক্রন্দনময় শিশুটিকে একটি বাক্যেই জীবন্ত করেছে। পুরো অনুচ্ছেদাংশটি ঘননিবিড়। এই নিবিড়তা মানিকের বিশিষ্টতা। গল্পে এ বিশেষভাবে লক্ষ্যভেদী।

'সরীসৃপ'-এর শেষাংশ গূঢ়তাৎপর্যময়। যখন 'পাপের ভারা' পূর্ণ হয়েছে—পরীকে হত্যা করতে গিয়ে চারু নিজেই মৃত্যুবরণ করেছে কলেরায়, ভুবনকে অবধারিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে পরী, ভোগ সম্পূর্ণ করার পর পরীকে 'বাড়ির রাজা' বনমালী 'ঝি-চাকরেরও নীচে' যাদের অবস্থান তাদের আবাসে পাঠিয়েছে, তখন সব শয়তানি ও নীচতার পরে—

> একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ রে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না ?' বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।' ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।

গল্পের একেবারে অন্ত্যম স্তবকটি বিস্ময়কর। একজন আধুনিক গল্পলেখক (খুব সম্ভবত রমানাথ রায়) শেষ অনুচ্ছেদটি বিষয়ে বলেছিলেন প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রয়োজনীয়। 'বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।' এখানেও গল্প শেষ হ'তে পারতো। আর প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র গুপ্তের কাছে গল্পের ঐ উপসংহার মনে হয়েছে রুদ্ধশ্বাস মর্বিডিটির পর 'চমৎকার রিলিফ'।

আসলে আকস্মিকতা বা উল্লম্ফন মানিকের আত্মস্বভাবী। গল্পের তৃতীয় অংশের শেষে এই বর্ণনাও কি খানিকটা আকস্মিক নয় ?—'কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দুটি কচি সবুজ ঘাসের শিষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির

করিয়া যমজ ভাই–এর মতো তাদের দুটিকে সে চাপা দিয়া দেয়।' মানিক তাঁর সমস্ত রচনায় এই উল্লম্ফন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছেন। এজন্যেই হয়তো যাকে বলে 'জনপ্রিয় লেখক', তা তিনি হ'তে পারেননি। সেদিক থেকে গল্পের উপসংহার মানিকের আত্মস্বভাবী। ছোটোগল্পের স্বস্বভাবী।

'সরীসৃপ' জটিল, তামসী গল্প। মানিক নিজেও এরকম অন্ধকার গল্প বেশি লেখেননি। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি ও সততা নিরঙ্কুশ। লেখক যে স্রষ্টার মতো নির্বিকার, তার প্রমাণ : শেষ অনুচ্ছেদ অবধি তাঁর সাবলীলতায় একটু ফাটল ধরেনি, তাঁর বর্ণ–লেপনে এতোটুকু অতিরিক্ততা বা কার্পণ্য নেই, প্রথম বাক্যের 'বাগান' থেকে শেষ বাক্যের 'বন' আসলে মানবিকতা থেকে পশুত্বে পৌঁছোনোর একটি নিরপেক্ষ আলেখ্য, এই নিরপেক্ষ আলেখ্য রচনায় লেখকের হৃদয় ও চোখের পাতা একটুও কাঁপেনি।

(তিন)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত প্রণীত হয়নি। ফলে, আমরা তাঁর সাহিত্যকর্মের অনেক প্রয়োজনীয় পটভূমি ও গোপন খোড়লের সন্ধান পাইনি।

'হারানের নাতজামাই' গল্প প্রসঙ্গে নেপথ্যের কিছু কথা।

চিন্মোহন সেহানবীশ (১৯১৩–৮৭) লিখেছিলেন, 'মনে পড়ে জেলে যাবার কিছুদিন আগে একদিন মানিকবাবুকে পীড়াপীড়ি করেছিলাম পুলিশী সন্ত্রাস–জর্জরিত বড়া–কমলাপুরে যাবার জন্যে—কিছুটা উদ্ধতভাবেই বলেছিলাম, "লেখক হিসেবে না হয় নাই গেলেন, কমিউনিস্ট হিসাবেই যান।" তারপর একদিন জেলখানার পাঁচিল পেরিয়ে এলো 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। সন্ত্রাসের ছমছমে আবহাওয়া মূর্ত হয়ে উঠেছিলো ঐ আশ্চর্য গল্পটিতে। মনে মনে সেদিন মাপ চেয়েছিলাম মানিকবাবুর কাছে।'[১৭] মানিকবাবু চিন্মোহন সেহানবীশের কথামতো বড়া–কমলাপুরে যাননি তখন।

কিন্তু গিয়েছিলেন যে তা জানা যাচ্ছে মানিক-গবেষক লিলি দত্তের গ্রন্থে কৃষক–আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমল চট্টোপাধ্যায়ের জবানিতে।[১৮] কমল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমরা জেনেছিলাম, বহরমপুর, কমলাপুর, চক, পহলামপুর, বড়ার প্রায় সকল কর্মীর সঙ্গেই তিনি [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] আলাপ করেছেন।' কমলবাবু দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—যে-দুটি ঘটনা 'হারানের নাতজামাই' গল্পের পৃষ্ঠপট হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কাছাকাছি ধরনের দুটি ঘটনার প্রথমটি উদ্ধৃত করছি কমলবাবুর জবানিতেই :

> শহর থেকে পার্টির একজন মেয়েকর্মীকে এখানে আনা হয়—এখানকার মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্য। গ্রামে সে শীলা নামে পরিচিত হলো। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ জানতে পারে, কমলাপুরে শীলা রয়েছে। তাকে ধরবার জন্য পুলিশ অনেকবার কমলাপুর এসেছে, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা তাকে সবসময়ই আগলে রাখে, নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায়, যাতে পুলিশ ব্যর্থ হয়।/একদিন ভোরে হঠাৎ পুলিশী হামলা হলো। পুলিশ ভেবেছিল, ঘুম থেকে ওঠার পর মেয়েরা নানা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে শীলাকে ফাঁদে ফেলা যাবে। যে পাড়ায় শীলা থাকতো, পুলিশ তার কাছাকাছি এসে গেছে। খবর পেয়েই মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো, তাকে তো অন্য পাড়ায় নিয়ে যাবার উপায় নেই। তখন একজন গৃহবধূ শীলাকে বললো, 'শিগ্গির পুকুরঘাটে চলুন।' সেখানে কয়েকজন তখন বাসন মাজছে। তারা ব্যাপারটা বুঝে বললো, 'দিদিমণি, ঘোমটা দিয়ে একগলা জলে নেমে পড়ুন।' শীলা তাই করলো। তখনই আর কয়েকজন মেয়ে এসে জলে নেমে শীলাকে ঘিরে দাঁড়ালো। তারা সকলেই যেন স্নান করছে। আর ঘাটে কয়েকজন বাসন মাজছে। সেই সময় পুকুরঘাটে

এলো পুলিশ।/ তখনই খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন নগনিদিদি। গ্রামের সর্বজনপরিচিতা বিধবা মহিলা। অত্যন্ত সাহসী এবং তেজী। নগনিদিদি একটা মুড়ো ঝাঁটা হাতে নিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মেয়েরা পুকুরে চান করছে, ঘাটে দাঁড়িয়ে পুলিশের লোকেরা তাই দেখছে, লজ্জাশরম নেই ওদের। শিগ্‌গির চলে যাও।'/ এই চিৎকারে পুলিশ হতভম্ব হলো। মেয়েদের অত ভিড়ের মধ্যে শীলাকে বার করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। পুলিশের ছোটোবাবু আমতা আমতা করে বললো, 'না, না, আমরা যাচ্ছি।' তারা চলে গেল।/ একটু পরে মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। নগনিদিদি তখন ঝাঁটা ফেলে দিয়ে বিজয়গর্বে চলে গেলেন।

চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর লেখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবে বড়া-কমলাপুরে যাবার জন্যে বলেছিলেন তার উল্লেখ করেননি। বলেছেন শুধু, তিনি 'জেলে যাবার কিছুদিন আগে' মানিকের কাছে ঐ প্রস্তাব করেছিলেন। চিন্মোহনবাবু জেলে গিয়েছিলেন ১৯৪৯ সালে—কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে। কমল চট্টোপাধ্যায়ও লিখছেন : 'ঘটনাস্থল : বড়া-কমলাপুর, কাল : ১৯৪৯-এর প্রথমভাগ।'

কিন্তু আমরা তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৪৭-এর ডায়েরিতেই পাচ্ছি 'হারানের নাতজামাই' গল্পের প্লটের প্রাথমিক খশড়া :

৫। লুকানো নেতা খুঁজতে রাতদুপুরে পুলিশের আবির্ভাব—নেতাকে মেয়ের জামাই করা—জামাই এসে কি বলবে সকলের এই ভাবনা—জামাই খুব খুশী—
পূর্বাশা মাঘ ১৩৫৩
'হারানের নাতজামাই' *[অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]*

'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী ঐ গ্রন্থের নির্দেশপঞ্জিতে মানিকের ১৯৫০-এর ডায়েরি থেকে এই তথ্যও উদ্ধৃত করেছেন :

4.1.47	'পূর্বাশা' 'হারানের নাতজামাই'	50/-
21.10.47	Eastern Express	
	'হারানের নাতজামাই' অনুবাদ	30/-

দেখা যাচ্ছে : ১৯৪৭-এই 'হারানের নাতজামাই' 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত, এমনকি তার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়ে গেছে। পরের বছর, ১৯৪৮-এই 'হারানের নাতজামাই' "ছোট বড়" নামক গল্পগ্রন্থে স্থান পায়।

পরিবেশ-পটভূমি থেকে মনে হয়, বড়া-কমলাপুরের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়েই 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্প দুটি লেখা হয়েছিলো। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটি ১৯৪৯ সালে ঐ নামের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। 'হারানের নাতজামাই' ১৯৪৭এ-ই লেখা হয়ে যায়। এই গল্পের ক্ষেত্রে স্মৃতিউল্লেখগুলি ভুল হচ্ছে নাকি সদাসর্বদাই ?

১১-পৃষ্ঠার তীক্ষ্ণ একলক্ষ্য জমজমাট ছোটোগল্প। চরিত্র অনেকগুলি। ঘটনা পর-পর দুই রাত্রির। ঘটনার কেন্দ্র একটিই। চাষিদের গ্রাম সালিগঞ্জের ছোটো একটা পাড়া হাঁসতলার হারানের বাড়িতেই সব ঘটনা ঘটে। জোতদার চণ্ডী ঘোষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভুবন মণ্ডল চাষিদের একত্রিত করেছে, সাহস দিয়েছে, ধান কাটার ব্যবস্থা করেছে। চণ্ডী ঘোষ পুলিশের শরণাপন্ন। ভুবন মণ্ডল গ্রামে গ্রামে পালিয়ে বেড়ায়। কিছুতেই তাকে পুলিশ ধরতে পারে না। গ্রামেরই কেউ একজন (খুব সম্ভবত মথুর) পুলিশের কাছে খবর দিলে, দারোগা মন্মথ আটজন পুলিশ নিয়ে এসে হারানের বাড়ি ঘিরে ফ্যালে। তখন বুড়ো হারানের মেয়ে ময়নার মা ভুবন মণ্ডলকে তার জামাই হিশেবে পরিচয় দ্যায়। মন্মথ অগত্যা পুলিশ

আর জোতদারের দুই লোক কানাই ও শ্রীপতিকে নিয়ে ফিরে যায়। পুলিশকে বোকা বানানোর এই কৌশলের কথা গ্রাম-গ্রামান্তরে চাউর হয়ে যায়, চাষিরা এই নিয়ে হাসাহাসি করে। এদিকে ময়নার মা-র সত্যিকার জামাই জগমোহন সব শুনতে পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে হারানের বাড়িতে আসে পরদিন। সে থাকতেই মন্মথ দারোগা আবার পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হয়। হারানের বাড়িসুদ্ধ লোককে যখন থানায় নিয়ে যাবে মন্মথ, তখন গ্রাম-গ্রামান্তরের অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়েছে হারানের বাড়ি ঘিরে। বোঝাই যাচ্ছে, পুলিশ ওদের কিছু করতে পারবে না। এই অবস্থায় গল্পটি শেষ হয়।

গল্প ছোটো। অনেকগুলি চরিত্র : ভুবন মণ্ডল, ময়না, ময়নার মা, মন্মথ, হারান, জগমোহন—কেন্দ্রীয় চরিত্র এগুলিই। অন্য চরিত্র আরো অনেক : গফুর আলি, গৌর সাঁউ, মোক্ষদার মা, ক্ষেন্তি, রসিক, নন্দ, নিতাই পালের বৌ, কানাই, শ্রীপতি, নামহীন আরো মানুষ। উজ্জ্বলতম চরিত্র নিঃসন্দেহে ময়নার মা। তারই কৌশলে ভুবন মণ্ডল পুলিশের কাছে ধরা পড়ে না। তার চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন লেখক : '...প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখদুর্দশার ছাপ ও রেখা রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।' ময়নার মা-র চরিত্রটাই তৈরি হয়েছে তেজস্বিতায় : শুধু পুলিশকে সে বোকা বানায়নি—এর আগে পুরুষশূন্য গ্রামে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়েদের দল নিয়ে সে তাদের গ্রাম-ছাড়া করেছে। পুরো গল্পে ময়নার মা-র নব্বই বছরের বৃদ্ধ পিতা হারান ধ্রুবপদের মতো একটি কথাই বলে যায় : 'হায় ভগবান!'

মানিকের অসাধারণ বাস্তবতাবোধ পুরো গল্পে কোথাও টাল খায় না।

বি.এ. পাশ দারোগা মন্মথই একমাত্র শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, বাকি সমস্ত গ্রামবাসীরই সংলাপ আঞ্চলিক ভাষায়। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষায়।

মন্মথ দ্বিতীয় রাতে আসে যখন, তখন 'তার চোখ শাদা।' এইটুকু মাত্র বলা হয়েছে। এটুকুই তার আগের রাত্রির সঙ্গে পার্থক্য সূচনা করে : আগের রাত্রিতে সে এসেছিলো একটুখানি রঙিন নেশা করে। এই বাস্তবতাময় গল্পে প্রয়োজনীয় কবিত্বের স্পর্শ লাগে যখন, তখন মানিক পর-পর তিনটি উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন : 'ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়ে' ময়নার শরীর দেখে মন্মথের মনে হয় 'এ যেন কবিতা।.. যেন চোরা হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ।'

৭. ভাষা

তিরিশের দশকের বা কল্লোলের কথাশিল্পীদের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই গল্প লিখেছেন। অন্যদের মতোই তাঁরও স্বাভাবিক আভিমুখ্য ছিলো চলতি রীতির দিকে। আশ্চর্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম-রচিত গল্প 'অতসী মামী'ই চলতি রীতিতে লেখা। মানিকের প্রথম গল্পগ্রন্থ "অতসী মামী"-র (১৯৩৫) গল্পগুলি রচনাকালের ক্রম অনুসারে সজ্জিত। এই হিশেবে দেখা যাচ্ছে 'অতসী মামী', 'নেকী', 'বৃহত্তর মহত্তর', 'শিপ্রার অপমৃত্যু'—এই চারটি গল্পের পরে সাধুভাষা ধরেছেন লেখক, 'সর্পিল' গল্প থেকে। "অতসী মামী" গ্রন্থের ঐ চারটি গল্প বাদে বাকি ছ-টি গল্পই—'সর্পিল', 'পোড়াকপালী', 'আগন্তুক', 'মাটির সাকী', 'মহাসংগম' ও 'আত্মহত্যার অধিকার'—ছ-টি গল্পই সাধু ভাষায় লেখা। মানিকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ "প্রাগৈতিহাসিক" (১৯৩৭)-এর দশটি গল্পই (পুনর্মুদ্রিত 'মাটির সাকী'সমেত) সাধু ভাষায় রচিত। মানিকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ

"লাজুকলতা"র (১৯৫৪) পনেরোটি গল্পই চলতি ভাষায় প্রণীত। মধ্যবর্তী "বৌ" (১৯৪৩) গল্পগ্রন্থের তেরোটি গল্পই সাধু ভাষায় লেখা। সব-মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধু ও চলতি দুই রীতিতেই গল্প লিখেছেন—তবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই চলতি ভাষা প্রয়োগের দিকে ক্রম-অগ্রসর হয়ে গেছেন।

তবে সাধু ভাষা ব্যবহার করলেও মানিক প্রথমাবধি বাস্তবানুগ বলে সংলাপে চলতি ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করেছেন—প্রয়োজন অনুসারে। "প্রাগৈতিহাসিক" গল্পগ্রন্থের পাশাপাশি দুটি গল্প উদাহরণ হিশেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি—'প্রাগৈতিহাসিক' (সংলাপে আঞ্চলিক বুলি) ও 'চোর' (সংলাপে চলতি শুদ্ধ বুলি)। আবার, সাধু ভাষা ব্যবহার করলেও মানিকের ধরনটা চলতি রীতির। উদাহরণ :

> একটি মেয়ে ছিল সনাতন চক্রবর্তীর—মোহিনী। একটা বাড়িও ছিল সনাতনের—বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। আর ছিল কিছু নগদ টাকা—কয়েক হাজার। মেয়ের বিবাহ দিবার অনেক আগেই মনে মনে একটা মতলব করিয়া রাখিয়াছিল সনাতন : ঠিক মতলব নয়—হিসাব, উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তার মৃত্যুর পর মেয়েটাই যখন তার বাড়িটা পাইবে, বিবাহের সময় পণ হিসাবে জামাইকে সে দিবে না একটি পয়সাও। মেয়েকে গয়নাগাঁটিও দিবে কম, যত কম দিয়া পারা যায়। বুড়া বয়সে যখন তার চাকরি থাকিবে না, জমানো টাকা কয়েকটা তখন মদের খরচ বাবদ লাগিবে না তাহার ? কেউ কি তখন একটি পয়সাও তাকে দিবে মদের জন্য ? বুড়া হইতে বা আর বাকিই কত!
>
> *[অন্ধ, প্রাগৈতিহাসিক]*

এই কথকতার ভঙ্গি মানিকের চিরদিনের গদ্যরচনারই একটি বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতায় ক্রিয়াপদ আর বাক্যের শেষে বসে না, যে-কোনো জায়গায় বসে যায়। মানিকের গদ্য-রচনায় এর উদাহরণ অগণিত।

সামগ্রিকভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরীতিতে কবিতার সংক্রমণ নেই। বস্তুত মানিকীয় রচনারীতির বিশিষ্টতাই তার কবিত্বহীনতায়। কিন্তু মানিকের সাহিত্যজীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে, যেমন "দিবারাত্রির কাব্য" (১৯৩৫) উপন্যাসে তেন্নি 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মতো গল্পে, এরকম বর্ণনা কবিতাকেই স্পর্শ করে যায় :

> দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।/হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনো দিন পাইবেও না।
>
> *[প্রাগৈতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক]*

কিন্তু এ নিছক কবিত্ব নয়—এর মধ্যে একটি সাংকেতিকতা লেগে রয়েছে। মানিকের কোনো কোনো গল্পের শেষে এম্নিভাবে আছে লেখকের মন্তব্য। সেই মন্তব্য আবার কখনো সাংকেতিকতা-দীপ্ত। যেমন :

> ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।
>
> *[সরীসৃপ, সরীসৃপ]*

গল্পকার মানিকের অতিসংক্ষিপ্ত মন্তব্যে কখনো সরসতা। বিয়ে–বাড়ির নানারকম আচার–অনুষ্ঠান–উত্তেজনার পরে ইন্দু তার স্বামী হরেনের সঙ্গে পালকিতে স্বামীগৃহে চলেছে। গল্পের শেষ হচ্ছে এভাবে :

> তারপর আরো কত গ্রাম, কত মাঠ পার হইয়া সন্ধ্যার একটু আগে পালকি স্টিমারঘাটে পৌঁছিল। স্টিমার তখন সবে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছে। নদীর অপর তীরে একটি চিতা প্রায় নিভিয়া আসিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া হরেন বলিল, 'পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমার আমার খুব মনের মিল হবে, হবে না ?'/ যেন পথে চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকি থাকিত!
>
> *[যাত্রা, প্রাগৈতিহাসিক]*

কখনো–বা দুর্ধর্ষ মন্তব্যের তীক্ষ্ণতা :

> মনোহর অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্কভাবে স্নানাহার সম্পন্ন করল। বিকেলে সে আর রোগী দেখতে গেল না। সন্ধ্যার সময় গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের সিনেমায় পাঠিয়ে দিয়ে সখিকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। বললো, 'আমার ঘরে একগ্লাস জল দিয়ে যাও সখি।'/ জল ? জলে কি মানুষের তেষ্টা মেটে ?
>
> *[দিকপরিবর্তন, সরীসৃপ]*

অতুলচন্দ্র গুপ্ত "Primeval and Other Stories"–এর ভূমিকায় যথার্থই মানিকের গদ্য–রচনাকে 'নিরলংকৃত' বলে বর্ণনা করেছিলেন। মানিকের গদ্যের স্বাতন্ত্র্যই তার অলংকারহীনতায়, কাটা–কাটা চোখা সংক্ষিপ্ত বাক্যে, কখনো তা সরাসরি বক্তব্যজ্ঞাপক, কখনো তির্যক, কবিতাবর্জিত—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের বিপরীত। তাই বলে মানিক উপমা–উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন না, তা নয়। কিন্তু সেই ব্যবহার কখনো কবিতায় রাঙানো নয়, অকারণ নয়, বিষয়কেই স্পষ্টতর ব্যঞ্জিত করার জন্যে। যেমন, দু–চারটি উদাহরণ :

১. তার মধ্যে গাবোকে বৌ সাজিয়ে তার কোলে হাড়ে চামড়ায় এক করা কুড়ানো বাচ্চাটাকে দিয়ে দুঃস্থ গৃহস্থ সেজে ভিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ছিদাম জীবনে ভুলবে না, ও যেন গজেন অপেরার যাত্রাগান। *[অমানুষিক, পরিস্থিতি]*
২. একটা মৃতদেহকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার মতো নিজের দেহটাকে সে উল্টো দিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। *[সাড়ে সাত সের চাল, পরিস্থিতি]*
৩. অমন মিষ্টি কোমল ফরশা রঙ জলে ধোয়া কাটা মাছের মতো কটকটে শাদা হয়ে গেছে। *[সখী, ছোটবকুলপুরের যাত্রী]*
৪. আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়। *[সরীসৃপ, সরীসৃপ]*
৫. জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। *[প্রাগৈতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক]*
৬. পরনের বেনারসীর রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হাসে, নববধূর মতো। *[যাকে ঘুষ দিতে হয়, আজ কাল পরশুর গল্প]*
৭. বৈঠকখানার ভাঙা তক্তাপোশে বিছানো ছেঁড়া ময়লা সতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী–পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবুথবু একটা

মানুষ, মেঝেতে লোম–ওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে।

[টিচার, খতিয়ান]

৮. দু–পাশের দোকানগুলির গ্রাম্য মূর্তির গায়ে শহুরে ভাবের তালি লাগানো—খালি গায়ে বুট–পরা মানুষের মতো। *[মাটির সাকী, প্রাগৈতিহাসিক]*

৯. কাঁচা–পাকা আমের মতো নতুন বৌকে সূর্যকান্তের লাগিতেছিল মিষ্টি আর টক।

[সাহিত্যিকের বৌ, বৌ]

১০. গায়ের রঙ তার খুবই ফরশা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়। *[কেরানীর বৌ, বৌ]*

শব্দ ব্যবহারে মানিকের কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই। বাস্তবতাই তাঁর অন্বিষ্ট। শব্দব্যবহারেও তার পরিচয় আছে। একেবারে দেশজ প্রচলিত শব্দ থেকে ইংরেজি শব্দ—সবই তিনি প্রয়োগ করেন অবলীলায়। উদাহরণ :

১. আজেবাজে খেয়ালে—যে–সব খেয়াল তাদেরি মানায়, তাদেরি ফ্যাসান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা–বাপ ছেলে–মেয়ে—অনর্থক অখুশি হতে রাজি নয় মানুষ।

[ছিনিয়ে খায়নি কেন, খতিয়ান]

২. বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে। *[হারানের নাতজামাই, ছোট বড়]*

৩. সত্যিকারের রোগা ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভালো লাগে—রায়বাহাদুরের এত তীব্র ইচ্ছা করে টিপেটুপে ছেনেছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে। *[টিচার, খতিয়ান]*

৪. সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।/একেবারে সাত–সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে পায়ে কোমরে পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হদ্দ করে ফেলে। *[শিল্পী, পরিস্থিতি]*

চরিত্রায়ণের জন্যে বর্ণনার মধ্যেই চরিত্রানুগ শব্দপ্রয়োগ মানিকের একটি বিশিষ্ট কুশলতা। তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে চয়ন করি :

> ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে। *[শিল্পী, পরিস্থিতি]*

ক্রিয়াপদ বিপর্যাসের মানিকীয় পদ্ধতি তাঁর গল্পগুচ্ছে অজস্র। এখানে শুধু একটি গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদটি তুলে দিচ্ছি :

> গাড়ি নূতন, বৌ নূতন, চাকরি নূতন। চাকরিটা জুটিয়াছে কৌশলে, শোভারানীকে পাশে বসাইয়া শহরের বাহিরে প্রকৃতির শোভা দেখিতে আর ফাঁকা হাওয়া খাইতে বাহির হওয়াটাও ঘটিয়াছে কৌশলেই। কাল বিকালে বাড়ির সকলে গিয়াছে এক ভাইপোর বিবাহ উপলক্ষে বর্ধমান, শোভারানীর বাপের বানানো অসুখের ছুতায় তারা দুজন থাকিয়া গিয়াছে। আজ বারাসতে বাপের অবস্থা দেখিয়া হয় শোভা যাইবে বর্ধমান, না হয় শোভা যাইবে না; এই হইয়াছে ব্যবস্থা।
>
> *[চাকরি, প্রাগৈতিহাসিক]*

মানিকের রচনায় মাঝে-মাঝেই 'সুভাষিত উক্তি' বা এপ্রিগ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মানিকের চিন্তার বিচিত্র বিশিষ্টতা এইসব উক্তির মধ্যেও পাওয়া যাবে। এরকম কয়েকটি :

১. কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি। *[চোর, প্রাগৈতিহাসিক]*

২. একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড়ো স্কেলে করিতে পারার নাম বড়োলোক হওয়া? *[কুষ্ঠরোগীর বৌ, বৌ]*

৩. ... নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। *[ঐ, ঐ]*

৪. ...বড়োলোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ করো। *[ঐ, ঐ]*

৫. প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে-আসা আত্মার দূরত্ব বেশি। *[বৃহত্তর ও মহত্তর, অতসী মামী]*

সাধারণত মানিক ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করেন। তারই মধ্যে হঠাৎ তিনি চারিয়ে দেন দীর্ঘ জটিল বাক্য। এরকম কিছু :

১. উত্তেজিত বেদনায় হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়ার সময় চার মিনিট তাহাকে ক্লোরোফর্ম করিয়া রাখার জন্য ভাগ্য ডাক্তারকে যে তিনশো টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছে ইন্দু তাহা জানিতে পারিল না। *[যাত্রা, প্রাগৈতিহাসিক]*

২. মনোহর মনোযোগ দিয়ে রোগী দ্যাখে, কম্পাউন্ডার ওষুধ তৈরি করে, চাকর দৈনিক বাজার থেকে বাঁচানো পয়সায় বড়োলোক হয়, ঠাকুর দু-বেলা ভাত রাঁধে, দারোয়ান নিয়মিত গেট পাহারা দ্যায় আর সখি বাসন মাজে, কাপড় কাচে, গিন্নির ফাইফরমাশ ঘটে। *[দিক পরিবর্তন, সরীসৃপ]*

৩. সে ছিল ওরকম অনেকের একজন। আধপেটা সিকিপেটার বেশি না খেয়ে, কখনোবা দু-চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিকে থাকতো, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়চড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। *[অমানুষিক, পরিস্থিতি]*

৪. না চেয়ে জীবনের প্রথাহীন খাপছাড়া বৈচিত্র্য জুটেছিল, চিরন্তন দীপশিখার ধোঁয়া থেকে কলঙ্ক তিলকের কালি সংগ্রহ করেও ভীতা সে তিলক পরেনি, বৈধব্যের বেদনায় আজো তার আপশোষ মিলিয়ে গেল না কেন ? অনুতাপে আজ এত মাধুর্য কেন, মুক্তির গৌরবে দাহ ? *[বিড়ম্বনা, মিহি ও মোটা কাহিনী]*

৫. তার মতো পর্দানশীন সাধারণ মেয়েকে (সাধারণ মেয়ে অবশ্য সে নয় কিন্তু, একদিন খানিকক্ষণ শুধু চোখে দেখিয়া, কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, সেলাইএর কাজের একটু নমুনা দেখিয়া আর একখানা গানের সিকি অংশ শুনিয়া তার কি পরিচয় ওরা পাইয়াছিল শুনি ? পছন্দ করে ? *[সাহিত্যিকের বৌ, বৌ]*

দীর্ঘ বাক্য অনেকসময় মানিক তৈরি করেন অসমাপিকা ক্রিয়া পর-পর প্রয়োগ করে :

সামনে রাখালের ঘর পেয়ে/ঝাঁপ ভেঙে/ তাকে বাইরে আনিয়ে/রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'হারান দাসের কোন বাড়ি?'

[হারানের নাতজামাই, ছোট বড়]

৮. উপসংহার

সংকলন মানে আর-কিছু না—সমালোচনা। সমালোচনা মানে নির্বাচন। খারাপ গল্প থেকে উৎকৃষ্ট গল্পকে আলাদা করে নেওয়া। মুকুল ধরে তো অজস্র, সবই কি ফলে পরিণত হয় ? যে-সব ফল পরিণত হচ্ছে, সেগুলোর সব স্বাদ ও মিষ্টত্ব কি সমান ? সৃষ্টিতেও তাই। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক—একই শিল্পীর রচনা হলেও তা-ই তার মধ্যে ফারাক থাকে

নানারকম। আবার রুচিভেদ তো থাকে বিভিন্ন পাঠকের। (যেমন : অনেক পাঠক-সমালোচকই—যেমন, গুণময় মান্না[১৯]—মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি" বা "পুতুলনাচের ইতিকথা"কে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করেন, কিন্তু নারায়ণ চৌধুরী পরিষ্কার বলেছেন মানিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "সহরতলী"।[২০]) আবার একই পাঠক ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রচনায় সাড়া দেন। কিন্তু তার পরেও অধিকাংশ পাঠক-সমালোচকের মেলার একটি সাধারণ পাটাতন আছে। প্রসঙ্গত বলা উচিত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'নির্বাচিত গল্প', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'বাছাই গল্প' ইত্যাদি যে-নামগুলি, এদের নামের পার্থক্য যা-ই থাক অভিপ্রায় সকলেরই এক : একজন লেখকের উৎকৃষ্টতম গল্পগুলির একত্রগ্রন্থন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে কয়েকটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সর্বস্পর্শী এরকম কয়েকটি সংকলনের পরিচয়।—

১. জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প"। ১৯৫০। সূচিপত্র : ১ প্রাগৈতিহাসিক ২ টিকটিকি ৩ আত্মহত্যার অধিকার ৪ সরীসৃপ ৫ কুষ্ঠরোগীর বৌ ৬ হলুদ পোড়া ৭ সমুদ্রের স্বাদ ৮ বিবেক ৯ আপিম ১০ আজ কাল পরশুর গল্প ১১ যাকে ঘুষ দিতে হয় ১২ নমুনা ১৩ দুঃশাসনীয় ১৪ কংক্রীট ১৫ শিল্পী ১৬ হারানের নাতজামাই ১৭ বিচার ১৮ ছোটবকুলপুরের যাত্রী।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্বনির্বাচিত গল্প"। ১৯৫৬। সূচিপত্র : ১ বৃহত্তর-মহত্তর ২ নেকী ৩ চোর ৪ ফাঁসি ৫ ভূমিকম্প ৬ টিকটিকি ৭ বিপত্নীক ৮ সিঁড়ি ৯ মহাকালের জটার জট ১০ হলুদ পোড়া ১১ চুরি চুরি খেলা ১২ ফাঁদ ১৩ রাঘব মালাকর ১৪ প্রাক-শারদীয় কাহিনী ১৫ রক্ত নোনতা ১৬ হারানের নাতজামাই ১৭ ভিক্ষুক ১৮ ধান ১৯ বিবেক ২০ শিল্পী।

৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত মানিকের ছোটোগল্পের অনুবাদ-সংকলন "Primeval and Other Stories"। ১৯৫৮। অনূদিত গল্পের সূচিপত্র : ১ প্রাগৈতিহাসিক ২ চোর ৩ সিঁড়ি ৪ সরীসৃপ ৫ সমুদ্রের স্বাদ ৬ জুয়াড়ীর বৌ ৭ হলুদ পোড়া ৮ যাকে ঘুষ দিতে হয় ৯ শিল্পী ১০ হারানের নাতজামাই ১১ ছোট বকুলপুরের যাত্রী।

৪. যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প"। ১৯৭১। সূচিপত্র : ১ প্রাগৈতিহাসিক ২ টিকটিকি ৩ আত্মহত্যার অধিকার ৪ সরীসৃপ ৫ কুষ্ঠরোগীর বৌ ৬ হলুদ পোড়া ৭ কে বাঁচায়, কে বাঁচে ৮ যাকে ঘুষ দিতে হয় ৯ দুঃশাসনীয় ১০ সাড়ে সাত সের চাল ১১ মাসি-পিসি ১২ শিল্পী ১৩ কংক্রীট ১৪ টিচার ১৫ ছিনিয়ে খায়নি কেন ১৬ হারানের নাতজামাই ১৭ ছোট বকুলপুরের যাত্রী ১৮ আর না কান্না।

প্রায় তিন দশকের অবিরল সাহিত্যচর্চায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য শুধু তাঁর গল্পের অন্তর্বস্তুই দেবে না—এক একটি গল্পগ্রন্থ গ্রন্থনার মনোভঙ্গিতেও পাওয়া যায়। তাঁর সর্বশেষ গল্পসংকলন "লাজুকলতা"-য় মানিক যা লিখেছিলেন, তা থেকেই পাওয়া যাবে তাঁর গল্প গ্রন্থনার মূলসূত্র : 'একটি গল্পসংকলনে মূল একটি সূত্রের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজ-জীবনের কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোটো ছোটো কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় করে গল্প চয়ন করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।' সাহিত্যচর্চাই ছিলো মানিকের জীবিকার উপায়—সেজন্যে তিনি সবসময় তাঁর ইচ্ছামতো গল্পসংকলন তৈরি করতে পারেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির ভূমিকাতেই আমরা তাঁর গল্প গ্রন্থনার বিশিষ্ট মনোভঙ্গি দেখতে পাই। "ফেরিওলা" গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন : 'গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলসূত্রের একটা যোগাযোগ আছে বলেই

আমার বিশ্বাস।' "পরিস্থিতি" গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন : 'চারিদিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে এইটুকুই শুধু গল্পগুলির একতা।' "আজ কাল পরশুর গল্প" গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় গল্পগুলি সাজানো যথাযথ হয়নি বলে দুঃখ করেছেন। মানিক তাঁর নিজস্ব প্রকাশনাসংস্থা 'উদয়াচল পাবলিশিং হাউস' থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৬–১৯৮৭) একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন (হয়নি শেষ–পর্যন্ত)। ঐ উপলক্ষে ৭ জুন ১৯৩৯–এ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে মানিক যে–চিঠি লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ : 'আপনার গল্প কয়েকটি কিভাবে সাজাতে চাই মোটামুটি আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি যদি পরিবর্তন করতে চান, আমাকে জানাবেন। কৈশোর বা বাল্যজীবন যে যে গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে সেইগুলিকে আমি প্রথমে দিতে চাই। অল্পবয়সী মানুষ–প্রধান গল্প আপনার আর আছে কি? থাকলে ভিন্ন ভিন্ন গল্প হলেও বইটিকে সমগ্রভাবে একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য দেওয়া সম্ভব হয়।'

দেখা যাচ্ছে : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো একটি গল্পগ্রন্থে 'সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অখণ্ড সমগ্রতা বা ধারা' ("পরিস্থিতি"র ভূমিকার কথাই ব্যবহার করছি) সৃষ্টি করতে চাইতেন।

এই দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর একএকটি গল্পগ্রন্থের চারিত্র স্পষ্টতর হবে। সবচেয়ে স্পষ্ট তো "বৌ" গল্পগ্রন্থটি। ১৯৪৩এ প্রকাশিত এই গল্পগ্রন্থে ছিলো বিভিন্ন পরিচয়ের মানুষের আটটি গল্প। ১৯৪৬এ প্রকাশিত "বৌ"–এর দ্বিতীয় সংস্করণে বৌ–কেন্দ্রিক আরো পাঁচটি গল্প যুক্ত হয়। এই তেরোটি গল্পের বাইরেও যে বৌ–কেন্দ্রিক আরো গল্প লিখবার ইচ্ছা ছিলো মানিকের তা তাঁর ডায়েরি ও নোটবই থেকে বোঝা যায়। তেমনিভাবে "আজ কাল পরশুর গল্প" অনেকটাই মন্বন্তরকেন্দ্রিক গল্পের সংগ্রহ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়েও বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন মানিক। "ছোটবকুলপুরের যাত্রী" গ্রন্থে একই ধরনের নামের দুটি গল্প আছে— 'নিচু চোখে দু আনা দু পয়সা' আর 'নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা'। মানিকের সমস্ত রচনার মধ্যে যেমন তেম্নি তাঁর গল্পগুচ্ছেও উদ্দাম সৃজনী আবেগের সঙ্গে একটি নিঃশব্দ জ্যামিতির শাসনও কাজ করে গেছে বলে মনে হয়।

বৈশাখ ১৪০৪ —আবদুল মান্নান সৈয়দ

---

১ সাক্ষাৎকার : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকারী : অজাতশত্রু [অমলেন্দু চক্রবর্তী]। 'নতুন সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩।

২ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (চতুর্থ খণ্ড) : সুকুমার সেন। তৃ সং ১৯৭১। ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা।

৩ চিঠিপত্র ২৩, "অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" : যুগান্তর চক্রবর্তী–সম্পাদিত। ১৯৭৬। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৪ "কল্লোল যুগ" : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। চতুর্থ প্রকাশ : ১৩৬৬। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৫ "An Acre of Green Grass" : বুদ্ধদেব বসু। ১৯৪৮। ওরিয়েন্ট লংম্যানস, বোম্বে কলকাতা মাদ্রাজ।

৬ 'সাহিত্য করার আগে'। প্রবন্ধ, "মানিক গ্রন্থাবলী", দ্বাদশ খণ্ড। ১৯৭৫। গ্রন্থালয়, কলকাতা।

৭ "পশ্চাৎপট" : বনফুল। দ্বি সং ১৯৮২। গ্রন্থালয়, কলকাতা।

৮ "অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" : যুগান্তর চক্রবর্তী–সম্পাদিত। ১৯৭৬। গ্রন্থালয়, কলকাতা।

৯ 'গল্প লেখার গল্প' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেতার–ভাষণ : ১২ মে ১৯৪৫। "মানিক গ্রন্থাবলী", দ্বাদশ খণ্ড।

১০ 'সাহিত্যের কানমলা' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শারদীয়া 'মাসিক বসুমতী', ১৯৫৩। "মানিক গ্রন্থাবলী", দ্বাদশ খণ্ড।

১১ পরিশিষ্ট ৫, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প" : যুগান্তর চক্রবর্তী–সম্পাদিত। পঞ্চম সং ১৩৭৮। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

১২ সংযোজন ২, "অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়"।

১৩ যেমন, 'গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' : রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। "মানিক সাহিত্য সমীক্ষা" : নারায়ণ চৌধুরী–সম্পাদিত। ১৯৮১। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১৪ 'কেন লিখি' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। "কেন লিখি" : হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়–সম্পাদিত। ১৯৪৪। "মানিক গ্রন্থাবলী", দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৫ 'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নতুন সাহিত্য', ভাদ্র ১৩৬০। "মানিক গ্রন্থাবলী", দ্বিতীয় খণ্ড।

১৬ "অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়"।

১৭ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন' : চিন্মোহন সেহানবীশ। 'পরিচয়', পৌষ ১৩৬৩। "মানিক–বিচিত্রা" : বিশ্বনাথ দে–সম্পাদিত। ১৯৭১। সাহিত্যম, কলকাতা।

১৮ 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' : কমল চট্টোপাধ্যায়। 'গণশক্তি', ২১ আগস্ট ১৯৮৮। "জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" : লিলি দত্ত। ১৯৮৯। দে বুক স্টোর, কলকাতা।

১৯ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে' : নারায়ণ চৌধুরী। "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" (প্রথম পর্ব) : সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়–সম্পাদিত। ১৯৮০। সুবর্ণরেখা প্রকাশনী, কলকাতা।

২০ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে' : গুণময় মান্না। 'জলার্ক', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা (দুই), পৌষ ১৩৯৫।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রাগৈতিহাসিক

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে-দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নিচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরো ন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ি চিতলপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাওখান সহজ লয় স্যাঙ্গাত। উটি পাকব। গা ফুলব। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে যামু? খুনটো যদি না করতিস—'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

'এই জন্মে লা, স্যাঙ্গাত।'

বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিন্‌জুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘটাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছে গা। সাপে যদি না কাটে তো আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কী?'

'চিঁড়া-গুড় দিলাম যে? দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম; রোজ আইলে মাইনসে সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা-টা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোনো-না-কোনো অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের

সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল, সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন–চার দিনের মতো চিঁড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসির জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না; অসহ্য ক্ষুধা পাইলে চিঁড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজরঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্‌জুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু ঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু–এক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকে ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুমবাড়ি গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ির বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কীভাবে দিনরাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে, কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম–ছুটানো তাড়ির নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসিটা এক সময় নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিঁড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশপাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য একবাটি ভাত ও কয়েকটি পুঁটিমাছভাজা আর একটু পুঁই চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মইয়ে শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপর খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই এক মাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না। গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে

পারিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ি ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্দীর মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌয়ের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে বাকি রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্তব্যই হোক সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারালো দা-টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান-প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর' আমার বাড়ির থেইকা,—দূর হ।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভালো চাস তো! বাজু না দিলি সা-বাড়ির মেজোকত্তার মতো গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি আমি অখনি যামু গিয়া।'

কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া-আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুররাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগ্দীপাড়ায় বিষম হইচই বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সব্বনাশ, হায় সব্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিল, হায় সব্বনাশ!'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারা ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলেডিঙি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ তাহার ছিল না, একটা

চ্যাপটা বাঁশকে হালের মতো করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোনোরকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশিদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবৎ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ–ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর–ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাঁহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কর্তা?'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ–চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া, আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল—'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন—'একটা দিলাম, তাতে হল না—ভাগ।'

একমুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়িমুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতেখড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহুপুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইনকানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্মভিখারির মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া দলা–দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন–পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুলগাছের নিচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নিচে ইটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে

ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনোদিন রাঁধে ছোট মাছ, কোনোদিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুলগাছটার নিচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস-টানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় : হেই বাবা একটা পয়সা : আমায় দিলে ভগবান দিবে : হেই বাবা একটা পয়সা—

অনেক প্রাচীন বুলির মতো 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারা দিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার-দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশি হইলেও সারাদিনে ভিখুর পাঁচ-ছ আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দু দিন হাট বসে। হাটবারের উপার্জন তাহার একটি পুরা টাকার নিচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দুই তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশে ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি-করিয়া-আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটুলি করিয়া বালিশের মতো ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জোলো-বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানিকে মারিতে ওঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারী-সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত; মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কী আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল

খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশি পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্দীর সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দুবছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনদুপুরে পুকুরঘাটে একাকিনী গৃহস্থবধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বৌকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালী হইয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ মাস পরে রাখুর বৌকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দায়ের এক কোপে দু ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কী জীবন তাহার ছিল, এখন কী হইয়াছে!

মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটি টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানি হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালাটার নিচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আফসোসের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এতবড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে! এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আফসোসেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিনী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নিচ হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সেজন্য ঘা-টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, 'ঘা-টি সারব না, লয়?'

ভিখারিনী বলে, 'খুব! ওষুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, ওষুদ দিয়ে চটপট সারাইয়া ল। ঘা সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না,—জানস? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি তো।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পরনি পা দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস তুই কিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিনী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিনী

কোনোমতেই রাজি হয় না। ভিখু ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার-ভাঁটা বয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলা বাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিনু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রুপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিনীর কাছে যায়। বলে, 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।'

ভিখারিনী বলে, 'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কী?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মতো জোয়ান দাড়িওলা এক খঞ্জ ভিখারি খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মতো একটি পা হাঁটুর নিচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে ওই অংশটুকু সামনে মেলিয়া সে আল্লার নামে দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিনী আবার বলিল—'বসস যে? যা পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন অমন সব হালাই করতিছে। উয়ার মতো দশটা মাইনষেরে একা ঘায়েল কইরা দিবার পারতাম, তা জানস?'

ভিখারিনী বলে, 'পারস তো যা না, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কী?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ'।'

'ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মতো কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মতো প্রস্থান করে। কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিনীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটো কী র‍্যা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে নাই।

ভিখারিনী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগতে আইছস? হোই ও বুড়ির কাছে যা।' ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিনীর সামনে রাখিয়া বলে, 'খা। তোর লগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিনী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশি হইয়া বলে, 'নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে,—পাঁচী। তুই কলা দিছস, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার

মতো শৌখিন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধুলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে। পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল, 'ইদিকে ঘুরাফিরা কী জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে! লাঠির একঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে!'

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুলগাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র, তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল, 'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে, দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার তাহারা একটি পয়সা দিয়াছে, পুনরায় তাহাকে দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারির অভাব নাই।

কোনো রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নিচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারদিক-ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোনো যুবতী ভিখারিনীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজি হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়তো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যেভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোনো উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি-ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারো কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিনু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-একদিন বিনুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আর কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া, জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসরমতো পাথরে ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটি সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে

লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিকিমিকি করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা লইয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল, 'বাঁটি লইয়া ডানটির যদি রেহাই দিতা ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ-হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দিয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে মাইলখানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছু দূর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে জমি সাফ করিয়া পাঁচ-সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠকঠক শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড়বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচুবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারির কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গামতো না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুশকিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক ; চিল্লোবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটুকু আওয়াজ লয়, ভালো চাস তো একদম চুপ মাইরা থাক।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া লইল।

দম লইয়া বলিল, 'আলোটা জ্বাইলা দে পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'দেখছস? কেডা কারে খুন করল দেখছস? তখন পই-পই কইরা কইলাম; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছাড়ান দেও। শুইনে মিয়াবায়ের অইল গোসা! কয় কিনা, শির ছেঁচ্যা দিমু! দেন গো দেন, শির ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই।' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরে দিমু নাকি সাবার কইরা,—অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'ইবারে কী করবি?'

'দ্যাখ কী করি। পয়সাকরি কনে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশি উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশি হইল। বলিল, 'কী কী নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চান্দ উঠব, আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠব পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?'

'হ, ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথে দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।

টিকটিকি

দোতলা বাড়ি। শহরের যে অঞ্চল বেজায় শহুরে বলে খ্যাত সেইখানে। তিন দিকে গাদা-করা বাড়ির চাপ, একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি, আবেষ্টনীকে লক্ষ করলে সন্দেহ হয়, সমস্তটাই বুঝি হাই মায়াপিয়ার লীলা। তা ছাড়া, এমন চেহারা বাড়িটার যে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অসবর্ণ রহস্যের মতো কুৎসিত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন পথিকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে: আমি ভীরু ও সরলা, খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে, তবে অসতী। বে-আবরু সমতল পিঠে পুরোনো বাদামি রঙের আবরণটা চোখেই পড়তে চায় না, প্রাচীনতার ছাপ এত বেশি।

দোতলা বাড়ি বটে, একতলা-দোতলায় কিন্তু সিঁড়ির যোগাযোগ নেই। তিনটি সদর দরজার ডাইনেরটি দিয়ে ঢুকলেই খাঁচা-বন্দি দোতলার সিঁড়ি। অকারণ নড়াচড়ার একটু স্থান অবশ্য আছে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা অথবা পথে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই কোনো দিকেই। দোতলায় থাকেন ইতিহাসের প্রফেসর, সদর দরজাটির পাশে ছোট পিতলের ফলকে যিনি এম.এ.। একতলায় থাকেন জ্যোতিষার্ণব, বাকি দুটি সদর দরজার উপরে কাঠের ফ্রেম লাগানো রঙিন টিনের মতো সাইনবোর্ডের যিনি প্রথিতযশা। দুটি দরজাই একটি ঘরের, যার বেশির ভাগ জ্যোতিষার্ণবের গণনালয়, বাকিটুকু অন্দরের প্যাসেজ। তিনটি সদর দরজার মাঝেরটি দিয়ে ঢুকলেই ডাইনে দোতলার সিঁড়ি-আড়াল-করা দেয়াল আর বাঁয়ে দুটি বই-ভরা আলমারির বে-আবরু পিঠ। এগিয়ে এগিয়ে যখন অন্দরের দরজা ডিঙিয়ে জ্যোতিষার্ণবের আবছা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে অন্দরে পদার্পণ না করে প্রায় আর উপায় থাকে না, তখন দেখা যায়, আলমারির দেয়াল একেবারে অন্দরের দেয়ালে গিয়ে ঠেকে নি, ফাঁক আছে হাতখানেক। এই ফাঁকটুকু দিয়ে জ্যোতিষার্ণব নিজে আর তার নিজের লোক অন্দর থেকে গণনালয়ে যাতায়াত করে।

বাইরের লোক আসে তিন নম্বর সদর দরজা দিয়ে। এসে ডবল চৌকির ময়লা ফরাশেই হোক আর অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারেই হোক, বসে। বসে চারিদিকে তাকায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা আশা-নিরাশার ভারে বিব্রত চোরের মতো। যা চোখে পড়ে তাই মনকে নাড়া দেয়, দেয়ালের টিকটিকি পর্যন্ত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন সমস্ত পরপুরুষের দৃষ্টি নিয়ে নিজের সমালোচনা করছে, আমার কী উপায় হবে?

আসলে, এ ছাড়া প্রশ্নও নেই জগতে। সবকিছুতেই এই সমস্যার ছাপ মারা। ভবিষ্যৎ কি সবকিছুকে গ্রাস করে নেই?

জ্যোতিষার্ণবের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবার সময় তার ছেলেমেয়ের মা মাথা কাত করে, চোখ উলটে দেয়, মোটা আলগা ঠোঁট দুটিকে টান করে হাসে। জ্যোতিষার্ণবের অপরাধ,

সাত বছর আগে এই ভঙ্গি তাকে ভুলিয়েছিল। তবে, কেবল ভঙ্গি নয়। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করে, 'আমি মরলে তোমার কী উপায় হবে?'

জিজ্ঞাসা করে সকালবেলা আর মরে যায় সেই সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে, তবু মনে হয় প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে যেন সে মরে গেল।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কী। তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকিটার লেজ নড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আর-একটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? আর সব তো তার জানা আছে, যা মানুষের জানা দরকার! ওই জ্ঞানটুকু লাভ করলেই কি তার মনের এ ধাঁধা মিটে যেত যে, তার ছেলেমেয়ের মা মরবে বলে টিকটিকিটা ডেকেছিল, অথবা টিকটিকিটা ডেকেছিল বলেই তার ছেলেমেয়ের মা মরে গেছে?

ছেলেমেয়েরা ছোট। বড় ছেলেটি প্রথমভাগের বানান শেখে, ছোট ছেলেটি শেখে কথা বলতে। এদের মাঝখানেরটি মেয়ে, বোবা বলে সে কথা বলতে শেখে নি। মার সম্বন্ধে তাই প্রশ্ন করে শুধু বড় ছেলেটি।

'মা কোথায় গেছে বাবা?'

'স্বর্গে!'

বলে প্রমাণের জন্য জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। টিকটিকি বাড়িতে আট-দশটার কম নয়, কিন্তু একটাও জ্যোতিষার্ণবের কথায় সায় দেয় না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে বোকা মনে করার লজ্জায় করুণভাবে হেসে জ্যোতিষার্ণব নিজে-নিজেই কয়েকবার মাথা নাড়ে। স্বর্গে যদি গিয়েও থাকে তার ছেলেমেয়ের মা, এত দিনে সেখানে পৌঁছে গেছে। অতীত ঘটনার সঙ্গে কী সম্পর্ক টিকটিকির যে তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে গেছে সে এ-কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সায় না দিয়ে টিকটিকি থাকতে পারবে না? তা ছাড়া স্বর্গে যাওয়া না-যাওয়া তো জীবনের ঘটনা নয় মানুষের। মরে মানুষ যে-স্বর্গে যায় ইহলোকে কি সে-স্বর্গই আছে? স্বর্গই নেই ইহলোকে!

মনে মনে এত গভীর ও জটিল যুক্তিতর্ক নাড়াচাড়া করেও কিন্তু সন্দেহ যায় না। তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যায় নি বলেও তো চুপ করে থাকতে পারে ত্রিকালদর্শী টিকটিকিগুলি? স্বর্গে গিয়ে থাকলে অন্যগুলি না হোক, যে টিকটিকিটা তার ছেলেমেয়ের মার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিল, সেটা অন্তত ডেকে উঠত। হোক না অতটুকু জীব, একবার যে অতখানি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে তার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? জ্যোতিষার্ণবের বিপদ এই সে জানে তার ছেলেমেয়ের মার স্বর্গে যাওয়া নিষেধ। অবিবাহিতা বৌদের জন্য স্বর্গ নয়। কিন্তু কুমারী-জীবন থেকে একজন পুরুষের সঙ্গে যারা জীবন কাটিয়ে দেয় তাদের জন্যও কি স্বর্গে যাওয়ার কড়া ব্যবস্থা একটু শিথিল হয় না? তার ছেলেমেয়ের মার পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকুই আশা-ভরসা জ্যোতিষার্ণবের।

মার জন্য ছোট ছেলেটা ককায়। মেয়েটা বোবা-কান্না কাঁদে। বড় ছেলেটা কাঁদে আর জিজ্ঞাসা করে, 'মা কোথায় গেছে বাবা?'

জিজ্ঞাসা করে গণনালয়ে, তিনজন ক্লায়েন্টের সামনে। জ্যোতিষার্ণব দেয়ালে টাঙানো যোগিনীচক্রের পাশে নিস্পন্দ টিকটিকিটার দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ক্লায়েন্টদের সবিনয়ে বলে, 'একটু বসুন, আসছি।'

বলে ছেলেকে নিয়ে অন্দরে শোবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে আর সিলিঙে ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে। সেদিন ঘরে যা-কিছু ছিল আজও তার সবই আছে, কেবল নেই শৃঙ্খলা আর সেই টিকটিকিটা। শৃঙ্খলা সত্যই নেই, শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে না, কিন্তু টিকটিকি তো ফাঁকে-ফোকরে জিনিসপত্রের আড়ালে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, অতটুকু জীব টিকটিকি। একটু আশ্বস্ত হয় জ্যোতিষার্ণব। ছেলেকে বলে, 'কী বলছিলি তুই খোকা?'

বাপের কোলে উঠে ছেলের মন এতক্ষণে শান্ত হয়েছে।

'কখন বাবা?'

'আপিসে ঢুকে কী বললি না আমাকে!'

'কিছু বলি নি তো।'

ছোট বোন আর ভাইটি বাপের যে লোমশ বুকখানায় আজকাল রাজত্ব করে, সেখানে উঠে স্মৃতিভ্রংশ হবার বয়স খোকার পার হয়ে যায় নি। তবে বয়সের তুলনায় ওজনটা তার হয়েছে অস্বাভাবিক। ছেলেকে জ্যোতিষার্ণব মেঝেতে নামিয়ে দেয়। মৃদুস্বরে সন্তর্পণে বলে, 'তোর মার কথা কী জিজ্ঞেস করলি না?'

'মা কোথায় গেছে বাবা?'

বোমা নিয়ে খেলা করবার মতো অসহায় সাহসের সঙ্গে জ্যোতিষার্ণব বলে, 'নরকে।' বলে কান পেতে থাকে। কানে আসে ছোট ছেলেটার কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসরের স্ত্রীর হঠাৎ গাওয়া দু লাইন গান, রাজপথের চটুল ফাজলামি।

বড় ছেলেটা বাপের মুখ দেখেই বোধ হয় কেঁদে উঠবার উপক্রম করেছিল।

জ্যোতিষার্ণব চোখ রাঙিয়ে বলে, 'কাঁদিস না।'

খোকা কাঁদে না।

'শোন্, আমি ভুল বলেছি। তোর মা এখনো নরকে যায় নি, যাবে। বুঝলি? যাবে, ভবিষ্যতে যাবে।'

আবার জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। বড় ছেলেটা কেঁদে ওঠা মাত্র হাত চাপা দেয় তার মুখে। কানে আসে ছোট ছেলেটার থেমে-আসা ছাড়া-ছাড়া কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসরের স্ত্রীর থেমে-আসা দু লাইন গানের দুর্বোধ্য গুনগুনানো সুর, রাজপথের চটুল ফাজলামি আর টিকটিকির ডাক।

সেই টিকটিকিটার নয়। সে যাকে সেদিন তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছিল, সেটার। দুটি টিকটিকির আকারে, চামড়ার রঙে, চালচলনে পার্থক্য অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সব টিকটিকিরই এক রা।

মনে যার ব্যথা থাকে তার শখ চাপে মনের কথা বলবার। মনের ব্যথা যে মনকে কামড়ায় এটা তার একটা লক্ষণ। ছেলেমেয়ের মা যার নরকে যাবে, মনে তার ব্যথা থাকা স্বাভাবিক। জ্যোতিষার্ণব তাই হাত দেখাতে, ঠিকুজি মেলাতে, ভাগ্য গনাতে, মাদুলি-কবচ বিধান-ব্যবস্থা নিতে, পূজা-পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নির্বাহের আহ্বান জানাতে যারা আসে, তাদেরও যেমন মনের কথা বলে; শুধু দেখা করতে যে বন্ধুরা আসে, তাদেরও তেমনি মনের কথা বলে। জ্যোতিষ-বচনের মতো মনের কথা বলার কথা তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এ যুগের মানুষের অবিশ্বাসপ্রবণতা দিয়ে আরম্ভ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও যে কেউ কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, এ পর্যন্ত আসতে আসতে জ্যোতিষার্ণবের মুখ বিমর্ষ হয়ে যায়; গভীর আর্ত বিষাদের ছাপ। তা ছাড়া গলাও কাঁপে। ফরাশে বা চেয়ারে যেখানেই তার

শ্রোতা বসে থাকে, কথার চেয়ে কথার সুর আর জ্যোতিষার্ণবের চেয়ে তার মুখের ভাব শ্রোতাকে বিচলিত করে বেশি। জ্যোতিষার্ণবের ভণ্ডামিতে আর যেন বিশ্বাস থাকে না, অন্তত তখনকার মতো।

'প্রমাণ? বিশ্বাসের জন্য প্রমাণ চাই? আমার নিজের জীবনেই কত বড় বড় প্রমাণ ঘটেছে। এই তো সেদিন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, আমি কি জানতাম না তিনি ওই সময় মারা যাবেন?'

'জানতেন?'

গণনালয়ের টিকটিকিটা সব সময় নিজেকে প্রকাশ করে রাখে। হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি, সুকেশিনীর ছবিযুক্ত কেশতৈলের দেয়ালপঞ্জি–বিজ্ঞাপন, দেয়ালে বসানো তাক, জানালার চতুষ্কোণ গহ্বর, ফাঁকা দেয়াল, ছাদ, কড়ি–বরগার আড়াল—সমস্ত জায়গা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না, এদিক–ওদিক একটু তাকালেই নজরে পড়ে। জ্যোতিষার্ণব খানিকক্ষণ আনমনে তাকিয়ে থাকে টিকটিকিটার দিকে, তারপর মাথা হেলিয়ে বলে, 'প্রথমে জানতাম না। নিজের লোকের মৃত্যুর দিন গণনা করতে নেই, মানুষের মন তো, মন বিচলিত হয়ে পড়ে। সেদিন সকালবেলা হল কী, তামাশা করে আমায় বললেন, আমি মরে গেলে তোমার কী উপায় হবে? মানে, সংসার তো এক রকম চালাতেন তিনি, তাই হঠাৎ পরিহাস করে বললেন আর কি যে, তিনি যদি মরে যান এ সব কাজকর্মই বা কে করবে, ছেলেমেয়ে মানুষই বা কে করবে। সেই বললেন কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।'

'টিকটিকি?'

'হ্যাঁ, টিকটিকি। মনে কেমন খটকা বাধল। হস্তরেখা বিচার করে ওঁর বয়স জিজ্ঞেস করলাম। বয়স অবশ্য আমি জানতাম, বিয়ের সময় থেকেই জানতাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, তোমার কোষ্ঠীটা বার করো তো, কালো তোরঙ্গের তলায় আছে। উনি হাসতে হাসতে কোষ্ঠী বার করে দিলেন। তখনো আমার মন বলছে, থাক গে কাজ নেই, মরণ যদি ওঁর ঘনিয়ে এসে থাকে, কী হবে আগে থেকে জেনে? লাভ তো কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে কিছুদিন অতিরিক্ত মনোকষ্ট ভোগ করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণনা না করে পারলাম না। গণনার ফল দেখে মাথা ঘুরে গেল। সেদিন গোধূলিবেলা পর্যন্ত ওঁর আয়ু। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটা শবের দিকে তাকিয়ে আছি, ঠিক পিছনে আবছা মতন—'

শ্রোতা স্তব্ধ। গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে নয়, প্রকৃত তৃষ্ণায়। কিন্তু এখন জল চাওয়া যায়!

'জানতাম কোনো লাভ নেই, ওঁর বাবা ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান সত্যবাদী পণ্ডিত, তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের সময় তোমার বয়স তো দু–এক বছর কম করে বলা হয় নি? কোষ্ঠী ঠিক আছে তো? বিয়ের সময় যদি—থাকগে ওসব কথা। আপনাকে যা বলেছিলাম, পার্শ্বমুখ নক্ষত্র—'

নয়টি পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের একটির নাম রেবতী। ছ মাস পরে জ্যোতিষার্ণব ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য রেবতীকে বিয়ে করে আনে। মরে গেলে স্বর্গে যাবার অধিকার নিয়েই রেবতী এ বাড়িতে আসে বটে, বাড়িতে কিন্তু একটিও টিকটিকির দেখা সে পায় না।

তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে জ্যোতিষার্ণব বৌকে সতর্ক করে দেয়, 'দ্যাখো, কোনোদিন মরার কথা মুখে এনো না।'

রেবতী তখনো পার্শ্বমুখী, সোজা জ্যোতিষার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। জ্যোতিষার্ণব হরদম তাকায়। নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে। বিশদ দুজনের নক্ষত্র নিয়ে। তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র আর রেবতীর উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র তাদের মিলনকে করেছে রাক্ষস ও নরের মিলনের মতো।

এখন এই যে জ্যোতিষার্ণব, আমি এর জীবনে উদিত হয়েছিলাম, কি এ-ই আমার জীবনে উদিত হয়েছিল, আজও আমি এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারি নি।

কত আর বয়স তখন আমার হবে, রেবতীর চেয়ে অনেক ছোট। কিছুদিনের জন্য থাকতে গিয়েছি ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়ি, কী ভীষণ ভাবটাই যে হয়ে গেল রেবতীর সঙ্গে। বয়সের তুলনায় কী প্রকাণ্ড তখন আমার দেহ, কত পরিণত মন—কারো স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হওয়াটাই তখন আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য। অথচ রেবতীর সঙ্গে সারাদিন এত বেশি কড়ি আর তাস খেলতাম যে ইতিহাসের প্রফেসরের স্ত্রী অভিমানে আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলত না।

তাতে আমার সুবিধাই ছিল। আমায় যে ভালবাসে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, শব্দ দিয়ে অনেক দামি কী যেন আদায় করে নিচ্ছি।

আমি রেবতীর সঙ্গে কড়ি খেলি, জ্যোতিষার্ণব দুবার ঘরে গিয়ে তৃতীয়বার কাছে এসে উবু হয়ে বসে।

'দেখি হে ছোকরা তোমার হাতটা। আরে বাস রে, এ কী হাত, এত হিজিবিজি রেখা পেলে কোথায়? ভালো করে দেখতে হবে তো হাতটা তোমার। বাঁচবে অনেক দিন, তবে—'

রেবতী আমার হাত কেড়ে নেয়।

'খুব হয়েছে, ছেলেমানুষকে ভয় না দেখালেও চলবে।'

অন্দর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গণনালয়ে জ্যোতিষার্ণব আমায় পাকড়াও করে, শোনায় ভূতের গল্প। প্রথমে কান দিয়ে আরম্ভ করে শেষে লোমকূপগুলিকেও শোনার কাজে লাগিয়ে দিই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাগিদটা চাপা পড়ে যায়, তাকিয়ে দেখি রেবতী এসে আলমারির পাশের ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোতিষার্ণবের গল্প শেষ হতে বলি, 'আর-একটা।'

রেবতী ম্লান মুখে চুপ করে থাকে।

জ্যোতিষার্ণব হাসির ভান করে বলে, 'এ বাড়ির টিকটিকিগুলি যদি মেরে ফ্যালো, তা হলে বলব। একটা টিকটিকির জন্যে একটা গল্প। এ ঘরেই তো তিনটে আছে, লাঠিটা দিয়ে মারো না একটা।'

আমি বলি, 'লাঠি দিয়ে বুঝি টিকটিকি মারে? দাঁড়ান, আমার তীর-ধনুক নিয়ে আসি।'

রেবতী বলে, 'মানিক, মেরো না, টিকটিকি মারতে নেই।'

আমি একটু দাঁড়াই। হিসাব করে দেখি যে, রেবতীর মতো মেয়ে যখন একবার আমাকে ভালবেসেছে, কথা না শুনলেও ভালো না বেসে সে পারবে না, আমার সঙ্গে কড়ি আর পাতাবিন্তি খেলার জন্য সে যেরকম পাগল হয়ে উঠেছে, সে পাগলামি যাবার নয়। গল্প না বলে আমায় কষ্ট দেবার সুযোগ পেলে জ্যোতিষার্ণব কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ছাড়বে না। সোজা দোতলায় গিয়ে আমার বাঁশের ধনুক, আর শরের তীর নিয়ে আসি। তীর আমার সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, ডগায় দুটি আলপিন বসানো আছে।

এককোণে একটা টিকটিকি ছিল, ফরাশে উঠে দাঁড়ালে আমার তীরের আয়ত্তে আসে এইরকম স্থানে। নিস্পন্দ শরীর, নিষ্পলক চোখ, ধূসর জীবটিকে দেখলেই মায়া হয়।

রেবতী আবার বলে, 'মানিক, মেরো না, মারতে নেই!'

রেবতীকে আমি ত্যাগ করি নি কিন্তু তার কথার কোনো দাম আমার কাছে নেই। আকর্ণ সন্ধান করে চার ইঞ্চি তফাত থেকে বাণ নিক্ষেপ করি। এমন আশ্চর্য জীব টিকটিকি যে শিকারিকে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখলেও নড়ে না।

বাণবিদ্ধ টিকটিকি নিচে পড়ে যায়। বাণটি টেনে খুলে নিয়ে দেখি দুটি আলপিন বিঁধে টিকটিকিটার চোখের পাশে দুটি রক্তের ফোঁটা জমেছে—যেন নূতন দুটি চোখ। মানুষের রক্তের মতো লাল রক্ত টিকটিকির নয়—

জ্যোতিষার্ণব হাসি চেপে হাসতে আরম্ভ করে।

'চার-চোখো করে দিলে! টিকটিকিকে চার-চোখো করে দিলে! তোমাকেও চার-চোখো হতে হবে মানিক।'

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। কে জানে বাণবিদ্ধ টিকটিকির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক! ছেলেমেয়ের বাপ-মা হবার জন্য তারা যদি পরস্পরকে কোনোদিন ডাকাডাকি করে থাকে, সে খবর কেবল তারাই জানে।

রেবতী নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলে, 'ফের? ফের ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ?' বলে জ্যোতিষার্ণবের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই ভয়ে মুষড়ে যায়।

স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে না-পাওয়ায় এক মাসের মধ্যে আমাকে চশমা নিতে হয়। চশমা চোখ নয়, কিন্তু বন্ধুরা আমায় চার-চোখো বলে কত যে তামাশা করে ঠিক নেই।

তারপর ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়িতে আমি কোনোদিন যাই নি। চার-চোখে রেবতীকে একবার চোখেও দেখি নি। রেবতীর কথা মনে হলেই সেই বাণবিদ্ধ টিকটিকিটার দুটি ধূসর চোখ, তার চোখ দুটির পাশে দুটি ফ্যাকাশে রক্তবিন্দুর ছবি মনে ভেসে আসে, দারুণ বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়। রেবতীর প্রতি বিতৃষ্ণা—রেবতীর কোনো দোষ ছিল না, তবু।

হয়তো রেবতী জ্যোতিষার্ণবের ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। হয়তো টিকটিকির জন্য জ্যোতিষার্ণবের প্রথম ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যেতে না পারলেও, টিকটিকির জন্যই রেবতীর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হবার বিপদ কেটে গিয়েছে এবং স্বর্গে যাবার প্রতীক্ষায় সে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

এদিকে আমার বেড়েছে চশমার পাওয়ার। কখনো দেয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমার চোখ বুজতে হয় না—চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।

আত্মহত্যার অধিকার

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে।

কিছু নারিকেল আর তাল-পাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোনো লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙা বাক্সপেঁটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামাকাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড় ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, কাঁদে না; কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর এক ঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কী চাহনি? আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাত বছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কী অপরাধ যে মেয়েটা তাকে ও-রকম ভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোট ছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল, 'ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে। ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?'

নীলমণি বলিল, 'হয়তো হবে। বাঁচবে।'

নিভা বলিল, 'বালাই, ষাট।—শ্যামা, তুইও তো ধরতে পারিস ছাতিটা একটু?'

শ্যামা নীরবে ভাঙা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল-ভেদ-করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিসপত্র লইয়া মানুষগুলি একোণ ওকোণ করিবে কেমন করিয়া?

'এক ছিলুম তামাক দে শ্যামা।' নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল, 'ছাতিটা ধরো তবে।'

নীলমণি আকাশের বজ্রের মতো ধমকাইয়া উঠিল : 'ফেলে দে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদী!'

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মতো মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল, 'তামাক আর একটুখানি আছে বাবা।'

দুঃসংবাদ!

এত বড় দুসংবাদ-প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতি কষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল : বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন করিয়া? ছেলের কান্না দুই কানে তীরের ফলার মতো বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মতো সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি।

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে! নিজে গেলে হয়তো দোকান হইতে ধার আনিতে পারিত, কিন্তু—

নীলমণি খুশি হয়। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

'তামাক নেই বিকেলে বলিস নি কেন?'

'আমি দেখি নি বাবা।'

'দেখি নি বাবা! কেন দেখ নি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?'

'তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজি নি বাবা!'

'তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোনার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!'

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্‌গত অশ্রু সে দমন করিয়া লইল। না আছে তামাক, না থাক। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখ-মুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড় বড় ফোঁটার জল পড়িতেছিল—টপ টপ। অঞ্জলি পাতিয়া নীলমণি গুনিয়া গুনিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ-করা চামড়ার মতো ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কী বলিল, ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মতো তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দুজনেই।

শ্যামা বলিল, 'ও কী করছ বাবা?'

নিভা বলিল, 'পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাঁগো, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?'

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, 'হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয়তো কাল জুটবে না নিভা!'

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তার সহজ নয়। ঘরের চারিদিকে

একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্মমতা তাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মতো চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওর চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিসফিস করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুসমন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোনার ওই ভাঙা বাক্সটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝমঝম করিতে থাকে—টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনোমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, রাত কত?'

'তা হবে, দুটো-তিনটে হবে।'

'একটা কিছু ব্যবস্থা করো! সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব?'

বসে ভিজতে কষ্ট হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরো ভালো করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরনটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

'কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?'

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল, 'তবে ভালো করেই ছাতিটা ধর বাবু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।'

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিসফিস করিয়া আপন মনে বলিল, কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি। নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তার সজাগ, নির্মমভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তার স্তিমিত দৃষ্টিতে নিভার মুখ তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে শুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায়, ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের

অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ার আর কী মানে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকী সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভালো ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই; ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পেটের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয়তো ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ির ভালো ভালো খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয়তো ঘুমের মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন হিসাবে?

'নিমুকে তুলে দে তো শ্যামা।'

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'কেন, তুলবে কেন? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।'

'ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে।'

'হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢং করছে! যেমন কথা তোমার! ঢং করার মতো সুখেই আছে কিনা!'

আধ–ঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল, 'দ্যাখো, এমন করে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চলো।'

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল, 'না।'

নিভা রাগ করিয়া বলিল, 'তুমি যেতে না চাও থাকো, আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।'

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

'না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটলোক। সেবার কী বলেছিল মনে নেই?'

'বললে আর করছ কী শুনি? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।'

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'বলে থাকে? রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে—এ কী জ্বালাতন? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে কাপড়জামা সব ভিজে? ময়লা হবার ভয়ে ফরাশ তুলে নিয়ে ছেঁড়া শতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয়?—যেতে হবে না। বাস।'

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তার মাথা গরম হইয়া গেল।

'ছেলে মেয়ে বৌকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান–অপমান–জ্ঞান কী জন্যে? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না?'

নীলমণি বলিল, 'চুপ।'

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

'চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে—'

হাতের কাছে, ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল, 'চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন করে ফেলব।'

কথা কেউ বলছে না। নিভা একেবারে নিভিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, 'মা, ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।'

গরিবের মেয়ে, হা–ঘরের বৌ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

'আঁচড়াচ্ছে তো কী হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচ!—ভালো করে ছাতি ধরে থাক

শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব।'

নীলমণি বলিল, 'আমার লাঠিটা কই রে?'

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল, মেরো না বাবা। দরজা না খুললে ও আপনি চলে যাবে।

'তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি? চুপ করে থাক।' বাঁ পা-টি আংশিকভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোনায় তার মোটা বাঁশের লাঠিটা ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটা সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে। বেচারি খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এত দিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথিঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল, 'মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।'

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস? আজ ওর ভব-যন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।'

ভব-যন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; তার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে—হোক পানসা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মতো কুকুরটিকেও মারিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!'

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল, 'লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি। তোকেই খুন করে ফেলব আজ।'

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বার বার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, 'কী জিদ মেয়েব! ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।'

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল, 'জিদ বার করছি।'

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও-রকম রাগ হইলে সে কখনো সামলাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয়তো ভিন্ন। কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে!

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু,শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে!

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে

আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান-অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিকিল না।

'লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা?'

শ্যামা একবার ভাবিল চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

'একটুখানি আছে বাবা।'

'জ্বাল তবে।'

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, 'লণ্ঠন কী হবে?'

'সরকারদের বাড়ি যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না?'

যেন, সরকারদের বাড়ি যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল, 'দেশলাই কোথা রাখলে মা?'

নিভা বলিল, 'দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই?'

নীলমণি বলিল, 'ওর কি জ্ঞান-গম্মি কিছু আছে?'

নিজের মুখের কথাগুলি খচখচ করিয়া মনের মধ্যে বেঁধে। এ যেন তোতাপাখির মতো অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা; না বলিলে চলে না সত্য; কিন্তু আসলে বলিয়া কোনো লাভ নাই।

সাত বছরের পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না বাবু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়ে নি। দে তো শ্যামা, শুকনো কিছু দে তো। আর এক কাজ কর—দুটো-তিনটে কাপড় পুঁটলি করে নে। ওখানে গিয়ে সবাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস।'

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল, 'হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা? লক্ষ্মী মা আমার—পারবি? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। জলের কি অভাব?—তামাকটুকু ফেলে যাস নে ভুলে।'

সব ব্যবস্থাই হইল, নিমুর কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তারা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে; সময়মতো অন্তত দুটি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধ হয় ওই ভগ্নস্তূপের মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়া ছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল—দরজা খোলো, দরজা খোলো।

বাড়ির সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছলে এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কষ্ট নীলমণিরই বেশি; শুকনো ডাঙাতেই বাঁ পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট করিয়া ডিঙাইয়া যাইতে হয়—এখন তার পা আর লাঠি দুই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটলি, হুঁকা কলকি, লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ি। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোনার প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটার তলা দিয়া তিন–চারি হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুলগাছটার জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছমছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোনালি পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল, 'ও শ্যামা, পার হব কী করে!'

শ্যামা বলিল, 'জল বেশি নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্তও ওঠে নি। চলে এসো।'

সুখের বিষয় স্রোতের নিচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাকে বিপন্ন করিল না, তবু এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দুচোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল,এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়? যে–প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙা ঘরে টিকিতে না পারিয়া তাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয়তো সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান—সে কোন দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া! একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল, 'বাবা, চলে এসো। দাঁড়ালে কেন?'

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল; ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মাগো, সাপ!'

পরক্ষণে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, 'সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কী পিছল!'

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল, 'শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর—পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!'

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনো বাড়িসুদ্ধ সকলে বাড়ি বাড়ি করিয়া পাগল। বলে, বেশ হয়েছে, না? দোতলায় দুখানা ঘর তুললে, বাস, আর দেখতে হবে না।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড় ছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল, 'ব্যাপার কী? ডাকাত নাকি?'

নীলমণি বলিল, 'না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে। ভাবলাম তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।'

বড় ছেলে বলিল, 'সন্ধ্যাবেলা এলেই হত!'

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল : 'সন্ধ্যায় কি বৃষ্টি ছিল ভাই? দিব্যি ফুটফুটে আকাশ— মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।'

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু বড় ছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড় ছেলে বলিল, 'বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকি পাবেন না, চৌকিতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।'

'তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখান কম্বল-টম্বল—'

'ওই কোণে চট আছে।'

বড় ছেলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁজালো হাসি হাসিয়া বলিল, 'দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু মারতে বাকি রাখবে।'

নিভা বলিল, 'ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো!'

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, 'তা ঠিক।'

ঘরে অর্ধেকটা জুড়িয়া চৌকি পাতা, বড় ছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকির উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ির আত্মীয়কেও ফরাশ তুলিয়া লইয়া শুধু শতরঞ্চির উপর শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুশি হইল। বড় ছেলের পিসে!—আপনার লোক। সে যদি ও-রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তারা যে লাথিঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য!

চারিদিকে চাহিয়া নীলমণির খুশির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক, মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোট জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ এক রাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক—তারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

'ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিস নি মা, চটগুলি বিছিয়ে দে চট করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, মারামারির কী আছে। এতক্ষণই গেল না হয় আরো খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ। দাও না, খোকাকে চৌকির একপাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফেল।' গলা নামাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, 'ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, অত লজ্জাটা কিসের শুনি? লজ্জা করে দরজা খুলে বারান্দায় চলে যাও না!'

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়, চাপা একটানা শাঁ শাঁ শব্দ। তাদের—নীলমণি আর তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ একরকম শাসানো! পঞ্চভূতের মধ্যে যার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কী করিবে? পরশু? তার

পরদিন? তারও পরের দিন।

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, 'মাগো কী গন্ধ!'

নিভা বলিল, 'নে, ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।'

নীলমণি বলিল, 'ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।'

নিভা বলিল, 'না না, ঝাড়িস নি। ধুলোয় চাদ্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।'

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকির দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড় ছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মতো ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোনা যায়। বুকের বাঁ পাশে কি ঠিক চামড়ার নিচেই হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিক পরে ক্ষীণস্বরে বলিল, 'একটা জানালা খুলে দিন।'

নীলমণি সভয়ে বলিল, 'দে তো শ্যামা, জানালাটা খুলে দে।'

শ্যামা আরো বেশি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'ঝড় হচ্ছে যে বাবা!'

'হোক, খুলে দে।'

শ্যামা পশ্চিমের ছোট জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পুবদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিটেফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ার বিশেষ কোনো মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর-এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল, 'ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাত! বাপ!'

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার অসুখ আছে নাকি?'

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, 'খুব মোটাসোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কানা, এত লোককে নিচ্ছে, আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায় শত্রুও যেন—'

'ব্যাপারটা কী?'

পিসে রাগিয়া বলিল, 'টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কী। যার হয় সে বোঝে।'

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'আহা, সেরে যাবে, ভালোমতো চিকিচ্ছে হলেই সেরে যাবে।'

পিসে বলিল, 'হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকি আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া—কিচ্ছুটি বাদ যায় নি। আজ চার বছর ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছি, কোনো ব্যাটা সারাতে পারল!'

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মতো শ্বাস টানে, এক-একবার থামিয়া গিয়া ডাঙায় তোলা মাছের মতোই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল।

বাতাস। পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

পিসে বলিল, 'কী করে জানেন? বলে, ভয় কী, সেরে যাবে। বলে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে, না বাপু, তোমার সারবে না, এসব ব্যারাম সারে না। আমি বলি, ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল, দে, মরবার ওষুদ দে।'

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তার বিনিদ্র আরক্ত চোখ দুটি কেবলি মিটমিট করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপদপ করিতেছে, এখনই নিবিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা–কলকি শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিবিয়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকি তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মতো শাঁ শাঁ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।

সরীসৃপ

চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। জমি কিনিয়া বাড়িটি তৈরি করিতে চারুর শ্বশুরের লাখ টাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টনটনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলি-ব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোনোদিন কোনো দিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমত, আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়ত, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরে প্রত্যেকটি মুহূর্ত বেশ ভালোমানুষের মতোই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ঙ্কর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়ত, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানা রকম মজা করিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতি-সাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আর যেদিকে সর্বনাশের পথ খোলা রহিল সেদিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্তভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে বাঁচানোই ছিল উচিত তাহার মতো বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহার নাম কিছুই-না-থাকা।

কোনো লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল, কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতের বৎসর বয়সে। বনমালী তখন পনের বৎসরের বালক মাত্র। চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়িতে স্ফূর্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোট দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, বৌমাকে পাহারা দিস বুনো।

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বৌ বলিয়া নয়, স্ত্রী-জাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়িতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চারুর দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে

তাই বাড়িতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময়ে চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত এবং কর্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ি ছাড়িয়া মার জন্য মন-কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত। কিন্তু অবুঝের মতো তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, 'চুপ চুপ! বাবার হুকুম।' এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনি যমের মতো ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, শহরের ভিতরে একটা বাড়ি করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোনো সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনি উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, 'ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ি তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমার সর্বস্ব গেছে, যাক, কী আর করব;—সবই মানুষের কপাল। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।'

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকাশে হইয়া আসিয়াছে কেবল এইটুকু লক্ষ করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল,—'নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধ হয় ভালো লাগছে না, ভাই?'

'বেশ লাগছে।'

চারুর ছোট বোন পরী এক মাসের ছেলে-কোলে কাছে বসিয়া ছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তার ভালো লাগিতেছিল না। এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, 'এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন, বনমালীদাদা। ডালনা নিশ্চয় ভালো হয় নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কি কিছুতেই আমাকে রাঁধতে দিলে!'

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, 'না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাপু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না?'

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'ঘেন্না হত! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা এ কথা বললেও আমি বিশ্বাস করি নে দিদি!'

চারু একটু হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নে, না করিস না করিস একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দে।'

'আমিও কথাই বলছি।'

চারু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের

মধ্যে খচখচ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার?' বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, 'দেখলে ভাই? শুনলে মেয়ের কথাবার্তা? আমি যেন ওর ইয়ার! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শ পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও দিদি! টাকার বেলা দিদি, দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়!'

বনমালী বলিল, 'ছেলেমানুষ, বোঝে না!'

'বোঝে না? হুঁঃ, কচি খুকি কিনা বোঝে না! বোঝে সব, সব বুঝে ও এমনি করে এ আর আমি টের পাই নে! দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট বলতে পাঁচশ টাকা পাঠিয়ে দেয় নি!'

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সী পাটের দালাল।

খানিক পরে চারু বলিল, 'যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ি আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়িটা নিয়ে নেবে না, কিন্তু আর কারো কাছে বাঁধা রাখলে কী সর্বনাশ হত বলো তো!'

'তা বৈকি। বাগানবাড়ি পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ি তো তুমি বাঁধা রাখ নি চারুদি, বিক্রি করেছিলে।'

'ওমা, সে কী? বাড়ি আমি বিক্রি করলাম কখন?'

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, 'দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো, তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার পাঁচ বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ি বিক্রি করেছ। বরাবর সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।'

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কী বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, 'তুমি হাসছ, তাই বলো!'

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামি মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য সহজে দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, 'আমি বলি কী, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ি দিয়ে তুমিই বা করবে কী; তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, বাকিটা আমাকে দাও। তোমার ত্রিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটখাটো বাড়ি তুলে বাস করিগে। জমি–জায়গা যা আছে দু–চার বিঘে তার খাজনা পাই না, ফসল পাই না, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।'

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোনোকিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখি হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া বলিল, 'তুমি এ বাড়ি বিক্রি করতে চাও? খেপেছ!'

চারু সভয়ে বলিল, 'কেন? তোমার টাকা তো তুমি পাবে!'

'আমার টাকা চুলোয় যাক।'

চারু আরো ভয় পাইয়া বলিল, 'রাগ কোরো না ভাই। মেয়েমানুষ কিছুই তো বুঝি নে!'

বনমালী বলিল, 'ভুবনের বাড়ি বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে? ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না। সময়টা, কি জান চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়িটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।'

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, 'তারপর?'

'ভুবনের বাড়ি ভুবন ফিরে পাবে।'

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, 'কিন্তু তোমার টাকা? তোমার তিরিশ হাজার টাকা?'

'ভুবনের কাছে জমা থাকবে।'

এ কথা কেহ বিশ্বাস করে! নির্মূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, 'কেঁদো না চারুদি। আমি কি তোমার পর? আগে তুমি আমাকে কত ভালবাসতে।'

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্য সত্যই আর কোনো আশা নাই।

'আমি যদি তোমার মনে কোনোদিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—'

বনমালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

'তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন?'

চারু চোর বনিয়া গেল—'যদির কথা বলছি।'

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরো গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ভুবন কোথায় চারুদি?'

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, 'ও ভুবন, ভুবন! একবারটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।'

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থপথপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভালবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, 'আর আসব না দিদি।'

আরো এক মাস পরে বনমালী তার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাস-দাসী ও মোট-বহর লইয়া শহরের ভিতরের বাড়ি ছাড়িয়া চারুর শহরতলির বাড়িতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই?'

বনমালী বলিল, 'অসুবিধে হলে এতদিন বাস করলাম কী করে, চারুদি? সে জন্য নয়। মনে করছি, বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দুখানা ঘর তুলব ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।'

চারুকে বলিতে হইল, 'আহা আসবে বৈকি, সে কী কথা, বেশ করেছ।'

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ি মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার

কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ি বনমালী দুইশ দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকার সদরের গেট হইতে পেছনের গলিতে খিড়কির দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, 'অসুবিধে হচ্ছে চারুদি?'

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয়।

'না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।'

'কিছুদিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বৈকি!'

'দেশে কি বাড়ি ঘর দোর কিছু আছে ভাই, যে যাব?'

'হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ি হয়। জমি-জায়গা আছে, খাজনা পাওনা, ফসল পাওনা, সব লুটেপুটে নিচ্ছে। নিজে থাকলে লোকসানটা রদ হত।'

'জমি! জমি কই দেশে? কিছু কি আর আছে ভাই, আমার সর্বস্ব গেছে।'

বনমালী তখনকার মতো চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, 'হ্যাঁ রে, ওরা কি যাবে না?'

'কোথায় যাবে?'

'যে চুলোয় খুশি, আমাদের তা ভাববার দরকার? ক-দিন দ্যাখ, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।'

'তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ওসব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।'

কয়েক দিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, 'শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও? আমায় বল নি কেন চারুদি? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্মকর্মে আমি বাধা দেব কেন?'

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে ভুবনকে লইয়া এ বাড়ি হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে একপরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, 'কই, তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলি নি? ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে। মামিকে বলছিলাম, স্বামী-শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার এক পা কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসিমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই?'

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভালো লাগে না।

'তবু, দেশ-বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হত।'

'হায়রে কপাল, ওর আবার দেশ বেড়ানো!'

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কী আর হইবে, থাক। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদির ভারটা আর এমন কী গুরু!

কাঁকর বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দুটি কচি সবুজ ঘাসের শিষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাইয়ের মতো তাদের দুটিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত!

তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, 'দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো! কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে!'

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া চারু গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটা বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, 'আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।'

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'অমন করে কাঁদিস নে পরী; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।'

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

'ওকে এখন ওসব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কি একটু কাঁদতেও পেরেছে রে! এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কি অসুখে পড়বে মেয়েটা? খানিক কেঁদে নিক।'

পরী আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, দেখো কী নির্মম; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না!

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে দম লইয়া পরী বলিল, 'ও মাসিমা, দিদি কী করছে দেখুন।'

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

'ধর তো, দেখেই আসি একবার।'

বনমালী হাত বাড়াইল না।

'আমি দেখে আসছি।'

'তুই এখানে বোস।' পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে একরকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে লইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এসব তাঁহার ভালো লাগে না— সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি! তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্বদা তাঁহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোনো প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পরের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁজে শেষে কি তাঁর তালু জ্বলিবে?

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, 'দরজা খোলো মা, দরজা খোলো, ওসব কি করতে আছে? মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মতো চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া

গিয়াছে। ভুবনকে আদর করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিরাজি তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, 'খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙেই গেল।'

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, 'তোর ছেলেটা তো বেশ হয়েছে রে।'

'থাক, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।'

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সঙ্গত; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনোদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোট বোন। আজ বনমালী লক্ষ করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।

'তোর ঘাড়ে কী লেগে আছে রে, পরী?'

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, 'কী লেগে থাকবে? কিছু না।'

'তুই পাউডার মেখেছিস?'

পরী জোরে নিশ্বাস লইয়া বলিল, 'মেখেছিই তো, একশ বার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন?'

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধ হয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর পেটে হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের মধ্যে কোন কারণে তাহার বুক সর্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিকমতো বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, 'আমার মতো অবস্থা মাসিমা শত্রুরও যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনো দিকে কূল-কিনারা নেই মাসিমা, আমি অকূলে ডুবেছি।'

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো মা, কী করবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

মাথা চারু ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে লইয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোন দিক সামলাইবে!

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু রেখে গেছে?'

'না।'

'কিছু না? পোস্টাফিসে, ব্যাংকে, তোর নামে কিছুই রেখে যায় নি?'

'কী রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি? মাস গেলে হাত-খরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাতত, রেখে যাবে!'

'আমি যা দিয়েছিলাম?'

'শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে—খাট-পালঙ্ক ছাড়া।'

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'তোর গয়নাও দেয় নি নাকি? তোকে যে আমি তের-চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে!'

'কিচ্ছুটি আমাকে দেয় নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্স খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্যন্ত।'

'এমন চামার! তা, আর দুটো মাস তুই ধৈর্য ধরে থাকলি না কেন? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।'

'বড় খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভালো লাগল না।'

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, 'থাকতে ভালো লাগল না! মেয়েমানুষের অত ভালো লাগা মন্দ লাগা কী লো, যা, কালকেই ফিরে যা তুই,—বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।'

পরী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'আছে ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের একটা রোজগার করে? তাদের দিয়ে যেতে হবে না? ও বাড়ি আমি আর যাচ্ছি না বাপু, হ্যাঁ।'

চারু আগুন হইয়া বলিল, 'ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি? তোকে খাওয়াবে কে শুনি? আমি! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।'

'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি', বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি! ভাবতে হবে না তো আমাদের বাড়িতে এসেছিস কেন লো হারামজাদী?'

তিন দিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত-পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

'দেখ পরী, এত বাড় ভালো নয়।'

'নয় তো নয়, কী হবে?'

'খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করি নি তোকে আমি?'

'সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।'

চারু বনমালীর শরণ নিল।

'মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।'

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, 'আহা, যাবে বৈকি চারুদি, যাবে। দুদিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কী?'

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'লেগেছ তো পিছনে? জগতে কারো ভালো করতে নেই।'

'তুই আবার কবে আমার কী ভালো করলি লো?'

'এখানে আছ কার জন্য? ভেবে দেখছ একবার?'

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোর জন্য, না? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস!'

'তাই।'

চট করিয়া ঘুরিয়া দম দম পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওর জন্য আমি আর কিছু করব না। করব না, করব না, করব না, এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।'

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশি দিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বোঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশি কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা অনেক আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলে, 'খান, পেট আপনার ভরে নি। কখখনো ভরে নি। আমি বুঝি না! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে?'

বলে, 'কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন, বেশ রাঁধি।'

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আবদারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, 'হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছ দিদি? দুধটা এনে দাও। খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভালো হবে?'

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু-চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হালকা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে 'স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কী করছেন।'

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপি চুপি ঘরে আসে।

বলে, 'কী চাই বলুন।'

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, 'পা কামড়াচ্ছে—কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না।'

পরী বলে, 'কেষ্ট কেন? আমি কি পা টিপতে জানি নে?'

অবশ্য পা টেপে না, অত বোকা পরী নয়; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, 'যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।'

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তনের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না। ভাবে, কী মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে!

একদিন একটু বেশি রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎ-চমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল; প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড় ভয় পাইতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজ-খবর লইলে পরী খুশি হইবে। বনমালীকে ও যে-রকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে ওকে একটু খুশি রাখা দরকার বেকি!

নিশুতি রাত, বাড়িটা এক-একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কী জানি, একটা বাজ যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে!

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দুপা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘগর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার

প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়সড় হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোট বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতা দুহাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চিৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কী বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন–ঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনো বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিড়–খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, একী মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া লইল যে তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারাজীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে।

হয়তো ভুবনকে না দিয়া এ বাড়িটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, 'ভুবন আর বাড়ি নিয়ে করবে কী চারুদি? পরীকেই দিয়ে দিলাম।'

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়া–আসা টের পাইয়াছে। পাক টের। কাল তারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোনো কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দুটো উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন দুঃখে? কপাল পুড়িয়া যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে বাড়ির ঝিয়ের চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠার বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহ চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়িতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে। যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটা বার বার ভাবিয়া এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ লইয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ির গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণি দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে কত যত্নে তাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার

ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করিল ইহার আকস্মিকতা, ইহার অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাত ছেলেমানুষি খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিন বছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ওসব পাগলামি চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারো মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যেদিকে যেভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কী আছে যে তার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে? মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কী কারণে মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনো কোনো আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই! তার নৈকট্যকে, তার নির্বাক আবেদনকে, তার দু-চোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তাহার হিসাব হয় না।

তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত!

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, ইহার চেয়ে সে-ই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভালো ছিল, এ রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু-তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই শুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না-চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। ইহার কোনোটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমনি অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন—এ রকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল, 'নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।'

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনো আর একজন বাকি।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী একরকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায়-চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত!

গাছের ডাল হইতে টপটপ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, 'কী বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল!'

বনমালী বলিল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

'হ্যাঁ। কদিন গরমে প্রাণটা গেছে—আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।'

বনমালী আচমকা বলিল, 'ক্ষেন্তির মা দুশ টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?'

চারু মাথা নাড়িল।

'কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মার কী? হুট বলতে ও যেখানে খুশি যেতে পারে, আমরা পারি নে। আমাদের মায়া–মমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে—'

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, 'ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোনো, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করার কী দরকার কে জানে! কথা কি শুনবে মেয়ে! তোমাকে মানে, ফলটল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা দেখো ভাই।'

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়ে একটা আস্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিত তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রীনিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে তার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকার দরকার নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে? পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বৌয়ের কলেরা হইয়াছে। তাকে বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বৌটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে লইয়াই মরিয়া হইয়া সে ধরনা দিতে আসিয়াছে। বৌটির নাম কনক, বয়স অল্প; থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মতো।

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বৈকি।

'হ্যাঁ মাসিমা, কদিন থাকবেন আপনি?'

চারু হিসাব করিয়া বলিল, 'আজ নিয়ে হল তিন দিন, আরো পাঁচ–ছ দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায়! কিন্তু দেখি কটা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্ন–আত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখানে, পা গুটিয়েই বোসো না, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ ছেলেকে ওরা কীভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কী করে জানব? এতকাল একটা জমিদারি চালিয়ে এলাম, আমার কি ওসব ভুল হয় বাছা? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।'

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাড়িতে থাকিলে ভাষার একটু সংযম

দরকার হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ি মনে করিবে!

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চা লইয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, 'আপনি তাহলে আছেন কদিন? আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসিমা। বাবার দয়া হতে দুদিন লাগে কি তিন দিন লাগে ঠিক তো কিছু নেই, একা কী করে থাকবে এখানে ভেবে বড় ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর—'

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'মাসিমাকে প্রণাম কর শিশু।'

কাল কনক ধরনা দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ।

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীবাসের কর্তা একটা গাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগতই বলিতেছে, 'যাও না হে ছোকরা, হাসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি? আচ্ছা বেয়াক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোনো ভয় নেই—আমি বলছি কোনো ভয় নেই। রোগী হাসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্যন্ত ডিসেনফিট করে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন।'

'হলে আর তোমায় বলে কী হবে বাপু?' এই ধরনের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্তা চোখ লাল করিয়া একবার তার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোনো জবাব দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহার দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

'মাসিমা, দেখুন না, এরা জোর করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না।'

চারু বলিল, 'তা যাও না বাছা, হাসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয়?' তারপর ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'এখনো একজন ডাক্তার ডাক নি, করেছ কী? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপর অন্য কথা।' বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ি লইয়া চাকর ফিরিয়া আসিলে।

শিশুকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমার পাথরের বাটিটা?'

'বাটিটা বৌদি নোংরা করে ফেলেছে, মাসিমা।'

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কেন নোংরা করেছে? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাপু। আচ্ছা, যা করেছে, বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও।'

'একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।'

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, 'দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ি ফেল করব নাকি? যেমন আছে তেমনি এনে দাও।'

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তার একখানা পরনের কাপড় মাটিতে বিছাইয়া বলিল, 'এইতে দাও।' অনেক পরত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু সেটা আলগোছে তুলিয়া লইল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া লইয়া চোরের মতো কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া

আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া ধূলাপায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, 'এক হাতে নয়, দুহাতে ধর। ছেলের মা তুই, তোর তো সাহস কম নয় পরী! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল।'

'দুটো ভাত যে দিদি!'

'ভাত নয় প্রসাদ, খা।'

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্মাল্য-পান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটা লইয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে একঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোকে সকলে ভালবেসেছে ভুবন?'

ভুবন অস্বীকার করিল।

'তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনল কেন? আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী রে পদ্ম? সকলের ভাবসাব কী রকম দেখলি বল তো?'

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালোও নয় কিন্তু। দুয়ের মাঝামাঝি। পরী তার বোনপোকে ঠিক সময়মতো না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মার জন্য হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুরবেলা ভুবন চুপি চুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

'কি জান মা, মার মতো কেউ কি করে?'

চারু বলিল, 'আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কী হবে? মারধর করে নি তো কেউ?'

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।

'না, মারধর কেউ করে নি।'

চারুর পুরা নাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরানী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়,— মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেষভাবে সুন্দরী দেখিল,—অপরূপ, অভিনব। পরী যতবার তার লাল-করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বহিয়া গেল।

ভাবিল, 'না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বৈ তো নয়।'

শরীরটা চারুর ভালো লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোনোমতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বৌটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিনঘিন করিতে লাগিল।

মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবত মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে।

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাকে বলিল, 'ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শিগগির।'

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল এক ঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড়বিড় করিয়া আপন মনে কী যে সে বকিতে লাগিল কেহ তার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর না বুঝুক, বনমালী বারকত তাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্য তার কোনো ভয় নাই, ভুবনের ভার সে লইল।

পরীর মনে হইল তাহারও কিছু বলা দরকার।

'ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনো।'

কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথা বিশ্বাস করে? চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, যাহার বিধান তারও বোধ হয় ক্ষমতা নাই সে-শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

কদিন পরী খুব কাঁদিল। 'দিদি আমায় বড় ভালবাসত', এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

'এক দিনের তরে সুখ কাকে বলে জানে নি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে'—বনমালী বলিল, 'শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।'

পরী বলিল, 'হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে একরকম মরবার দাখিল হয়েছিল।'

'অথচ একটু যত্ন হয় নি!'

'না। নিলে তো কারো যত্ন! তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্য খেটে প্রাণটা দিয়েছে।'

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, 'বড় ঘা খেয়ে গেল। আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কী বল?'

'হলে না কেন?'

পরী হাসিয়া বলিল, 'বাহ, বেশ; আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসাব থাকে? তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব!'

বনমালী বলিল, 'তাই নাকি!'

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনো পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সেদিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলোচুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আলতা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া লইল। ছোট একটি পান সাজিয়া মুখে লইয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর বনমালীর বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়িয়া একটু হাসিল।

'শোনো। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিং বোতল এনো, আমি

মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো?'

'আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারি কাঁদছে পরী।'

'পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।'

'পদ্মর কাছে না দিলেই হয়।'

'আমাকে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয়।'

বনমালী তাহার গালে একটা টোকা দিল।

'না সাজলেই তোকে ভালো দেখায় পরী।'

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম-ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া লইল। চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোকে না পাঁচশ বার বলেছি বাবুর ধারে-কাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না?'

পদ্ম একগাল হাসিয়া বলিল, 'বাবু নিজে ডাকলে গো। বললে, 'খোকাকে আন তো পদ্ম। ভয়ে মরি দিদিমণি।'

'মরণ তোমার! ভয় আবার কিসের?'

'তা যাই বল, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু। দেখলে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই অ্যাদ্দূর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।'

পরী হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, বেশ করিস। তার পর কী হল বল।'

'ভয়ে ভয়ে খোকাকে তো নিয়ে গেলাম। বাবু কোলে নিলে, আদর করলে, চুমো পর্যন্ত খেলে। তারপর বললে, বেশ ছেলেটা, না রে পদ্ম? লজ্জায় মরি দিদিমণি।'

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, 'আচ্ছা, পরের ছেলেকে তুমি এত ভালবাসলে কী করে বলো তো? তোমার হিংসা হয় না?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না, দুদিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব কী? বরং তোর ছেলে বলে ভালই বাসি।'

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

এ কী পরিণাম! সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক!

আরশি কি প্রত্যহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালবাসা এর মধ্যে উপিয়া গেল কী করিয়া? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আরশিতে নিজেকে তাহার প্রত্যহ নূতন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক-একটা অভিনব ভঙ্গিমা আজও সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এর মধ্যে পুরানো হইয়া গেল। মাথায় না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায়?

পরীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনো চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম-ঝি বড় মিথ্যা বলে নাই। বনমালীকে সেও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোনো স্তরই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুত গতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়া লয়। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনি অধীর। স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক জীবনের রস-বস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জব্দ করিয়াছিল চারু।

চারু তার প্রথম বয়সের নেশা; অদম্য, অবুঝ, বহুকালস্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারী-মনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে, চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহমন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে লইয়া খেলা করিত; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তাহার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর একগ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মতো প্রতিভা নাই। বনমালীর পাকখাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নিচে জুঁই আর বেল ফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায় সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলিতে থাকে, 'শোধ নিস, শোধ নিস; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন? শোধ নিস।'

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া ওঠে, 'কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা!'

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে এ-বারান্দা ও-বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে উঁকি দেয়, বনমালীর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নৈশ পর্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল বিছানায় উপুড় হইয়া সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিরদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বনমালীকে ডাকিয়া তুলিল।

'ভুবন কী রকম করছে দেখবে চলো।'

'কী রকম করছে?'

'কাঁদছে আর ছটফট করছে।' অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, 'প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে?'

'আমি।'

বনমালী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, 'দ্যাখো তো কী করলে! নিভিয়ে দাও।'

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।

'ঘরে যাও' বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নিচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুইয়া থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

'কে রে? পরী নাকি? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কী করছিস পরী?' বলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া যোগ দিলেন, 'মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে!'

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিতা হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এ কী কাণ্ড মা! অ্যাঁ?'

পরদিনটা কোনোরকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, 'পরীকে পাঠিয়ে দে বনমালী।'

'দেব। এখন থাক।'

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল–তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেন না, তিনি আবার বলিলেন, 'না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস?'

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, 'দুটি খায়, ও আবার বোঝা কী মা?'

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনির মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটা পর্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দুদিন পরে আবার বলিলেন, 'যে রাগী মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয় না বাপু। কিন্তু চোখ মেলে তো এ আর দেখা যায় না বনমালী!'

'কী হয়েছে?'

'রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না, বল?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না। আমার রাগ হবে না, বলো।'

হেমলতা গলা নিচু করিয়া বলিলেন, 'পরীর স্বভাব–চরিত্র ভালো নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস। ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া কাঁকড়া চুল?'

'জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুরবেলা সেদিন চোরের মতো পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক চেয়ে ওদিক চেয়ে নিচে নেমে গেল।'

'কবে?'

'পরশু।'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'পরশু তো? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারি চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা! পরী সেরকম নয়।'

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোশ গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত। আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভালো করিতে যাওয়া কি তাহার সাজে?

এদিকে বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মতো জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, 'অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব? যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাব? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকব? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ব? পায়ে ধরে যে দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব?'

এর মধ্যে শেষ কল্পনা দুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালবাসে।

অন্তত তার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোনো কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে— ভুবনকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে লইয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মতো একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারি সুখী।

বলে, 'ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।'

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, 'আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে এ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিও।'

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, 'যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।'

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত।

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া লইতেছেন।

বনমালী বলে, 'আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।'

হেমলতা বলেন, 'আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস।'

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বার বার হলঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল, পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে দুটা বাজিতে চলিল কী করিয়া?

ঘড়ির ডায়ালটা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারি কৌতুক করিয়াছে এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, 'ভেঙে ফেলে দেব, পাজি কোথাকার!'

ঘড়িতে ছটা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, 'ছটা বাজল মামা।'

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয় ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর একপ্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়। ছটার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে

হইবে, কিন্তু সময়মতো ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়তো কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে? তাহাকে একটু খুশি করার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য।

ভুবনকে সে যে ভালো বলিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরো একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত; চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, 'একটা বাড়ি নিবি, ভুবন?'

'নেব মামা।'

'আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ি লিখে দেব।'

এ বাড়ি অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোট বাড়ি সম্প্রতি একপ্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়িটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরী তো তাহার মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়িটিই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিত কুক্কুরীর মতো অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া লইয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাশিতে কাশিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, 'কী করে এমন হল দিদিমণি?'

পরী ফিসফিস করিয়া বলিল 'বাবুর কীর্তি পদ্ম। অন্ধকারে—'

পদ্ম চোখ মিটমিট করিয়া বলিল, 'সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। হুঁদো বেড়ালটার হয়েছিল দেখ নি? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা পুঁজে রক্তে—!'

কয়েকদিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে লইয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপিচুপি ভুবনকে বলিল, 'মার কাছে যাবি, ভুবন?'

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, 'যাব।'

'এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।'

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

'মামাকে বলে যাই?'

'তবেই তুমি গিয়েছ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস? ছাই দেবে!'

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল।

পরী বলিল, 'কাউকে কিছু বলিস নে কিন্তু, খবরদার। বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।'

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির পিছন দিকে গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হনহন করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া স্টেশনে।

দরাজহাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

'যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ি থামবে সেইখানে নেমে যাবি।'

ভুবন বলিল, 'আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসি।' পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'মামা দিয়েছে। কটা বেজেছে জান? তিনটে বেজেছে।'

'ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ি না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।'

ভুবন বলিল, 'আচ্ছা।'

'রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস? ওটা পাঁচ টাকার নোট জানিস তো? ভাঙিয়ে কাল খাবার কিনিস।'

'মা স্টেশনে আসবে, মাসি?'

'আসবে।'

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

'খোকাকে দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।'

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

'না না এখ্খুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।'

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ি ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

'ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী?'

'ভুবন? ভুবনের আমি কী জানি! বাড়ি নেই?'

বনমালী হাঁকিল, 'কেষ্ট, এদিকে আয়।'

কেষ্ট ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

'তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।'

কেষ্ট কাঁদ–কাঁদ হইয়া বলিল, 'কেন বাবু?'

'রাতদুপুরে তুই দোতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস বলে। আমার নশ টাকা চুরি গেছে।'

ঝি–চাকর আশ্রিত–আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট? পালিয়ে গেছে?'

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

'ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।'

দোতলায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল, বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়া–মোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, 'এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নিচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।'

নিচে ভাঁড়ারের পাশে এক সারিতে খানসাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়িতে যাদের স্থান ঝি–চাকরেরও নিচে, বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না?

সে কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমি কী করেছি? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—'

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কাহার? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় লইয়াছে।

পরীকে নিচেই যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, 'কী গো, ওপর থেকে তাড়িয়ে দিলে? বড়লোকের মর্জি দিদি, কী করবে বলো।'

পরী বলিল, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে? আমি যেচে এসেছি। ওপরে যে সব স্লেচ্ছাচার—বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষাল না।'

ক্ষেন্তি বলিল, 'ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ি তো একদিন তোমার নিজের দিদির ছিল! আজ যে রানী, কাল সে দাসী। হায় রে কপাল!'

ছোট স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন? সয়ে যাবে।'

বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

'শোনো বলি। কলকাতার সে বাড়িতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম—'

পরী বাধা দিয়া বলিল, 'থাক। তুমি যাও।'

'শোনোই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ির রাজা আমাকে বললে, নিচেটা স্যাঁতসেঁতে, তুই ওপরেই থাক। তোর মার সহ্য হয়ে গেছে, কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি—'

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হালকা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোক গিলিয়া সে বলিল, 'ব্যাপার বুঝে আমি রাজি হলাম না। নিচে মার কাছেই রইলাম।'

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, 'আমার জ্বর আসছে, তুমি যাও ভাই।'

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?'

বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।'

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।

কুষ্ঠ-রোগীর বৌ

কোনো নৈসর্গিক কারণ থাকে কি না ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা দিবার জন্যও ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ।

এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপিচুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশি অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশ ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন করো : সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ করো। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাংকে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না। তাই, জীবনের আনাচে-কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।

লোকে যা বলিয়াছিল অবিকল তাহাই। একেবারে কুষ্ঠব্যাধি।

মহাশ্বেতা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল : 'তোমার আঙুলে কী হয়েছে?'

'কী জানি। একটা ফুসকুড়ির মতো উঠেছিল।'

মহাশ্বেতা আঙুলটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিল : 'ফুসকুড়ি নয়। চারদিকটা লাল হয়েছে।'

'আঙুলটা কেমন অসাড়-অসাড় লাগছে শ্বেতা।'

'একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক

চুমোতে সেরে যাবে।'

আঙুলটা চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।

'পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছ। বাবা, মানুষের আঙুলের রং পর্যন্ত এমন টুকটুকে হয়! রক্ত যেন ফেটে পড়ছে!'

আঙুলটি যে হাতে লাগানো ছিল স্বামীর সেই হাতটি মহাশ্বেতা নিজের গলায় জড়াইয়া দিল। জীবনে যে-কথা সে বহুবার বলিয়াছে আজ আর একবার সেই কথাই বলিল।

'এ তোমার ভারি অন্যায় তা জান? তুমি সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে! তোমাকে ভালবাসি, না, তোমার চেহারাকে ভালবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো? হুঁ, তবে আর ভাবনা কী ছিল! দিনরাত কীরকম ভাবনায়-ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে!'

তারপর আরো কিছুকাল বোঝা গেল না। শুধু আঙুল নয়, যতীনের হাতে দু-তিন জায়গায় তামার পয়সার মতো গোলাকার কয়েকটা তামাটে দাগ যখন দেখা দিল, তখনো নয়। মহাশ্বেতার শুধু মনে হইল যতীনের শরীরটা বুঝি ভালো যাইতেছে না, গায়ের রঙটা তাহার রক্ত খারাপ হওয়ার জন্য কীরকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। একটা টনিক খাওয়া দরকার।

'দ্যাখো, তুমি একটা টনিক খাও।'

'টনিক খেয়ে কী হবে?'

'আহা খাও না। শরীরটা যদি একটু সারে।'

যতীন টনিক খাইল। কিন্তু টনিকে এ ব্যাধির কিছু হইবার নয়। ক্রমে আরো কয়েকটা আঙুলে তাহার ফুসকুড়ি দেখা দিল। শরীরের চামড়া আরো কর্কশ, আরো মরা মরা দেখাইতে লাগিল। চোখের কোল এবং ঠোঁট কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর মৃত মাংসের রূপ লইয়া অল্প-অল্প ফুটিয়া উঠিল। স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিল। চিমটি কাটিলে তাহার যেন আর তেমন ব্যথা বোধ হয় না। দিবারাত্রি একটা ভোঁতা অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাখিল। এবং সকলের আগে যে আঙুলের ছোট একটি ফুসকুড়িকে মহাশ্বেতা চুম্বন করিয়া টিনচার আইডিন লাগাইয়া দিয়াছিল সেই আঙুলেই তাহার পচন ধরিল প্রথম।

ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি; আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।'

বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'টাইপটা খারাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।'

'সেরে তা হলে যাবে ডাক্তারবাবু?'

'যাবে না? ভয় পান কেন? রোগ যখন হয়েছে সারতেও পারে নিশ্চয়।'

এমন করিয়া ডাক্তার কথাগুলি বলিলেন, আশ্বাস দিবার চেষ্টাটা তাহার এত বেশি সুস্পষ্ট হইয়া রহিল যে কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না যতীনের এ মহাব্যাধি কখনো সারিবে না।

একশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'যতটা সম্ভব লোকালাইজড করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তার বেশি কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে, সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে হওয়াটা .... বোঝেন না?'

বোঝে না? যতীন বোঝে, মহাশ্বেতা বোঝে। কিন্তু ছমাস আগে যদি এই বোঝাটা যাইত!

মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য

মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল : 'তোমার কুষ্ঠ হয়েছে? ও ভগবান, কুষ্ঠ!'

যতীন তখনো মরে নাই, মরিতেছিল। সাধারণ কথার সুর তাল লয় মান সমস্ত বাদ দিয়া সে বলিল : 'কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?'

'তোমার পাপ কেন হবে গো? আমার কপাল!'

নিজের বাড়িতে আত্মীয়–পরিজনের মধ্যে যতীন হইয়া রহিল অস্পৃশ্য। গৃহের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ থাকিলেও বাধা অবশ্য কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। কিন্তু সে গোপনতা খুঁজিয়া লইল। বাড়ির একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সেখানে নিজেকে সে নির্বাসিত ও বন্দি করিয়া রাখিল। মহাশ্বেতা ছাড়া আর কাহারো সেদিকে যাইবার হুকুম রহিল না। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিয়া বাহির হইতে ফিরিয়া গেল, সামনাসামনি মৌখিক সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মীয়স্বজন হইয়া গেল ব্যর্থ। যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারো চোখের সামনে বাহির করিতে রাজি হইল না। নিজের ঘরে সে রেডিও বসাইল, স্তূপাকার বই আনিয়া জমা করিল, ফোন বসাইয়া বাড়ির অন্য অংশ এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দের সংযোগ স্থাপিত করিয়া লইল। জীবন যাপনের প্রথার আকস্মিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সীমা–পরিসীমা রহিল না।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বর্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পারিল না। নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মতো মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না কিন্তু মহাশ্বেতার সম্বন্ধে সে শিশুর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল। আপনার সংক্রামক ব্যাধিটিকে আপনার দেহের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়া মৃত্যু পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া চিতার আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিবার যে অনমনীয় প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিল, মনে হইল, মহাশ্বেতাকে সে বুঝি তাহার সেই আত্মপ্রতিশ্রুতির অন্তর্গত করে নাই। আত্মীয়–পর সকলের জন্য সাবধান হইতে গিয়া মহাশ্বেতার বিপদের কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া দেহের এই কদর্য রোগের ভাগটাও মহাশ্বেতাকে যদি আজ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার যেন কিছুই বলিবার নাই।

স্ত্রীকে সে সর্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তার সঙ্গে কথা বলুক, তাকে বই পড়িয়া শোনাক। রেডিওতে ভালো একটা গান বাজিতেছে, পাশাপাশি বসিয়া গানটা না শুনিলে একা ভালো লাগে না। ফোনে সে কার সঙ্গে কথা বলিবে নম্বরটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কানেকশন লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক। আর তা না হয় তো সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।

মহাশ্বেতা এসব করে। খানিকটা কল–বনিয়া–যাওয়া মানুষের মতো যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যতীন যা বলে নির্বিকার চিত্তে সে তাহাই পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনো সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করে না। তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর কথা শুনিয়া চলিবার রকম দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না তাহার নিজেরও স্নানাহারের প্রয়োজন আছে, সুস্থ মানুষের সঙ্গলাভের প্রয়োজন আছে, কিছুক্ষণ আপন মনে একা থাকিবার প্রয়োজন আছে। যতীন খেয়াল করিয়া ছুটি দিলে সে খাইতে যায়, যতীন মনে করাইয়া দিলে বিকালে তাহার একটু বাগানে বেড়ানো হয়। তা না হইলে নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যতীনের পরিবর্তনশীল ইচ্ছাকে সে অক্লান্ত

তৎপরতার সহিত তৃপ্ত করিয়া চলে।

অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না। যতীনের দরকারি সুখসুবিধাগুলির জন্য ধরাবাঁধা যে সব নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি যথারীতি পালিত হয় কি না এ বিষয়ে সে নজর রাখে কিন্তু যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের খেয়ালে সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত সবকিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোনো উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।

তাহাদের সহযোগ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।

তাহাদের জীবনের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতগুলি রীতি ছিল। সে গতিও এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে-সব রীতিও গেছে বদলাইয়া। পুরানো ভালবাসা, পুরানো প্রীতি, পুরানো কৌতুক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাহাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পূর্বতন বোঝাপড়াগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইয়াছে।

প্রথমদিকে যে মুহ্যমান অবস্থাটি তাহাদের আসিয়াছিল সেটুকু কাটিয়া যাওয়ার আগে আপনা হইতে এমন কতকগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—যাহা খেয়াল করিবার অবসরও তাহাদের থাকে নাই। চিকিৎসার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রোগী ও সুস্থ মানুষের শয্যা গিয়াছে পৃথক হইয়া। কথা বলিবার সময় শুধু হাসিয়া কথা বলিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া গিয়াছে। যার নাম দাম্পত্যালাপ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসেই সমৃদ্ধ, দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আর পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখে-চোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকু নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখে-চোখে চাহিয়া এখন তাহারা শুধু দেখিতে পায় একটা অবিশ্বাস্য অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া আছে : এ কী হল?

মহাশ্বেতা দিনরাত বোধ হয় এই কথাটাই ভাবে। তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক-এক সময় সে শুধু বেশি বাতাসের প্রয়োজনে জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মতো শোনায়।

যতীন অনুযোগ করিয়া বলে : 'দিনরাত তুমি অমন কর কেন?'

মহাশ্বেতা ঠোঁট নাড়িয়া উচ্চারণ করে : 'কেমন করি? কিছু করি না তো?'

যতীন হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলে : 'এমনিতেই আমি মরে আছি, তারপর তুমিও যদি আমার মনে কষ্ট দাও—'

যতীন ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া সে মহাশ্বেতার হাত চাপিয়া ধরে। প্রথম দিকে তাহার ঘায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হইত, আজকাল আলো ও বাতাস লাগাইবার জন্য খুলিয়া রাখা হয়। ডাক্তার দিনে পাঁচ-ছয় বার ধুইয়া যতক্ষণ সম্ভব রোদে ঘাগুলি মেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যান্ডেজ শুধু রাত্রির জন্য।

মহাশ্বেতা তাহার তিনটি চামড়া-তোলা ফাটিয়া-যাওয়া আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্যও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহার হাতে কনুইয়ের অল্প নিচে টাকার মতো চওড়া যে ক্ষতটি ছোট ছোট রক্তাভ গোটায় উর্বর হইয়া আছে, মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন করিতে

পারে।

যতীন হাত সরাইয়া লয়। রাগ করিয়া বলে : 'তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা?'

মহাশ্বেতা এ কথা অনুমোদন করিবার সুরে রাগিয়া বলে : 'কখন আবার ঘেন্না করলাম?'

'তবে অমন করে তাকাও কেন?'

'কেমন করে তাকাই?'

এ রকম অবস্থায় এ ধরনের পালটা প্রশ্ন মানুষের সহ্য হয়? যতীন উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বেলা বারটার কড়া রোদে পাতিয়া–রাখা ইজিচেয়ারটিতে কাত হইয়া এলাইয়া পড়ে। বৈশাখী সূর্যের এ অম্লান কিরণ ভালো মানুষের হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশি সহ্য হয় না। কিন্তু যতীনের অনুভব–শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই রোদে নিজেকে মেলিয়া রাখিয়া পড়িয়া থাকে। রোদ সরিয়া গেলে ইজিচেয়ারটাও সে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তারের কাছে সে সূর্যালোকের মধ্যে অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়। অপচয় করিতে পারে না।

খানিক পরে ডাকিয়া বলে : 'এদিকে শোনো শ্বেতা!'

মহাশ্বেতা আসিলে বলে : 'এইখানে বোসো।'

মহাশ্বেতা যতীনের কাছে ছায়ায় বসে। নিকটবর্তী রোদের ঝাঁজে তাহার ঘর্মাক্ত দেহ শুকাইয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে। কিন্তু সে উঠিয়া যায় না। জ্যোতির্ময়ী পতিব্রতার মতো স্বামীর কাছে বসিয়া ঝিমায়।

যতীন বলে : 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

মহাশ্বেতা তাহাকে জল আনিয়া দেয়।

যতীন বলে : 'আমার আর–একটা বালিশ চাই।'

মহাশ্বেতা তাহাকে আর–একটা বালিশ আনিয়া দেয়।

যতীন বলে : 'এনে দিলেই হল বুঝি? মাথার নিচে দিয়ে দাও।'

মহাশ্বেতা বালিশটা তাহার মাথার নিচে দিয়া দেয়।

যতীন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে : 'কী ভাবছ শুনি?'

মহাশ্বেতা বলে : 'কী ভাবব?'

বৈশাখী দুপুরটি গুমোটে জমিয়া ওঠে।

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারারাত্রি আর সে চোখ খোলে না।

এ জগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই! মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙে গড়ে। আজ যে রাজা ছিল কাল সে ভিখারি হইলে যদি–বা এটুকু বোঝা যায় যে লোকটা চিরকাল ভিখারি ছিল না, তার বেশি আর কিছুই বোঝা যায় না।

সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মেজাজটা যতীনের একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথায় রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহার কী গোল বাধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দুটি মেজাজের সঙ্গে

মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলার আওয়াজ তাহার চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্ধেকের বেশি উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকের রঙটা তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কত কালের বাসি হইয়া ভিতর হইতে পচন ধরিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে। কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।

মানুষের স্তরে আর যে তাহার স্থান নাই যতীন তাহা বুঝিতে পারে। মানুষের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা পাওয়ার আশা এ-জীবনের মতো তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে। সে কাছে আসিতে দেয় না বলিয়া কেহ তাহার খোঁজখবর নেয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে সে রাজি নয়। মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।

নাগাল সে পায় শুধু মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাকেই তাহার ব্যাধি ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভার বহন করিতে হয়।

সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার অবসন্ন শিথিল ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।

যতীনকে সে বলে : 'কোথাও যাবে?'

যতীন বলে : 'না।'

'সমুদ্রের জল লাগালে হয়তো কমত।'

যতীন কুটিল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে : 'কমত? তোমার মাথা হত! ডাক্তার ও কথা বলে নি।'

মহাশ্বেতা রাগ করিয়া বলে : 'ডাক্তারের কথা শুনে তো সবই হচ্ছে।'

খানিক পরে সে আবার বলে : 'ঠাকুর দেবতার কাছে একবার হত্যে দিয়ে দেখলে হত। হয়তো প্রত্যাদেশটেশ কিছু পেতে।'

যতীন আরক্ত চোখে মহাশ্বেতার সুস্থ সবল দেহটির দিকে চাহিয়া থাকে।

'নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর-দেবতায় অত ভক্তি কেন? প্রত্যাদেশ! তোমার মতো পাপিষ্ঠার স্বামীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ দেন না।'

ব্যাপারটা মাসখানেক পুরানো। যতীন ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছে। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে বিশ্বাস করে নাই। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ করিয়াছে, সন্দেহটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজের তাহাতে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে এবং উগ্র উত্তেজনায় একটা পুরা দিন পাগল হইয়া থাকিয়াছে।

মহাশ্বেতা কিছু প্রকাশ করে না। জেরার জবাবে এমন সব কথা বলে যে যতীন বিশ্বাস করিতে পারে না। জোড়াতালি দিবার চেষ্টাটা তাহার ধরা পড়িয়া যায়। তা ছাড়া মহাশ্বেতা এমন এমন ভাব দেখায় যেন এটা সম্পূর্ণভাবে তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। এমনও মনে হয় যে এ ব্যাপারে তাহার হাত ছিল, দৈবের চেয়ে সে-ই বেশি দায়ী, বলিবার অধিকার যতীনের নাই। সে তাহার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলিয়া অনর্থক বিব্রত হইতেছে। মহাশ্বেতার কপালে দুঃখ ছিল, সব দিক দিয়া বঞ্চিত হওয়ার বিধিলিপি

ছিল, সে দুঃখ পাইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছে। যতীনের কী? সে কেন ব্যস্ত হয়?

তার স্বামী বলিয়া যতীন দেবতার প্রত্যাদেশও পাইবে না। এ কথাটা মহাশ্বেতার সহ্য হয় না। সে বলে : 'ছেলে-ছেলে করে তো মরছ। শুনে জেনেছ ছেলে?'

যতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে।

'ছেলে নয়? ওরা যে বলল ছেলে?'

'আমার চেয়ে ওরা যে বেশি জানে!'

যতীন তখন আর কিছু বলে না। চুপচাপ ভাবিতে থাকে। পরদিন দুপুরে যতীনের রোদটুকু হরণ করিয়া আকাশ ভরিয়া মেঘ জমিলে মহাশ্বেতাকে কাছে, খুব কাছে আহ্বান করে। বাহিরে ব্যাকুল বর্ষণ শুরু হইলে হঠাৎ সে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অভিমানের সুরে বলে : 'মেয়ের বুঝি দাম নেই?'

মহাশ্বেতা অবাক হইয়া বলে : 'তুমি এখনো সে কথা ভাবছ?'

যতীন বলে : 'কী করেছিলে? গলা-টিপে তুমি তাকে মারতে পার নি শ্বেতা? না, তাও পেরেছিলে?'

মহাশ্বেতা বলে : 'আবোল-তাবোল কথার কত জবাব দেব? যা বোঝ না তাই নিয়ে কেবল বকবক করবে। বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি। তুমি পার না?—কী বৃষ্টিটাই নাবল! দেখি একটু।'

মহাশ্বেতা উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল পড়ে আর যতীন অবিরত গাল দেয়। মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা দ্যাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে। যতীন যখন বলিতে থাকে যে এ কাজ যে-মেয়েমানুষ করিতে পারে সে যে আর কোনো অন্যায় করিতে পারে না, এ কথা স্বয়ং ভগবান তাহাকে বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না, তখন মহাশ্বেতা একটু হাসে।

একদিন তাহাদের এই কথোপকথন হইয়াছিল :

'কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?'

'তোমার পাপ কেন হবে? আমার কপাল।'

আজ কথা বলিবার ধারা উলটিয়া গিয়াছে। যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে : 'তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলে-খেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পার নি? না, সাধ-আহ্লাদ এখনো মেটে নি? এখনো বুঝি একজন খুব ভালবাসছে?'

এই সন্দেহটাই এখন যতীনের আক্রমণ করার প্রধান অস্ত্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কারো এ কথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গি ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটা সে কাটায় কোথায়? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরেরই যদি তার প্রয়োজন, যতীনের পাশের ঘরখানা কী দোষ করিয়াছে? নির্জন দুপুরে নিচের তলায় কোনার একটা ঘর ছাড়া ওর বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে-ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা-যাওয়া করিতে পারে?

'অত বোকা নই আমি, বুঝলে?'

পালটা প্রশ্ন করার অভ্যাসটা মহাশ্বেতার এখনো একেবারে যায় নাই। সে বলে : 'তোমাকে বোকা কে বলেছে?'

যতীন গোঁ ধরিয়া বলে : 'ওসব চলবে না। আমার বাড়িতে বসে ওসব তোমার চলবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলাম। এখনো মরি নি আমি।'

'কী সব বলছ।'

'বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ডু। ওরে বাপরে, চান্দিক দিয়ে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল যে!'

যতীন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মহাশ্বেতা ছবির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দেখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহার চারিদিকে পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, কে যে কোথায় কাঁদিতেছে।

পাগলামি মহাশ্বেতারও আসিয়াছে বৈকি। তাহা অপরিহার্য। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যাহা করে না সে-সব করার নাম পাগলামি। সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ওসব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া যায়। বন্ধুকে কারো মনে হয় শত্রু, প্রিয়কে কারো মনে হয় অপ্রিয়, জীবনকে কারো মনে হয় সীমান্তোলিত কৌতুক। দুঃখ দেখিলে কেহ কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চা পান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, আকাশে কী আশ্চর্য একটা পাখি উড়িয়া গেল!

মহাশ্বেতা রাত্রে এ ঘরে থাকে না। পাশের ঘরে সে বিছানা পাতে।

যতীন প্রশ্ন করে, কেন? সে মুখে কিছু বলে না, ঘরে ঢুকিয়া খিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জবাবটা সুস্পষ্ট করিয়া রাখে। যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলে : 'রিভলবারে গুলি ভরে রাখলাম। কাল সকালে ঘর থেকে বেরুলেই তোমাকে গুলি করব।'

বলে : 'এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা! তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে?'

এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিস্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা সে ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, কত কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারে না; সব গোলমাল হইয়া যায়। কুমারী জীবনের স্মৃতি একটা অচিন্তনীয় অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের বাহিরে-বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবাহের পর যে চারটা বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুরূপ ছিল, সে সময়ের কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায়। জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র-করা পচা ভাপসানো জীবনে, সেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বার বার জন্মিয়া বার বার মরিয়া যায়।

যতীনের মনে যত আলো ছিল সব নিভিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে তাহার মনে এককালীন হাস্যকর কত কুসংস্কারের যে জন্ম হইয়াছে, সংখ্যা হয় না। কয়েক দিন ভাবিয়াই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম

ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।

কিন্তু কোন দেবতা? তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কোথায় তাহার প্রত্যাদেশ আসিবে?

যতীন নিজে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। মহাশ্বেতাকে সে পরামর্শ করিতে ডাকে। 'কোথায় গিয়ে হত্যে দেওয়া ভালো শ্বেতা?'

মহাশ্বেতা সবচেয়ে দূরবর্তী একটি পীঠস্থানের নাম স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে : 'কামাখ্যায় যাও।'

'আমি যাব?' যতীন স্তম্ভিত হইয়া যায় : 'এ অবস্থায় আমি কী করে যাব?'

মহাশ্বেতা বলে : 'কে যাবে তবে?'

'কেন তুমি যাবে। স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রী গিয়েই হত্যে দেয়, প্রত্যাদেশ নিয়ে আসে।'

মহাশ্বেতা বলে : 'আমি? আমি গেলে প্রত্যাদেশ পাব না। ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস নেই? মন্তব্যটা যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'এক ফোঁটাও নয়। হত্যে দেবার কথা ভাবলে আমার হাসি আসে।'

যতীন রাগিয়া ওঠে।

'তা পাবে না?' হাসি তো পাবেই। হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। এদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আর একজনের সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ!'

মহাশ্বেতা বলে : 'কার সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে?'

'তাই যদি জানব তুমি এখনো এ বাড়িতে আছ কী করে?' যতীন পচনধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া আর্তনাদের মতো বলিতে থাকে : 'ভেবো না, ভেবো না, তোমারও হবে! আমার চেয়ে আরো ভয়ানক হবে! এত পাপ কারো সয় না!'

হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলে : 'ধরল বলে, তোমাকেও ধরল বলে! আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটল বলে। আর দেরি নেই।'

এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে একরকম ত্যাগ করিল। সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল। সকালে একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া যতীনকে সে দেখিয়া যায়, সারাদিন আর তাহার দেখা মেলে না। রাত্রে শোয়ার আগে একবার শুধু উঁকি দিয়া যায়। মুহূর্তের জন্য। পরিহাসের মতো।

যতীন খেপিয়া উঠিয়া মহাশ্বেতাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি হইতেই তাড়াইয়া দিত কি না বলা যায় না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেই প্রত্যাদেশ আনিতে কামাখ্যায় চলিয়া গেল। যতীনের পীড়াপীড়িতে ক্রুদ্ধ আদেশ ও সকরুণ মিনতিতে মহাশ্বেতা সঙ্গে যাইতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রা করার সময় তাহাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। যতীনের এক পিসি বলেন : মহাশ্বেতা কালীঘাটে গিয়াছে। যতীনের চাকরকে সঙ্গে করিয়া যতীনের মোটরে এই খানিক আগে মহাশ্বেতা কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছে।

গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইয়াছিল। মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল, ঠাকুর-দেবতায় সে বিশ্বাস করে না এ কথাটা তাহার সত্য নয়। সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অত

টাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, এক ধামা পয়সা ভিখারিদের বিতরণ করিত না।

এ কাজটা মহাশ্বেতা নিজেই করিয়াছিল। মন্দিরে ঢুকিবার পথে দুদিকে সারি দিয়া ভিখারি বসিয়া ছিল। চাকর আর মোটর-চালকের হাতে পয়সার ধামাটা তুলিয়া দিয়া আগে আগে চলিতে চলিতে মহাশ্বেতা দুদিকে মুঠা মুঠা পয়সা বিলাইয়াছিল। সে হইয়াছিল এক মহাসমারোহের ব্যাপার। শুধু ভিখারি নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইয়া গিয়াছিল অনেক।

ভিখারিদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীও ছিল বৈকি! হাতে পায়ে কারো ছিল চট বাঁধা, কারো নাক গলিয়া গিয়া একটা গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল, কারোর সমস্ত মুখের ফাঁপানো মাংস বড় বড় গোটায় ভরিয়াছিল, কারো কব্জির কাছ হইতে দুটি হাত বহুকাল আগে খসিয়া গিয়া ঘা শুকাইয়া হইয়াছিল মসৃণ। এদের পয়সা দিবার সময় মহাশ্বেতার একটি মুষ্টিতে কুলায় নাই। এদের দিয়া এক ধামা পয়সায় কুলানো যায় নাই।

বাড়ি ফিরিয়া সেই দিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।

চাকর সেদিন পথ হইতে পাঁচ জন ভিখারিকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুজন হাজার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভেও এখানে থাকিতে রাজি হয় নাই। বাকি তিনজন সেই হইতে আরাম করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। খায়-দায় ঘুমায়, আর মহাশ্বেতাকে ক্ষণে ক্ষণে ধনে-পুত্রে লক্ষীলাভ করায়, আর তাহাদের কাজ নাই। সাত দিনের মধ্যে মহাশ্বেতার আশ্রমবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একুশ জন।

আত্মীয়স্বজন সকলকে সে ভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মাহিনা করা কয়েকজন চাকর-দাসী-মেথর আর বাড়ি-ভরা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে সে এখানে বাস করে একা। সকালে-বিকালে এদের দেখিয়া যাওয়ার জন্য সে একজন ডাক্তার ঠিক করিয়াছে। দুজন অভিজ্ঞ নার্সের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার বলিয়াছে : 'এখানে আপনাকে কুষ্ঠাশ্রম খুলতে দেবে না।'

'কেন?'

'শহরের মাঝখানে এ ধরনের আশ্রম কি খুলতে দেয়?'

মহাশ্বেতা আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছে : 'ওরা তো শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি বাড়ির মধ্যে ভরে বিপদ আরো কমিয়েছি।'

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিয়াছে : 'তবু দেবে না। তবে কি জানেন, এসব হল সৎ কাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না। পাড়ার লোকে নালিশ করবে; সে নালিশের তদ্বির হবে, তারপর আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখনো দুমাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে-সুস্থে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন।'

ডাক্তারের এত কথার জবাবে মহাশ্বেতা বলিয়াছে : 'কুষ্ঠ কি ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার তাহার বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছে : 'এ রকম কত রোগ সংসারে আছে! মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।'

বংশ! পুরুষানুক্রম! কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া খেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা করিয়াছে। ডাক্তার জানিয়াও নির্বিকার হইয়া আছে। হয়তো মনে মনে ডাক্তার সমর্থনও করে। জ্ঞানী ও

অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।

নার্স ঠিক হওয়ার আগেই যতীন ফিরিয়া আসিল। সে ঠিক প্রত্যাদেশ পায় নাই, কেমন একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে যে কুণ্ড হইতে একটি সাদা ফুল আনিয়া মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে সে নীরোগ হইতে পারে। বাড়ি ফেরার আগেই যতীন মাদুলি ধারণ করিয়াছে।

বাড়ির ব্যাপার দেখিয়া তাহার চমক লাগিয়া গেল।

'এ সব কী করেছ শ্বেতা?'

মহাশ্বেতার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসায় বুদ্ধিটাও তাহার বেশ পরিষ্কার ছিল। সে বলিল : 'তোমার কল্যাণের জন্যই করেছি। কালীঘাটে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম, অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনো দেখি নি। চোখ যেন আগুনের মতো আলো দিচ্ছে। তিনি বললেন : 'কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভালো হয়ে যাবে।'

মাদুলি ধারণের প্রভাব তখনো যতীনের মনে প্রবল হইয়া আছে। সে অভিভূত হইয়া বলিল : 'সত্যি?'

'তোমার কাছে মিছে বলছি? তুমি সে সন্ন্যাসীকে দ্যাখো নি। দেখলে তোমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত! আমাকে কথাগুলি বলে কোন দিকে যে চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

যতীন আফসোস করিয়া বলিল : 'একটা ওষুধ–টষুধ যদি চেয়ে নিতে শ্বেতা!'

বাড়ির যে অংশ যতীনের ছিল সে আবার সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাদুলি আর সন্ন্যাসীর ভরসায় মেজাজটা সে অনেকখানি নরম করিয়াই রাখিল।

কিন্তু মহাশ্বেতা কাছে ভেড়ে না। কামাখ্যা যাওয়ার আগে যেমন ছিল তেমনি দূরে দূরে থাকে। কুষ্ঠাশ্রম লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। একুশটি অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছিলে তার যেন আনন্দের সীমা থাকে না। দিবারাত্রি সে পথে–কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈরি হইয়াছে, তার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা ওরা পায়।

যতীন একদিন কাঁদ–কাঁদ হইয়া বলিল : 'তুমি খালি ওদেরি সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখ না।'

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠ রোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।

এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা।

মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠ–রোগীর বৌ।

হলুদ পোড়া

সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে-পরে গাঁয়ে দু-দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝবয়সী জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল-সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা-পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আট চির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃত্যুই আশপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্য পক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায় নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়ে ছিল! গাঁয়ে সবশেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁসুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয় নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, 'পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে না পারি—'

চশমার কাচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেঁতুলগাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেইরকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাষ্টারি করে। গাঁয়ে সে-ই একমাত্র ডাক্তার, পাস-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাস করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথমদিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি, সাত জন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দুবছরে চারিটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশ-তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবদ্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু-চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু-তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয়। চার আনা আট আনা ফী নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রি করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসি কলসি জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বললে, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাস-করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।'

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? কী হবে? তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞানবুদ্ধি আছে, তুমিও কী বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা-আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দুজনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাস ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দুজনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরো অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভর সাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষ-তক। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন, রও! এখনি হয়েছে কী! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়।'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ করো ভাই।'

উঠানে ত্রিশ–পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি। কমবয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতিও পায় নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলি মেয়ে–পুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহলভরা পরম উপভোগ্য শিহরন।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি-দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা-বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরন বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা। আমায় মেরো না।'

'চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছ? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট করে।'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক বার তাকে প্রশ্ন করা হল কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদ পোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রতিক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর ও সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুদ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।'

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাইয়ের দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে মশানে দিনক্ষণ প্রকৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না; ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ–শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাড়টি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে–নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোন দিক থেকে কী ভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরোনো ভাবনা সে

ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোনো বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। যা খুশি মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খবরদার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল, মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরো স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল; কথাটা তুমি কীভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষমোচনের জন্য দরকারি ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত, স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যাঙের মতো মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি এক মাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। মাইলখানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এইরকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমন ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় নি, এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতেপায়ে না ধরাই ভালো। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হইচই হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তা হলে মুশকিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয় নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারি মাথাটা বালিশে

রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে-বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মতো কী যেন একটা নড়াচড়া করছে।

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে! কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উঠি–পড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোনখানে?'

বাঁশঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি, মাস্টারবাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তিপিসি বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে তাড়াতাড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেয়ো না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধাবাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাঠ পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দি হয়ে ধীরেন আকাশ–পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসি ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেতনি। বেটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে–অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দুধারের বাঁশঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারিঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা–পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশ পেতে দাও।'

'বাঁশটা পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দুপ্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোনো কিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা

দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এঁটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায় নি। দু-তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরো কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে, আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো। বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো। কী হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙোতে পারছে না। মাটিতে শোয়ানো বাঁশ। শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশচেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন-চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হয়; মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

সমুদ্রের স্বাদ

সমুদ্র দেখিবার সাধটা নীলার ছেলেবেলার! কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিল। ভূগোলে পৃথিবীর স্থলভাগ আর জলভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তার অনেক আগে হইতেই নীলা জানিত পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। সাত বছর বয়সে বাবার মুখে খবরটা শুনিয়া কী আশ্চর্যই সে হইয়া গিয়াছিল। এ কি সম্ভব? কই, সে তো রেলে চাপিয়া কত দূরদেশে ঘুরিয়া আসিয়াছে, মামাবাড়ি যাইতে সকালবেলা রেলে উঠিয়া সেই রাত্রিবেলা পর্যন্ত ক্রমাগত হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতে হয়, কিন্তু নদীনালা খালবিল ছাড়া জল তো তার চোখে পড়ে নাই। চারিদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আকাশ পর্যন্ত শুধু মাটি আর গাছপালা।

তারপর কত ভাবে কত উপলক্ষে ছাপার অক্ষর, মুখের কথা আর স্বপ্নের বাহনে সমুদ্র তার কাছে আসিয়াছে। বলাইদের বাড়ির সকলে পুরী গিয়া কেবল সমুদ্র দেখা নয়, সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিল। কলিকাতায় সাহেব-কাকার ছেলে বিনুদা বিলাত গেল—সমুদ্রের বুকেই নাকি তার কাটিয়া গেল অনেকগুলি দিন। সমুদ্রের জল মেঘ হইয়া নাকি বৃষ্টি নামে, মাছ-তরকারিতে যে নুন দেওয়া হয় আর থালার পাশে একটুখানি যে নুন দিয়া মা দুবেলা ভাত বাড়িয়া দেন, সে নুন নাকি তৈরি হয় সমুদ্রের জল শুকাইয়া! সারাদিন গরমে ছটফট করিবার পর সন্ধ্যাবেলা যে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগানোর জন্য তারা ছাদে গিয়া বসে, সে বাতাস নাকি আসে সোজা সমুদ্র হইতে!

'সমুদ্দুর বুঝি দক্ষিণ দিকে বাবা?'

'চারিদিকে সমুদ্দুর আছে। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর—আমাদের খুব কাছে।'

ঠিক। ম্যাপে তাই আঁকা আছে। কিন্তু চারিদিকে সমুদ্র? উত্তর দিকে তো হিমালয় পর্বত, তারপর তিব্বত আর চীন! ম্যাপটা আবার ভালো করিয়া দেখিতে হইবে।

'আমায় সমুদ্দুর দেখাবে বাবা?'

বাবা অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এবারো দিলেন। সমুদ্র দেখার আর হাঙ্গামা কী? একবার তীর্থ করিতে পুরীধামে গেলেই হইল, সুবিধামতো একবার বোধ হয় যাইতেও হইবে। নীলার মার অনেক দিনের সাধ।

কিন্তু কেরানির স্ত্রীর সহজ সাধও কি সহজে মিটিতে চায়! অনেক কষ্টে একরকম মরিয়া হইয়া একটা বিশেষ উপলক্ষে স্ত্রীর সাধটা যদি-বা মেটানো চলে, ছেলেমেয়ের সাধ অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

রথের সময়ে যে ভিড়টাই হয় পুরীতে, ছেলেমেয়েদের কি সঙ্গে নেওয়া চলে? তাছাড়া, সকলকে সঙ্গে নিলে টাকায়ও কুলায় না। ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনাই বা করিবে কে?

নীলাকে সঙ্গে না নেওয়ার আরো কারণ আছে।

'না গো, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নিয়ে ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ভরসা আমার নেই।'

বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কিন্তু বিয়ের অযুগ্যি অবুঝ মেয়ের মতো কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। কয়েকদিন চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদ ছাড়া জিভ যেন তার ভুলিয়া গেল অন্য কিছুর স্বাদ। মা–বাবা তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিলে কোথায় হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করিবে, তীর্থযাত্রার গল্প শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, একটি প্রশ্ন করিয়াই নীলা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

'সমুদ্দুরে চান করেছ বাবা?'

গাড়ি হইতে নামিয়া সবে ঘরে পা দিয়াছেন, নীলার বাবা বসিয়া বলিলেন, 'করেছি রে, করেছি। একটু দাঁড়া, জিরিয়ে নিই, বলবখন সব।'

কী বলিবেন? কী প্রয়োজন আছে বলিবার? নীলা কি পুরীর সমুদ্র–স্নানের বর্ণনা শোনে নাই? বলাইদের বাড়ির তিনতলার ছাতে উঠিয়া চারিদিকে যেমন আকাশ পর্যন্ত ছড়ানো স্থির অনড় রাশি রাশি বাড়ি দেখিতে পায়, তেমনি সীমাহীন জলরাশিতে বাড়ির সমান উঁচু ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে আর তীরের কাছে বালির উপর আছড়াইয়া পড়িয়া সাদা ফেনা হইয়া যাইতেছে, এ কল্পনায় কোথাও কি এতটুকু ফাঁকি আছে নীলার? কেবল চোখে দেখা হইল না, এই যা। বাপের আদুরে মেয়ে সে, অন্তত সকলে তাই বলে, তার সমুদ্র দেখা হইল না, কিন্তু বাপ তার সমুদ্র দেখিয়া, স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নীলা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবা তাড়াতাড়ি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পুজোর সময় যেমন করে পারি তোকে সমুদ্র দেখিয়ে আনব নীলা, ধার করতে হলে তাও করব। কাঁদিস নে নীলা, সারারাত গাড়িতে ঘুমোতে পাই নি, দোহাই তোর, কাঁদিস নে।'

সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার বদলে পূজার সময় নীলাকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বলাই বাহুল্য যে, এবার সমুদ্র দেখা হইল না বলিয়া নীলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদে আর সবকিছুর স্বাদ ডুবাইয়া দিল না, কাঁদিল সে বাপের শোকেই। কেবল সে একা নয়, বাড়ির সকলেই কাঁদিল। কিছুদিনের জন্য মনে হইল, একটা মানুষ, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বয়সের বিশেষ একটা মানুষ, চিরদিনের জন্য নীলার মনের সমুদ্রের মতো দুর্বোধ্য ও রহস্যময় একটা সীমাহীন কিছুর ওপারে চলিয়া গেলে, সংসারে মানুষের কান্না ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।

ছেলেবেলা হইতে আরো কতবার নীলা কাঁদিয়াছে। বাড়ির শাসনে কাঁদিয়াছে, অভিমানে কাঁদিয়াছে, খেলার সাথীর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় কাঁদিয়াছে,পেটের ব্যথায় ফোড়ার যাতনায় কাঁদিয়াছে, সমুদ্র দেখার সাধ না মেটায় কাঁদিয়াছে, অকারণেও সে দু–চারবার কাঁদে নাই এমন নয়। এমন কষ্ট হয় কাঁদিতে!—দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট। শরীরটা যেন ভারি হইয়া যায়, জ্বর হওয়ার মতো সর্বাঙ্গে অস্বস্তিকর ভোঁতা টনটনে যাতনা বোধ হয়, চিন্তাজগৎটা যেন বর্ষাকালের আকাশের মতো ঝাপসা হইয়া যায়, একটা চিরস্থায়ী ভিজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থমথম করিতে থাকে। শরীর ও মন দুরকম কষ্টেরই আবার স্বাদ আছে—বৈচিত্র্যহীন আলুনি ও কড়া নোন্‌তা স্বাদ।

স্বাদটা অনুভব করিবার সময় নীলার লাগে একরকম, আবার কল্পনা করিবার সময় লাগে অন্যরকম—রক্তের স্বাদের মতো। ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে, বঁটি দিয়া তরকারি কুটিতে, কোনো কিছু দিয়া টিনের মুখ খুলিতে, নিজের অথবা ভাইদের আঙুল কাটিয়া গেলে তার প্রচলিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে নীলা কাটাস্থানে মুখ দিয়া চুষিতে আরম্ভ করে—রক্তের স্বাদ তার জানা আছে।

নীলার বাবার মৃত্যুর পর সকলে মামাবাড়ি গেল। বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া অতদূর মফস্বলের ছোট শহরে যাওয়ার ইচ্ছা নীলার মার ছিল না। তিনি বলিলেন, 'আর কটা মাস থেকে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে হত না দাদা? একটা ছোটখাটো বাড়ি ঠিক করে নিয়ে—'

মেজমামা বলিলেন, 'মাথা খারাপ নাকি তোর? অরক্ষণীয়া নাকি মেয়ে তোর? বাপ মরেছে, একটা বছর কাটুক না।'

'ও!' বলিয়া নীলার মা চুপ করিয়া গেলেন।

কেবল তাই নয়, শহরে তাদের দেখাশোনা করিবে কে, খরচ চালাইবে কে? মামারা তো রাজা নন। সুতরাং সকলে মামাবাড়ি গেল। সকালে গাড়িতে উঠিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত হু হু করিয়া চলিলে সেখানে পৌছানো যায়। স্থানটির পরিবর্তন হয় নাই, অনেক কালের ভাঙা ঘাটওয়ালা পানাভরা পুকুরটার দক্ষিণে ছোট আমবাগানটির কাছে নীলার দুই মামার বাড়িখানিরও পরিবর্তন হয় নাই। কেবল মামারা, মামিরা, আর মামাতো ভাইবোনেরা এবার যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই মামার বাড়ির আদর, সকলের আনন্দ–গদগদ ভাব, অফুরন্ত উৎসব? এবার তো একবারও কেউ বলিল না, এটা খা—ওটা খা? তার বাবার জন্য কাঁদাকাটা শেষ করিয়া ফেলিবার পরেও তো বলিল না! একটু কাঁদিবে নাকি নীলা, বাবার জন্য মাঝে মাঝে যেটুকু কাঁদে তারও উপরে মামাবাড়ির অনাদর অবহেলার জন্য একটু বেশিরকম কান্না?

কিছুকাল কাটিবার পর এ বিষয়ে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিবার প্রয়োজনটা মিটিয়া গেল, আপনা হইতেই যথেষ্ট কাঁদিতে হইল নীলাকে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় তো নীলা জীবনে কখনো পরে নাই; গোবর দিয়া ঘর লেপে নাই, পানাপুকুরে বাসন মাজে নাই; কলসি কাঁখে জল আনে নাই, বিছানা তোলা, মসলা বাটা, রান্না করা লইয়া দিন কাটায় নাই, এমন ভয়ানক ভয়ানক খারাপ কথার বকুনিও শোনে নাই। হায়, একটু ভালো জিনিস পর্যন্ত সে যে খাইতে পায় না, এমনিই তার শরীরের নাকি এমন পুষ্টি হইয়াছে যে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ের যা হয় না, হওয়া উচিত নয়! কিন্তু তারই না হয় অভদ্ররকমের দেহের পুষ্টি হইয়াছে, তার ভাইবোনেরা তো রোগা, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে ওরাও একটু দুধ পায় না কেন, পিঠা–পায়েসের ভাগটা ওদের এত কম হয় কেন? এমন ভিখারির ছেলের মতো বেশ করিয়া তার ভাই দুটিকে স্কুলে যাইতে হয় কেন? মামাদের জন্য ভাইরা যে তার দুবেলা খাইতে পাইতেছে, স্কুলে পড়িতে পাইতেছে, এটা নীলার খেয়ালও থাকে না, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে নিজের ভাইবোনদের আহার–বিহারের স্বাভাবিক পার্থক্যটা তাকে কেবলি কাঁদায়।

বড়মামি বলেন, 'বড় তো ছিচকাঁদুনে মেয়ে তোমার ঠাকুরঝি?'

মেজমামি বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটি খেয়েছ একেবারে।'

নীলার মা বলেন, 'দাও না তোমরা ওর একটা গতি করে, মেয়ে যে দিন দিন কেমনতরো হয়ে যাচ্ছে?'

পাত্র খোঁজা হইতে থাকে আর নীলা ভাবিতে থাকে, বিবাহ হইয়া গেলে সে আবার শহরের সেই বাড়ির মতো একটা বাড়িতে গিয়া থাকিতে পাইবে, সকলের আদর–যত্ন জুটিবে, অবসর সময়ে বলাইদের মতো কোনো প্রতিবেশীর তিনতলা ছাদে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ির সমুদ্র দেখিতে পারিবে, বলাইয়ের মতো কারো কাছে সমুদ্রের গল্প শোনা চলিবে?

ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে নীলার একটি ভাই মরিয়া গেল। নীলার মা কী একটা অজানা অসুখে ভুগিতে ভুগিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। বড়মামার মেজ মেয়ে সন্তান

প্রসব করিতে বাপের বাড়ি আসিয়া একখানা চিঠির আঘাতে একেবারে বিধবা হইয়া গেল। পানাভরা পুকুরটার অপর দিকের বাড়িতেও একটি মেয়ে আরো আগে সন্তানের জন্ম দিতে বাপের বাড়ি আসিয়াছিল, একদিন রাতভর চেঁচাইয়া সে নিজেই মরিয়া গেল। আমবাগানের ওপাশে আট–দশখানা বাড়ি লইয়া যে পাড়া, সেখানেও পনের দিন আগে-পিছে দুটি বাড়ি হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া শোকের কান্না ভাসিয়া আসিতে শোনা গেল।

তারপর একদিন অনাদি নামে সদর হাসপাতালের এক কম্পাউন্ডারের সঙ্গে নীলার বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই একরকম স্বীকার করিল যে, ধরিতে গেলে নীলার বিবাহটা মোটামুটি ভালোই হইয়াছে বলা যায়। মেয়ের তুলনায় ছেলের চেহারাটাই কেবল একটু যা বেমানান হইয়াছে। কচি ডাল ভাঙিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয়, কতকটা সেইরকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ–ভরা মুখের চামড়া কেমন মরা–মরা, চোখ দুটি নিষ্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। এদিকে মামাবাড়ির অনাদর অবহেলা সহিয়া এবং বাবা ও ছোটভাইটির জন্য কাঁদিয়াও নীলার চেহারাটি বেশ একটু জমকাল ছিল, একটু অতিরিক্ত পারিপাট্য ছিল তার নিটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গঠন–বিন্যাসে।

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই, মুখ বুজিয়া সব মানিয়া লইতে হইল নীলার। বিশেষ আর এমন কী পরিবর্তন হইয়াছে জীবনের? বাস কেবল করিতে হয় অজানা লোকের মধ্যে, যাদের কথাবার্তা চালচলন নীলা ভালো বুঝিতে পারে না; আর রাত্রে শুইয়া থাকিতে হয় একটি আধ–পাগলা মানুষের কাছে, যার কথাবার্তা চালচলন আরো বেশি দুর্বোধ্য মনে হয় নীলার। কোনোদিন রাত্রে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ছুটি পাইয়া ঘরে আসিবামাত্র অনাদি দরজায় খিল তুলিয়া দেয়, হাত ধরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে কী যে সে বলিতে আরম্ভ করে, নীলা ভালো বুঝিতেই পারে না। কেবল বুঝিতে পারে, আবেগে উত্তেজনায় অনাদি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হয়, নীলার আসিতে আর একটু দেরি হইলে সে বুঝি বুক ফাটিয়া মরিয়াই যাইত! কোনো দিন ঘরে আসিয়া দেখিতে পায় অনাদির মুখে গভীর বিষাদের ছাপ, স্তিমিত চোখে দৃষ্টি আছে কি না সন্দেহ। ঘুম আসে নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিলেও ঘুম যে আজ তার আসিবে না, নীলা তা জানে, কিন্তু হাই সে তুলিতেছে মিনিটে মিনিটে।

কী বলিবার আছে, কী করিবার আছে? হয় দাঁতের ব্যথা, নয় মাথা ধরা, নয় জ্বরভাব, অথবা আর কিছু অনাদিকে প্রায়ই রাত জাগায়, অন্যদিন সে রাত জাগে নীলার জন্য। সুযোগ পাইলে নীলা চুপি চুপি নিঃশব্দে কাঁদে। সজ্ঞানে মনের মতো স্বামীলাভের তপস্যা সে কোনোদিন করে নাই, কী রকম স্বামী পাইলে সুখী হইবে, কোনোদিন এ কল্পনা তার মনে আসে নাই, সুতরাং আশাভঙ্গের বেদনা তার নাই। আশাই সে করে নাই, তার আবার আশাভঙ্গ কিসের? অনাদির সোহাগেই সোহাগ পাওয়ার সাধ মিটাইয়া নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করিতে পারিত, উত্তেজনা ও অবসাদের নাগরদোলায় ক্রমাগত স্বর্গ ও নরকে ওঠা–নামা করার যে চিরন্তন প্রথা আছে জীবন যাপনের, তার মধ্যে নরকে নামাকে তুচ্ছ আর বাতিল করিয়া দিয়া সকলের মতো সেও একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া নিতে পারিত যে স্বর্গই সত্য, বাকি সব নিছক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বামীই তো মেয়েদের সব নয়, গত জীবনের একটা বড় রকম প্রত্যাবর্তন তো নীলা আশা করিয়াছিল, যে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে শহরে তাদের সেই আগেকার বাড়িতে থাকা, সকলের না হোক অন্তত একজনের কাছে সেইরকম আদর–যত্ন পাওয়া, অবসর সময় বলাইদের মতো কোনো প্রতিবেশীর তিনতলা বাড়ির ছাদে উঠিয়া চারিদিকে

বাড়ির সমুদ্র দেখা আর বলাইয়ের মতো কারো মুখে আসল সমুদ্রের গল্প শোনার মোটামুটি একটা মিল আছে। এখানে নীলাকে বিশেষ অনাদর কেউ করে না, লজ্জায় কম করিয়া খাইলেও মামাবাড়ির চেয়ে এখানেই তার পেটভরা খাওয়া জোটে; এখানে তাকে যে দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হয় নাই, এখানে থাকিবার স্বাভাবিক অধিকারই তার আছে, এটা সকলে যেমন সহজভাবে মানিয়া লইয়াছে, সে নিজেও তেমনি আপনা হইতে সেটা অনুভব করিয়াছে। মামাবাড়ির চেয়েও এখানকার অজানা অচেনা নরনারীর মধ্যে ঘোমটা দেওয়া বধূজীবন যাপন করিতে আসিয়া নীলা তাই স্বস্তি পাইয়াছে অনেক বেশি। তবু একটা অকথ্য হতাশার তীব্র ঝাঁজালো স্বাদ সে প্রথম অনুভব করিয়াছে এখানে। গুমরাইয়া গুমরাইয়া এই কথাটাই দিবারাত্রি মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতেছে যে সব তার শেষ হইয়া গিয়াছে, কিছুই তার করার নাই, বলার নাই, পাওয়ার নাই, দেওয়ার নাই—শানাই বাজাইয়া একদিনে তার জীবনের সাধ, আহ্লাদ, সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দের সমস্ত জের মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'কাঁদছ নাকি? কী হয়েছে?'

'কাঁদি নি তো।'

কাঁদিতে কাঁদিতেই নীলা বলে সে কাঁদে নাই। জানুক অনাদি, কী আসিয়া যায়? কাঁদা আর না-কাঁদা সব সমান নীলার। নীলার কান্নার মৃতসঞ্জীবনী যেন হঠাৎ মৃতপ্রায় দেহে মনে জীবন আনিয়া দিয়াছে এমনিভাবে অনাদি তাকে আদর করে; ব্যাকুল হইয়া জানিতে চায়, কেন কাঁদিতেছে নীলা, কী হইয়াছে নীলার? এখানে কেউ গালমন্দ দিয়াছে? মা-বোনের জন্য মন কেমন করিতেছে? অনাদি নিজে না জানিয়া মনে কষ্ট দিয়াছে তার? একবার শুধু মুখ ফুটিয়া বলুক নীলা, এখনিই অনাদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে!

কিন্তু কী বলিবে নীলা, বলার কী আছে? সে কি নিজেই জানে, কেন সে কাঁদিতেছে? আগে প্রত্যেকটি কান্নার কারণ জানা থাকিত, কোন কান্না বকুনির, কোন কান্না অভিমানের, কোন কান্না শোকের, আর কোন কান্না সমুদ্র দেখার সাধের মতো জোরালো অপূর্ণ সাধের। আজকাল সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নার সমস্ত প্রেরণাগুলি যেন দল বাঁধিয়া চোখের জলের উৎস খুলিয়া দেয়।

সেদিন অনাদি ভাবে, কান্নার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, নীলা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। পরদিন আবার তাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে রীতিমতো ভড়কাইয়া যায়, কান্নার কারণটা তবে তো নিশ্চয় গুরুতর! আরো বেশি আগ্রহের সঙ্গে সে কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং কিছুই জানিতে না পারিয়া সেদিন তার একটু অভিমান হয়। তারপর দুদিন নীলা কাঁদে কি না সেই জানে না, দাঁতের ব্যথা আর মাথার যন্ত্রণায় বিব্রত থাকায় অনাদি টের পায় না।

পরদিন আবার নীলার কান্না শুরু হইলে রাগ করিয়া অনাদি বলিল, 'কী হয়েছে, যদি নাই বলবে, বারান্দায় গিয়ে কাঁদো, আমায় জ্বালিও না।'

এতক্ষণ কাঁদিবার কোনো প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, এবার স্বামীর একটা কড়া ধমক খাইয়া নীলা অনায়াসে আরো বেশি আকুল হইয়া কাঁদিতে পারিত, কিন্তু ধমক খাওয়া মাত্র নীলার কান্না একেবারে থামিয়া গেল।

'দাঁত ব্যথা করছে তোমার?'

অনাদি বলিল, 'না।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'না।'

'তবে?'—নীলা যেন অবাক হইয়া গিয়াছে। দাঁতও ব্যথা করিতেছে না, মাথার যন্ত্রণা নাই, কাঁদিবার জন্য তবে তাকে ধমক দেওয়া কেন, বারান্দায় গিয়া কাঁদিতে বলা কেন? দাঁতের ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা না থাকিলে তো তার প্রায় নিঃশব্দ কান্নায় অনাদির অসুবিধা হওয়ার কথা নয়!

তারপর ধমক দিয়া কয়েকবার নীলার কান্না বন্ধ করা গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে ধমকেও আর কাজ দিল না। মাঝে মাঝে তুচ্ছ উপলক্ষে, মাঝে মাঝে কোনো উপলক্ষ ছাড়াই নীলা কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল, তার একটা উদ্ভট ও দুর্নিবার পিপাসা আছে, নিজের নাকের জল চোখের জলের স্রোত অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিরাম পান না করিলে তার পিপাসা মেটে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনাদি টের পাইতে থাকে, বৌয়ের তার কান্নার কোনো কারণ নাই, বৌটাই তার ছিচকাঁদুনে, কাঁদাই তার স্বভাব।

অনাদির মা–ও কথাটায় সায় দিয়া বলেন, 'এদ্দিন বলি নি তোকে, কী জানি হয়তো ভেবে বসবি আমরা যন্ত্রণা দিয়ে বৌকে কাঁদাই, তোর কাছে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছি—বড্ড ছিচকাঁদুনে বৌ তোর। একটু কিছু হল তো কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। আগে ভাবতাম, বৌ বুঝি বড্ড অভিমানী, এখন দেখছি তা তো নয়, এ যে ব্যারাম! আমাদের কিছু বলতে কইতে হয় না, নিজে নিজেই কাঁদতে জানে। ওবেলা ও–বাড়ির কানুর মা মহাপ্রসাদ দিতে এল, বসিয়ে দুটো কথা বলছি, বৌ কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে, বলা নেই কওয়া নেই ভেউ ভেউ করে সে কী কান্না বৌয়ের! সমুদ্দুরে চান করার গল্প থামিয়ে কানুর মা তো থ বনে গেল। যাবার সময় চুপি চুপি আমায় বলে গেল, বৌকে মাদুলি তাবিজ ধারণ করাতে। এসব লক্ষণ নাকি ভালো নয়।'

অনাদির মা কান পাতিয়া শোনে, দরজার আড়াল হইতে অস্ফুট একটা শব্দ আসিতেছে।

'ঐ শোন। শুনলি?'

বাহিরে গিয়া অনাদি দেখিতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া নীলা বঁটিতে তরকারি কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।

বিবেক

শেষ রাত্রে একবার মণিমালার নাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। শিয়রে ঘনশ্যাম অত্যন্ত সজাগ হইয়াই বসিয়াছিল। স্ত্রীর মুখে একটু মকরধ্বজ দিয়া সে বড় ছেলেকে ডাকিয়া তুলিল।

'ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় সন্তু। নিখিলবাবু যদি না আসেন, মোড়ের বাড়িটাতে যে নতুন ডাক্তার এসেছেন, ওঁকে আনিস উনি ডাকলেই আসবেন।'

ঘরে একটিও টাকা নাই, শুধু কয়েক আনা পয়সা। ভিজিটের টাকাটা ডাক্তারকে নগদ দেওয়া চলিবে না। বাড়িতে ডাক্তার আনিলে একেবারে শেষের দিকে বিদায়ের সময় তাকে টাকা দেওয়া সাধারণ নিয়ম, এইটুকু যা ভরসা ঘনশ্যামের। ডাক্তার অবশ্য ঘরে ঢুকিয়াই তার অবস্থা টের পাইবেন, কিন্তু একটি টাকাও যে তার সম্বল নাই এটা নিশ্চয় তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হইবে না। মণিমালাকে ভালোভাবেই পরীক্ষা করিবেন, মরণকে ঠেকানোর চেষ্টার কোনো ত্রুটি হইবে না। বাঁচাইয়া রাখার জন্য দরকারি ব্যবস্থার নির্দেশও তাঁর কাছে পাওয়া যাইবে। তারপর, শুধু তারপর, ঘনশ্যাম ডাক্তারের সামনে দুটি হাত জোড়া করিয়া বলিবে, 'আপনার ফী-টা সকালে পাঠিয়ে দেব ডাক্তারবাবু—'

মণিমালার সামনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতজোড় করিয়া বিড়বিড় করিয়া কথাগুলি বলিতেছে। ঘুমভরা কাঁদ-কাঁদ চোখে বড় মেয়েটা তাকে দেখিতেছে। আঙুলে করিয়া আরো খানিকটা মকরধ্বজ সে মণিমালার মুখে গুঁজিয়া দিল। ওষুধ গিলিবার ক্ষমতা অথবা চেষ্টা মণিমালার আছে, মনে হয় না। হিসাবে হয়তো তার ভুল হইয়া গিয়াছে। আরো আগে ডাক্তার ডাকিতে পাঠানো উচিত ছিল। ডাক্তারকে সে ঠকাইতে চায় না, ডাক্তারের প্রাপ্য সে দু-চার দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবে, মণিমালা মরুক অথবা বাঁচুক। তবু, গোড়ায় কিছু না বলিয়া রোগিণীকে দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে ব্যবস্থা আদায় করার হিসাবে একটু প্রবঞ্চনা আছে বৈকি। এসব হিসাবে গলদ থাকিয়া যায়।

কিন্তু উপায় কী! ডাক্তার না দেখাইয়া মণিমালাকে তো মরিতে দেওয়া যায় না।

'আগুন করে' হাতে পায়ে সেঁক দে লতা। কাঁদিস নে হারামজাদী, ওরা উঠে যদি কান্না শুরু করে, তোকে মেরে ফেলব।'

মণিমালার একটি হাত তুলিয়া সে নাড়ি পরীক্ষার চেষ্টা করিল। দুহাতে দুটি রুলি এখনো তার আছে। সজ্ঞানে এ রুলি সে কিছুতেই খুলিতে দেয় নাই। কাল সন্ধ্যায় জ্ঞান প্রায় ছিল না, তখন একবার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চোখ কপালে তুলিয়া যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া মণিমালাকে খাবি খাওয়ার উপক্রম করিতে দেখিয়া সাহস হয় নাই। এখন অনায়াসে খুলিয়া নেওয়া যায়। সে টেরও পাইবে না! সকালেই ডাক্তারকে টাকা দেওয়া চলিবে, ওষুধপত্র আনা যাইবে। কিন্তু লাভ কি কিছু হইবে শেষ পর্যন্ত? সেইটাই ভাবনার বিষয়। রুলি-বেচা

পয়সায় কেনা ওষুধ খাইয়া জ্ঞান হইলে হাত খালি দেখিয়া মণিমালা যদি হার্ট ফেল করে!

সন্তু যখন ফিরিয়া আসিল, চারিদিক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। মণিমালা ততক্ষণে খানিকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। খুঁজিয়া নাড়ি পাওয়া যাইতেছে, নিশ্বাস সহজ হইয়া আসিয়াছে! ডাক্তার আসেন নাই শুনিয়া ঘনশ্যাম আরাম বোধ করিল।

নিখিল ডাক্তার বলিয়া দিয়াছেন, বেলা দশটা নাগাদ আসিবেন। মোড়ের বাড়ির নতুন ডাক্তারটি ডাকা মাত্র উৎসাহের সঙ্গে জামা গায়ে দিয়া ব্যাগ হাতে রওনা হইতেছিলেন, হঠাৎ কী ভাবিয়া সন্তুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন খোকা?'

'মা মরে যাবে ডাক্তারবাবু ?'

'শেষ অবস্থা নাকি?' বলে ডাক্তার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া চারটে টাকার জন্য সন্তুকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন! কাছেই তো বাড়ি। তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, টাকা লইয়া গেলেই আসিবেন। সন্তুকে তিনি আরো বলিয়া দিয়াছেন, নগদ চারটে টাকা যদি বাড়িতে নাও থাকে তিনটে কি অন্তত দুটো টাকা নিয়েও সে যেন যায়। বাকি টাকাটা পরে দিলেই চলিবে।

'তুই কাঁদতে গেলি কেন লক্ষীছাড়া?'

এ ডাক্তারটি আসিলে মন্দ হইত না। ডাক্তারকে ডাক্তার, ছ্যাঁচড়াকে ছ্যাঁচড়া। টাকাটা যতদিন খুশি ফেলিয়া রাখা চলিত। একেবারে না দিলেও কিছু আসিয়া যাইত না। এসব অর্থের কাঙাল নীচু স্তরের মানুষ সম্বন্ধে ঘনশ্যামের মনে গভীর অবজ্ঞা আছে। এদের একজন তাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, ভাবিলে সে গভীর অস্বস্তি বোধ করে না, মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায় না।

ঘরের অপর প্রান্তে, মণিমালার বিছানার হাত তিনেক তফাতে, নিজের বিছানায় গিয়া ঘনশ্যাম শুইয়া পড়িল। ভিজা ভিজা লাগিতেছে বিছানাটা। ছোট মেয়েটা সারারাত চরকির মতো বিছানায় পাক খায়, কখন আসিয়া এদিকে তার বিছানা ভিজাইয়া ওপাশে খোকার ঘাড়ে পা তুলিয়া দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। মারিবে? এখন মারিলে অন্যায় হয় না। সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিবে ওর পিঠের ওই পাঁজরায় অথবা লোল ও তুলার আঁশ মাখানো গালে? আধঘণ্টা ধরিয়া চিৎকার করিবে মেয়েটা। মণিমালা ছাড়া কারো সাধ্য হইবে না সহজে ওর সেই কান্না থামায়।

আধঘণ্টা মরার মতো পড়িয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। অশ্বিনীর কাছেই আবার সে কয়েকটা টাকা ধার চাহিবে, যা থাকে কপালে। এবার হয়তো রাগ করিবে অশ্বিনী, মুখ ফিরাইয়া বলিবে তার টাকা নাই। হয়তো দেখাই করিবে না। তবু অশ্বিনীর কাছেই তাকে হাত পাতিতে হইবে। আর কোনো উপায়ই নাই।

বহুকালের পুরানো পোকায়–কাটা সিল্কের জামাটি দিন তিনেক আগে বাহির করা হইয়াছিল, গায়ে দিতে গিয়া ঘনশ্যাম থামিয়া গেল। আর জামা নাই বলিয়া সে যে এই জামাটি ব্যবহার করিতেছে, এই জামা গায়ে দিয়া বাজার পর্যন্ত করিতে যায়, অশ্বিনী তা টের পাইবে না। ভাবিবে, বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া বাক্স প্যাঁটরা ঘাঁটিয়া মান্ধাতার আমলের পোকায় কাটা দাগ ধরা সিল্কের পাঞ্জাবিটি সে বাহির করিয়াছে। মনে মনে হয়তো হাসিবে অশ্বিনী।

তার চেয়ে ছেঁড়া ময়লা শার্টটা পরিয়া যাওয়াই ভালো। শার্টের ছেঁড়াটুকু সেলাই করা হয় নাই দেখিয়া ঘনশ্যামের অপূর্ব সুখকর অনুভূতি জাগিল। কাল লতাকে সেলাই করিতে বলিয়াছিল। একবার নয়, দুবার। সে ভুলিয়া গিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত কারণে মেয়েটাকে মারা

চলে। ও বড় হইয়াছে, কাঁদাকাটা করিবে না। কাঁদিলেও নিঃশব্দে কাঁদিবে, মুখ বুজিয়া।

'লতা ইদিকে আয়। ইদিকে আয় হারামজাদী মেয়ে!'

চড় খাইয়া ঘনশ্যামের অনুমানমতো নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে লতা শার্ট সেলাই করে, আর বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ঘনশ্যাম আড়চোখে তার দিকে তাকায়। মায়া হয়, কিন্তু আফসোস হয় না। অন্যায় করিয়া মারিলে আফসোস ও অনুতাপের কারণ থাকিত।

অশ্বিনীর মস্ত বাড়ির বাহারে গেট পার হওয়ার সময় সবিনয় নম্রতায় ঘনশ্যামের মন যেন গলিয়া যায়। দাসানুদাস কীটাণুকীটের চেয়ে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়! সমস্তক্ষণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে ধনহীনতার মতো পাপ নাই। রাস্তায় নামিয়া যাওয়ার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত এই ভয়াবহ অপরাধের ভারে সে যেন দু-এক ডিগ্রি সামনে বাঁকিয়া কুঁজো হইয়া থাকে।

সবে তখন আটটা বাজিয়াছে। সদর বৈঠকখানার পর অশ্বিনীর নিজের বসিবার ঘর, মাঝখানের দরজায় পুরু দুর্ভেদ্য পরদা ফেলা থাকে। এত সকালেও বৈঠকখানায় তিন জন অচেনা ভদ্রলোক ধরনা দিয়া বসিয়া আছেন; ঘনশ্যাম দমিয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া পরদা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল অশ্বিনীর বসিবার ঘরে। অন্দর হইতে অশ্বিনী প্রথমে এ ঘরে আসিবে।

ঘরে ঢুকিয়াই ঘনশ্যাম সাধারণভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল ঘরে কেউ নাই। সোনার ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ার পর আর একবার বিশেষভাবে সে বুঝিতে পারিল ঘর খালি। উনানে বসানো কেটলিতে যেমন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ শুরু হয় এবং খানিক পরে আওয়াজ কমিয়া জল ফুটিতে থাকে, ঘনশ্যামের মাথাটা তেমনি খানিকক্ষণ শব্দিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া চিন্তায় টগবগ করিয়া উঠিল। হৃৎপিণ্ড পাঁজরে আছাড় খাইতে শুরু করিয়াছে। গলা শুকাইয়া গিয়াছে। হাত পা কাঁপিতেছে ঘনশ্যামের। নির্জন ঘরে টেবিল হইতে তুলিয়া একটা ঘড়ি পকেটে রাখা এত কঠিন! কিন্তু দেরি করা বিপজ্জনক। ঘড়িটা যদি তাকে নিতেই হয়, অবিলম্বে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দেরি করিতে করিতে হয়তো শেষ পর্যন্ত সে যখন ঘড়িটা তুলিয়া পকেটে ভরিতে যাইবে ঠিক সেই সময় কেহ ঘরে ঢুকিয়া সব দেখিয়া ফেলিবে। কেউ না দেখিলে তার কোনো ভয় নাই। সদ্‌বংশজাত শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সে, সকলে তাহাকে নিরীহ ভালোমানুষ বলিয়া জানে, যেমন হোক অশ্বিনীর সে বন্ধু। তাকে সন্দেহ করার কথা কে ভাবিবে! ঘড়ি সহজেই হারাইয়া যায়। চাকর ঠাকুর চুরি করে, সন্ন্যাসী ভিখারি চুরি করে। শেষবার ঘড়ি কোথায় খুলিয়া রাখিয়াছিল মনে পড়িয়াও যেন মনে পড়িতে চায় না মানুষের। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি কোথায় ছিল, কে নিয়াছে, কে বলিতে পারিবে!

তারপর ঘড়িটা অবশ্য এক সময় ঘনশ্যামের পকেটে চলিয়া গেল। বুকের ধড়ফড়ানি ও হাতপায়ের কাঁপুনি থামিয়া তখন নিজেকে তার অসুস্থ, দুর্বল মনে হইতেছে। হাঁটু দুটি যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। পেটের ভিতর কিসে জোরে টানিয়া ধরিয়াছে আর সেই টানে মুখের চামড়া পর্যন্ত শির শির করিতেছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই ঘনশ্যাম থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অশ্বিনীর পুরানো চাকর পশুপতি উপস্থিত ভদ্রলোকদের চা পরিবেশন করিতেছে। ঘড়িটা পকেটে রাখিতে সে যে এতক্ষণ ইতস্তত করিয়াছে, ঘনশ্যামের ধারণা ছিল না। হিসাবে একটা ভুল হইয়া গেল। পশুপতি মনে রাখিবে। এ ঘর হইতে তার বাহির হওয়া, তার থমক, চমক, শুকনো মুখ, কিছুই সে ভুলিবে না।

'কেমন আছেন ঘোনোস্‌শ্যামবাবু? চা দিই?'

'দাও একটু।'

ধোপদুরস্ত ফরসা ধুতি ও শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল। তার চেয়ে পশুপতিকে ঢের বেশি ভদ্রলোকের মতো দেখাইতেছে। ঘনশ্যামের শুধু এটুকু সান্ত্বনা যে আসলে পশুপতি চোর; অশ্বিনী নিজেই অনেকবার বলিয়াছে, সে এক নম্বরের চোর! কিন্তু কী প্রশ্রয় বড়লোকের এই পেয়ারের চোর-চাকরের! এক কাপ চা দেওয়ার সঙ্গে বড়লোক বন্ধুর চাকর যে কতখানি অপমান পরিবেশন করিতে পারে খেয়াল করিয়া ঘনশ্যামের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল। আজ কিন্তু প্রথম নয়। পশুপতি তাকে কোনোদিন খাতির করে না, একটা অদ্ভুত মার্জিত অবহেলার সঙ্গে তাকে শুধু সহ্য করিয়া যায়। এ বাড়িতে আসিলে অশ্বিনীর ব্যবহারেই ঘনশ্যামকে এত বেশি মরণ কামনা করিতে হয় যে, পশুপতির ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অবসর সে পায় না। চায়ে চুমুক দিতে জিভ পুড়াইয়া পশুপতির বাঁকা হাসি দেখিতে দেখিতে আজ সব মনে পড়িতে লাগিল। মনের মধ্যে তীব্র জ্বালা-ভরা অনুযোগ পাক দিয়া উঠিতে লাগিল অশ্বিনীর বিরুদ্ধে! অসহ্য অভিমানে চোখ ফাটিয়া যেন কান্না আসিবে। বন্ধু একটা ঘড়ি চুরি করিয়াছে জানিতে পারিলে পুলিশে না দিক, জীবনে অশ্বিনী তার মুখ দেখিবে না সন্দেহ নাই। অথচ প্রথার মতো নিয়মিতভাবে যে চুরি করিতেছে সেই চাকরের কত আদর তার কাছ। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি চুরি করা অন্যায় নয়। ওরকম মানুষের দামি জিনিস চুরি করাই উচিত।

একঘণ্টা পরে মিনিট পাঁচেকের জন্য অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইল। প্রতিদিনের মতো আজও সে বড় ব্যস্ত হইয়া আছে। মস্ত চেয়ারে মোটা দেহটি ন্যস্ত করিয়া অত্যধিক ব্যস্ততায় মেঘ-গভীর মুখে হাঁসফাঁস করিতেছে। ঘনশ্যামের কথাগুলি সে শুনিল কি না বোঝা গেল না। চিরদিন এমনিভাবেই সে তার কথা শোনে, খানিক তফাতে বসাইয়া আধঘণ্টা ধরিয়া ঘনশ্যামকে দিয়া সে দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী আবৃত্তি করায়। নিজে কাগজ পড়ে, লোকজনের সঙ্গে কথা কয়, মাঝে মাঝে আচমকা কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়াও যায়। ঘনশ্যাম থামিয়া গেলে তার দিকে তাকায়—হাকিম যেভাবে কাঠগড়ায় ছ্যাঁচড়া চোর আসামির দিকে তাকায় তেমনিভাবে। জিজ্ঞাসা করে, 'কী বলছিলে?'

ঘনশ্যামকে আবার বলিতে হয়।

আজ পাঁচ মিনিটও গেল না, নীরবে ড্রয়ার খুলিয়া পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া ঘনশ্যামের দিকে ছুড়িয়া দিল। ডাকিল, 'পশু!'

পশুপতি আসিয়া দাঁড়াইলে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাপড় কাচা সাবান আছে?'

'আছে বাবু!'

'এই বাবুকে একখণ্ড সাবান এনে দাও। জামা কাপড়টা বাড়িতে নিজেই একটু কষ্ট করে কেচে নিও ঘনশ্যাম। গরিব বলে নোংরা থাকতে হবে?' পঁচিশ টাকা ধার চাহিলে এ পর্যন্ত অশ্বিনী তাকে অন্তত পনেরটা টাকা দিয়াছে, তার নিচে কোনোদিন নামে নাই। এ অপমানটাই ঘনশ্যামের অসহ্য মনে হইতে লাগিল। মণিমালাকে বাঁচানোর জন্য পাঁচটি টাকা দেয়, কী অমার্জিত অসভ্যতা অশ্বিনীর, কী স্পর্ধা! পথে নামিয়া ট্রাম-রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ঘনশ্যাম প্রথম টের পায়, তার রাগ হইয়াছে। ট্রামে উঠিয়া বাড়ির দিকে অর্ধেক আগাইয়া যাওয়ার পর সে বুঝিতে পারে, অশ্বিনীর বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষে বুকের ভিতরটা সত্যই তার জ্বালা করিতেছে। এ বিদ্বেষ ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিবে। হয়তো আজ সারাটা দিন, হয়তো কাল পর্যন্ত।

ঘনশ্যামের একটা বৈঠকখানা আছে। একটু স্যাঁতসেঁতে এবং ছায়ান্ধকার। তক্তপোশের ছেঁড়া শতরঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে দেহ মন জুড়াইয়া যায়, চোখ আর জ্বালা করে না, ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে হয়। মিনিট পনের ঘনশ্যামের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকার পর তার বন্ধু শ্রীনিবাস চিৎ হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়াছিল। আরো আধঘণ্টা হয়তো সে এমনিভাবে পড়িয়া থাকিত, কিন্তু যাওয়ার তাগিদটা মনে তার এতই প্রবল হইয়াছিল যে, ঘনশ্যাম ঘরে ঢোকামাত্র ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ভালোই হল, এসে পড়েছিস। আর এক মিনিট দেখে চলে যেতাম ভাই। ডাক্তার আনলে না?'

'ডাক্তার ডাকতে যাই নি। টাকার খোঁজে বেরিয়েছিলাম।'

শ্রীনিবাস ক্লিষ্টভাবে একটু হাসিল।— 'দুজনেরই সমান অবস্থা, আমিও টাকার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, ওনার বালা দুটো বাঁধা রেখে এলাম। শেষ রাতে খোকারও যায় যায় অবস্থা—অক্সিজেন দিতে হল।' একটু চুপ করিয়া কী ভাবিতে ভাবিতে শ্রীনিবাস আস্তে আস্তে সিধা হইয়া গেল, 'আচ্ছা, আমাদের সব একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে কেন বল তো? এক মাস আগে পরে চাকরি গেল, একসঙ্গে অসুখ-বিসুখ শুরু হল, কাল রাত্রে এক সময়ে এদিকে সন্তুর মা, ওদিকে খোকা—'

দুর্ভাগ্যের এই বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দুই বন্ধুকে নির্বাক করিয়া রাখে। বন্ধু তারা অনেক দিনের, সব মানুষের মধ্যে দুজনে তারা সবচেয়ে কাছাকাছি। আজ হঠাৎ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর নিকটতর মনে হইতে থাকে। দুজনেই আশ্চর্য হইয়া যায়।

'টাকা পেলি না?'

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িল।

'গোটা দশেক টাকা রাখ। নিখিলবাবুকে একবার আনিস।'

পকেট হইতে পুরানো একটা চামড়ার মনিব্যাগ বাহির করিয়া কতগুলি ভাঁজ-করা নোট হইতে একটি সন্তর্পণে খুলিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিল। কিছু আবেগ ও কিছু অনির্দিষ্ট উত্তেজনায় সে নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে। তার স্ত্রীর বালা বিক্রির টাকা, মরণাপন্ন ছেলের চিকিৎসার টাকা। আবেগ ও উত্তেজনায় একটু কাবু হইয়া ঝোঁকের মাথায় না দিলে একেবারে দশটা টাকা বন্ধুকে সে দিতেই বা পারিবে কেন!

'গেলাম ভাই। বসবার সময় নেই। একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাব।'

একটু অতিরিক্ত ব্যস্তভাবেই সে চলিয়া গেল। নিজের উদারতায় লজ্জা পাইয়া বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দুমিনিটের মধ্যে আরো বেশি ব্যস্তভাবে সে ফিরিয়া আসিল। আতঙ্কে ধরা গলায় বলিল, 'ব্যাগটা ফেলে গেছি।'

'এখানে? পকেটে রাখলি যে?'

'পকেটে রাখবার সময় বোধ হয় পড়ে গেছে।'

তাই যদি হয়, তক্তপোশে পড়িয়া থাকার কথা। ঘনশ্যামকে টাকা দিয়া পকেটে ব্যাগ রাখিবার সময় শ্রীনিবাস বসিয়া ছিল। ঘর এত বেশি অন্ধকার নয় যে, চামড়ার একটা মনিব্যাগ চোখে পড়িবে না। তবে তক্তপোশের নিচে বেশ অন্ধকার। আলো জ্বালিয়া তক্তপোশের নিচে আয়নায় প্রতিফলিত আলো ফেলিয়া খোঁজা হইল। মেঝেতে চোখ বুলাইয়া কতবার যে শ্রীনিবাস সমস্ত ঘরে পাক খাইয়া বেড়াইল। ঘনশ্যামের সঙ্গে তিনবার পথে নামিয়া দুটি বাড়ির পরে পান-বিড়ির দোকানের সামনে পর্যন্ত খুঁজিয়া আসিল। তারপর তক্তপোশে বসিয়া পড়িয়া মরার মতো বলিল, 'কোথায় পড়ল তবে? এইটুকু মোটে গেছি, বিড়ির দোকান পর্যন্ত। এক পয়সার বিড়ি কিনব বলে পকেটে হাত দিয়েই দেখি ব্যাগ

নেই।'

ঘনশ্যাম আরো বেশি মরার মতো বলিল, 'রাস্তায় পড়েছে মনে হয়। পড়ামাত্র হয়তো কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে।'

'তাই হবে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে রাস্তায় পড়ল, একজন কুড়িয়ে নিল! পকেট থেকে পড়বেই বা কেন তাই ভাবছি।'

'যখন যায়, এমনিভাবেই যায়। শনির দৃষ্টি লাগলে পোড়া শোল মাছ পালাতে পারে।'

'তাই দেখছি। বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা যাবে।'

ঘনশ্যামের মুখের চামড়ায় টান পড়িয়া শিরশির করিতে থাকে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়িটা পকেটে ভরিবার পর এমনি হইয়াছিল। এখনো ব্যাগটা ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অসাবধান বন্ধুর সঙ্গে এটুকু তামাশা করা চলে, তাতে দোষ হয় না। তবে দশটা টাকা দিলেও ডাক্তার লইয়া গিয়াও ছেলেকে দেখাইতে পারিবে। দশ টাকায় মণিমালার যদি চিকিৎসা হয়, ওর ছেলের হইবে না কেন!

শ্রীনিবাস নীরবে নোটটি ফিরাইয়া লইল। পকেটে রাখিল না, মুঠা করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। সমান বিপন্ন বন্ধুকে খানিক আগে যাচিয়া যে টাকা দিয়াছিল সেটা ফিরাইয়া লওয়ার সঙ্গতি–অসঙ্গতির বিচার হয়তো করিতেছে। নিরুপায় দুঃখ, ব্যাগ হারানোর দুঃখ নয়, এই দশ টাকা ফেরত লইতে হওয়ার দুঃখ, হয়তো ওর কান্না আসিবার উপক্রম হইয়াছে। ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। ঘনশ্যাম মমতা বোধ করে। ভাবে, মিছামিছি ওর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

'গোটা পঁচিশেক টাকা জোগাড় করতে পারব শ্রীনিবাস।'

'পারবি? বাঁচা গেল। আমি তাই ভাবছিলাম। সন্তুর মার চিকিৎসা না করলেও তো চলবে না।'

শ্রীনিবাস চলিয়া যাওয়ার খানিক পরেই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যামের সর্বাঙ্গে একবার শিহরন বহিয়া গেল। ঝাঁকুনি লাগার মতো জোরে। শ্রীনিবাস যদি কোনো কারণে গা ঘেঁষিয়া আসিত, কোনোরকমে যদি পেটের কাছে তার কোনো অঙ্গ ঠেকিয়া যাইত! তাড়াতাড়িতে শার্টের নিচে কোঁচার সঙ্গে ব্যাগটা বেশি গুঁজিয়া দিয়াছিল, শ্রীনিবাসের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরিয়া খোঁজার সময় আলগা হইয়া যদি ব্যাগটা পড়িয়া যাইত! পেট ফুলাইয়া ব্যাগটা শক্ত করিয়া আটকাইতেও তার সাহস হইতেছিল না, বেশি উঁচু হইয়া উঠিলে যদি চোখে পড়ে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি আলগাভাবে শার্টের পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া কতক্ষণ ধরিয়া চা খাইয়াছে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, অশ্বিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তো একবারও হয় নাই। সেইখানেই ভয় ছিল বেশি। তার ব্যাগ লুকানোকে শ্রীনিবাস নিছক তামাশা ছাড়া আর কিছু মনে করিত না। এখনো যদি ব্যাগ বাহির করিয়া দেয়, শ্রীনিবাস তাই মনে করিবে। তাকে চুরি করিতে দেখিলেও শ্রীনিবাস বিশ্বাস করিবে না সে চুরি করিতে পারে। কিন্তু কোনোরকমে তার পকেটে ঘড়িটার অস্তিত্ব টের পাইলে অশ্বিনী তো ওরকম কিছু মনে করিত না। সোজাসুজি বিনা দ্বিধায় তাকে চোর ভাবিয়া বসিত। ভাবিলে এখন তার আতঙ্ক হয়। সেখানে কী নিশ্চিত হইয়াই ছিল! ঘড়ির ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল পাতলা শার্টের পকেটটা। তখন সে খেয়ালও করে নাই। অশ্বিনী যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, তোমার পকেটে কী ঘনশ্যাম!

ঘরের স্যাঁতসেঁতে শৈত্যে ঘনশ্যামের অন্য সব দুশ্চিন্তা টান–করা–চামড়ার ভিজিয়া–ওঠার মতো শিথিল হইয়া যায়, উত্তেজনা ঝিমাইয়া পড়ে, মনের মধ্যে কষ্টরোধের মতো চাপ

দিতে থাকে, শুধু এক দুর্বহ উদ্বেগ। অশ্বিনীর মনে খটকা লাগিবে। অশ্বিনী সন্দেহ করিবে। পশুপতি তাকে অশ্বিনীর বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল। পশুপতি যদি ওকথা তাকে বলে, বলিবে নিশ্চয়, অশ্বিনীর কি মনে হইবে না ঘড়িটা ঘনশ্যাম নিলেও নিতে পারে?

এই ভাবনাটাই মনের মধ্যে অবিরত পাক খাইতে থাকে। শরীরটা কেমন অস্থির অস্থির করে ঘনশ্যামের। সন্দেহ যদি অশ্বিনীর হয়, ভাসা ভাসা ভিত্তিহীন কাল্পনিক সন্দেহ, তার তাতে কী আসিয়া যায়, ঘনশ্যাম বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এতদিন সে যে অশ্বিনীর ঘড়ি চুরি করে নাই, কোনো সন্দেহও তার সম্বন্ধে জাগে নাই অশ্বিনীর, কী এমন খাতিরটা সে তাকে করিয়াছে? শেষরাত্রে মণিমালার নাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল শুনিয়া পাঁচটি টাকা সে তাকে দিয়াছে, একতাড়া দশ টাকার নোটের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঁচ টাকার একটি নোট ছুড়িয়া দিয়াছে। আর দিয়াছে একখানা কাপড় কাচা সাবান। চাকরকে দিয়া আনাইয়া দিয়াছে। সন্দেহ ছোট কথা, অশ্বিনী তাকে চোর বলিয়া জানিলেই বা তার ক্ষতি কী?

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দে চমকিয়া ওঠে। নিশ্চয় অশ্বিনী আসিয়াছে। পুলিশ নয় তো? অশ্বিনীকে বিশ্বাস নাই। ঘড়ি হারাইয়াছে টের পাওয়ামাত্র পশুপতির কাছে খবর শুনিয়া সে হয়তো একেবারে পুলিশ লইয়া বাড়ি সার্চ করিতে আসিয়াছে। অশ্বিনী সব পারে।

না, অশ্বিনী নয়। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে দেখিতে আসিয়াছে।

কিন্তু ঘড়িটা এভাবে কাছে রাখা উচিত নয়। বাড়িতে রাখাও উচিত নয়। ডাক্তার বিদায় হইলে সে ঘড়িটা বেচিয়া দিয়া আসিবে। যেখানে হোক, যত দামে হোক। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে পরীক্ষা করে, অর্ধেক মন দিয়া ঘনশ্যাম তার প্রশ্নের জবাব দেয়। সোনার ঘড়ি কোথায় বিক্রি করা সহজ ও নিরাপদ তাই সে ভাবিতে থাকে সমস্তক্ষণ। বাহিরের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণের সঙ্কেতময় নীরবতার পর নিখিল ডাক্তার গম্ভীরমুখে যা বলে তার মানে সে প্রথমটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

মণিমালা বাঁচিবে না? কেন বাঁচিবে না, এখন তো আর টাকার অভাব নাই, যতবার খুশি ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিবে। মণিমালার না বাঁচিবার কী কারণ থাকিতে পারে!

'ভালো করে দেখেছেন?'

বোকার মতো প্রশ্ন করা। মাথার মধ্যে সব যেরকম গোলমাল হইয়া যাইতেছে তাতে বোকা না বনিয়াই বা সে কী করে। গোড়ায় ডাক্তার ডাকিলে, সময়মতো দু-চারটা ইনজেকশন পড়িলে মণিমালা বাঁচিত। তিন-চার দিন আগে ব্রেন কমপ্লিকেশন আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিকে চিকিৎসা আরম্ভ হইলেও বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। তিন-চার দিন! মণিমালা যে ক্রমাগত মাথাটা এপাশ ওপাশ করিত, চোখ কপালে তুলিয়া রাখিত, সেটা তবে ব্রেন খারাপ হওয়ার লক্ষণ। রুলি খুলিতে গেলে সে সজ্ঞানে বাধা দেয় নাই, হাতে টান লাগায় আপনা হইতে মুখ বিকৃত করিয়া গলায় বিশ্রী ভাঙা ভাঙা আওয়াজ করিয়াছিল। স্থির নিশ্চল না হইয়াও মানুষের জ্ঞান যে লোপ পাইতে পারে অত কি ঘনশ্যাম জানিত।

চেষ্টা প্রাণপণে করিতে হইবে। তবে এখন সব ভগবানের হাতে।

ডাক্তার ভগবানের দোহাই দেয়। এতদিন সব ডাক্তারের হাতে ছিল, এখন ভগবানের হাতে চলিয়া গিয়াছে। নিখিল ডাক্তার চলিয়া গেলে বাহিরের ঘরে বসিয়াই ঘনশ্যাম চিন্তাগুলি গুছাইবার চেষ্টা করে। কালও মণিমালার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত ছিল, ডাক্তারের এ কথায় তার

কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না। শেষরাত্রে নাড়ি ছাড়িয়া একরকম মরিয়া গিয়াও মণিমালা তবে বাঁচিয়া উঠিল কেন? তখন তো শেষ হইয়া যাইতে পারিত। মণিমালার মরণ নিশ্চিত হইয়াছে আজ সকালে। ডাক্তার বুঝিতে পারে নাই, এখনকার অবস্থা দেখিয়া আন্দাজে ভুল অনুমান করিয়াছে। ঘনশ্যাম যখন অশ্বিনীর ঘড়িটা চুরি করিয়াছিল, তার জীবনে প্রথম চুরি, তখন মণিমালা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ওর চিকিৎসার জন্য সে পাপ করিয়াছে কিনা, ওর চিকিৎসা তাই হইয়া গিয়াছে নিরর্থক। সকালে বাড়ি হইতে বাহির হওয়ার আগে নিখিল ডাক্তারকে আনিয়া সে যদি মণিমালাকে দেখাইত, নিখিল ডাক্তার নিশ্চয় অন্য কথা বলিত।

ঘড়িটা ফিরাইয়া দিবে?

খুব সহজে তা পারা যায়। এখনো হয়তো জানাজানিও হয় নাই। কোনো এক ছুতায় অশ্বিনীর বাড়ি গিয়া একফাঁকে টেবিলের উপর ঘড়িটা রাখিয়া দিলেই হইল।

আর কিছু না হোক, মনের মধ্যে এই যে তার পীড়ন চলিতেছে আতঙ্ক ও উদ্বেগের, তার হাত হইতে সে তো মুক্তি পাইবে। যাই সে ভাবুক, অশ্বিনী যে তাকে মনে মনে সন্দেহ করিবে সে সহ্য করিতে পারিবে না। এই কয়েক ঘণ্টা সে কি সহজ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে? পশুপতি যখন তাকে অশ্বিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল, তাকে সন্দেহ করার সম্ভাবনা যখন আছে অশ্বিনীর, ঘড়িটা রাখিয়া আসাই ভালো। এমনিই অশ্বিনী তাকে যে রকম অবজ্ঞা করে গরিব বলিয়া, অপদার্থ বলিয়া, তার উপর চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে না জানি কী ঘৃণাটাই সে তাকে করিবে! কাজ নাই তার তুচ্ছ একটা সোনার ঘড়িতে।

টাকাও তার আছে। পঁচিশ টাকা।

ভিতরে গিয়া মণিমালাকে একবার দেখিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম বাহির হইয়া পড়িল। ট্রাম রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর আগাইয়া সে শ্রীনিবাসের মনিব্যাগটা বাহির করিল। নোটগুলি পকেটে রাখিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়াই চলিতে চলিতে এক সময় আলগোছে ব্যাগটা রাস্তায় ফেলিয়া দিল। খানিকটা গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ছাতি হাতে পাঞ্জাবি গায়ে একজন মাঝবয়সী গোঁফওয়ালা লোক খালি ব্যাগটার উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া কতই যেন আনমনে অন্যদিকে চাহিয়া আছে।

ঘনশ্যাম একটু হাসিল। একটু পরেই ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া লোকটি সরিয়া পড়িবে। হয়তো কোনো পার্কে নির্জন বেঞ্চে বসিয়া পরম আগ্রহে সে ব্যাগটা খুলিবে। যখন দেখিবে ভিতরটা একেবারে খালি, কী মজাই হইবে তখন! খুচরা সাড়ে সাত আনা পয়সা পর্যন্ত সে ব্যাগটা হইতে বাহির করিয়া লইয়াছে।

স্টপেজে ট্রাম থামাইয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। খুচরা সাড়ে সাত আনা পয়সা থাকায় সুবিধা হইয়াছে। নয়তো ট্রামের টিকিট কেনা যাইত না। তার কাছে শুধু দশ টাকা আর পাঁচ টাকার নোট।

অশ্বিনীর বৈঠকখানায় লোক ছিল না। তার নিজের বসিবার ঘরটিও খালি। টেবিলে কয়েকটা চিঠির উপর ঘড়িটা চাপা দেওয়া ছিল, চিঠিগুলি এখনো তেমনিভাবে পড়িয়া আছে। ঘড়িটি চিঠিগুলির উপর রাখিয়া ঘনশ্যাম বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

বেল টিপিতে আসিল পশুপতি।—'বাবু যে আবার এলেন?'

'বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব।'

ভিতরে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুপতি ফিরিয়া আসিল।

'বিকেলে আসতে বললেন ঘনোস্‌শ্যামবাবু, চারটের সময়।'

ঘনশ্যাম কাতর হইয়া বলিল, 'আমার এখুনি দেখা করা দরকার, তুমি আর একবার বলো গিয়ে পশুপতি। বোলো যে ডাক্তার সেনের কাছে একটা চিঠির জন্য এসেছি।'

তারপর অশ্বিনী ঘনশ্যামকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইল, অর্ধেক ফী-তে মণিমালাকে একবার দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তার বন্ধু ডাক্তার সেনের নামে একখানা চিঠিও লিখিয়া দিল। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির এইসব লীলাখেলা অশ্বিনী ভালবাসে, নিজেকে তার গৌরবান্বিত মনে হয়।

চিঠিখানা ঘনশ্যামের হাতে দেওয়ার আগে সে কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ফী-র টাকা বাকি রাখলে চলবে না কিন্তু। আমি অপদস্থ হব। টাকা আছে তো?'

ঘনশ্যাম বলিল, 'আছে। ওনার গয়না বেচে দিলাম, কী করি।'

আপিম

আজ সকালে বাজারে যাওয়ার লোকের অভাব ঘটিয়াছে। বাজার প্রতিদিন একরকম নরেন নিজেই করে, আজ সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া সে একগাদা আপিসের কাগজপত্র লইয়া বসিয়াছে। অথচ বাজারে একজনকে পাঠাইতে হইবে। আপিস আছে, স্কুল-কলেজ আছে, কিছু মাছ-তরকারি না আনাইলে চলিবে কেন? ব্যস্ত ও বিব্রত স্বামীর মুখ দেখিয়া মায়ার বড়ই মমতা বোধ হইল, বাজারের কথাটা না তুলিয়াই সে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল ছাতে।

ছাতের ঘুপচি-ঘরখানায় থাকে বিমল, সংসারের সমস্ত গণ্ডগোলের উর্ধ্বে থাকিয়া সে কলেজের পড়া করে। বিমল তখনো ঘুমাইতেছিল। বেলা আটটার আগে কোনোদিনই তার ঘুম ভাঙে না। ছোট কেরোসিন-কাঠের টেবিলটিতে গাদা করা বই-খাতা আর ইংরেজি-বাংলা মাসিকপত্র; বিছানাতেও কয়েকটা বই পড়িয়া আছে। মাথার কাছে একটা বার্লির কৌটা, দেশলাইয়ের কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরা আর ছাইয়ে প্রায় ভর্তি হইয়া গিয়াছে, বিছানা পাতিয়া মেঝের যেটুকু ফাঁকা আছে সেখানেও এইসব আবর্জনাই বেশি।

এসব মায়ার নজরে পড়িল না, এতবড় ছেলে সিগারেট খাইবে সেটা আর এমন কী দোষের ব্যাপার? মায়ার শুধু চোখে পড়িল ঘুমন্ত ছেলের ক্লিষ্ট মুখখানি। আহা, কত রাত জাগিয়া না জানি ছেলে তার পড়িয়াছে! আজ যেমন করিয়াই হোক ওকে একটু বেশি দুধ খাওয়াইতেই হইবে। ভাশুরের দুধ যদি একটু কমাইয়া দেওয়া যায়— আপিম খায় বলিয়াই একজন রোজ একবাটি দুধ খাইবে আর এত খাটিয়া তার ছেলের যথেষ্ট দুধ জুটিবে না? যে ছেলে একদিন ...

সেইখানে দাঁড়াইয়া মায়া হয়তো ছেলের ভবিষ্যতের এবং সেই সঙ্গে জড়ানো নিজের ও নিজের এই সংসারের ভবিষ্যতের স্বপ্নে কিছুক্ষণের জন্য বিভোর হইয়া থাকিত, গোঙানির মতো আওয়াজ করিয়া বিমল পাশ ফেরায় স্বপ্ন দেখা তখনকার মতো স্থগিত রাখিতে হইল।

কাল যে ইংরেজি নভেলখানা পড়িতে পড়িতে বিমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক পিঠের নিচে সেই বইখানাই অনেকক্ষণ তার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করিতেছিল। মায়া ডাকিতেই সে জাগিয়া গেল।

বাজার? চা-টা খাইয়া একবার বাজার যাইতে হইবে? মস্ত একটা হাই তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বিমল বলিল, 'আমি পারব না।'

মায়া তা জানে। বিমল কোনোদিন বাজারে যায় না, বাজারে গেলে তার বিশ্রী লাগে, কেমন যেন লাগে, বড় খারাপ লাগে। তবু মায়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, 'কাকে পাঠাব তবে? আজকের মতো একবারটি যা লক্ষ্মী, উনি আপিসের কাজ নিয়ে বসেছেন, নইলে—'

বিমল আবার মাথা নাড়িল, 'উঁহুঁ, বাজার-টাজার আমার দ্বারা হবে না মা, বল তো দশবার গিয়ে দোকান থেকে জিনিস এনে দিচ্ছি; বাজারে ঢুকে মাছ, তরকারি কিনতে পারব না।'

মায়া ফিরিয়া গেল। তাই হোক, কোনোদিন যেন ছেলেকে তার নিজে বাজার করিতে যাইতে না হয়, শুধু বাজার করার জন্যই যেন মাহিনা দিয়া লোক রাখিবার ক্ষমতা তার হয়।

আচ্ছা, তার ভাশুর কেন বাজারে যায় না? অন্তত আজকের মতো কেন যাইবে না? আপিম খায় বলিয়া? এ তো উচিত নয়! আগে যখন বড় চাকরি করিত, তখনকার কথা আলাদা। তখন কিছু বলিবার ছিল না, কিন্তু এখন যখন সপরিবারে ধরিতে গেলে একরকম ভাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়া আছে, এখন একদিনের জন্য দরকার হইলে কেন সে যাইবে না?

কথাটা বুঝাইয়া বলিতে নরেনও সায় দিল, তারপর সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'দাদা কি যাবে? কাল কতটা গিলে ঘুমোচ্ছে কে জানে, ডেকে তুলতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। দাদার কথা বাদ দাও।'

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আজকাল।'

নরেন এ কথাতেও সায় দিল। বলিল, 'কি জান, শোকে তাপে এরকম হয়েছেন। বৌদি মারা যাবার পর থেকে—'

'তার আগে বুঝি খেতেন না?'

'তা খেতেন, তবে সে নামমাত্র, এতটা বাড়ে নি।'

'আপিমের নেশা বাড়ালেই বাড়ে।'

মায়া উঠিয়া গেল, বাজারে পাঠাইয়া দিল ঠিকা-ঝি কালিদাসীকে। বাড়তি একটা কাজও কালিদাসী করে না, এক গ্লাস জল গড়াইয়া দিতে বলিলেও গজর গজর করে, কিন্তু বাজারে পাঠাইলেই যায়। পয়সা তো চুরি করেই, মাছ-তরকারিও কিছু কিছু সরায়, ভিন্ন একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া নির্ভয়ে মায়াকে দেখায়, অন্তরঙ্গভাবে একগাল হাসিয়া বলে, 'ঘরের বাজারটাও এইসাথে সেরে এলাম মা। গরিবের বাজার দেখেছ মা, দুটি আলু, দুটি ঝিঙে—'

মায়া বিশ্বাস করে না যে, তাদের বাজার হইতে সরানো এই সামান্য জিনিসেই কালিদাসীর বাড়ির সকলের পেট ভরে। তবে সে আরো যে তিনটি বাড়িতে কাজ করে তাদের প্রত্যেকের বাজারে এ রকম ভাগ বসাইলে চলিয়া যাইতে পারে বটে। মাঝবয়সী এই স্ত্রীলোকটির আঁটসাঁট গড়ন আর চালচলন সমস্তই মায়ার চক্ষুশূল, ঝি পাওয়া এত কঠিন না হইলে সে কবে কালিদাসীকে দূর করিয়া দিত। তবু মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের ঘরের খবর না জানিয়া পারে না, তাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া কালিদাসীর সংসারের সব বিবরণই মায়া প্রায় জানিয়া ফেলিয়াছে। খাওয়ার লোক এ বাড়ির চেয়ে দু-একজন বেশিই হইবে, তাছাড়া কালিদাসীর স্বামী মদন আপিম খায়।

প্রথম দিন খবরটা শুনিয়া মায়া গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলিয়াছিল, 'আপিম খায়! তাই বুঝি রোজগারপাতি কিছুই করে না?'

কালিদাসী আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিল, 'রোজগার করবে না কেনে গা? ওর মতো খাটতে পারে কটা লোক? তবে গরিবের রোজগার তো, কুলোয় না।'

মায়াও আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিল, 'আপিম খায়, তবু নিয়মিত কাজকম্ম করে?'

কালিদাসী বলিয়াছিল, 'আপিম খায় তো কাজকম্ম করবে না কেনে মা?

প্রায় দশটার সময় কালিদাসীর বাজার-করা মাছ-তরকারি মুখে গুঁজিয়া নরেন আপিস যাইতেছিল, আপিমখোর দাদা ডাকিতেছে শুনিয়া তার ঘরে গেল। তিনটি মাথার বালিশের

উপর একটা পাশবালিশ চাপাইয়া আরামে ঠেস দিয়া হরেন আধশোয়া অবস্থায় পড়িয়া আছে। মুখে কিন্তু তার একটুও আরামের ছাপ নাই, আছে চটচটে ঘামের মতো ভোঁতা একটা অবসাদ আর নির্বিকার উদাসভাবের আবরণ। তোশকটা একটু ছেঁড়া, বিছানার চাদরটা অত্যন্ত ময়লা, দুটি বালিশ আর পাশবালিশটিতে ওয়াড়ের অভাব, ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রে পীড়াদায়ক বিশৃঙ্খলা। কিন্তু উপায় কী? শোকে তাপে মানুষ যখন কাতর হইয়া পড়ে, তখন আর তার কাছে কী প্রত্যাশা করা যায়?

হরেন বলিল, 'আপিস যাচ্ছ?'

নরেন বলিল, 'হ্যাঁ।'

'একটা টাকা দাও দিকি আমাকে।'

নরেন একটু ভাবিল। টাকার বড় টানাটানি, মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে। অনেকদিন হইতে দাদাকে সে টাকা দিয়া আসিতেছে, কখনো একটা, কখনো দশটা। আজ ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। আর কি কোনোদিন হরেনের পক্ষে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বড় চাকরি-বাকরি করা সম্ভব হইবে? আগের মতো অত বড় না হোক, মাঝারি রকমের বড়? দুবছরের মধ্যে যদি এত আপিম বাড়াইয়াও শোকতাপটা সামলাইয়া উঠিতে না পারিয়া থাকে, আর কি কোনোদিন পারিবে? আপিমটা হয়তো দিন দিন পরিমাণে বাড়িয়াই চলিবে। মায়া ঠিক বলিয়াছে, আপিমের নেশা বাড়াইলেই বাড়ে।

'টাকা তো নেই দাদা। মাস কাবার হয়ে এল, আমি সামান্য মাইনে পাই—'

'একেবারে নেই? আনা চারেক হবে না?'

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, একটি পয়সা নেই। আপিমের জন্যে তো? আপিমটা এবার তুমি ছেড়ে দাও দাদা।'

হরেন তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল, 'আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু হঠাৎ তো ছাড়া যায় না, এ্যাদ্দিনের নেশা! কারো কাছে ধারধোর করে অল্প একটু এনো আজ কিনে, কমিয়ে কমিয়ে কদিন বাদেই একেবারে ছেড়ে দেব। সত্যি, এ নেশাটা এবার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। এনো কিন্তু, কেমন?'

'দেখি'—বলিয়া নরেন চলিয়া গেল।

জবাবটা হরেনের তেমন পছন্দ হইল না। অন্তত আজকের দিনটা চলিয়া যায় এ রকম সামান্য পরিমাণে আপিম নরেন কিনিয়া আনিবে এটুক ভরসাও কি করা চলে, এ রকম জবাবের পর? যদি না আনে? অসময়ে সে ফিরিয়া আসিবে, তারপর হয়তো হাজার চেষ্টা করিয়াও এক রতি আপিমও সংগ্রহ করা চলিবে না। কী সর্বনাশ! সন্ধ্যার সময় একটু আপিম না হইলে তার চলিবে কেন? কথাটা ভাবিতে গিয়াই তার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বিমল কলেজ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলে বিমলকে সে ডাকে, গলা যথাসম্ভব মিহি করিয়া বলে, 'কলেজ যাচ্ছ? তোমার কাছে টাকা আছে, একটা দিতে পার আমায়?'

বিমল বলে, 'আছে, তোমায় দেব না।'

'কেন?'

'আপিম খেয়ে খেয়ে তুমি গোল্লায় যাবে আর আমি—'

হরেনের আধবোজা চোখ দুটি যেন এমন শ্রান্ত যে আড়চোখে ভাইপোর মুখের দিকে তাকানোর পরিশ্রমটুকু করিবার ক্ষমতাও চোখের নাই। চোখ দুটি একেবারে বুজিয়া ফেলিয়া বলে, 'আচ্ছা, থাক থাক। দরকার নেই।'

স্নানাহারের পর হরেন আধ-ময়লা একটি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া নিজেই বাহির হইয়া যায়। আপিম ছাড়া তো চলিবে না, যেভাবেই হোক জোগাড় করিতেই হইবে।

এদিকে আপিসে কাজ করিতে করিতে নরেনের মনটা খুঁতখুঁত করে। প্রথমটা হরেনের মঙ্গলের জন্য নিজের দৃঢ়তা প্রদর্শনের কথা ভাবিয়া বেশ গর্ব বোধ হইতেছিল, আপিসে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই প্রায় সে ভাবটা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন মনে হইতেছে, মোটে চারগণ্ডা পয়সা চাহিয়াছিল, না দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? একদিনে আপিম ছাড়া আপিমখোরের পক্ষে সম্ভব নয়, এ কথাও সত্য। মনে কর, হরেন যদি সত্য সত্যই কমাইয়া ধীরে ধীরে আপিম ছাড়িয়া দেয়, আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া ভালো একটা কাজ সংগ্রহ করিয়া ফেলে এবং আজকের ব্যাপারের জন্য তাকে কোনোদিন ক্ষমা না করে? কোনোদিন যদি তাকে আর টাকা-পয়সা কিছু না দেয়? কাজে নরেনের ভুল হইয়া যাইতে থাকে। হরেন যখন বড় চাকরি করিতেছিল তখনকার সেই সুখের দিনগুলির কথা মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে। কী আরামেই তখন সে ছিল! কোনো ভাবনা ছিল না, কোনো অভাব ছিল না, নিজের বেতনের প্রায় সব টাকাই নিজের সুখের জন্য খরচ করিলেও কিছু আসিয়া যাইত না। আজ চারিদিকে টানাটানি, কেবল অভাব আর অভিযোগ, দিনে পাঁচটির বেশি সিগারেট খাওয়ার পর্যন্ত তার উপায় নাই, বিড়ি টানিতে হয়! আপিমের নেশাটা ছাড়িয়া হরেন যদি আবার ....

টিফিনের সময় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, একমাথা ঝাঁকড়া চুল লইয়াই মাঝবয়সী এক লোক আসিয়া বলিল, 'এ মাসে নেবেন তো? আপনার জন্যে বাছা বাছা নম্বর রেখেছি—সব কটা জোড় সংখ্যা, একটা বিজোড় নেই। এই দেখুন, চার, আট, ছয়—'

ছটি লটারির টিকিট বাহির করিয়া সে নরেনের হাতে দেয়। নরেন নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'কিনছি তো প্রত্যেক মাসে, লাগছে কই!'

প্রথমে তিনখানা, তারপর জোড়াসংখ্যার টিকিট কেনা ভালো মনে করিয়া চারখানা টিকিট রাখিয়া নরেন একটি টাকা বাহির করিয়া দিল। টাকাটা পকেটে ভরিয়া লোকটি বলিল, 'এক টাকা দামের একখানা টিকিট আছে, নেবেন? ফার্স্ট প্রাইজ চল্লিশ পার্সেন্ট, গতবার সাতান্ন হাজার হয়েছিল, এবার আরো বেশি হবে। মস্ত ব্যাপার!'

টিকিটখানা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নানাভাবে দেখিয়া নরেন বলিল, 'নেব কী, টাকাই যে নেই। একেবারে মাসকাবারে এলেন, কদিন আগে যদি আসতেন! তেসরা আসবেন, নেবখন।'

লোকটি ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকি দিয়া বলিল, 'তেসরা আসব কী মশায়, আজকে লাস্ট ডেট। সব টিকিট সেল হয়ে গেছে, ওই একখানা রেখেছিলাম আপনার জন্য—কি জানেন, এতে আপনার চান্স বেশি, টিকিট লিমিটেড কিনা। থার্ড প্রাইজও যদি পান, বিশ হাজার টাকা তো বটেই, বেশিও পেতে পারেন।'

আর একটি টাকা মনিব্যাগে ছিল, টাকাটি নরেন বাহির করিয়া দিল।

এদিকে কলেজে বিমলের মনটাও খুঁতখুঁত করে। হরেন যখন তাকে ডাকিয়াছিল, তার খানিক আগেই কাগজে দেশনেতার মস্ত একটা বিবৃতি সে পড়িয়া ফেলিয়াছিল। বিবৃতিটি অবশ্য আপিম সম্পর্কে নয়, তবু সেটি পড়িয়া দেশসুদ্ধ লোকের উপর যে তীব্র আক্রোশ আর যে অনির্দিষ্ট আত্মগ্লানি তাকে পীড়ন করিতেছিল, অর্ধশায়িত জেঠাকে দেখিয়া তার প্রতিক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট উপলক্ষ পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ-জাগা বেপরোয়া উদ্ধতভাবের

আর সীমা ছিল না। কলেজে পৌছিতে পৌছিতেই সে ভাবটা প্রায় উবিয়া গিয়াছে। এখন মনে হইতেছে, ওরকম বাহাদুরি না করিলেই বোধ হয় ভালো হইত। কেবল সবিতাদের বাড়িতে নয়, আরো যে কয়েকটি উঁচুস্তরের পরিবারে সে মেলামেশার সুযোগ পাইয়াছে, একটু খাতিরও পাইতেছে, তা তো কেবল সে হরেন মিত্রের ভাইপো বলিয়াই! তার জেঠামহাশয়ের সুদিন যদি কোনোদিন ফিরিয়া আসে আর জেঠামশায় যদি তাকে উঁচুস্তরে উঠিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তবেই তো কেবল সবিতার সম্বন্ধে আশাভরসা পোষণ করা তার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। অবশ্য সবিতা যদি তার জন্য পাগল হইয়া ওঠে, যদি বুঝিতে পারে যে তাকে ছাড়া বাঁচিয়া থাকিয়া কোনো সুখ নাই, তবে হয়তো জেঠামশায় পিছনে নাই জানিয়াও এবং সে যে একদিন বড় হইবেই হইবে তার কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ সে এখন দেখাইতে না পারিলেও, তাকেই সবিতা বরণ করিবে। তবুও, জেঠামশায়কে চটানো বোধ হয় উচিত হয় নাই।

তিনটার সময় বিমল গেটের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তার ক্লাস এক ঘণ্টা আগেই শেষ হইয়াছে, এবার শেষ হইল সবিতার।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সবিতা আসিল, বিনা ভূমিকাতেই বলিল, 'আজ তো আপনাকে মোড় পর্যন্ত পৌছে দিতে পারব না। আমি অন্যদিকে যাব।'

বিমল বলিল, 'কোন দিকে?'

সবিতা বলিল, 'এই—অন্যদিকে। মানে, আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি যাব।'

বিমল বলিল, 'কতক্ষণ থাকবেন ?'

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তার কি ঠিক আছে কিছু!'

সবিতার গাড়ি চলিয়া গেলে বিমল ভাবিতে লাগিল, এখন কী করা যায়? একবার সে বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা দামি ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল। হরেন তাকে একদিন ঘড়িটি কিনিয়া দিয়াছিল। এত শিগগির বাড়ি ফিরিয়া কোনো লাভ নাই। মাধুরীদের বাড়িতে যদি যায়, কেমন হয়? মাধুরী হয়তো দু-একখানা গান শোনাইতে পারে, তারপর হয়তো তার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেও রাজি হইতে পারে। কিন্তু বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাইয়া যাওয়া দরকার, মাধুরী তো শুধু এক কাপ চা খাইতে দিবে।

সেদিন রাত্রি নটার সময়ও হরেন বাড়ি ফিরিল না। নরেন আর বিমলকে ভাত দিয়া মায়া দুবাটি দুধও দুজনের থালার সামনে আগাইয়া দিল।

বিমল আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'দুধ কেন?'

নরেন বলিল, 'দাদার দুধ আছে তো?'

মায়া বলিল, 'ওঁর দুধ লাগবে না।'

খাইয়া উঠিয়া নরেন ঘরে গেল, আপিসে একজন একপয়সা দামের একটি চুরুট উপহার দিয়াছিল, বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া সবে চুরুটটি ধরাইয়াছে, হরেনের ছোট মেয়ে অমলা আসিয়া খবর দিল, 'বাবা তোমায় ডাকছে কাকু।'

নরেন অন্য কথা ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে দাদা কখন বাড়ি ফিরিয়াছে টেরও পায় নাই। জানালার সিমেন্টের উপর চুরুটটি নামাইয়া রাখিয়া একটু অস্বস্তির সঙ্গেই সে হরেনের কথা শুনিতে গেল। এমন সময় বাড়ি ফিরিয়া তাকে ডাকিয়া হরেনের কী বলিবার থাকিতে পারে?

হরেন তাকে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, 'একেবারেই টাকা নেই বলছিলে, এই টাকা কটা রাখো। আর শোনো, বসাকদের কোম্পানিতে একটা কাজ ঠিক করে এলাম। বুড়ো কদিন থেকে আমায় বলছিল—তুমি তো চেন বুড়োকে, চেন না? শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, কিন্তু কী আর করা যায়, সংসার তো চালানো চাই। মেয়েটারও বিয়ে দিতে হবে দুদিন পরে। এইসব ভেবে—'

হরেনের ভাব দেখিয়া মনে হয়, একটা চাকরি ঠিক করিয়া আসিয়া সে যেন অপরাধ করিয়াছে এবং নিজেকে সমর্থন করার জন্য নরেনের কাছে কৈফিয়ত দিতেছে। হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে ডাকিল, 'অম্‌লি!'

অমলা আসিলে বলিল 'তোর কাকিমাকে বল তো গিয়ে, আমি ভাত খাব না, শুধু দুধ খাব।'

নরেন নিজেই মায়াকে খবরটা জানাইয়া আসিল। হরেনের চাকরির খবরের চেয়ে সে শুধু দুধ খাইবে এই খবরটাই যেন মায়াকে বিচলিত করিয়া দিল বেশি। গৃহিণীর কর্তব্য পালনের জন্যই সে যে আজ একফোঁটা দুধও রাখে নাই, দুধের কড়াইটা পর্যন্ত মাজিবার জন্য কলতলায় বাহির করিয়া দিয়াছে! কী হইবে এখন?

'বিমলকে ডাকো শিগগির—আর, কআনা পয়সা দাও।'

বিমল মোড়ের ময়রার দোকান হইতে দুধ আনিতে গেল, নরেন ঘরে গিয়া আবার বিছানায় আরাম করিয়া বসিল। চুরুটটা নিভিয়া গিয়াছে। রাত্রে সহজে ঘুম না আসিলে দরকার হইতে পারে ভাবিয়া দুটি সিগারেট নরেন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম না আসিলে গভীর রাত্রে ক্রমাগত সিগারেট টানিবার ইচ্ছাটা কেন যে প্রচণ্ড হইয়া ওঠে কে জানে! বিমলকে পাঁচটা সিগারেটও আনিতে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই সঞ্চিত সিগারেটের একটি ধরাইয়া সে টানিতে লাগিল। যার যা টানা অভ্যাস সেটা না হইলে কি তার আরাম হয়!

হরেন আবার চাকরি করিবে, সংসারের অভাব অনটন দূর হইবে, এ চিন্তার চেয়ে অন্য একটা অতি তুচ্ছ কথা নরেনের বেশি মনে হইতে থাকে। কাল বাজার করার পয়সা কোথায় পাইবে সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, হরেন পাঁচটা টাকা দেওয়ায় এই দুশ্চিন্তার হাত হইতে সে রেহাই পাইয়াছে। বাজারের পয়সা পর্যন্ত না রাখিয়া দুটাকা দিয়া লটারির টিকিট কিনিয়াছে, এই চিন্তাটাও মনের মধ্যে বড় বেশি বিঁধিতেছিল। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাইয়া গেলে যে কী মজাটাই হইবে; এ কল্পনায় যেন তেমন সুখ হইতেছিল না। এবার চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্ত মনে কল্পনাকে আমল দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

পড়ার টেবিলের সামনে বসিয়া বিমল ভাবিতে থাকে, এতরাত্রে সে যে কষ্ট করিয়া তার খাওয়ার জন্য দুধ কিনিয়া আনিয়াছে, পাকে-প্রকারে জেঠামহাশয়কে এ খবরটা জানাইয়া দিতে পারিলে বোধ হয় ভালো হইত। সকালের ব্যাপারেও জেঠামশায় যদি চটিয়া থাকে, কথাটা শুনিয়া খুশি হইতে পারে। খুশি হইলে হয়তো—

রাত্রির মতো মায়ার সংসারের হাঙ্গামা চুকিতে এগারটা বাজিয়া গেল। হরেন তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিন সন্ধ্যার পরেই নেশা জমিয়া আসে, এগারটা-বারটা পর্যন্ত ঝিমানোর আরাম ভোগ করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ সে সুখটা ফসকাইয়া গিয়াছে। রাত নটা পর্যন্ত বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া এমন শ্রান্তই সে হইয়া পড়িয়াছিল যে ভালো করিয়া নেশা জমিবার আগেই ঘুম আসিয়া গিয়াছে। নরেন চিৎ হইয়া শুইয়া তৃতীয়বার লটারির টিকিটের

লেখাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়িতেছে। বিমলও পড়ার টেবিল ছাড়িয়া কয়েকখানা বই আর খাতা-পেন্সিল লইয়া বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মুখে তার গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। কিছুক্ষণ হইতে সে মনে মনে একটা গল্প গড়িয়া তুলিতেছিল।—'কলেজ হইতে সবিতার গাড়িতে মোড় পর্যন্ত আসিবার সময় একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়া গিয়াছে, হাসপাতালে সে আর সবিতা একটা ঘরে পাশাপাশি দুটি বেডে পড়িয়া আছে। সবিতার বিশেষ কিছু হয় নাই, সবিতাকে বাঁচাইতে গিয়া তার আঘাত লাগিয়াছে গুরুতর। ডাক্তারের বারণ না মানিয়া সবিতা বেড ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া তার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে।' গল্পটি যখন জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তখন বিমলের মনে পড়িয়া গিয়াছে, আহত হইয়া এক হাসপাতালে গেলেও তাদের তো এক ওয়ার্ডে রাখিবে না!

টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ঢাকা দিয়া রাখিয়া মায়া খানিকক্ষণ ছেলের দিকে চাহিয়া রহিল। একবার ভাবিল, আর বেশি রাত জাগিতে ছেলেকে বারণ করে। তারপর ভাবিল, বড় হইতে হইলে রাত জাগিয়া না পড়িলে চলিবে কেন! এ পর্যন্ত ছেলের পরীক্ষাগুলি ভালো হয় নাই, এবার একটু রাত জাগিয়া যদি মেডেল পায়, বৃত্তি পায়—

শরীরে শ্রান্তি আসিয়াছে কিন্তু চোখে ঘুম আসে নাই। একটি পান মুখে দিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া মায়া দ্রুতবেগে ছেলের মেডেল আর বৃত্তি পাওয়ার দিনগুলি অতিক্রম করিয়া যায়। গিয়া পৌঁছায় সেইসব দিনে, বিমল যখন মস্ত চাকরি করিতেছে, ঘরে একটি টুকটুকে বৌ আসিয়াছে—

বাড়িতে আপিম খায় একজন, কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখে সকলেই। হরেনের পনের বছরের মেয়ে অমলা পর্যন্ত কাকিমার চোখ এড়াইয়া এতরাত্রে খোলা ছাতে একটু বেড়াইতে যায়—ছাতে গিয়া নানা কথা ভাবিতে তার বড় ভালো লাগে।

আজ কাল পরশুর গল্প

মানসুকিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝোল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরোনো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিকে আছে, ছমাসের সুযোগেও কেউ হাত দেয় নি। আর সব গেছে, বেড়া খুঁটি মাচা তক্তা—মাটির হাঁড়ি-কলসিগুলি পর্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা কেশব আর তোলে নি। কার জন্য তুলবে? দাওয়ার দুপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত-হয়ে-পড়া চালার নিচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর একটি ছেলে।

এদের মধ্যে একজন রামপদর বৌ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমতো কপাল-ঢাকা ঘোমটা। সুরমার ঘোমটা সিঁথির সিঁদুরের রেখাটুকুও ঢাকে নি ভালো করে। এতে আর শাড়ি পরার ভঙ্গিতে আর চলন-ফিরন-বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষাভুষো গেরস্তঘরের বৌ; অন্য দুজন শহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে-বৌ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি সুকাজ তা নিয়ে দেশজুড়ে মতভেদ। নইলে, শাড়িখানা বুঝি দামিই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর সুরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামি ময়লা শাড়ি মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানসুকিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মা-ঠাকরুনরা রামপদর বৌকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদর ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি—গগনের পানবিড়ির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ওপাশের ধার ঘেঁসে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁসে; বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

কজন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীব হয়ে ওঠে। বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকাণ্ড, এমনভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুনে ওখানে নজর আটকে যায়।

'রামের বৌটা তবে এল?'

'তাই তো দেখি।' নিকুঞ্জ বলে, তার আধ-পোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কি না ভাবতে ভাবতে। এক পয়সার চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ করে এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও-বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'রাম নেবে ওকে?'

'না-নেবে তো না-নেবে। ওর বয়ে গেল।' জোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেয়া।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না 'তুই থাম ছোঁড়া' বলে। তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিরুদ্ধে! গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, ফিরবার কি দরকার ছিল ছুঁড়ির?

গোকুল ইয়ার্কি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হালকা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মতো সুদাসের চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়িখানা। সকলের মতো সে-ও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এড়িয়ে চলতে আরো সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তবু গাঁ তো অরণ্য হয় নি, পাড়া পেরোতে হয়, ঘন বসতি কোনোটা, কোনোটা ছড়ানো। ভদ্র মানুষেরা তাকায় একটু উদাসীনভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতূহলে। চাষাভুষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ খানিকটা দূর পর্যন্তই পৌঁছায়। বয়স্করা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা-দেওয়া ছ্যাঁকা-লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে, কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কত উৎপড়ীন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছুদিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান্ লা মাগী?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, 'ক্যান্ ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কী পাটা নিয়ে? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ! যা!'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হল্‌কায় হল্‌কায় আগুন বেরিয়ে আসে হিংসার বিদ্বেষের। সুরমা স্মিতমুখে মিষ্টি কথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁজে এক পা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা বুঝি শেষ পর্যন্ত আঁচড়ে কামড়ে দেবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েকজন। একজন, কোমরে তার গামছা পরা আর মাথায় কাপড়খানা

পাগড়ির মতো জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। একজন বলে, 'বাহ্ বাহ্। বেশ।' একজন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পেরোবার জন্য পাতা তালগাছের কাণ্ডটার এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরের মানুষকে হাঁক দেবার মতো জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, 'গিরির মা! বলি ও গিরির মা!'

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে! শুনতে পাও না?'

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মতো ক্ষণিক সম্বিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মতো, তারপর যেন চোখের পলকে এলিয়ে যায়।

'ডাকছে? অ্যাঁ, ডাকছে নাকি গিরি? যাইলো গিরি, যাই!'

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরোনো কাঁঠালগাছের ছায়ায় বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজেছে একটুখানি, ডুমুর ফলের মতো। তামাক পাওয়া বড় কষ্ট। মুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুঁকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে জোগাড় করা তামাক।

'আসেন।' রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়িত ভীরু অসহায়ের মতো। তিন জন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদিকের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার উপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

'তোমার বৌকে দিয়ে গেলাম, ভাই। যা বলার সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর একদিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়ে তো গেলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একবার সে ঢোক গেলে, চোখের পাতা পিটপিট করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্বাঙ্গ-জোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

'যাবে বলেছিলে, গেলে না কেন রামপদ?'

'তাই তো মুশকিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী—এরা কজন। ঘনশ্যাম একরকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষাভুষোদের, অর্থাৎ চাষি গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সে-ই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য কজন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদর। একটু ভাবনা হয়েছে।

একটু!

নৌকোতে পাতবার শতরঞ্চিটা কাঁঠালতলায় বিছিয়ে তিন জন বসে। রামপদকেও

বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁসে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদর মুখের দিকে। বৌয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোনোদিন দেখে নি।

এ সমস্যা তুচ্ছ করার মতো নয়। একজন বড় মাতব্বর আর তার ধামাধরা কজন তুচ্ছ লোক রামপদর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কর্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। দু-চার জন হয়তো ঠাট্টাবিদ্রূপ করত কিছুদিন, দু-চার জন হয়তো বর্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না। চারিদিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কী কাণ্ড? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ির দশ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দুজন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় কমাস নষ্টামি করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার একটা গণ্য করার মতো ঘটনা? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু ঘনশ্যামেরা কজন যখন গায়ে পড়ে উসকে দিতে চাইছে সবাইকে, কী জানি কী ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে, 'যাই হোক, বৌয়ের জন্য ভাত তো রেখেছ রামপদ?'

'আজ্ঞে আপনারা?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে দুটি খেতে দাও তো তুমি। চালাটা তোল নি কেন?'

'তুলব। তুলব।'

সুরমাই বলে কয়ে নিয়ে দুটি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদর সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝাপড়া হওয়া দরকার। গ্রামের একজন কর্মী শঙ্করের বাড়িতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভালো জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আর একটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে?' রামপদ শুধোয়।

'মোর জন্য রেঁধে রেখেছ!' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝোল আর ভাত। আলুনি হইছে কিন্তু।'

এগার মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি-বেশি রয়ে রয়ে অল্প দুটি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড় যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আসে : ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের, রামপদ যখন বিদেশে যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।

'খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, একফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি-মতন করে দিলাম কদিন। চাল ফুরলে কী দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কী! তাতেই শেষ হল।'

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয়? আগে পারত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে? গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তার।

'শেষ দুটো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে—'

মুক্তা এবার কাঁদে।

'কেউ কিছু করলে না?'

'দাসমশায় দুধ দিতে চেয়েছিল, মোকেও দেবে খেতে–পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজি হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচত। মরণ মোর হলই, সে–ও মরল।'

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ত দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভালো বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'খোকন মরল, তোমার কোনো পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ির মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দুটো মদ্দ এল, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশেমিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।

'দাসমশায় তো খুব করেছেন মোদের জন্যে!' রামপদ বলে চাপা ঝাঁজালো সুরে।—'যা তুই, খেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝোল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের হাঁক আসে : রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন–পাঁচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারি সমন জারির পেয়াদার মতো গরম গাম্ভীর্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয় নি।

'বৌ এসেছে রামপদ?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে নিয়েছিস?'

'আজ্ঞে।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক।'

'ভাত খাচ্ছে।'

রামপদর ভাবসাব জবাব–ভঙ্গি কিছুই ভালো লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, 'তোর মতলব কী?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে রাখবি ঘরে?'

'বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কী করে?'

এই নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় মানসুকিয়ার চাষাভুষোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে। নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয়তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট। সবাই যদি সব রকমে বর্জন করে রামপদকে কথা পর্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদর। সমাজের নির্দেশ অমান্য করলে শুধু একঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না, তাও জানা কথা। টিটকারি, গঞ্জনা, মারধর, ঘরে আগুন লাগা সবকিছুই ঘটবে তখন। সবাই এসব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই; হয় বিপক্ষ নয় উদাসীন, যার উপর যা খুশি অত্যাচার করলেও কেউ

ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড় ভালবাসে এমন যারা আছে কজন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড় খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায়ের মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে, এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোঁট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যটা বেরিয়ে আসে। রামপদর কাণ্ডের কথাটা হুঁ-হাঁ দিয়ে সেরে দিয়ে সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুন কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না, রামপদর বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েকজন তো স্পষ্টই বলে বসল, 'ছেড়ে দ্যান্ না, যাক্ গে। অমন কত ঘটছে, কদিন সামলাবেন? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপনজনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য শহরে পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশি জোরালো। এ রকম কিছুই ঘটে নি এমন পরিবারও কটাই বা আছে!

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

'বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।'

'বটে।'

'সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন এক দিন, চুকে যেত, বিচার-সভা ডেকে বসলেন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, যাবেন কোথা? দুগগার কথা যদি তোলে কেউ?'

'তুই চুপ থাক হারামজাদা।' ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে, কিন্তু হাত তার উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকের ঘন লোম। জ্বালাও করে মনটা রামপদর স্পর্ধায়। সে নাকি দাওয়ায় চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে নাকি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিকতে দিলে বৌকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও! আগের চেয়ে কত বেশি খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদর কাছে সে হার মানবে? মনটা জ্বালাও করে ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জরুরি কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা দুটোর মধ্যেই, কিন্তু মনের মতো হয় না, যেমন সে ভেবেছিল, সে রকম। মনটা তার আর একটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতি খাবার, গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্নে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌঁছবে ঠিক সময়ে।

গোকুলকে সবচেয়ে কমদামি বিলাতি বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নিচে। মাদুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে; দুজন তার চেনা, মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও সুযোগ মেলে না, 'এই? শোনো, শোনো।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

'ভাগছ যে? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।'

'ওনারা কারা?

'তা দিয়ে কাজ কী তোমার?' গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের, পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। ঢোক গিলে দাঁতে দাঁত ঘষে।

'মা নাকি ভালো আছে, বেশ আছে, মোর মা?'

'আছে না?'

'আছে? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর? খেপেছে কে, মুই! তা খেপেছি, মাথা মোর ঘুরতে নেগেছে। ওরে নক্ষিছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—'

'ও গিরিবালা!' সুরমা ভিতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মোর বাপকে টাকা দিয়ে বিভুঁয়ে মরতে পাঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি?'

'মিছে বলেছে?' গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, 'ও বাবা! মোর নেগে তুমি খুন হলে গা বাবা! এ নচ্ছার মেয়ার ধরে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকে, 'ও গিরিবালা! তোমার বাবা মরেছে কে বললে? খবর তো পাওয়া যায় নি কিছু। বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

'নিখোঁজ তো হয়েছে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁটো বাসনগুলির অখাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ। সুরমারা চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরি থেকো।'

'সকালে আসবে কেন?'

'মোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এসো, বসবে।'

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায়। ঘরে ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কী করা যায়, কী করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাদুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেশে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কী করবি গিরি? আমি বরং—'

'বরং টরং রাখো তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি, যত টাকা নাগে। নয়তো কী কেলেঙ্কারি করি দেখো। ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরো অপরূপ, মারাত্মক। সাধে কি ওকে পাবার জন্য অত করছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে না। কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে সে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছুদিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত! আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে

পড়তে হত না ভদ্রঘরের ওই ধিঙ্গি মাগীগুলোর কল্যাণে।

'এত পয়সা করেছ, বিড়ি টান?' গিরিবালা বলে, মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, 'রামপদর পেছনে নাকি নেগেছ তুমি? একঘরে করবে? সাধুপুরুষ আমার! মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর বউকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?'

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে ঘনিয়ে আসে রুগ্ণের যাতনাভরা লোলুপতা, নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

'বিলাতি?'

গোকুল সায় দেয়।

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, 'যাক, এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু।'

মদের গ্লাসে দু–চার বার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোনো উপায় নেই। ভয় দেখানো, জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো কিছুই খাটবে না। সে গিরি আর নেই, সেই ভীরু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'কী করি বলো? কাল একবার যেতে হবেই। মার জন্য আঁকুপাঁকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি! মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব কদিন পরে। মাঝে মাঝে গাঁয়ে যেতে দিও মোকে, অ্যাঁ? ভেবো না, ফিরে আসব।'

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ি ভেজে গিরির। খিলখিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচার–সভায় লোক খুব বেশি হল না, মানসুকিয়ার ঘেঁসাঘেঁসি পাঁচ–ছটা গাঁ ধরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারে নি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসে নি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম–ধরা, নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্‌গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভালো লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই–আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার–সভা বসেছিল এই চাষাভুষো শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কী চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গম্‌গম্ করছিল! কী ঔৎসুক্য ফুটেছিল মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারি জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কী করা উচিত বুঝিয়ে দিতে।

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝবয়সী বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিতভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে— উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিতভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে

পারে নি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছে রামপদ, এদের সঙ্গে আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্তা, গিরির গায়ে লেগে। সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁসে বসে নি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েছে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হয় নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বার বার গিরির ওপরে গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব-পরামর্শমতো বুড়ো টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা শুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে আর একটা হাতাছেঁড়া ময়লা খাকি শার্ট গায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী উঠে চেঁচিয়ে বলে, 'কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদর বৌ কোনো দোষ করে নি।'

সবাই জানে, বনমালীর বৌকে সদরের দত্তবাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌটাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায় নি। এখনো সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, 'আহা, দোষ করেছে কি করে নি, তাই তো মোরা বিচার করব।'

বনমালী রুখে বলে, 'বটে? কোনো দোষ করে নি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করে নি? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোনো মেয়েছেলে গাঁ ছেড়ে কদিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ!'

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে, 'ঠিক কথা, গাঁয়ে খেতে পায় নি, সোয়ামি কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের?'

কে একজন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে, 'সে-বেলা তো কেউ আসে নি, দুটি খেতে-পরতে দিতে?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বৌ আর বড় ছেলের বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবার নয়, যায়ও নি তাই। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়, সে থরথর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়, 'প্রাণে বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কি? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তো ভগবান আছেন।'

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পড়ায় শঙ্করের মতো অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মতো মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা ঠিক পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—'

গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে, 'খেটে খায় নি তো কী? মোরা একসাথে খেটে খেয়েছি। এক পাড়ায় দুবাড়ি ঝিগিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন মুখপোড়া বলে খেটে খাই নি মোরা, শুনি তো একবার?'

প্রায় সকলেই জানে এ কথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে

সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছুকাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য করে দেয়—খুব বেশি নয়। যে দিনকাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথাটেকো নন্দই শুধু বলে, 'কিন্তু বহু লোকে যে চোখে দেখেছে। ফণী বলছে সে নিজের চোখে—'

মাঝবয়সী বেঁটে ফণী চট করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, 'না না, আমি বলি নি, আমি কেন ও কথা বলতে যাব?'

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টু শব্দ নেই কারো মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভায় কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দুহাত খানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'যাক্, যাক্। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কী, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদর ইস্তিরি নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।

বনমালী ফুঁসে ওঠে, 'কিসের প্রাচিত্তির? দোষ করে নি তো প্রাচিত্তির কিসের?'

গিরি গলা চেরে, 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে নাকি তবে?'

তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। বনমালীর বৌ চোখভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধরে চুমো খেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিতভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিতভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, 'যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই?'

বনমালী আশ্চর্য হয়ে যায়।—'ফিরে নেব না তো খুঁজে মরছি কেন?'

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘর-সংসার আর যোগ্য না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘর-সংসারের। কিন্তু কী হবে ও-কথা বলে বনমালীকে? মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌ হিসাবে ওর বৌয়ের মরণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে যা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি না মানুষের জগতে, সেটা আগে জানা দরকার।

'চেষ্টা করে দেখি কী হয়।' বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজের বন্ধুর হাত যেমনভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানসুকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলার ভূতের ভয়—বছরখানেক বছর দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজকাল বেলতলার ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মানসুকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, 'তুমি যদি না বলতে, ব্যাপারটা চাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোখ-কান নেই? দ্যাখো নি, আমি কী বলি না বলি তাতে কী আসত যেত? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।'

গিরির বাড়ি বেলতলার কাছেই। বেলতলায় সে ভয় পায় নি, বাড়ি যেতে পথের পাশে নালার উপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

'কে গা?'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অঃ! এত রাতে এখানে বসে আছ?'

'এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো এলে, গাঁয়ে গিরির মন টিকবে কি টিকবে না।'

'কী দেখলে?'

'টিকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মতো একটা ছেলেপিলে যদি হত তোর, কবছর ঘর-সংসার যদি করতিস, তবে হয়তো—না, গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিকবে না।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির দুটো ভারি কথা না শুনেই, ভালোমতো টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কিসে যেন টান পড়ে টনটন করে উঠেছে বুকের শিরা-টিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আর একবার মুখ হাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, 'মা? ওমা?'

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, 'কে গো বাছা তুমি? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে?'

যাকে ঘুষ দিতে হয়

মোটর চলে আস্তে। ড্রাইভার ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হয়, স্পিড দেবার জন্য অভ্যাস নিশপিশ করে ওঠে প্রত্যঙ্গে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুর আস্তে চালাবার হুকুম। কাজে যাবার সময় গাড়ি জোরে চললে তার কোনো আপত্তি হয় না কিন্তু সস্ত্রীক হাওয়া খেতে বার হলে তারা দুজনেই কলকাতার পথে মোটর চড়ে—নিজেদের দামি মোটর চড়ে বেড়াবার অকথ্য আনন্দ রয়ে-সয়ে চেটেপুটে উপভোগ করতে ভালবাসে।

এত বড়, এত দামি এমন চকচকে মোটর গড়িয়ে চলেছে শহরের পিচ-ঢালা পথে, শুধু এই সত্যটাই যেন একটানা শিহরন হয়ে থাকে সুশীলার। তারপর আছে পুরোনো, সস্তা, বাজে মোটরগাড়ির চলা দেখে মুখ বাঁকানোর সুখ। আর আছে বোঝাই ট্রাম-বাসের দিকে তাকিয়ে তিন বছর আগেকার কল্পনাতীত স্বপ্নজগতে বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিচরণের অনুভূতি। ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভুত মায়া! যাতে গর্ব বেশি। তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হত। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দশা আজ বড় বেশি মনে হওয়ায় ট্রাম-বাসের বাদুর-ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার। মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, 'কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব?'

সুশীলা বিবেচনা করে জবাব দেয়। সে মধ্যবিত্ত ভালো ঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাস-করা গরিবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরি কিনা একশ টাকার! কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। চালাকও হয়েছে সে আজকাল একটু। ভেবেচিন্তে তাই সে বলে, 'আমি জানতাম।'

মাখনের মনে পড়ে সুশীলার আগের ব্যবহার। একটু খাপছাড়া সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'জানতে?'

'জানতাম বৈকি। বড় হবার, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা তোমার ছিল আমি জানতাম। তাই না অত খোঁচাতাম তোমাকে। টের পেয়েছিলাম, নিজেকে তুমি জান না। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায় মরিয়া করে জিদ জাগালাম—'

'সত্যি! তোমার জন্যে ছাড়া এত টাকা—ড্রাইভার, আস্তে চালাও।'

সুশীলা তখন বলে, 'কিন্তু যাই বল, দাস সাহেব না থাকলে তোমার কিছুই হত না।'

মাখন হাসে, বলে, 'তা ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলেও আর দাস সাহেব ফাঁপত না। কী ঘুষটাই দিয়েছি শালাকে!'

'কত কনট্রাক্ট দিয়েছে তোমাকে!'

'এমনি দিয়েছে? এত ঘুষ কে দিত?'

গাড়ি চলছে। আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলছে। আর একখানা গাড়ি, দামি কিন্তু পুরোনো, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিক এগিয়ে স্পিড কমিয়ে প্রায় থেমে গেল। মাখনের গাড়ি কাছে গেলে পাশাপাশি চলতে লাগল দাস সাহেবের গাড়িটা।

'কোথায় চলেছেন?'

'একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

দাস সাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলাফেরা করছে টের পায় সুশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাস সাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীর ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামি মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাশুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার শামিল।

'আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে।'

দাস সাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে—বাড়ির স্ত্রী বাড়িতেই থাকে।

সুশীলা ভাবে, তাতে আশ্চর্য কী! যে-রকম উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্পদিনে! ওঁর কাছে আমাকে নেহাত কচিই দেখায়। দুটি গাড়িই ততক্ষণে থেমেছে। পিছনে অন্য গাড়ির হর্ন শুরু করেছে অভদ্র আওয়াজ।

দাস সাহেব নেমে এ গাড়িতে এসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয় এ গাড়ির পিছনে আসতে। দাস সাহেব ভেতরে ঢোকা মাত্র মাখন আর সুশীলা টের পায় এই বিকেলবেলাই সে মদ খেয়েছে।

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেন নি?'

'এই যে দিচ্ছি। শুনছ, ইনি আমাদের মি. দাস।'

পরনের বেনারসীর রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হাসে, নববধূর মতো। বৌয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাস সাহেব আলাপি লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ শুরু হয়েছিল মাখনের মনে, অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে, বিনা আহ্বানে কেউ এভাবে গাড়ি চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না—অন্তত তাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বার বার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতে পারত না।

দাস বলে, 'চা খেয়েছেন?'

সুশীলা বলে, 'না।'

'আসুন না আমার ওখানে, চা-টা খাওয়া যাবে।'

মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, 'সেই কনট্রাক্টের কথাটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।'

মাখনের দুচোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। সুশীলার নিশ্বাস আটকে যায়। আজ কদিন ধরে মাখন এই কনট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা করছিল—প্রকাণ্ড কনট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে। দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সঙ্গে দাসের দহরম-মহরম

দেখে ব্যাপার অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা একরকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও-বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কইতে চায়। এই দরকারে তাকে দাস খুঁজছিল।

সম্ভ্রান্ত শহরতলিতে দাসের মস্ত বাড়ি। সামনে সম্ভ্রান্ত বাগান। অনেকগুলি চাকর-খানসামা নিয়ে এত বড় বাড়িতে দাস একা থাকে। বিয়ে করে নি, বৌ নেই। আত্মীয়স্বজনের সে সাহায্য করে কিন্তু কাছে রাখে না। শখ হলে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে দু-চার দিনের জন্য, ছুটি ভোগ করার মতো।

যেই আসুক 'সাহেব বাড়ি নেই' বলে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার হুকুম জারি করে দাস তাদের ভেতরে নিয়ে বসায়। ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সুশীলা, নিজেদের বাড়িতে এখানকার কোন বিশেষত্ব আমদানি করবে মনে মনে স্থির করে। তারপর আসে চা। এ কথা হতে হতে আসে কন্ট্রাক্টের কথা। সুশীলার সামনেই আলোচনা চলতে থাকে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে সব কথা শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। মাখনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবার পর সুশীলার দিকে দাসের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, কথাতেই তাকে মশগুল মনে হয়। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলে স্নিগ্ধ।

তারপর দাস বলে, 'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বসুন, ফোন করে আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুশীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'খালি কাজের কথা বলছি, রাগ করবেন না।'

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না।'

দাস চলে গেলে চাপা গলায় সুশীলা বলে, 'সোয়া লক্ষের মতো হবে!'

'বেশিও হতে পারে।'

'ফেরবার পথে কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাড়ি যাব।' গলা বুজে আসে সুশীলার।

খানিক পরে ফিরে আসে দাস।

'মাখনবাবু!'

'আজ্ঞে?'

'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে। কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। দুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন।' দাস নিশ্চিন্তভাবে বসে।—'আমরা ততক্ষণ গল্প করি। আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না।' দাস একটা সিগারেট ধরায়। সুশীলাকে বলে, 'উনি ঘুরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আর এক কাপ চা খাবেন?'

সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গমগম করতে থাকে। মাখন সুশীলা দুজনেরই মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে—অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ।

তারপর মাখন বলে, 'তুমি চা-টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

সুশীলা ঢোক গিলে বলে, 'দেরি কোরো না।'

'না, যাব আর আসব।'

গাড়ি রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে, 'জোরসে চালাও। জোরসে।'

নমুনা

কেবল কেশবের নয়, এ রকম অবস্থা আরো অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু–তিন গুণ। সেইসঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগেও কেশব ভালো ছেলে খুঁজেছে নগদ গহনা জামাকাপড় আর তৈজসপত্রসমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম, যথারীতি দান করতে সে সর্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্বস্ব খুব বেশি না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটে নি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলেমেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—একপেটা, আধপেটা, সিকিপেটা অন্ন—জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভালো করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায় নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে; তেতাল্লিশ টাকার মাস্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরনের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশ ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা–ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে জোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আর একটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরি হয়ে গেল!

সদয় ডাক্তার বলল, 'পাগল, ও খুব ভালো কুইনিন। নতুন ধরনের কুইনিন—খুবই এফেক্টিভ। নইলে দাম বেশি নিই কখনো আপনার কাছে?'

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও শৈলর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সেজন্য কেশবের মনে কোনো আফসোস নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও

ফ্যাকাশে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কীভাবে যেন মারা যায়। দাদার দুনম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক, কালাচাঁদ তাকে জোর-জবরদস্তি করে একটা বাড়ির বাড়িউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ি নয়, অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়িতে তখন দশ-বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়িটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দুবাড়িতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতের-আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ির কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধবধবে আধা-হাতা শেমিজের উপর ধবধবে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে শহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তা ছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভালো খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরি করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলানো রূপসৃষ্টির স্থূল রঙিন ফুলেল কায়দা।

প্রায়-কীর্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফসোস করে কালাচাঁদ, বলে, 'আহা চুক্ চুক্! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়!'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দুটি একটু ছলছল পর্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কী যেন হয়েছে দেশসুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

শহরের আস্তানা থেকে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা-যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখে নি, নিজে ঘা খায় নি। সে কেন কেশবের নির্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল-ডাল মাছ-তরকারি এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দুবেলা তিনবেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়িও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর শেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে একসময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কানাঘুষা কেশবের কানেও এসেছিল। সে চাপা আর্তকণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়িতে রাখবে? শৈলিকে বাড়িতে রাখবে তোমার?'

'বাড়িতে নয় তো কোথা রাখব চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজি হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুশি হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশি রাতেই আসব, গাড়িতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কী আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ি গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটায় বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রি হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দুজন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারে নি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ কটাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্ত মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত? বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ি সচল হয়। তালাধরা কানে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি–ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুলচন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলোমেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা, মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলর বাপ!

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দুটি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ, সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুনগুনানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায় : তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলর রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই। কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। পাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বার হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেটমোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়িসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ সানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল সানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্তমানে সদয়কে সানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনোমতে বাড়ি এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এ রকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়িতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগিল। বাড়িতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ি রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়িতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে সানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, 'ও বাবা কালাচাঁদ!'

'আজ্ঞে?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না? বলুন তবে কী করব! মালপত্র গাড়িতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভালো। এই কাপড়-জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয়, না বারণ করে স্পষ্ট বোঝা যায় না। শৈলর মা আর একটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আন্‌গে যা বদ্যি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়িতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করে কালাচাঁদ টর্চটা জ্বেলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম্ করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙিন শাড়ি, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি করো বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি?'

শৈলর হাতে জামাকাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করে বলে যে, বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি কোরো, সে তোমার ধম্ম। আমার ধম্ম রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক, তবু বেশি লোক সঙ্গে না করে মাঝরাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'যা করবার করুন চটপট।'

কালাচাঁদের কাছ থেকেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জোছনায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙিন সায়া ব্লাউজ শাড়ি পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বার বার মনে হতে লাগল প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, 'শিগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে এসব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভালো লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্‌ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজি না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানির কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোনো পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়, কালাচাঁদের ভালো লাগছিল না। শৈলও থ বনে গিয়েছিল।

শিউলি-জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ির সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আরো কয়েকবার হাতটানা ও 'যাব না' বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ির আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য হালকা রোগা শরীরে জোর এল অদ্ভুত রকমের। পরস্পর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাতপা ছুড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল। মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল, 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামায়? আর কি মেয়ে নেই পিথিমিতে?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল! মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকি কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল!'

'দুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেককাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিস। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথাব্যথা, আদর-যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও শেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী তার চোখে দেখা দিল কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হালকা দামি ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁসতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ি নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে-করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কী, বাড়ি নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসি-চাকরানীর মতো।'

দুজনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে খিল বন্ধ করে দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ি। স্ত্রীর সঙ্গে বাকি দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ি নিয়ে শৈলকে আনতে গেল। বাড়িতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে-করা-স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুনতে আরম্ভ করল। গোনা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশি টাকা কী? গেঁয়ো কুমারী খুঁজেছিল।'

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশি দিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক; মাঠ ক্ষেত, ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক; হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ; জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু; বটপুকুরের পুব-উত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুনছানার; দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এ সবই জোগাত ভরসা, রাতদুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এ-ই সঙ্গত লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকম বাংলার, রাতে সব গ্রাম। গা ছমছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কী দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে শহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এইরকম কোনো ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ি। বাড়ির সামনে ভাঙা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকাল কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসি, খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে, অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ের ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে? কে গো ওখানে?'

কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু-সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ-ভাই স্বামী-শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায়। কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে—মাসি, খুড়ি, পিসি, মেয়ে, বোন, শাশুড়ি, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক-একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয়, কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুনসির সঙ্গে দুআঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতি ধুতিখানা মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে-কোনো সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বৌ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজ ছেলে পটলের বৌ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কতকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকব মা?'

পাঁচী হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

'আর সয় না।'

বলে শালকাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয় না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধুলায় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা!

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে নিজেকে আর বৌটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা এবং ওপাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দুবিঘে বিচ্ছিন্ন ধানজমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াইখানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসতবাটি। আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার ঝাঁপের দরজা, বাঁশের দেয়াল, বাঁশের দুয়ার, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপথপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি করছিস ছোটবৌ, বাড়াবাড়ি করছিস বড়। মোর কাছে তোর লজ্জাটা কী?'

তার বৌ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বোয়ের সাথে মশকরা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল থেকে সন্ধ্যাতক ঝাঁপের দুপাশে এমনি গালাগালি চলে দুজনের মধ্যে। বাড়ির তিনদিকে মাঠ ভরে শণ উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাশরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। এই শণের বনের মাঝখানের পায়ে হাঁটা পথ ধরে বেনারসী শাড়ি-পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ-কুনের ছাউনির দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে দেখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রিতক, সারাদিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপিচুপি ঘাটে আসত দুটো-চারটে বাসন আর কলসি নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থানকাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগী?

শণক্ষেতের রঙ্গমঞ্চে রঘু একটু মশকরা করে বেনারসী-পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে-সাজা-ছেলে সখীর মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুসকাঁদা ষোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিকে ওদিকে চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালানো চলে। ইস্! কী সাদা ওর পরনের ধুতিটা।

'অ বিন্দু! দাঁড়া।' রঘু ডাকে।

বিন্দি দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয়, আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল—কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসী-পরা মালতী বলে, 'ইহিরে, খুকি মোর, ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল কাপড়। যাবি তো চ, নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘরে যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'ঝাঁপ ভাঙব ছোটবৌ।'

মানদা বলে, 'ভাঙো—মাথা ভাঙব তোমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামির কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কী?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বার। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগার দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, 'মা, ওমা! খিদে পায় যে!'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, 'শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে-গে যা নিয়ে।'

'পাড়তে পারি না যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাব? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কী আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটা। ও মা কালী, তুই-ই বল মা, যাব? বল মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল!'

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি-হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুষ্ক, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। এক হাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছিঁড়ে ফেলে ভূতি, এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে শুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝের ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া কদিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষির ঘরের বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না-খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলে নি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ-কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ? খেতে দিতে না পারার দোষও গ্রাহ্য করে নি। পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে

না সে কেমন মরদ, তার আবার শাদি করা কেন?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজ সাবু খপর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে গিয়ে সবুর করব এবার।' শেমিজ না পরলে দু-ফেরতা শাড়ি পরা রাবেয়ার অভ্যাস। একফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয় নি কোনোদিন। পায়খানার চটের পরদাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী! আল্লা, এ কোন মরদের হাতে সে পড়েছিল!

রাত্রের ছায়ামূর্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো, চুনের বস্তা। বস্তার নিচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশশ চাষি ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াইশ ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের কাপড় জোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উসকানি জুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ। সতের মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেকশ গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের পাল্টা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে, হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মনোহর শা-র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে উপায় কী।

দুজন আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট-করা কাপড়ের ভাগ তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই। বিকালে ছোটখাটো একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পূর্ব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

'কী হল ঘোষমহাশয়, কাপড়ের কী হল?'

'গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল? কিসের গোলমাল?'

'কলকাতা থেকে মাল আসে নি। ভাইসব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্কুর সাঙ্গোপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে–সময়টা কলেরায় মরোমরো হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারে নি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি, পুলিশ দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুনে গুনে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসে নি।'

'কবে আসবে?'

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে?'

হতাশ ম্রিয়মাণ জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরি রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের মতো হাত নেড়ে ইশারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইশারা দেখে, ড্রাইভারকে কী যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জন করে লরিটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধুলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, এক–পা দু–পা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনো ছাড়ে নি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোশাক পরা সুদেব, কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে! লাল–পাগড়ি–আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে—চা এবং একটা কিসের যেন চ্যাপ্টা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে যেন ভেতরে কাঁচা কয়লার আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড়?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ি। বাড়ির সামনে যেতেই হাতজোড় করে বলল, 'কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সারা বাড়ি তল্লাশ করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে। রসুই ঘরে ফেরারী ছোঁড়াকে সরিয়ে সারা বাড়ি সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙে একদম ভেতরে। আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল মশায়। সব কটাই প্রায় বুড়ি, কিন্তু একটা যা ছিল মি. ঘোষ, কী বলব আপনাকে! পাতলা একটা উড়নি পরেছে, একদম জালের মতো, গায়ের রং দেখে তো আমি মিষ্টার—'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশি। এভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাতলে দিত।

'জান নয় দিলাম রে আব্বাস', আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটা দিব তা বল?'

ভোলা বলে, 'লুট করে তো আনতে পারি দু–এক জোড়া, কিন্তু তারপর?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। কদিন পরে জোছনার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে।

চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ির বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারের বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ি পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা কজন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরির কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরো কত লোকেও তো কাজ করে সতের মাইল দূরে কাপড় তৈরির কলে, তবে কেন এ অবস্থা তাদের? সবাই ভাববার চেষ্টা করে।

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁটরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধরনা দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ি গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ি না পাক, কথা সে আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ি ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভালো করে বুঝতে চান আগে।

কদিন পরে তিনি একখানা শাড়ি অন্তত আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক, তাও মন্দের ভালো। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্তত বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু–চার দিনের মধ্যে শাড়ি পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারেও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ি। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পরদা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফোঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার, অনেকদিন পর সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবে নি? চলো।'

'চলো।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়ে নি।'

ঘর থেকে ভরা কলসি এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুর্তিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট–পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁটে পুকুরের জলের নিচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

কংক্রিট

সিমেন্ট ঘাঁটতে এমন ভালো লাগে রঘুর। দশটা আঙুল সে ঢুকিয়ে দেয় সিমেন্টের স্তূপে, দু-হাতে ভরতি করে তোলে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরঝুর করে ঝরে যায়। হাত দিয়ে সে থাপড়ায় সিমেন্ট, নয়, শুধু এলোমেলোভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে। জোয়ান বয়সে ছেলেবেলার ধুলোখেলার সুখ। কখনো খাবলা দিয়ে মুঠো করে ধরে, যতটা ধরতে চায় পারে না, অল্পই থাকে মুঠোর মধ্যে। হাসি ফোটে রঘুর ঠোঁটে। এখনো গঙ্গামাটির ভাগটা মেশাল পড়ে নি—ও চোরামিটা কোম্পানি একটু গোপনে করে। কী চিকন মোলায়েম জিনিসটা, কেমন মিঠে মেঘলা বরণ। মুক্তার বুক দুটির মতো। বলতে হবে মুক্তাকে তামাশা করে, আবার যখন দেখা হবে।

'এই শালা খচ্চর!'

গিরীনের গাল, ছিদামের নয়। ছিদাম বিড়ি টানছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ব্যাটার তিনটে আব-বসানো কিম্ভূত মুখ দেখলে গা জ্বলে যায় রঘুর, গাল শুনলে আরো বেশি। রুমাল-পোঁছা আসছে বুঝি তার চাকে পাক দিতে, ব্যাটা হলো বোলতা, গিরীন তাই সামলে দিয়েছে তাকে। চট করে কাজে মন লাগায় রঘু। গিরীনকে ভালো লাগে রঘুর, লোকটা হলো বেড়ালের মতো রগচটা আর বেঁটেখাটো ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে হলেও যত বদমেজাজি হোক, যে-কোনো হাসির কথায় হ্যা-হ্যা করে হাসে যেন শেয়াল ডাকছে ফুর্তির চোটে। আবার কারো দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনলে বাঘের মতো গুম হয়ে যায়, মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় যেন রোলার মেশিনে পাথর গুঁড়োচ্ছে মড়মড়িয়ে।

'রুমাল-পোঁছা এল না দিকি?'

'না।'

'এল না এল, তোর কী রে বাঞ্চোৎ?' ছিদাম বলে দাঁত খিঁচিয়ে, 'ওনার আর কাজ নেই, তোর কাজ দেখতে আসবেন? আমি আছি কী করতে?'

কথা না কয়ে খেটে যায় রঘু। পোঁছাবাবু আসে এদিক-ওদিক তেরচা চোখে চাইতে চাইতে, দুবার রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছে ফেলে দশ পা আসতে আসতেই। তার গালভরা নাম বিরামনারায়ণ—এই মুদ্রাদোষে চিরতরে তলিয়ে গিয়ে হয়েছে রুমাল-পোঁছা, সংক্ষেপে পোঁছাবাবু। গিরীন, গফু, ভগলু, নিতাই, শিউলালেরা একটু শক্ত বনে-গিয়েই কাজ করে যায়, ছিদাম যেন খানিকটা নেতিয়ে বেঁকিয়ে যায় পোষা কুকুরের ঢঙে, উৎসুক চোখে তাকায় বারবার মুখ তুলে, লেজ থাকলে বুঝি নেড়ে দিত।

'তোর ওটা এখন হবে না গিরীন, সাফ কথা। হাঙ্গামা মিটলে দেখা যাবে।'

'দুমাস হয়ে গেল বাবু। হাঙ্গামার সাথে মোর ওটার—'

'বাস, বাস। এখন হবে না। সাফ কথা।'

রুমালে মুখ পুঁছে এগিয়ে যায় পোঁছাবাবু। রগচটা গিরীন রাগের চোটে বিড়বিড় করে বুঝি গাল দিতে থাকে তাকে। ছিদাম একটু অবাক হয়ে ভাবে যে দুপুরের ভোঁ পড়ার মোটে দেরি নেই, টহল দিতে বার হল কেন পোঁছাবাবু অসময়ে। ভোঁয়ের টাইম হয়ে এলে কাজে ঢিল পড়ে কেমন, ফাঁকি চলে কী রকম দেখতে? দেখবে কচু, পোঁছাবাবু টহলে বেরোলে টের পায় সবাই। এর বদলে তাকে ডেকে শুধোলেই সে বলে দিতে পারত সব।

খিদেয় ভেতরটা চোঁ-চোঁ করছে রঘুর, তেষ্টায় কি না তাও যেন ঠিক আন্দাজ করা যায় না, ঘেমে ঘেমে দেহটা লাগছে যেন কলে-মাড়া আখের ছিবড়ে। ভোঁর জন্য সে কান পেতে থাকে। আগে মুখ হাত ধোবে না সোজা গেটে চলে যাবে, বন্ধ গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে চানা কিনবে না মুড়ি কিনবে, আগে পেট পুরে জল খাবে না দুমুঠো খেয়ে নেবে আগে, এইসব ভাবে রঘু। মুক্তাকে এনে রাখতে পারলে হত দেশ থেকে, রোজ পুঁটলি করে খাবার সাথে দিত বেন্দার বৌটার মতো। বৌ একটা বটে বেন্দার! রঙে ঢঙে ছেনালিতে গনগনে কী বাস রে মাগীটা, মুক্তার মতো কচি মিষ্টি নয় যদিও মোটে। তবে পুঁটলি করে বেন্দাকে খাবার দেয় সাথে রোজ, রুটি চচ্চড়ি ভাজা, নয়তো ঝাল-ঝাল শুখা ডাল, নয়তো চিচিঙার পেঁয়াজ ছেঁচকি।

হঠাৎ বড় শ্রান্ত, অবসন্ন লাগে নিজেকে রঘুর। সে জানে এ রকম লাগলে কী ঘটবে এখুনি। কাশি আসছে। আঁতকানির মতো একটা টান লাগে ভেতরে, তারপর শুরু হয় কাশি; কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে রঘু। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ে, দুহাতে শক্ত করে নিজের হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতেই মুখ গুঁজে দেয়। এমনি করে আস্তে আস্তে শ্বাস টানবার চেষ্টা করলে কাশিটা নরম পড়ে, এক দলা সিমেন্ট-রঙা কফ উঠে আসবার পর কাশিটা থামে।

গিরীন গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে বাঘের মতো, গলায় দুবার খাঁকারি দেয় আড়ালের রোলার মেশিনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

'আমি সাত বচ্ছর খাটছি, তুই শালা দু-চার বছরে খতম হয়ে যাবি!'

ট্যাক ফ্যা-ফ্যা করছে রঘুর, পয়সা নেইকো। বেন্দার ট্যাকে দু-এক টাকা আছেই সব সময়, মাল টেনে এত পয়সা ওড়ায়, তবু। রঘু তাই দু-এক আনা ধার করতে যায় বেন্দার কাছে আর তাই সে দেখতে পায় রোলার মেশিনে কেষ্ট বাতাপির পিষে থেঁতলে যাবার রকমটা।

মাটিতে শিকড়-আঁটা গুমোটের গাছের মতো রঘু নড়েচড়ে না, মুখ হাঁ হয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সরে পড়তে গিয়ে তাকে দ্যাখে বেন্দা, দাঁতে দাঁতে ঠেকে গিয়ে খিচে উঠে ছিরকুটে যায় বেন্দার মুখ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাপের হিশহিশানির আওয়াজে সে বলে, 'যা যা, ভাগ। পালা শিগগির।'

দিশেহারা রঘু পালাতে গেলে কিন্তু ফের তাকে ডেকে বেন্দা বলে, 'শোন। এখানে এই-ছিলি খপরদার বলিস নি কাউকে, মারা পড়বি—খপরদার।'

পাতা হয়ে ঝড়ে উড়ে যেন রঘু ফিরে আসে নিজের জায়গায়, রঘুর প্রাণটা আরকি, নয়তো ফেরে সে পায়ে পায়ে হেঁটেই। মেঘলা গুমোটের কাল ঘাম ছুটেছে, সেটা দেখা যায়। ভাবসাব দেখে মনে হয়, কাশির ধমকটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে তাকে, কাবু করে দিয়েছে। কিন্তু রঘু ভাবে তার ভেতরের উলটেপালটে পাক-খাওয়াটা বুঝি চোখে পড়েছে সকলের, এই বুঝি কে শুধিয়ে বসে, ব্যাপারখানা কী রে!

'জল খেলি?' গিরীন শুধোয় বাপের মতো সুরে।

'হ্যাঁ, খেলাম।'

প্রথম ভোঁ বাজে দুপুরের। হাঁপ ফেলবার, ঢিল দেবার, জল-চানা খাবার এতটুকু অবকাশ। দমে আর হাতপায়ে একটু ঢিল পড়ে, মনটা শিথিল হবার সুযোগ পায় না কারো। হবু ধর্মঘট নিয়ে ব্যগ্র উত্তেজিত হয়ে আছে মজুরেরা, ও ছাড়া চিন্তা নেই, আলোচনা নেই। তার মধ্যে খবর ছড়ায় দুর্ঘটনার, কী তাড়াতাড়ি যে ছড়ায়। কেষ্ট বাতাপি রোলার মেশিনে পিষে থেঁতলে মারা গেছে খানিক আগে— এ খবর যে শোনে সে গুম হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্য, তারপর অকথ্য বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, এটা কী রকম হল? হু-হু করে উত্তেজনা বেড়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে থাকে উত্তেজনার, সবার কথার মোট আওয়াজটা নতুন রকমের ধ্বনি হয়ে উঠে। প্রথম দিকে খবর পেয়ে কয়েকজন যারা ছুটে গিয়েছিল দেখতে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে কেষ্ট বাতাপির ছেঁচা দেহটা, জিজ্ঞেস করে ভাসা-ভাসা শুনতে পেয়েছে কিসে কী ঘটল। তারপর খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে, ওখানে গণ্ডগোল করা বারণ হয়ে গেছে।

ছিদাম বলে, 'আহা রে! বিষ্যুৎবারের বারবেলায় পেরানটা গেল কপাল দোষে।'

রগচটা গিরীন যেন চটেই ছিল আগে থেকে, শুনেই গর্জে ওঠে, 'বারবেলার কপালদোষ! পোঁছা বুঝি বলেছে তোকে বলে বেড়াতে? পোঁছার পা-চাটা শালা ঘাসি-বুড়ো! পোঁছা খুন করিয়েছে কেষ্টকে, জানিস? বজ্জাত শকুন তুই, চুপ করে থাক।'

ছিদাম সরে পড়ে, চমক লেগে, চমৎকৃত হয়ে। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তার মনটা। এদিক-ওদিক ঘোরে সে, ছাড়া ছাড়া কথা শুনতে ছোট ছোট দলের উত্তেজিত আলোচনার। কাছে যেতে তার ভরসা হয় না। সবাই হয়তো চুপ হয়ে যাবে, কেউ তাকাবে আড়চোখে, কেউ কটমটিয়ে। যেটুকু সে শোনে তাতেই টের পায়, শুধু গিরীন নয়, অনেকেই বলাবলি করছে ষড়যন্ত্র—গোপন কারসাজির কথা।

আর একবার ভোঁ বাজে। যে যার কাজে যায়। যন্ত্রের একটানা গম্ভীর গর্জনে চাপা পড়ে যায় বটে কথার গুঞ্জন কিন্তু খাটুনেদের কানাঘুষা চলতে থাকে কাজের মধ্যেই।

ছিদাম আমতা আমতা করে বলে, 'একটা কথার হদিস পাচ্ছি না, তোকে শুধাই গিরীন। কেষ্ট ভিন্ন ডিপাটে, রোলার মেশিনে ও গেছল কেন?'

'বদলি করল না ওকে ক-রোজ আগে? এই মতলব পোঁছা শালার, খুনে ব্যাটা!'

'হ্যাঁ—? বটে—?'

'কী তবে?' গিরীন ফের চটে যায়, রগচটা গিরীন, 'কী বলতে চাস তুই? এক রোজ যে-কাজ করে নি সে-কাজে বদলি করবার মানেটা কী?'

রঘু শোনে। তার খাপছাড়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মানে পেয়ে পেয়ে বীভৎসতর হয়ে উঠেছিল আগে থেকেই, গিরীনের কথার মানে আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

ম্যানেজারের ডান হাত পোঁছাবাবু। কিছুদিন আগেও বড় খুশি ছিল পোঁছাবাবু তার ওপর। কত গোপন কথা পোঁছাবাবু জেনে নিত তার কাছে, ওপরের কত গোপন ব্যাপারের হদিস তাকে দিত, সেইসঙ্গে খোলা হাতে বোতল বোতল মদের দাম বকশিশ। সে রকম অনুগ্রহ পোঁছাবাবু আর তাকে করে না আজকাল, যদিও ছোটখাটো দয়া আজও তার জোটে, ছোটখাটো কাজে সে লাগে। দোষ তার নিজের। সবাই জেনে গেল তার ব্যাপার আর সাপের মতো বিছার মতো তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, ফলে আজ তার এই অবস্থা। তার নিজের গুখুরি ছাড়া আন্দাজ কি করতে পারত কেউ! আফসোসে বুকটা বিছার বিষে জ্বলে যায়

ছিদামের। নিজের ঘরে সিঁধ দেওয়ার মতো কী বোকামিটাই সে করেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে খাতির করে জানিয়ে জানিয়ে খাতিরের সাঙ্গাতদের কাছে নিজের মান বাড়াবার কী ভূতটাই চেপেছিল তার ঘাড়ে। তা না হলে কি জানাজানি হয়, আর এমন ভাবে তার খাতির কমে যায় পোঁছাবাবুর কাছে। বড় বেশি মাল খাচ্ছিল সে কাঁচা টাকা পেয়ে পেয়ে, মাথার তার ঠিক–ঠিকানা ছিল না কিছু, বিগড়ে গিয়েছিল একদম। একটু যদি সে সামলে চলত, কর্তারা তাকে খাতির করে এটা চেপে গিয়ে যদি বলে বেড়াত ওপর থেকে তাকে পিষে মারছে, আজ কি তাহলে তার অগোচরে কেষ্ট বাতাপিকে রোলার মেশিনে পিষে মারবার ব্যবস্থা করতে পারত পোঁছাবাবু, কয়েকটা নোট তার পকেটে আসত না!

জ্বালা যেন সয় না ছিদামের। এত পাকা বুদ্ধি নিয়ে বোকামি করে সব হারাল, এখন যে একটা চাল চালবার বুদ্ধি গজাচ্ছে মাথায় সেটাকে দাবিয়ে রেখে ফের কি একটা সুযোগ হারাবে বোকার মতো? উসখুস করতে করতে এক সময় মরিয়া হয়ে সে বেন্দার কাছে যায়। ভয়ে এদিকে বুকটা কাঁপেও।

'কী যে বোকার মতো কাজ করিস বেন্দা।' চুপি চুপি বলে সে বেন্দাকে।

সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, 'কী বলছ? বোকার মতো কী কাজ?'

'সবাই কী বলাবলি করছে জানিস?'

কী বলাবলি করছে? চমকে আঁতকে ওঠে বেন্দা।

'হুঁ, হুঁ,' ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, 'আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন? পোঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পোঁছাবাবুকে জানি। সবাই কী বলাবলি করছে জানা দরকার পোঁছাবাবুর।'

বেন্দা ঢোক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, 'চলো, বলবে চলো পোঁছাবাবুকে।

পোঁছাবাবু বলে,' কী রে ছিদাম, খবর আছে?'

'আজ্ঞে।'

পোঁছাবাবু তাকে বসতে বলে চেয়ারে। প্রায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে। ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পোঁছাবাবু—ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে ছিদাম মনে মনে।

যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পোঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না পোঁছাবাবু কী করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই খোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও সে ভালোরকম জানে না, পোঁছাবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রতিবিধানের।

গালে প্রকাণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটে নি, আর একটা সে বোকামি করে ফেলেছে।

তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হোক। দুটো টাকা হাতে দিয়ে পোঁছা বলে, 'কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না। কংক্রিটের গাঁথনি উঠেছে, ওর মধ্যে পুঁতে ফেলব তোকে।'

কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পোঁছাবাবু। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে।

এবার থেকে সে ওদের দলে।

—'শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষি দেব তোদের হয়ে।'

—'তোর সাক্ষি চাই না।'

অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরো তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে আসে। গোবর্ধন নাকি সময়মতো এসেও কার্ড পায় নি ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোনো ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে,—নাসিরকে যেমন ঠিক ওই সময় পোঁছা ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকাবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য ঝুলোঝুলি করছিল আট-দশ দিন থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে থেঁতলে মরল কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ-চিৎকার শোনে নি, মেশিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরে নি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের রুমাল-পোঁছার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কি বাকি থাকে কারো কেন তাকে মরতে হল, কী করে সে মরল।

রঘু টের পায়, ক্ষোভে আফসোসে অনেকে ফুঁসছে মনে মনে গিরীনের মতো যে, এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার জোরে পোঁছার টুঁটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মানতে।

সে পারে। একমাত্র সে-ই শুধু পারে ওই অস্ত্রটি ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বড় যে এক খটকা আছে রঘুর মনে। কারসাজি কি ফাঁস হবে ওপরওয়ালাদের? আটঘাট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কি করে রাখে নি ওরা—ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানির কায়দায়? কোনো যোগসাজশ কি প্রমাণ করতে পারবে কেউ? অস্ত্রটা শুধু পড়বে গিয়ে বেন্দার গর্দানে। আর কেউ যদি হত বেন্দা ছাড়া—

গাঁয়ের মানুষ, বন্ধু মানুষ। পয়সা ধার চাইলে কখনো 'না' বলে না, ঘরে বোতল খুললে তাকে ডেকে দুপাত্র খাওয়ায়। রানী খুশি হয় তাকে দেখলে, 'এসো বোসো' বলে ডেকে বসায় আদর করে, ঘরে রাঁধা এটা-ওটা খাওয়ায়, হাসি-তামাশা রঙ্গরসে মশগুল করে রাখে। মুক্তার জন্য বুকটা যে খাঁ-খাঁ করে তার, তাও যেন ভুলিয়ে দেয় রানী। ওর চলন-ফিরন নড়ন-চড়ন দেখে রক্ত তাজা হয়ে ওঠে তার, বুকের মধ্যে কেমন করে। আর কী বুঝদার মেয়েটা, কত আপন ভাবে তাকে। কদিন আগে হঠাৎ খেপে গিয়ে সে যে বলা নেই কওয়া নেই জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, সে রাগ করে নি, শুধু একটা ধমক দিয়েছিল। বেন্দাকে কিছু বলে নি, নিজে তফাত হয়ে থাকে নি, আগেরই মতো হাসিখুশি আপন ভাব বজায় রেখেছে।

কিন্তু বেন্দা শুধু খুন করে নি কেষ্ট বাতাপিকে পোঁছার টাকা খেয়ে, সে দালাল এই ছিদামের মতো। ট্যাক তার ফাঁকা থাকে না কখনো, ঘরে বাইরে সে বোতল বোতল মাল টানে, মিহি শাড়ি কিনে দেয় রানীকে, সব পাপের যা সেরা পাপ তারই টাকাতে। রঘুর মাথার মধ্যে বিছার হুলের মতো বিঁধে থাকে এই চিন্তা।

ছুটির পর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মানুষগুলি কেষ্ট বাতাপির দেহটা দাবি করে। ওকে যারা মেরেছে আজ তাদের মারা না যাক, শোভাযাত্রা করে কেষ্টকে তারা শ্মশানে নিয়ে যাবে। এদের মধ্যে নিজেকে কেমন একা আর অসহায় মনে হয় রঘুর। দুর্বল অবসন্ন লাগে শরীরটা, মুখটা এমন শুকনো যে ঢোক গেলা যায় না। মাথার মধ্যে রোলার মেশিনের ঘর্ঘর আওয়াজ

চলে, জ্যান্ত একটা মানুষের খুলি চুরমার হয়ে যায় প্রচণ্ড শব্দে, তারপর সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের নরম মাংস ছেঁচে যাবার রক্তাক্ত শব্দহীনতায়।

বস্তিতে নিজের ঘরটিতেও সে একা। অন্য ঘরের বাসিন্দাদের হইচই বেড়েছে সন্ধ্যার সময়, রোজ যেমন বাড়ে। গলির ওপারে দুটো বাড়ির পরের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছিদামের গলা-ফাটানো বেসুরো গান, এর মধ্যে বুড়ো নেশা জমিয়েছে। একটানা কোঁদল চলছে সামনের বাড়ির তিন-চারটি স্ত্রীলোকের, ওদের মধ্যে কুঞ্জার বয়স গড়ন মুক্তার মতো, গলাটা কিন্তু ফাটা বাঁশির মতো—ভাঙা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি যেতে বলে, বেন্দা কী দরকারে কোথায় গেছে। যাবে জেনেও রঘু মনে মনে নাড়াচাড়া করে, না গেলে কেমন হয়। রানী তাকে টানছে, এখন থেকেই টানছে জোরালো টানে। এই যে তার একা একা মন খারাপ করে থাকা, রানী যেন ম্যাজিকে সব উড়িয়ে দেবে। তবু সে ভাবছে, না গেলে কেমন হয়। মনটা তার বিগড়ে গেছে বেন্দার ওপর, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠেছে। সোজা সহজ একটা কথা বার বার মনে পড়েছে যে এসব লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখতে নেই, হোক গাঁয়ের মানুষ, হোক বন্ধু মানুষ, চোর ডাকাত খুনের চেয়ে এরা বদ, ওদের সঙ্গে থাকলেই বিপদ। রানী যদি বেন্দার বউ না হত—

মালতীর ন বছরের মেয়ে পুষ্প এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ির মতো বলে, 'কী গো, আজ রাঁধবে না?'

বলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে জবাবের। অসুখ-বিসুখ যদি হয়ে থাকে, যদি আলসেমি ধরে থাকে না-রাঁধবার; যদি বলে, দুটি রেঁধে দিবি পুষ্প, সে ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনবে। পুষ্পর আজ পেটটা ভালো করে ভরবে। উঠোনে পা ঝুলিয়ে ভিজে দাওয়ায় বসে বাতাসের সঙ্গে বকাবকি করছে পুষ্পর মা মালতী। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ঠ্যাং ছিঁড়ো না, ঠ্যাং ছিঁড়ো না বলছি। ওবছর পুষ্পর বাপ লক্ষ্মণের পা আটকে গিয়েছিল কলে, পাটা কেটে ফেলতে হয়েছিল পাছার নিচে থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচে নি।

'আলসেমি লাগছে পুষ্প।'

'মাকে ডাকি?' বলেই পুষ্প ছুট দেয় রঘুর সায় শুনবার আগেই।

রানী আসে রঘুকে ডাকতে।

'যাওয়ার যে চাড় দেখি না, হাপিত্যেশ করে বসে আছে লোকটা ঢেলে-টুলে।'

'চলো যাই।'

গলিতে নেমে ছিদামের গান আরো স্পষ্ট শোনা যায়, কথাগুলি জড়ানো। নেশা আরো চড়িয়ে চলেছে ছিদাম। নয়তো মিনিট কয়েক চেঁচানোর পর সে ঝিমিয়ে যায়, আশপাশের লোক স্বস্তি পেয়ে বলে, 'যাক, শ্যাল-শকুনের কোঁদল থামল।'

গলি থেকে আরো সরু গলি, তার মধ্যে বেন্দার ঘর, কাছেই। লণ্ঠনের আলোয় ফুর্তির সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছে বেন্দা। ভাঁড়ের বদলে আজ কাচের গেলাস, কিনেই এনেছে বুঝি। খুরিতে ঝাল মাংস, কাগজে ডাল বাদাম। জলের বদলে চারটে সোডা।

'হুঁ হুঁ বাবা, আজ খাঁটি বিলিতি, দামি চিজ।'

কফে গলাটা ধরা ছিল বেন্দার, রঘু ঘড়ঘড় আওয়াজ পায়। একদিনে যেন বেন্দার মুখটা আরো ছুঁচলো হয়ে চামড়া আরো বেশি কুঁচকিয়ে গেছে। মিহি শাড়িটা পরেছে রানী, তলায় বুঝি সালুর শেমিজ, রং বেরোচ্ছে। দানা দানা মিহি বুদবুদ উঠছে ভরতি গেলাসের টলটলে রঙিন পানীয় থেকে।

'ঢেলে বসে আছি তোর জন্যে। মাইরি ঠেকাই নি ঠোঁট।'

আজ তার বিশেষ খাতির। হবে না কেন, হওয়াই উচিত। গেলাস তুলে এক চুমুকে শেষ করে ফেলে রঘু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে, হঠাৎ খেপে গিয়ে সেদিন যেমন সাপটে ধরেছিল রানীকে।

'আরে আরে, রয়ে-সয়ে খাও।' রানী বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে তার কাণ্ড দেখে।

বেন্দা বোতল থেকে তার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, খানিকটা সোডা দিয়ে খানিক জল মেশায়, সোডায় কুলোবে না।

নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, 'বাপস! ভাগ্যে তুই এলি আচমকা, অন্য কেউ নয়! প্রাণটা লাফিয়ে উঠেছিল কঠাতে মানুষ দেখে, তারপর দেখি তুই। ধড়ে প্রাণ এল।' আরো দুবার চুমুক দেয়, খানিকটা বেপরোয়াভাবে বলে, 'তবে, কী আর হত! একটু হাঙ্গামা, বাস। পোঁছাবাবু ঝানু লোক, ঠিক করে নিত সব।'

আর এক গেলাস ঢেলেছে সবে বেন্দা নিজের জন্য, লোক আসে পোঁছাবাবুর কাছ থেকে।

পোঁছাবাবু একবার ডেকেছে বেন্দাকে, এখুনি যেতে হবে, জরুরি দরকার। পোঁছাবাবু আছে ম্যানেজার সাহেবের কাছে, সেখানে যেতে হবে। ম্যানেজার সাহেব নিজের গাড়ি পাঠিয়েছে, বড় রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

'দুত্তেরি শালার নিকুচি করেছে।' বেন্দা বলে বেজার হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, 'তুই বোস রঘু, খা। চটপট আসছি কাজটা সেরে। গাড়ি করে যদি না দিয়ে যায় তো—'

বেন্দা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে রানী। টুক করে এসে উবু হয়ে বসেই বেন্দার খালি গেলাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এক চুমুকে গিলে ফেলে জল বা সোডা না দিয়েই, ঝাঁজে মুখ বাঁকিয়ে থাকে কতক্ষণ।

রঘুর চাউনি দেখে বলে, 'কী হল, খাও?' হাত বাড়িয়ে গালটা সে টিপে দেয় রঘুর।

ভালো করে বসে আর একটু ঢালে, এবার সোডা মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খায় একটু একটু করে। রঘুর গেলাস তুলে ধরে তার মুখে।

কাছে ঘেঁষে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ওকে বোলো না খেয়েছি। ফিরে এসে নেশা চড়লে নিজেই ডাকবে, তখন একটুখানি খাবখন দেখিয়ে। ফিরতে দেরি আছে, এক ঘণ্টা তো কম করে।'

গায়ে লেগে কানে কানে কথা কয় রানী, তার মদ-পেঁয়াজের গন্ধ-ভরা নিশ্বাসে ঝড় ওঠে রঘুর মাথার রঙিন ধোঁয়ায়। গেলাস রেখে সে ধরে রানীকে।

রানী বলে, 'বাস রে, ধৈর্য নেই এতটুকু? গেলাসটা শেষ করো।

খালি গেলাস মদ সোডার বোতল তফাতে সরিয়ে জায়গা করে মুচকে হেসে নিজে থেকেই সে নেতিয়ে পড়ে রঘুর বুকে।

আর একটু ঢেলে খায়, রঘুকে দেয়। বলে, 'আর তোমার ভাবনাটা কী? কত বিলিতি খাবে তুমি এবার নিজের রোজগারে। তুমি চালাক-চতুর আছ ওর চেয়ে, ও তো একটা গোঁয়ার। এবার কত কাজে লাগাবে তোমায় পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি।'

মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রঘুর এতক্ষণ পরে।

'যাই বাবা ওঘরে, কখন এসে পড়বে।' যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রানী আবার বলে, একটা কথা বলি শোনো। তোমার জন্যেও পোঁছাবাবু টাকা দিয়েছে ওকে, চেয়ে নিও। ভাগ ছাড়বে কেন নিজের? এমনি হয়তো চেপে যাবে, কথায় কথায় বোলো, মোকে কিচ্ছু দিলে না পোঁছাবাবু? তাহলে দেবে।' চোখ ঠেরে রানী হাসে, 'বাৎলে দিলাম, ভাগ দিবে কিন্তু মোকে।'

কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেঁতলে যাবার যে শব্দ সেই—তার মতো। এই কাজ করতে হবে তাকে এবার, বেন্দা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মতো ছিদামের মতো। এই তার পথ। আর একমুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনিভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হনহন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। মদের নেশার চেয়ে অন্য নেশাই তার হয়েছিল জোরালো। ছিদামের ঘরের কাছাকাছি সে হোঁচট খায় একটা মানুষের দেহে। নেশার ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিদাম রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ তাকে তোলে নি। হোঁচট খাওয়ার রাগে একটা লাথি তুলে পা নামিয়ে নেয় রঘু। জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। তার ধৈর্য ধরছিল না। কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেশিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে একমুহূর্তের বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত–সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হন্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়নচড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, ঘুম আসে না, মনটা টনটন করে একধরনের উদাস–করা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে। যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বৌকে সঙ্গে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু–একখানা ভালো, মদন তাঁতির নামকরা বিশেষ রকম ভালো কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদের কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাঁকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দুবছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সঙ্গে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কি ক্ষমতা আছে একহাতে টেনে খিচ–ধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের? মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আনে পা–টা।

'বাঁচালেন মোকে।'

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে। খড়ি–ওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয় : 'উঠে হাঁটো দুপা। সেরে যাবে।'

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে–পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসে নি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে–পুরুষের পিত্তি–জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে : 'কী হল গো? বলি হল কী?'

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাত দিন তাঁত বন্ধ মদনের, বৌটা তার নমাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপিচুপি দিয়েছে কাল মদনের বৌকে, চুপিচুপি শুধিয়েছে মদনের মতি-গতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কি না মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বৌ, না, একগুঁয়েমি তার কাটে নি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বার বার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দুচোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগার-খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, 'পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কী যন্ত্রণা, বাপ, একদম যেন মৃত্যুযন্ত্রণা, মরি আরকি। উনি ছুটে এসে টেনে-টুনে ঠিক করে দিলেন পা-টা, বাঁচালেন মোকে।'

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বৌ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, 'অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো তাইতো বলি মোরা।'

'তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই।' তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বৌয়ের মুখকে তার বড় ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায়-লাগাও—উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার দুপাশের ডালপালা দুজনের চালকে প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরোনো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড় ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতিপাড়ার সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাব ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া থমথম করছে; শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িক ভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, 'কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?'

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

'জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।'

'কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।'

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

'ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ওসব জানি না কিছু আমি।'

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন।

গগনের বৌ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, 'আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে!' 'কত ঢং জানে বুড়ো।'

বুড়ো ভোলা বলে, 'আহা থাম না বুনোর মা। অত কথায় কাজ কী? যন্তনা গেছে না

মদন? মোরা তবে যাই।'

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা—এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, 'তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড় বোকা।'

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, 'সে কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।'

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, 'সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, এ কী কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—'

'পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশিরভাগ দাদন-কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?'

'নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কী দরে সুতো কেনা জান?' ভুবন আফসোসের শ্বাস ফেলে, 'যাক গে, কী করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দু-দিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আফসোস করবে—আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।'

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গ্যাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুরঘুর করে আশপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয় নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিচড়ে ওঠে, 'মেয়েটাকে নেয় না কোলে, কেঁদে মরছে। মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি!'

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না, মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসিমার বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সঙ্গে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসী বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ

সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে।

মদনের মা–বৌ ফিরে আসে গুটি–গুটি, পেটের ভারে মদনের বৌ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত–পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরোনো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনো পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জটবাঁধা–চুল চোকলা–ওঠা ফাটা চামড়া এসব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে! সামনে এসেই সে শুরু করে দেয়—মদন তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি–টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনী। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি! মদন তাঁতির কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি!

'বলল? বলল ওসব কথা?' পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন; 'বেড়েছে—বড় বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।'

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বৌ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভিতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে : 'এক পয়সার মুরোদ নেই, গপ্পো কত!'

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।'

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা–বৌও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে, তারাও তাঁত বোনে,. পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁফদাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলের তাঁতি–মহলে একটা কথা চলিত আছে : মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝে নি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতিপাড়ার বেশিরভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড় খামখেয়ালি একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হা–হুতাশ করে, এই লম্বা–চওড়া কথা কয় যেন রাজা–মহারাজা!

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল। তার পরেই মাসির গলা : 'ও মদন, দ্যাখসে বৌ কেমন করছে।'

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে, তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড় বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বৌয়ের। কী হয়েছে মদনের বৌয়ের? কী হতে পারে? গুরুতর কিছু যদি হয়...

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বৌয়ের শরীরটা কেমন-কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগী এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দুমাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য।

'এখনো গেলে না যে?'

'যাব। আলিস্যে লাগছে।'

'ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত?' উদি আব্দার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, 'তোর কথা বড় বিচ্ছিরি।'

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে। উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়ে ছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

'কেমন আছে বৌ?'

'ব্যথা উঠেছে কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়িকে আনতে গেছে।'

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমতো ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ : 'ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু? সুতো নেই বুঝি?'

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

'সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসী ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?'

'বেনারসী?' বেনারসী না-বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আফসোসের সঙ্গে বলে মদন, 'বেনারসী জীবনে বুনি নি।'

এক ঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে! এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনে নি। সকালে পায়ে যেমন খিচ ধরেছিল তেমনিভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে হাত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বার বার, বৌটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কী করবে মদন তাঁতি?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর-শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন

তাঁতির তাঁতঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক! খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, 'এর মধ্যে তাঁত চাপাল? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?'

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে। সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, 'মদন তাঁত চালায় নাকি রে?'

'তা ছাড়া কী আর?' কেশব জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে, 'রাতদুকুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।'

'ভুবনের সুতো না হতে পারে।'

'কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?'

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, 'কতটা বুনলে তাঁতি?'

'আয় দেখবি।'

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁতঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, 'নিয়ে যা, ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—'

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার অর্ধেক মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারো চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বৌটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় : 'ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি সুতো নিয়েছ, মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুররাতে চুপিচুপি?'

'দেখে এসো তাঁত।'

'তাঁত চালাও নি রাতে?'

'চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে বাতে, তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—'

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

হারানের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধানকাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারানের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁসুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড় মাস চেষ্টা করে পায় নি, ভুবন এ-গাঁ ও-গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আটঘাট বেঁধে বসবার কোনো চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারানের। বোঝা গেল আটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে কার ঘরে নিয়ে গেছে হারানের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে, ভুবন হারানের ঘরে যাবার পরে! এমনিও কি কেউ আছে তাদের এ-গাঁয়ে? শীতের তেভাগা চাঁদের আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে গফুর আলি বলে, 'দেইখা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে! দেইখা লমু।'

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনো গাঁয়ে সে ধরা পড়ে নি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙা হয়ে ওঠে। লাঠি-সড়কি-দা-কুড়াল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন-চারটে টর্চ। হাঁসতলা পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপদপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারানের বাড়িটা ঠিক চিনত না।

সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, 'হারান দাসের কোন বাড়ি?'

তার পাশের বাড়ির হারান ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারান আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পাল্টা প্রশ্ন করে, 'আজ্ঞা, কোন হারান দাসের কথা কন?'

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটক আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে।

এদিকে হারান বলে, 'হায় ভগবান।'

ময়নার মা বলে, 'তুমি উঠলা কেন কও দিকি।'

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায় নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারান। কী হয়েছে ভালো বুঝতে বোধ হয় পারে নি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারান তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোনো কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব!

ভুবনকে বলে ময়নার মা, 'বুড়া বাপটার তরে ভাবনা।'

ভুবন বলে, 'মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা!'

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, 'হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করেছিলেন।'

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারানকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আফসোসে ফুঁসে ওঠে, 'আহ! ভালো শাড়িখান পরতে পারলি না?'

বলছ নাকি? 'ময়না বলে।'

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙিন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙিন শাড়িখানা।

বলে, 'ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামাইয়ের কাছে যেমন দেখাস।' ভুবনকে বলে, 'ভালো কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিনাড়া, থানা গৌরপুর—'

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ-দুর্দশার ছাপ ও রেখা রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

'গাঁ ভাইঙা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কী, গাঁয় মাইনষের সাড়া নাই!'

ভুবন বলে, 'তবেই সারছে! দশ–বিশটা খুনজখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।'

'থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কী হয়।'

শ–দেড়েক চাষি চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারানের ঘরের সামনে—দু–চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথর, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষিদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমতো নরম শোনায়। স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতি পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারানের ঘর তল্লাশ করতে। তল্লাশ করে আসামি না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বেআইনি কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, 'মোরা তাল্লাশ করতি দিমু না।'

প্রায় দুশ গলা সায় দেয়, 'দিমু না।'

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোনো আসামি নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামি রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তল্লাশ করতে চান, তল্লাশ করেন।'

মন্মথ বলে, 'ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।'

ময়নার মা বলে, 'দ্যাখেন আইসা, তল্লাশ করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়ে দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রুপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কী দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'—মন্মথ বলে, 'ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।'

গৌর সাউ হেঁকে বলে, 'অত চুপেচুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা?'

গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, 'সদর দিয়া আইছে! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই, চুপেচাপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে।'

গৌর আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপে–ধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙিন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথর, পিঁচুটির মতো চোখে এঁটে যায় ঘোমটা–পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি.এ. পাস মন্মথর কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আফসোস হয় যে জোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার আলুথালু বেশ।

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে শনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না। ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে

যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারি সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ মন্মথ গর্জন করে হারানকে প্রশ্ন করে, 'এ তোমার নাতনির বর?'

হারান বলে, 'হায় ভগবান!'

ময়নার মা বলে, 'জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।'

অ! 'মন্মথ বলে।'

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

'এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। উড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেণ পোলার দিয়া খপর দিলেন মাইয়া নাকি মর-মর তখন যায় এখন যায়।'

'তুমি অমনি ছুটে এলে?'

'আসুম না? রতিভরা সোনারুপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?'

'ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবি লোক বটে।' মন্মথ বলে, ব্যঙ্গ করে। আর কিছু করার নাই, বাড়িগুলি তল্লাশ ও তছনছ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু-পা পিছু হটে এখনো চাষির দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায় নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয়ডর নেই। ঘরে ঘরে তল্লাশ চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথা কালি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারানের বাড়িতে। অল্প নেশায় রঙিন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য—চোখ তার রঙিন শাড়িজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি-বাইশ বছরের জোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, 'শীতে কাঁপুনি ধরেছে শো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে—' ময়নার মার গলা ধরে যায়, 'আপনারে কী কমু দারোগাবাবু—'

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আর দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, 'গুরুজনের কথা শোনো, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কী করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।'

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগদিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোক বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে। এমন তামাশা কেউ কখনো করে নি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করে নি পুলিশকে। কদিন

আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা। সে যে এমন রসিকতাও জানে কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনাচিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, 'মাগো মা ময়নার মা, তোর মদ্যি এত?'

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, 'কী লো ময়না, জামাই কী কইলো? দিছে কী?' লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে-সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ-সাতাশ, বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা শার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারানের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, 'জগমোহন নাকি? কখন আইলা?'

নন্দ বলে, 'আরে শোনো, শোনো, তামুক খাইয়া যাও।'

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, 'কী কাণ্ড বুঝলা নি?'

'কেমনে কমু?'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটাসুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, 'বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?'

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

'অ! তুমিও আইছো ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?'

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরে নি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে। মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে।

'শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখানা!'

'নিজের হইলে বুঝতা।' জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে। চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অবাক হয়ে।

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্ত-সমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল জানা ছিল এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, 'আসো বাবা আসো। ও ময়না পিঁড়া দে। ভালো নি আছে বেবাকে। বিয়াই-বিয়ান পোলামাইয়া?'

'আছে।'

আর একটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোঁসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটাছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভালো ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির, পণ করেছে জগমোহন। লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারান হাঁকে, 'আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান।'

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, 'বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।'

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারান সকাল থেকে কেন দেখে না, কী হয়েছে হারানের নাতির, ময়নার ভাইয়ের, জানতে চাইবে জগমোহন কিন্তু কোনো খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

'খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বসো বাবা, বসো।'

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

'মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।'

'না, যামু গিয়া অখনি।'

'অখনি যাইবা?'

'হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?

'শুইছিল?' ময়নার মার চমক লাগে, 'মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব।'

'ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।'

তারপর বেধে যায় শাশুড়ি জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ। ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, 'তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না-দিছে, তুমি দোষ ধরলা? অন্যে তো কয় না?'

'অন্যের কী? অন্যের বৌ হইলে কইত।'

'বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা জুয়ান ভাইয়ের লগে ক্যান্ কথা কয়।'

'কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।' তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারান কাঁপা গলায় চেঁচায়, 'আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে?' ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

'কী হয়েছে গো ময়নার মা?' নিতাই পালের বৌ শুধায়, 'মাইয়া কাঁদে ক্যান?'

তাদের দেখে সংবিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, 'কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?'

'জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?'

'শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।'

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কী?'

'বাপ নাকি?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

'বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্ম দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইর না।'

'বুইঝা কামই নাই। অখন যাই।'

'রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কী কইব?'

'জামাইয়ের অভাব কী। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটব।'

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছ যে শুধু শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গটগট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু জোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামাইয়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, 'ঘরে আসো।'

'খাসা আছি। শুইছিলা তো?'

'না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।'

'ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!'

ময়না তখন কাঁদে।

'তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।'

ময়না আরো কাঁদে।

ঘর থেকে হারান কাঁপা গলায় হাঁকে, 'আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!'

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া জোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারিগাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সঙ্গে, দারোগা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করা চলে; অবুঝ, পাষণ্ড জামাইয়ের সঙ্গে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারান, 'আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!'

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—'উয়ারে ধরছে ক্যান?'

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, 'মণ্ডলখুড়ার লগে গৌদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।'

'ক্যান ধরছে?'

'কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।'

বসে বসে কী ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয়, জামাইকে বলে, 'মাথা খাও, মুখে দাও।' আবার বলে, 'রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।'

থাকনের জো নাই। মা দিব্যি দিছে।

'তবে খাইয়া যাও। আখা ধরাই। পোলাটারে ধইরে নিছে, পরানডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।'

'না, রাইত বাড়ে।'

'আবার কবে আইবা?'

'দেখি।'

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিশ হানার সেই রকম শোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশি। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারানের বাড়ি।

'কী গো মণ্ডলের শাশুড়ি,' মন্মথ বলে ময়নার মাকে, 'জামাই কোথা?'

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এটা আবার কে?'

জামাই। ময়নার মা বলে।

'বাহ্, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—'

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, 'মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!'

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারানকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমে নি, দলে দলে লোক ছুটে আসে চারিদিক থেকে; জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা-পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি লোক পথ আটকায়। রাত বেশি হয় নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বোঝা যেত, হারানের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে। মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারান সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, 'ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান!'

বিচার

প্রকৃতপক্ষে এখনো ভোর হয়েছে বলা যায় না। কৃষ্ণপক্ষের গোড়ার দিকের প্রায়-আস্ত চাঁদটার আলো ফ্যাকাশে হয়ে এলেও ভোরের আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় নি। এক সূর্যেরই আলো, চাঁদের গা থেকে ঠিকরে আসা আর সিধে আসা, তফাত তো শুধু এইটুকু, তবু কত তফাত!

ইতিমধ্যেই রাস্তায় জলের কলে লোক জমতে শুরু করেছে। কলে জল আসতে আসতে ছোটখাটো ভিড় গড়ে উঠবে। বস্তির মেয়ে-পুরুষরাই সংখ্যায় বেশি, বস্তির গা ঘেঁষে যে নতুন কলোনি গড়ে উঠেছে সেখান থেকেও দু-চার জন জল নিতে আসে। কলোনি থেকে রাস্তার কলে নিরুপায় হয়ে ধন্না দিতে আসে শুধু লুঙি-পরা গেঞ্জি-গায়ে বা গামছা-জড়ানো বেপরোয়া জোয়ান পুরুষ আর কোরা অবস্থা থেকে একবারও ধোপ না দিয়ে মাঝে মাঝে সাবান কাচা করার ফলে পাকা একটা ময়লা রঙের মোটা ছেঁড়া থান-পরা মাঝবয়সী বিধবা—যাদের স্তিমিত বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখে মজুর মেয়ে-পুরুষ গোড়ার দিকে অদ্ভুত এক ধরনের মায়া বোধ করত।

আজকাল আর করে না। ওরা ভীষণ ঝগড়াটে! লাইনে জায়গা দখল নিয়ে, বালতি কলসি ভরে এখানে জল নেওয়া সম্পর্কে সকলের স্থির করা নিয়ম ভেঙে চট করে একটু চানও করে নিতে চেয়ে গলা ছেড়ে কোন্দল করে।

শহরতলির এই বস্তিবাসী মজুর-মজুরনির চোখের সামনে কয়েক মাসের মধ্যে ভোজবাজির মতো প্রায় একই ধাঁচের ছোট ছোট দালানের কলোনিটা গড়ে উঠেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে গোটাকতক কুঁড়ে, তিনটে ডোবা পুকুর, বাঁশঝাড় এবং ছোট একটা মহিষের খাটাল। লোকে বলে রসিকবাবুর কলোনি, কিন্তু আসলে রসিক ছিল জমিটার বেনামদার মালিক। সবাই জানে মারোয়াড়ি ভগবানদাসের টাকায় অবস্থা আঁচ করে জমিটা কিনে নিয়ে ডোবা ভরিয়ে বাঁশঝাড়, কচুবন, কুঁড়ে, খাটাল উচ্ছেদ করে সস্তা ওঁচা ইট সুরকি সিমেন্ট ইত্যাদি নিয়ে নিচু ভিতে দালানগুলি তুলেছে—পূর্ববঙ্গের একশ্রেণীর গৃহত্যাগী ও গৃহের জন্য উন্মাদ মানুষের ঘাড় ভেঙে মোটা মুনাফা লুটেছে। এরা ধনী নয়—অবস্থাপন্ন জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরে—দশ-বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাড়ির মালিক হয়ে গ্যাট হয়ে বসাটাই ছিল এদের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম প্রয়োজন। অধিকাংশ বাড়ির মালিক আবার বাড়ির একাংশে ভাড়াটে বসিয়েছে, অন্তত একখানা ঘরে, কিছু আয়ের জন্য। ভাড়াটেরা অল্প সঞ্চয় নিয়ে আগত রিফউজি অথবা এই বাংলার সাধারণ চাকুরে।

এই কলোনির বিপরীত দিকে রাস্তার ওপারে একটুকরো পোড়ো জমিতে আর একটা কলোনি গড়ে উঠেছে—পুতুলের খেলাঘরের মতো কয়েকটা হোগলার চালা উঠেছে, প্রায় মানুষের মাথা সমান উঁচু, লম্বা হয়ে শোয়া যায় প্রায় এ রকম লম্বা, তিন-চার জন পাশাপাশি

শোয়া চলে প্রায় এতখানি চওড়া। এটা হল তাদের কলোনি, ইংরেজের ভাগাভাগি নীতির চরম পরিণতির রক্তাক্ত বন্যায় কুটার মতো দলে দলে যারা ভেসে এসে চারিদিকে সর্বত্র আটকে গেছে—বস্তিতে, রোয়াকে, রাস্তায়, গাছতলায়।

ভোরের আলো যত প্রকট হতে থাকে, জলের উমেদারদের লাইন বড় হয়ে চলে। খানিক তফাতে রাস্তার ওপারে হাইড্রান্টের চুয়ানো ময়লা জল লোটায় ভরে স্নান চলছে। বস্তির কাছে ছোট পুকুরটার জল সবুজ হয়ে গেঁজিয়ে উঠেছে, তার চেয়ে এই কাদাগোলা নদীর জল অনেক শুদ্ধ ও পরিষ্কার।

রাত্রে একদমক ঝড়ের সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, ভোরটা ঠাণ্ডা ও মিষ্টি হয়ে আছে—খালি গা-গুলিতে। আকাশে সাদাটে ভাঙা মেঘ দ্রুত উত্তরে পাড়ি দিচ্ছে, চাঁদটা ছুটেছে বিপরীত দিকে। চারদিকে কাছে ও দূরে এলোমেলোভাবে ওই আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে কারখানার চিমনি। ওগুলির তুলনায় রাস্তায় জলের কলের নলটা কত সরু! ওই চিমনির কোনো কোনোটা হাজার মানুষকে খাটিয়ে রক্তমাংস আনন্দ অবসর শুষতে ধোঁয়া ছাড়ে কিন্তু সারা এলাকায় যতগুলি চিমনি রাস্তায় বস্তিতে ততগুলি জলের কলও বুঝি নেই। উপোসী মানুষের জলের তেষ্টাও মেটে না, মুখ দিয়ে জল গিলে খাবার তেষ্টাটুকু ছাড়া সর্বাঙ্গের যে শতরকম তেষ্টা আছে, কাপড়গামছা বাসনপত্র ধুয়ে মেজে সাফ করার যে দরকারি সাধ আছে।

দাঁতন ঘষতে ঘষতে মতিলাল বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে জলের কলের লাইন আর হাইড্রান্টের চুয়ানো জলে স্নানের চেষ্টা দেখে থুতু ফেলে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে। উঁচানো চিমনিগুলিকেই যেন ভাঙা শব্দের একটা অশ্রাব্য গাল দেয়। মানুষটা সে ঢ্যাঙা, চওড়া বুকের পাঁজরাগুলি ঠেলে উঠেছে, মুখভরা খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি কিন্তু মাথায় মস্ত একটি টাক। টাকের বাড় ঠেকাতেই যেন কদমছাঁটা কাঁচাপাকা চুলের বাঁধ দিয়েছে টাকটা ঘিরে।

মতিলালের হাতে ছিল ঘরে লোহার শিক বাঁকিয়ে তৈরি করা নকল চাবি, খানিক ধস্তাধস্তি করে সে হাইড্রান্টের মুখটা খুলে দেয়। হাতের তালু দিয়ে হাইড্রান্টের মুখ চেপে সরু ধারায় জল তুলে ধীরে ধীরে লোটা ভরে রামসুখ স্নান করছিল। পা দিয়ে চেপে মতিলাল তোড়ে জলের তিন হাত উঁচু বাঁকা ফোয়ারা তুলে দেয়, রামসুখ এবার উঠে দাঁড়িয়ে মনের সুখে স্নান করে, গা ঘষে ময়লা গামছা দিয়ে।

স্নানার্থী একজন বলে, 'আরে রাম রাম, রামসুখ!'

তেওয়ারী ব্রাহ্মণ রামসুখ নীচু জাতের একজনের পা-ধোয়া জলে স্নান করছে—মন্ত্র পড়তে পড়তে স্নান করছে—বেচারা শিউশরণের কাঁচা শহুরে প্রাণটাকে এটা নাড়া দিয়েছে ভীষণভাবে। মানুষটা মেটে রঙের, মাঝবয়সী, কপালে গতকালের চল্‌টা ওঠা চন্দন-তিলকের চিহ্ন, কব্জিতে গোটাতিনেক মাদুলি, নেড়া মাথায় টিকি থেকে ফুলটা খসে পড়ে গেছে কিন্তু গিটটা টিকে আছে। পরনের নতুন আধখানা হেঁটো কাপড়খানা কয়লার গুঁড়োয় কুচকুচে কালো; মতিলালও এভাবেই কাপড় পরে। একখানা কাপড় কিনে দুখণ্ড করে চালায়—কাপড়ের যা দাম!

মাত্র ক-মাস আগে দেশ থেকে চাষবাস ছেড়ে কলকাতায় এসেছে শিউশরণ—সেও ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ-হৃদয়টি তার এই ক-মাসে কতবার কতভাবে যে বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম করেছে, শহরে জীবনের অনিয়ম আর অত্যাচার দেখে! অসংখ্য অন্যায় আর অবিচারের চেয়েও এটা এখনো তার কাছে বড় হয়ে আছে। তার হৃদয় কিন্তু বিদীর্ণ হয় নি।

কারণ তার হৃদয়টাই ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখার চেয়ে প্রাণটা বজায় রাখা পছন্দ করেছে অনেক বেশি!

অভয়পদ দাসের স্থানীয় ছোট কয়লার গুদামে সে কুলি খাটে—মুফতে! লরি ভরে চালান এলে কয়লা নামায়, খদ্দের এলে কয়লা মেপে দেয়—পাঁচ সের থেকে এক মণ পর্যন্ত একবারের মাপ। এ জন্য মজুরি পায় না, পায় দুবেলা আধপো হিসাবে আটা, ছটাকখানেক তরকারি আর দুটি করে কাঁচা লঙ্কা। তার রেশন কার্ডের চিনি আর চাল অভয়পদর বাড়িতে যায়। সকালে বিকালে ফাউ পায় শিউশরণ দুপয়সার ছাতু বা ছোলা! ভোর থেকে রাত আটটা–নটা পর্যন্ত কয়লার গুদামে তার এলোমেলো ছাড়াছাড়া ডিউটি।

বাড়তি খেটে তার রোজগার। যারা মোটে পাঁচ–দশ সের কয়লা কেনে তারা থলি বস্তা সাথে এনে নিজেরাই বয়ে নিয়ে যায়। আধমণ এক মণ কয়লার বস্তা খদ্দেরের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে শিউশরণ মজুরি পায় দুআনা। বাঁধা রেট—খদ্দেরের বাড়ি এক মিনিট বা দশ মিনিট দূরে হোক। এই কুলিখাটার অধিকারের মূল্য হিসাবে কয়লা গুদামের খাটুনিটা তাকে এমনিই খেটে দিতে হয়।

রামসুখ তার তিরস্কার শুনেও শোনে না বলে শিউশরণ ভীষণ রেগে আবার বলে, 'রাম রাম রামসুখ! ধিক্!'

তার ধিক্কার শুনতে শুনতে রামসুখ নির্বিচারে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সরে দাঁড়িয়ে গা মুছতে থাকে। এমন সে স্বার্থপর নয় যে তোড়ে জল পেয়েছে বলেই অন্য সকলের স্নান ঠেকিয়ে নিজে সাধ মিটিয়ে স্নান করে যাবে— যদিও সে জানে আরো দু–তিন মিনিট জলের ফোয়ারাটা সে দখল করে থাকলেও কেউ কিছু বলত না বা ভাবত না।

রামসুখের বদলে মতিলাল এবার ধমকের সুরে শিউশরণকে বলে, 'পাগলা হো গিয়া? গঙ্গাজল আছে না?'

রামসুখ মতিলালের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকে হাসে। মতিলাল না হেসেই চোখের ইঙ্গিতে সায় দেয়। তারা দুজন কারখানার ঘাগি মজুর, দুজনেই বুঝে নিয়েছে বেচারা শিউশরণের মুশকিল।

'ও, হাঁ, ঠিক বাত।'

শিউশরণ যেন মুক্তি পায়, ইংরেজ রাজের জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে বড় মুক্তি। এতই সে স্বস্তি আর আশ্বাস বোধ করে যে অল্পবয়সী মুসলমান ছোকরাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মতিলালের পা–ধোয়া কাদাগোলা গঙ্গাজলের ফোয়ারায় স্নান করতে লেগে যায়! মনে হয়, মতিলালের পায়ের চাপে হাইড্রান্ট থেকে বাঁকা হয়ে যে জলের ফোয়ারা উঠেছে সেটা তার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে কোমরে গলায় সাপ জড়ানো, কোলে মোমের রক্তহীন পুতুলের মত আকাট ফরসা ছোটখাটো একটি মেয়ে বসানো শিবের বটতলার সস্তা ছবির জটা থেকে উৎসারিত জলের ফোয়ারাকে!

কিন্তু নাওয়া তার এত সহজে হয় না। রামসুখ ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়, গর্জন করে বলে, 'লাটসাহেবি জজ ম্যাজিস্টারি চলবে না হেথা, খপরদার! একজন যে নাইছে তাকে নাইতে দিয়ে তবে তুমি আসবে।'

ক্রুদ্ধ শিউশরণ রুখে উঠে বলে, 'আমি পয়লা এসেছি।'

'না, তুমি পয়লা আস নি। তোমার আগে সালেক এসেছে।'

'হাঁ? তুমি বললেই হয়ে গেল? একে জিজ্ঞেস করো।'

পীতাম্বর খাবারের দোকানে কাজ করে, একপাশে বসে সে কড়াই মাজছিল। সাক্ষী

মানায় শিউশরণকে সমর্থন করে সে বলে যে হ্যাঁ, সালেকের আগেই শিউশরণ এসেছিল বটে।

'ঝগড়া করছ কেন? একে একে নেয়ে নাও না!'

কিন্তু তা কি হয়! তোড়ে জল উঠছে, ঝগড়ার মীমাংসা হতে হতে সালেকের স্নান হয়ে যাবে কিন্তু সে হল ভিন্ন কথা। আপসে একজন কেন দশজন তার আগে নেয়ে নিক, শিউশরণ কিছু বলবে না। অন্যায় সহ্য করবে কেন, অবিচার মানবে কেন! যতই সামান্য হোক সে অন্যায়, অবিচার।

রামসুখ বলে, 'আরে বাবা, তোমাদের দুজনারই আগে সালেক এসেছিল। কল খোলার চাবিটা তো চাই? না, চাই না? চাবি আনতে সালেককে মতিলালের ঘরে ভেজেছিলাম। ভেবেছিলাম কী, মতিলাল আজ ভোরে নাইতে আসবে না।'

মতিলাল বলে, 'হ্যাঁ, চাবি চাইতে গিয়েছিল। একসাথে আসছিলাম, দাঁতন খুঁজতে পিছিয়ে গেল।'

তা হলে অবশ্য কোনো কথা নেই। পরে এসে তাকে ডিঙিয়ে নাইতে শুরু করেছিল ভেবেই সে সালেককে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল, সালেক যদি সত্যই আগে এসে থাকে তবে কাজটা তার অন্যায় হয়েছে বৈকি, তাকে ধাক্কা দিয়ে ধমক দিয়ে রামসুখ দোষ করে নি। মেঘ সরে গিয়ে যেভাবে সূর্য বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে, পলকে পলকে শিউশরণের মুখের ক্রুদ্ধ ভাব কেটে যেতে থাকে।

রামসুখ মতিলালকে জিজ্ঞাসা করে, 'ভোরে নাইলে কেন আজ?'

মতিলাল আশ্চর্য হয়ে বলে, 'খাটতে যাব না?'

'খাটতে যাবে? আজ?'

আজ বিশ বছর ধরে মতিলাল কারখানায় খাটতে যাচ্ছে, আজ কারখানার ছুটি বা ধর্মঘট বা শহরে হরতাল এসব কিছুই নেই, তবু মতিলাল আজ কাজ করতে যাবে শুনে রামসুখ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার মুখ দেখে মতিলালেরও ভাবনা লেগে যায় যে তার অজান্তেই হয়তো–বা মস্ত ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে যেজন্য আজ কাজে যাওয়াটা খুবই খাপছাড়া হবে।

'কী ব্যাপার রামসুখ? কী বলছ? আজ কাজে যাব না কেন?'

'কোর্টে যাবে না? কাজে যাবে তো কোর্টে যাবে কী করে?'

'এবার মতিলালের মুখের ভাব কঠিন হয়ে যায়।'

'কোর্টে যাব? কোর্টে যাবার দরকার কী?'

'তোমার ছেলেকে হাজির করবে না আজ?'

মতিলাল মাটিতে থুতু ফেলে দারুণ অবজ্ঞার সুরে বলে, 'হাঃ, কত হাজির করছে!'

দাঁতনটা দাঁতে চিরে মতিলাল জিভ চাঁছে, মুখ ধোয়। রাস্তা দিয়ে একটা ফাঁকা লরি জোরে বেরিয়ে যায়! রামসুখ দ্বিধাভরে খানিকটা যেন জিজ্ঞাসার সুরেই বলে, 'তবু একটা হুকুম যখন হয়েছে—'

'হুকুম হয়েছে, তোমার শখ থাকে তুমি যাও! মিছিমিছি একটা দিনের মজুরি যাবে, বাসভাড়া যাবে, অত গরজ আমার নেই।'

মতিলালের দ্বিধা নেই, সংশয় নেই, বিচারক হুকুম দিলেও তার আটক ছেলে ও সাথিদের বিচারালয়ে হাজির করা হবে, সে বিশ্বাস করে না! বিনা বিচারে আটক বাতিল হবে না, এটা জানাই গেছে। কিন্তু বন্দিদের বিচারালয়ে হাজির করা হবে, এতেও মতিলালের এমন সুনিশ্চিত অবিশ্বাস যে এক দিনের মজুরি ও বাসের পয়সা খরচ করে গিয়ে যাচাই করে

আসতেও সে রাজি নয়।

জলের কলের লাইন থেকে একজন চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, 'মতিলাল! কোর্টে যাবে তো?'

মতিলাল চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'না!'

তার জবাব শুনে কয়েকজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক লাইন ছেড়ে এদিকে এগিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় মতিলালের জবাব তাদেরও রামসুখের মতোই বিচলিত করে দিয়েছে।

কাছে এসে দু-তিন জন একসঙ্গ প্রশ্ন করে : 'যাবে না কীরকম? তারিখ পাল্টেছে? বিচার বাতিল হয়ে গেছে?'

আর একজন প্রশ্ন করে, 'তোমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে?'

এই প্রশ্ন শুনে মতিলাল জ্বালা ও ব্যঙ্গভরা এক অদ্ভুত সশব্দ হাসি হাসে—'ছেড়ে দিয়েছে বৈকি, ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করাতে হাওয়াই জাহাজে মার্কিন মুলুকে পাঠিয়েছে।'

হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্নকারীকে বলে, 'আমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে, তবে আর ভাবনা কী, আর কে শালা কোর্টে যায়—তাই কোর্টে যাব না ভাবছ বুঝি?'

প্রশ্নকারী লজ্জা পায়, তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, তা ভাবি নি, তা ভাবব কেন! কথাটা মনে হল তাই—'

আর একজন বলে, 'যাক যাক, যেতে দাও। ব্যাপারটা কী মতিলাল? যাবে না কেন? আমি তো ভাবছিলাম যাব, দেখে আসব কী হয়।'

মতিলাল বলে, 'ব্যাপার কী আবার, ব্যাপার কিছু নেই। কিছুই হবে না জানি তো ফের গিয়ে কী করব? শুধু আইনের মারপ্যাঁচ নিয়ে কচকচি হবে খানিক, কানাকড়ি মানেও ঢুকবে না মাথায়। কাজ কী বাবা ঝকমারিতে!'

'কী করে জানলে তোমার ছেলেদের আনবে না?'

'কী করে আনবে? সাহস পাবে কোথা? কী তাদের দরকারটা আনবার? কোর্টে যদি আনবে, বিচার যদি করবে, বিনা বিচারের কানুন করেছে কি শখের জন্য, ধুয়ে জল খাবে বলে?'

সবাই নির্বাক হয়ে শোনে, শুনেও নির্বাক হয়ে থাকে। তোড়ে জল বেরিয়ে নালা বেয়ে গড়িয়ে যায়, স্নানটা সেরে নিতে শিউশরণেরও খেয়াল থাকে না।

প্রায় ষাট বছর বয়সের বুড়ো পটল প্রথম কথা বলে। বিড়িটাতে বাঁধা সুতোটার কাছ পর্যন্ত শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে, দুবার কেশে, ধীরস্বরে সে বলে, 'আমি বলি কী, আইন-মতে সমনটমন বেরিয়েছে ওদেরই জজ-আদালত, ওদেরই নিয়মকানুন, তাই হয়তো-বা—'

মতিলাল হেসে বলে, 'কোথায় আছ দাদা? ভাবচ বুঝি ইংরেজ আমল শেষ হয়ে গেছে, সত্যযুগ এসে গেছে? যার সৈন্য যার পুলিশ, তার আইন তার বিচার। নিজের আইনের ফাঁদে পড়লে, জজ-আদালতের রায় মুশকিল করলে, কাল ফের একটা নতুন আইন করে জজ-আদালত তুলে দিতেই বা কতক্ষণ!'

কড়াই মাজা বন্ধ রেখে পীতাম্বর শুনছিল, সে বলে, 'যা বলেছ মাইরি। লোকে বলে, ভদ্দরলোকের এক কথা! এ কেমন এক কথা রে বাবু ভদ্দরলোকের! এদিকে বিচারও রইবে, বিচার ছাড়া আটকের আইনও রইবে! রাখবি তো একটা রাখ, খুশি হয় বিচার টিচার সব তুলে দে। বিচার রইলে বিনা-বিচার রয় কোন বিচারে, অ্যাঁ?'

মতিলাল বলে, 'ইংরেজ-মার্কিনের লেজ ধরে স্বাধীন হলে সবই হয়, এ বাবা মার্কিনি

বিচার।—এ শিউশরণ, তোমার তো ভাই টাইমের কাজ নয়, আমি আগে নেয়ে নি?'

'হাঁ, হাঁ।'

মতিলাল নাইতে শুরু করে। জলের কলের লাইন থেকে যারা এসেছিল তারা ফিরে যায়।

স্নান শেষ হতে হতে মতিলাল টের পায়, জলের কলের লাইনে একটা গোল বেধেছে। চেঁচামেচি তার কানে আসে। লক্ষ্মীর মা ক-জনের সঙ্গে লাইন ছেড়ে তার সঙ্গে কথা কইতে এসেছিল, লক্ষ্মীর মার পরিচিত তীক্ষ্ণ ও চড়া গলার আওয়াজ গোলমাল ছাপিয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাছে গিয়ে দেখে, লাইন ছেড়ে যারা তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গেই লাইনের অন্য কয়েকজনের ঝগড়া বেধেছে।

লাইনের যেখান থেকে তারা মোটে দুমিনিটের জন্য সরে গিয়েছিল, ফিরে এসে তারা আবার সেইখানে দাঁড়াতে চায় কিন্তু কয়েকজন তাদের এ দাবি মানতে রাজি নয়। তারা বলছে, এদের দাঁড়াতে হবে সকলের পিছনে।

কারণ, তা-ই নিয়ম, জলার্থীদের রাস্তায় দাঁড়ানো পার্লামেন্টের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইন।

অনেকটা মতিলালের চেষ্টাতেই আইনটা পাস হয়েছিল। শুধু লাইনে দাঁড়ানোর আইন নয়, অন্যান্য কয়েকটা ধারাও পাস হয়েছে। একজন ক-বালতি জল পাবে, কখন খাবার জল নেওয়া ছাড়া মুখহাত ধোয়া পর্যন্ত চলবে না, কখন চলবে, এসব বিষয়েও নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, সকলে স্বীকার করেছে নিয়ম মেনে চলবে। নানা অবস্থার নানা বয়সের লোক এসে কলে ভিড় করত, বস্তি থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ দোকানপাট ঘরবাড়ির আনাচ-কানাচ রিফিউজিতে ভরে যাবার পর ভিড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, বিশেষ করে এই ভোরের দিকে। প্রতিদিন হাতাহাতির উপক্রম হত, ছোটখাটো মারামারি বেধেও যেত প্রায়ই। ভোরে বেশি মজুর হাজির থাকায় মারামারিটা গড়াত না, অল্পেই থেমে যেত। মতিলাল একদিন সকলের জন্য একরকম নিয়ম চালু করার কথা বলে। কলোনির ফকিরবাবু খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বালতি-কলসি বসিয়ে রেখে, এমনকি আগের রাত্রে ভাঙা মাটির কলসি বসিয়ে লাইনে জায়গা দখল করে রাখা নিয়েই ঝগড়া হত সবচেয়ে বেশি। তাই নিয়ম হয়, লাইনে যে হাজির থাকবে তারই জল নেবার অধিকার, বালতি-কলসির নয়। লাইন ছেড়ে চলে গেলে ফিরে এসে সকলের পিছনে দাঁড়াতে হবে।

এই নিয়মের ব্যাখ্যা আর প্রয়োগ নিয়েই আজ গোল বেধেছে।

আর একটা নিয়ম হয়েছিল, ভোরে একজন এক বালতি বা এক কলসির বেশি জল পাবে না, সাতটার পর দুবালতি বা দুকলসি। ফকিরবাবু নিয়ম করার সময় খুব লাফিয়েছিল, পরদিন সে পাঁচটি বাচ্চা, দুটি বড় কলসি আর চারটি বড় বালতি নিয়ে হাজির—বোধ হয় প্রতিবেশীর কাছে ধার করে : বাচ্চাগুলি তার নিজের।

ঝগড়া আরম্ভ করেছিল লক্ষ্মী, সকলে তার পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু ফকিরবাবু কিছুতে মানবে না সে নিয়ম ভেঙেছে। নিয়ম হল এক জনের এক বালতি—সে তো বেশি চাইছে না। বাচ্চারা কি মানুষ নয়!

অন্য কয়েকজনও ছেলেমেয়ে সাথে এনেছিল কিন্তু ফকিরবাবুর মতো অতটা চালাক হতে কেউ পেরে ওঠে নি। এই গণ্ডগোলের পর নতুন নিয়ম হয়, প্রত্যেকের জন্য এক বালতি জল বরাদ্দ বটে কিন্তু সে এমন বালতি হবে যা জল ভরে নিজে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ফকিরবাবু হম্বিতম্বি করেছিল অনেক, কিন্তু সকলে মিলে যে নিয়ম করেছে তা না মেনে উপায় কী। তা ছাড়া কলোনির দু–তিন জন ভদ্রলোকও তার বিপক্ষে দাঁড়ায়। স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করে যে এসব ফকিরবাবুর অন্যায়।

আজও ফকিরবাবুই চেঁচাচ্ছে বেশি।

—'যা নিয়ম আছে তা মানতে হবে। তোমরা কোন লাটসায়েব যে খুশিমতো নিয়ম ভাঙবে? চলবে না ওসব, পিছনে দাঁড়াতে হবে তোমাদের, সবার পিছনে।'

লক্ষ্মী আকাশচেরা গলা শেষ পরদায় তুলে বলে, 'আরে মরণ মোর! নিয়ম ভাঙলাম কিসে? দু–পা গিয়ে দু–দণ্ড একটা লোকের সাথে কথা কয়েছি, তাতে লাইন ছেড়ে যাওয়া হল কোনখানটায়? একটা লোকের জোয়ান ছেলেটা কতকাল বিনা বিচারে আটক রয়েছে, আজ নাকি তার বিচার হবে সবার সাথে, বাপটাকে দেখে দুটো কথা শুধিয়ে না এসে থাকতে পারে মানুষ? তাতেই লাইন ছাড়া হল! এ কোন দেশী বিচার গো মা! তুমি যে নর্দমায় জল করতে যাও, সেটা লাইন ছাড়া হয় না কেন? পিছনে দাঁড়াও না কেন জল করে এসে?'

মতিলাল কাছে এলে লক্ষ্মী বলে, 'ও মতিলাল, একটা বিচার করো!'

ফকিরবাবু বলে, মতিলাল আবার কী বিচার করবে! বিচারের কী আছে? লাইন ছেড়ে গেলে পিছনে দাঁড়াতে হবে, সোজা কথা!

কিন্তু মতিলালকে এত সহজে বাতিল করা সম্ভব নয়। বেশিরভাগ যারা চুপ করে ঝগড়া শুনছিল, বুঝে উঠতে পারছিল না কোন পক্ষের যুক্তি সার্থক, তারা বলে, 'না না, মতিলাল কী বলে শোনা যাক।'

দেখা যায়, যারা ফকিরবাবুকে সমর্থন করছে তাদের মধ্যেও কয়েকজন মতিলালের কথা শুনতে ইচ্ছুক।

মতিলাল গামছা দিয়ে মুখ মুছে ফকিরবাবুর দিকে চেয়ে বলে, 'মোরা হেথা বেশিরভাগ গরিব মানুষ বাবু, খেটে খাই।'

মতিলাল একটু থামে। সকলে চুপ করে শোনে। কলে জল এসেছে, তলে বসানো বালতিতে জল পড়ার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

মতিলাল বলে, 'মোরা এঁটো কথা গিলি না বাবু, বমি করে খাই না।'

সে আবার একটু থামে। বোঝা যায়, ফকিরবাবু বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছে। মতিলাল তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনে। বলে, 'মোরা দশজনে মিলে নিয়ম করেছি, নিয়মটা মোদের মানতে হবে। কেউ তো খুশিমতো নিয়ম মোদের ঘাড়ে চাপায় নি, মোদের কী বলার আছে কানে না তুলেই তোমাদের কিন্তু লক্ষ্মী পিছনে দাঁড়ানো উচিত। মোদের নিয়ম মোরাই যদি না মানি তো মানবে কে?'

লক্ষ্মী নরম সুরে মৃদু প্রতিবাদ জানায়, 'বিনা বিচারে আটকের বিচারটা কী ব্যাপার একটুখানি জানতে গেলাম—'

মতিলাল মাথা নেড়ে বলে, 'তা বললে চলবে কেন! লাইন ছেড়ে না গেলেই হত, আমি এখান দিয়ে যাবার সময় শুধোতে পারতে, ঘরে গিয়ে জানতে পারতে। জরুরি বলে যদি লাইন ছেড়ে না গিয়ে পার নি, তার দামটুকু দিতে হবে না?'

বুড়ো পটল বলে, 'ঠিক কথা!'

বলে সে বালতি হাতে লম্বা লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য পা বাড়িয়েছে, জোয়ানবয়সী খলিল তার হাত ধরে লাইনে নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

বলে, 'আমার তাড়া নেই, পিছনে যাচ্ছি। বুড়ো মানুষ, তোমার কষ্ট হবে।'

খলিলের জল পাবার পালা আসতে বাকি ছিল মোটে চার জন। বিনা দ্বিধায় সে সতের জনের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

লাইনের মাঝামাঝি জায়গা থেকে সুখী ডেকে বলে, 'অ লক্ষ্মীদিদি, তুমি বরং মোর জায়গায় এসে দাঁড়াও। মেয়েটার জ্বর কমে নি, না?'

যারা মতিলালের সঙ্গে কথা কইতে লাইন ছেড়েছিল তাদের উদ্দেশ করে লাইনের সামনের দিকের আর একজন বলে, 'তোমাদের কারো যদি তাড়া থাকে ভাই—'

ছোট বকুলপুরের যাত্রী

গাড়িটা ঘণ্টাখানেক লেট করেছে।

ঠিক সময়ে পৌঁছলেও অবশ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, স্টেশনের তেলের বাতিগুলি তার আগেই জ্বালানো হয়। প্ল্যাটফর্মে অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, শঙ্কিত ও স্তব্ধভাবে। আরো গভীর রাত্রের ট্রেনের জন্যও এ স্টেশনে সাধারণত আরো অনেক বেশি যাত্রী জড়ো হতে দেখা যায়। আজ একদল সিপাই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূর্ণ করেছে।

গাড়ি দাঁড়ায় মিনিট দেড়েক। এই সময়টুকুর ব্যস্ততা এবং কলরবও আজ স্টেশনে ঝিমানো মনে হয়, তারপর গাড়ি ছেড়ে যাবার দু-চার মিনিটের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে স্টেশন এলাকা যাত্রীশূন্য হয়ে ছমছমিয়ে আসে। গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তারা কোনো দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গেটে টিকিট দিয়ে পথে নেমে যায়—এত লোকে যে টিকিট কাটে এবং সদর গেটে টিকিট দাখিল করে স্টেশন ছাড়ে এও এক অসাধারণ ব্যাপার বটে। চারদিকে একনজর তাকালেই টের পাওয়া যায় যে, বাড়ির টান আজ সকলের হঠাৎ বেড়ে যায় নি, স্টেশন এলাকা ছেড়ে তফাত হবার তাগিদেই যাত্রীদের এত তাড়া।

পথে নেমেও কেউ দাঁড়ায় না। স্টেশনের লাগাও তেরাস্তার মোড়, দু-তিনটি দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলি বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এ সময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরা থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষি কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ভেণ্ডি-বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যেন আজ কারো নেই।

স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক-ওদিক তাকায়। চোখের পলকে পলকে তার জানাচেনা স্টেশনটি যেভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস আছে। কাল এখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়িতে শুনেছে। এ রকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল।

'দেখলি ব্যাপার?'

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, 'দেখব আবার কী? হাঙ্গামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার হবে? হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকো নি, যাই চলো।'

বিড়ি-সিগারেট টানতে টানতে ক-জন বাবুমতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ করছিল, নামধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-এক জনকে। স্টেশন যাত্রীশূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদের নজর পড়ে। মাঝবয়সী বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও।'

তার খদ্দরপরা ছোকরা বয়সী সঙ্গীটি পানরাঙা মুখে আরো দুটো পান পুরে চিবোতে চিবোতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকে, আচমকা প্যাচ করে পিক ফেলে হাত উঁচিয়ে আঙুল ঠেরে দিবাকরকে কাছে ডাকে, 'এই! শোনো!'

দিবাকর অবশ্য দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। পুঁটুলিটা বগলে চেপে দড়িবাঁধা হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকে।

ওরা জন তিনেক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

'টিকিট আছে?'

'আছে।'

শার্টের বুকপকেট থেকে দিবাকর দুখানা টিকিট বার করে দেখায়।

'কোথা যাবে?'

'আজ্ঞে ছোট বকুলপুর যাব।'

শুনে তারা যেন একটু চমকে যায়। পানখোর ছোকরা আবার প্যাচ করে খানিকটা পিক ফেলে। গতকালের হাঙ্গামায় প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে খানিক রক্তপাত ঘটেছিল, ছোঁড়া যেন পানের পিক দিয়েই তার জের টেনে প্ল্যাটফর্মটা রাঙা করে দিতে চায়। দিবাকরও পান ভালবাসে, রাস্তায় পুরো চার পয়সার তৈরী পান কিনেছে। কাগজের ঠোঙাটা বার করে সেও একটা পান মুখে পুরে দেয়। লোকগুলির এত কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধ হয় পানটা তার একটু তিতো লাগে। ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানাটার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিন জন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েকশ মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধা-চাষি আধা-মজুর প্রাণটা বড়ই বিগড়ে আছে।

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, 'রাত করে ছোট বকুলপুর যাবে? সেখানকার খবর জান সব?'

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে বলে, 'খপর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয়-কুটুম আছে সেথা, খপর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছেন না স্বাধীন হয়েছে।'

বেঁটে বলে, 'ও বাবা, তোমার দেখি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা!'

'না বাবু, গরিব মানুষ কথা কোথা পাব?'

তেমাথার পাশে দুটি খোলা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ। স্টেশনের সামনে সাধারণত দু-তিনটি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়া যত প্রাচীন, গাড়িগুলি ততোধিক। বেগার খাটার ভয়ে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করে নি। গাড়ি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবার মতো বড়লোক দিবাকর কোনোদিন ছিল না, আজ কিন্তু সে ঘোড়ার গাড়ি চেপেই যেত—আন্নার রুপার গয়না বাঁধা দিয়ে এই উদ্দেশ্যেই সে টাকা জোগাড় করে এনেছে। ছোট বকুলপুর পৌছতে রাত হবে এটা জেনেই তারা রওনা দিয়েছে, তবে রাত করে মেয়েছেলে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ির আশাটা ছিল।

এখন ভরসা গরুর গাড়ি।

'গাড়োয়ান কই হে!' দিবাকর ডাকে।

দুই গাড়ির দুজন মালিকেরই আবির্ভাব ঘটে। আবছা আলোয় মনে হয় একজন যেন পুরোনো বটগাছটা এবং অন্যজন দোকানঘরের বেড়া ভেদ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের তাড়া নেই, গরুর গাড়িতে কম্পিটিশনও নেই। ধীরেসুস্থে তারা জানতে চায় দিবাকরেরা কোথায় যাবে।

'ছোট বকুলপুর।'

শুনে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে। ওরে বাবা, রাত্রিবেলা ছোট বকুলপুর কে যাবে! যেখানে সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমতো লড়াই চলছে।

চার জনেই তারা সম্মুখে পথটার দিকে তাকায়। ছোট বকুলপুরের এ রাস্তা কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সে পর্যন্ত এখন নজর চলে না—মনে হয় বিপজ্জনক অন্ধকারেই বুঝি পথটা হারিয়ে গেছে। বাঁ হাতে কোলের বাচ্চাকে সামলে ডান হাতে আন্না দিবাকরকে এক-পা পিছু ঠেলে দেয়, নিজে এগিয়ে দায়িত্ব নেয়।

'ওখান-তক্ নাই বা গেলে বাবা? যদ্দূর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকি রাস্তা মোরা হেঁটে যাব। ভাড়া ঠিকমতো পাবে।'

রাম বলে, 'রাতের বেলা কে অত হাঙ্গামা করে, না কি বল ঘোষের পো?'

ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ! আন্না মিষ্টি সুরে বলে, 'বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ!'

রাম চুপ করে থাকে। তার বয়স বেশি, সাহস কম। গগন ঘোষ বলে, 'কমলতলা-তক্ যেতে পারি।'

তাই হোক। কমলতলার সীমা পেরিয়েও যদি নামিয়ে দেয় তবু প্রায় আধ মাইল হাঁটতে হবে। পুরো দেড় ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভালো। একটা গাড়িতে বলদ জুড়লে আন্না উঠে বসে, এ কসরত তার অভ্যাস আছে। গগনের গাড়িটা নড়বড়ে, ক্রমাগত লেজ মলে তাড়া না দিলে শীর্ণ বুড়ো বলদ এক-পা এগোতে চায় না। আন্না আগ্রহের সঙ্গে ছোট বকুলপুরের খবর জিজ্ঞাসা করে, তবে গাঁয়ে-ঘরে পৌছবার আগে বাপ-ভাইয়ের কুশল জানার আশা সে করে না। গ্রামের সাধারণ অবস্থার ঘনিষ্ঠতর বিবরণ, অনেক নতুন খবর গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোট বকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্তজীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার ঠিক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তারপর গাঁয়ের লোক আটঘাট বেঁধে এমন তৈরি হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষেদের কোনো লোক অন্তত দু-ডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায় না।

একবার মুখ খুললে গগনকে থামানো দায়। গরুর লেজ মলে মলে মুখে গরু তাড়ানোর অদ্ভুত আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সে চারদিকের অবস্থা বর্ণনা করে যায়, তার মতে কলিযুগ সত্যই এবার শেষ হতে চলেছে, সমস্ত লক্ষণ থেকে তাই মনে হয়। নইলে রাজায় প্রজায় এমন যুদ্ধ বাধে?

'মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়াইয়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্যযুগ করবে!'

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথে বেশ শোরগোল তুলেই গাড়ি চলে। রাস্তার ধারের কোনো কোনো ঘরের বেদখল দাওয়া থেকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়িতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসে : 'কে যায়? কোথা যাবে?'

গগন জবাব দেয় : 'ইস্টেশনের ট্রেইনের মেয়েছেলে। কমলতলা যাবে।'

গাড়ি গাছপালা বাড়িঘরের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়িটাতে সেটা যেন যতক্ষণ

সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।

এ অঞ্চলে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগানো বড় বড় গ্রাম। তবু এখন সন্ধ্যারাত্রেই রাস্তায় প্রায় লোক চলাচল নেই। গেঁয়ো লোকের পথ চলাও খাপছাড়া রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এই পথ ধরেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকে পাড়ি দেয়, আজ যেন চারদিকে সকলেরই দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার পাশ থেকে আচমকা হয়তো একজন রাস্তায় উঠে আসে, জোরে জোরে পা ফেলে খানিকটা এগোতে না এগোতেই আবার রাস্তার ধারের অন্ধকারেই মিশিয়ে যায়। মাত্র দুটি লোকের এ রকম টুকটাক খুচখাচ খুচরো চলাফেরার প্রয়োজন নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে আরো বেশি অস্বাভাবিক করে তোলে।

কমলতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। চোখ তুলে সেদিক চেয়ে গগন মাথা চুলকায়।

'যাব নাকি এগিয়ে ছোট বকুলপুর-তক?'—গগন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলে, দিবাকরেরাই যেন তাকে যেতে বারণ করেছে! —'চলো যাই মেয়া, তোমায় নিয়ে যাই। মাঝরাস্তায় কেমন করে নামিয়ে দি বলো, আঁ?'

আন্না খুশি হয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, 'ভগবান মুখপোড়া একচোখো কানা, নইলে তোমার নতুন গাড়ি হত বাবা, জোয়ান বলদ হত!'

ছোট বকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একেবারে তিন-তিনটে টর্চের আলো গরুর গাড়িতে এসে পড়ে। কিছু হাঁকডাক শোনা যায়। বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে যারা পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, অসময়ে গগনের গরুর গাড়ির আবির্ভাবে তাদের মধ্যে খানিকটা সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। গাড়িতে শুধু দুটি বলদ, একটি গাড়োয়ান, এক জন পুরুষ ও একটি মেয়েমানুষ এবং একটি বাচ্চা—সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

দেখতে দেখতে সাত-আট জন গাড়িটা ঘিরে ফেলে। টুপিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে মাঝবয়সী মোটা লোকটি, সে-ই বোধ হয় বেসরকারি দলপতি, গম্ভীর গলায় বলে, 'কোথা থেকে আসছ?'

গগন বলে, 'ইস্টিশনের টেরেনগাড়ির প্যাসিঞ্জার আজ্ঞা।'

'শাট্ আপ! তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে? তোমার নাম?'

'মোর নাম দিবাকর দাস।'

'বাপের নাম? কোথায় থাক? কী কর, এদিকে এসেছ কেন?'

'বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা স্বগগে গেছেন—তিপ্পান্নর মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানায় মজুর খাটি। এদিকে হাঙ্গামা শুনলাম, বৌ কাঁদতে লাগল যে তার বাপ ভাই মরেছে না বেঁচে রয়েছে। তা ভাবলাম কী যে কারখানার ধরমঘট দু-দশ দিনের মেটার নয়, যা দিনকাল। বৌকে নিয়ে দেখে আসি শ্বশুরবাড়ি ব্যাপার কী।'

সবিনয়ে স্পষ্ট সরল ভাষায় দিবাকর তাদের আগমনের কারণ ও বিবরণ দাখিল করে। কাঁদাকাটা করে না বলে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে পায়ের তলায় আছড়ে আছড়ে পড়ে না বলে বোধ হয় তার ব্যাখ্যা এদের পছন্দ হয় না।

'পুঁটলিতে কী আছে? বোমাবন্দুক?'

'আজ্ঞে কাঁথাকাপড়।

'তুমি যে সত্যি দিবাকর দাস, মজুর খাট, শ্বশুরবাড়ি আসছ, কোনো বদ মতলব নেই,

তার প্রমাণ দিতে পার?'

কী প্রমাণ দেব বলেন? সাক্ষিপ্রমাণ তো সাথে আনি নি!

ষোল–সতের বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফরসা ছেলেটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়বয়সী লোকটির ধমকে বিষম খেয়ে থেমে যায়, কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে।

আন্না বলে, 'গাঁয়ের চাষা পাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না। বাবুরা, মোকে দু–চার জন চিনবেই, গাঁয়ের মেয়া আমি।'

'সে তো চিনবে, না চিনলেও চিনবে। যাদের সঙ্গে যোগসাজশ তাদের যদি না চিনবে তো কাদের চিনবে?'

আন্না দিবাকরের কানে কানে বলে, 'গাঁয়ের লোক ডাকতে ডরাচ্ছে, জান?'

দীর্ঘ থলথলে লোকটি আঙুল উঁচিয়ে বলে, 'এই কানে কানে কী কথা হচ্ছে? চুপিচুপি সলাপরামর্শ চলবে না, খবরদার!'

গাঁয়ে যাওয়া কি বারণ বাবু? একশ চুয়াল্লিশ রটিয়েছ? 'দিবাকর প্রশ্ন করে।'

কদমছাঁটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে বয়াটে চেহারার ছোঁড়াটা বলে, 'বারণ কেন, বারণ নেই। তোমরা কে, কী মতলবে এসেছ জানা গেলেই যেতে দেওয়া হবে।'

'ওসব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত করো বাবুরা?'

'চোপ, তামাশা হচ্ছে, না?'

ধমকানির চোটে দিবাকরেরা চুপ হয়ে যায়, বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায়। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে শান্ত করতে করতে আন্না তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ শোনে। আচমকা গরুর গাড়ি চেপে হাজির হয়ে তারা যে গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে মানুষগুলি রীতিমতো বিব্রত ও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গের জিনিস বেশভূষা চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সত্যি সত্যি টের পাবার জো নেই যে এরা সত্যিকারের নিরীহ সাধারণ গোবেচারি চাষামজুর মাগভাতার ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ সন্দেহের কারণ। যে তাণ্ডব চলেছে ছোট বকুলপুরে কদিন ধরে, তাতে সত্যিকারের কোনো ভীরু মুখ্যু ছোটলোক মাগছেলে সঙ্গে নিয়ে সাধ করে কখনো তার মধ্যে আসতে চায়? তাও আবার হাঙ্গামার খবর জানবার পরে! বাজে লোকের এ সাহস হবে কোত্থেকে? তার চেয়েও বড় কথা, সন্দেহের কথা, চারদিকে এত রাইফেল বন্দুকের সমারোহ দেখেও ওরা মোটে ভড়কে যায় নি, দিব্যি নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব।

একজন নিচু গলায় বলে, 'নিশ্চয় কোনো ডেঞ্জারাস লোক ছদ্মবেশে এসেছে।'

দীর্ঘ থলথলে লোকটি হুকুম দেয়, 'এই! জিনিসপত্র নিয়ে নামো।'

তার মুখের কথা খসতে না খসতে দুজনে দিবাকরকে ধরে টেনে নামিয়ে দেয়। উৎসাহ অথবা উত্তেজনার আতিশয্যে একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মুখবাঁধা মাটির হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আধ হাঁড়ি জল আর তাতে কিলবিল করে গোটা ছয়েক শিংমাছ।

দিবাকর গোঁসা করে বলে, 'দিলে তো বাবুরা, গরিবের পথ্যির দফা মেরে দিলে তো? রুগী বৌটা এখন খাবে কী!'

'বলি ওহে দিবাকর দাস,' একজন গম্ভীর মুখে বলে, 'কারখানায় খেটে খাও বললে না? কুলি–মজুরের বৌরা কবে থেকে শিংমাছের ঝোল খাচ্ছে হে? পাঁচ–ছ টাকা শিং মাছের সের।'

'শিংমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু?'

এ ফোড়নের অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে সে গর্জন করে ওঠে, 'শাট্ আপ, বেয়াদপ।'

পোঁটলাটা খুলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়, তাতে একটা অঘটন ঘটে যায়। আন্নার বাচ্চাটা রাস্তায় দু-একবার পায়খানা করেছে, নোংরা ন্যাকড়া দলা পাকিয়ে আন্না পুঁটলির মধ্যে রেখেছিল। ঘাঁটতে যাওয়ায় অনুসন্ধানীর হাতে ময়লা লেগে যায়। গন্ধে ও স্পর্শে রাগ চড়ে যাওয়ায় বেহিসাবির মতো পুঁটলিটাতে সে বল শুট করার মতো লাথি মেরে বসে। ফলে কাদার মতো তরল পদার্থ খানিকটা তার পায়েও লাগে, ছিটকে বন্দুকের গায়েও একটু-আধটু লেগে যায়।

গাড়িতে বিছানো বিচালি তুলে, ছেঁড়া বস্তাটার ভাঁজ খুলে খোঁজার পর গগন আর দিবাকরের গা খোঁড়া হয়। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হয় পানের মোড়কটা।

'বাহ্, সাজা পান! দে তো একটা।'

তিনটি পান অবশিষ্ট ছিল, তিন জনের মুখে যায়। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় পানমোড়া ছাপানো কাগজটার দিকে একনজর তাকিয়েই যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে চমকে ওঠে। কাগজটা ভালো করে মেলে ধরে সে বিস্ফারিত চোখে বড় হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে। —"ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।"

নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাওয়া গেছে। ইস্তাহার পাওয়া গেছে!'

ইস্তাহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।

তবু তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর শূন্যে হাতড়াতে হবে না, মনগড়া সন্দেহ-সংশয়ে জর্জরিত হতে হবে না, একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে হাতের মুঠোয়। এবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

'এই ইস্তাহার পেলে কোথা?'

প্রশ্নটার যেন স্বাদ আছে এমনিভাবে আরামে জিভে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করা হয়।

'ইস্তাহার? ইস্তাহারের তো কিছু জানি না! চার পয়সার পান কিনলাম, পানওলা ও-কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।'

'পানওলা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবেচিন্তে পান কিনে ইস্তাহারটাতে জড়িয়ে নিলে?'

'কেন? তা কেন করতে যাব?'

'আর ঢং কোরো না, এবার আসল নাম বলো দিকি।'

দিবাকর আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

কে বাঁচায়, কে বাঁচে!

সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল—অনাহারে মৃত্যু! এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা, আজ চোখে পড়ল প্রথম। ফুটপাথে হাঁটা তার বেশি প্রয়োজন হয় না। নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু–পা হেঁটেই সে ট্রামে ওঠে, নামে গিয়ে প্রায় আপিসেরই দরজায়। বাড়িটাও তার শহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে সে পাড়ায় ফুটপাথও বেশি নেই, লোকে মরতেও যায় না বেশি। চাকর ও ছোট ভাই তার বাজার ও কেনাকাটা করে।

কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল। মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়, মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ। আপিসে পৌঁছে নিজের ছোট কুঠরিতে ঢুকে সে যখন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, তখন সে রীতিমতো কাবু হয়ে পড়েছে। একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে। দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে পেট ভরে যতকিছু খেয়ে এসেছিল ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, দই আর ভাত, প্রায় সব বমি করে উগরে দিল।

পাশের কুঠরি থেকে নিখিল যখন খবর নিতে এল, কলঘর থেকে ফিরে মৃত্যুঞ্জয় কাচের গ্লাসে জল পান করছে। গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে সে শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

আপিসে সে আর নিখিল প্রায় সমপদস্থ। মাইনে দুজনের সমান, একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ টাকা বেশি পায়। নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু আলসে প্রকৃতির লোক। মৃত্যুঞ্জয়ের দু–বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোটে দুটি সন্তানের পিতা হয়েছে। সংসারে তার নাকি মন নেই। অবসর জীবনটা সে বই পড়ে আর একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দিতে চায়।

অন্য সকলের মতো মৃত্যুঞ্জয়কে সেও খুব পছন্দ করে। হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালও বাসে। মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদী ভালোমানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য–আদর্শবাদের কল্পনা–তাপস বলে। মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে কোনো কথা ছিল না, দুটো খোঁচা দিয়ে খেপিয়ে তুললেই তার মনের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বেরিয়ে এসে তাকে অবজ্ঞেয় করে দিত। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়। শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে, অব্যয়কে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহু ক্ষয় হয়ে গেছে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ। নিখিল পর্যন্ত তাই মাঝে মাঝে কাবু হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। মৃদু ঈর্ষার সঙ্গে সে তখন ভাবে যে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল, বড় একটা সমস্যার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে এবং শার্শিতে আটকানো মৌমাছির মতো সে মাথা খুঁড়ছে সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে।

'কী হল হে তোমার?' নিখিল সন্তর্পণে প্রশ্ন করলে।

'মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল!' আনমনে অর্ধভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয়।

আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হল, মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ্য ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না। সেটা আশ্চর্য নয়। সে একসঙ্গে পাহাড়প্রমাণ মালমশলা ঢোকাবার চেষ্টা করছে তার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির থলিটিতে। ফুটপাতের ওই বীভৎসতা ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর রূপ? না-খেয়ে মরা, কী ও কেমন? কত কষ্ট হয় না-খেয়ে মরতে, কী রকম কষ্ট? ক্ষুধার যাতনা বেশি, না, মৃত্যুযন্ত্রণা বেশি—ভয়ঙ্কর?

অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা।—'ভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে-লোকটা না-খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী? জেনেশুনেও এতকাল চার বেলা করে খেয়েছি পেট ভরে। যথেষ্ট রিলিফওয়ার্ক হচ্ছে না লোকের অভাবে, আর এদিকে ভেবে পাই না কী করে সময় কাটাব। ধিক্, শত ধিক্ আমাকে।'

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছলছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে। দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই এ জগতে। নিখিলের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীভূত করে ঢাললেও এ আগুন নিভবে না ক্ষুধার, অন্নের বদলে বরং সমিধে পরিণত হয়ে যাবে। ভিক্ষা দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবি জন্মাবে কিসে? রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম। চিতার আগুনে যত কোটি মড়াই এ পর্যন্ত পোড়ানো হয়ে থাক, পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলিকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নিখিল সংবাদপত্রটি তুলে নিল। চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল, ভালোভাবে সদ্গতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয় নি বলে একস্থানে তীক্ষ্ণধার হা-হুতাশভরা মন্তব্য করা হয়েছে।

কদিন পরেই মাইনের তারিখ এল। নিখিলকে প্রতিমাসে তিন জায়গায় কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। মনিঅর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কলম ধরে সে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করছে তিনটি সাহায্য এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কি না। মৃত্যুঞ্জয় ঘরে এসে বসল। সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে। নিখিলের সঙ্গেও বেশি কথা বলে নি।

'একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।' মৃত্যুঞ্জয় একতাড়া নোট নিখিলের সামনে রাখল।—'টাকাটা কোনো রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসতে হবে।'

'আমি কেন?'

'আমি পারব না।'

নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনল।

'সমস্ত মাইনেটা?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে তোর ন-জন লোক। মাইনের টাকায় মাস চলে না। প্রতিমাসে ধার করছিস।'

'তা হোক। আমায় কিছু একটা করতেই হবে ভাই। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে

খেতে পারি না। এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর টুনুর মার একবেলার ভাত বিলিয়ে দি।'

নিখিল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জ্বর হলে যেমন দেখায়, মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমনি থমথম করছে। ভেতরে সে পুড়ছে সন্দেহ নেই।

'টুনুর মার যা স্বাস্থ্য, একবেলা খেয়ে দিন পনের-কুড়ি টিকতে পারবে।'

মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁপিয়ে উঠল।—'আমি কী করব? কত বলেছি, কত বুঝিয়েছি, কথা শুনবে না। আমি না খেলে উনিও খাবেন না। এ অন্যায় নয়? অত্যাচার নয়? মরে তো মরবে না-খেয়ে।'

নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে, এভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্ন তো পেটে যাবেই কারো-না-কারো। যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো। এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা। কিন্তু এসব কোনো কথাই সে বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল।

সে শুধু বলল, 'ভূরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না-খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই। আমি কেটেছেঁটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব। নীতিধর্মের দিক থেকে বলছি না, সমাজধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড় পাপ।'

'ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা।'

'কিন্তু যারা না-খেয়ে মরছে তাদের যদি এই স্বার্থপরতা থাকত? এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হত? অন্ন থাকতে বাংলায় না-খেয়ে কেউ মরত না। তা সে অন্ন হাজার মাইল দূরেই থাক আর একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক।'

'তুই পাগল নিখিল। বদ্ধ পাগল।' বলে মৃত্যুঞ্জয় উঠে গেল।

তারপর, দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরি করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, এক সময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাথ ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নিচে খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নরনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত, এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানে নি, বোঝে নি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। টুনুর মা বিছানা নিয়েছে, বিছানায় পড়ে থেকেই সে বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে স্বামীর খোঁজে বার বার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই বিরাট শহরের কোথায় আগন্তুক মানুষের কোন জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে! কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে, টুনুর মাকে মিথ্যা করে বলে যে

মৃত্যুঞ্জয় আসছে—খানিক পরেই আসছে। খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর, কেউ কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বসে থাকে, ছেলেমেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে।

নিখিলকে বার বার আসতে হয়। টুনুর মা তাকে সকাতর অনুরোধ জানায়, সে যেন একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, একটু যেন সে সঙ্গে থাকে তার।

নিখিল বলে, 'আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠে ঘরের দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকব, নইলে নয়।'

টুনুর মা বলে, 'উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।'

'ঘুরতেন?'

'নিশ্চয়। ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মতো হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলি মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলির কথা। আমাকে দু-তিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে, 'আচ্ছা, কিছুই কি করা যায় না? এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওঁর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।'

নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না। নিখিল চেষ্টা করে তার ছুটির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে। আপিসের ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়—মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলি এখন অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে উল্টো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়। মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে কথার মানে সে আর বুঝতে পারছে না, তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে নিখিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোট একটি মগ হাতে আরো দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি করে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাই নে বাবা। আমায় খেতে দাও।'

সাড়ে সাত সের চাল

আঁধার রাত। গাঁয়ের নিঝুম পথ।

বেলেমাটির কাঁচা নরম পথে সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছিল। পথের এই গুণের কথা সন্ন্যাসীর মনে ছিল না। স্টেশন থেকে তিন মাইল দূর সালাতি পেরিয়ে আরো চার মাইল হেঁটে পলাশমতিতে পৌছবার কষ্ট সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভয়ানক হয়ে উঠেছিল, দেহ বড় দুর্বল, কোমর আর হাঁটুতে ব্যথা, মনে মনে সর্বাঙ্গের পুঞ্জীভূত ব্যথিত অবসাদ। প্রথমটা সন্ন্যাসী স্টেশনেই শুয়ে থাকবে ভেবেছিল। চার পয়সা দিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে স্টেশনেই শেডটার নিচে চিৎপাত হয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বাড়ির দিকে রওনা হবে।

কিন্তু সন্ন্যাসী হিসেবি লোক, কল্পনা করতেও ভারি পটু। সে হিসেব করে দেখল, সাত মাইল পথ তাকে হাঁটতেই হবে, রাতেই হোক বা ভোরেই হোক। এক কাপ চা খেয়ে খিদেকে মেরে ফেললেও মরা-খিদে রাতভর জীবনীশক্তি শুষে শুষে আরো একটু কাহিল করে ফেলবে তাকে। ঘুম ভাঙতে হয়তো তার বেলা হয়ে যাবে। জিরিয়ে জিরিয়ে বাড়ি পৌছতে হয়তো এত দেরি হবে যে সঙ্গে তার সাড়ে সাত সের চাল থাকা সত্ত্বেও বাড়ির লোকের মধ্যাহ্নভোজনটা ফসকে যাবে।

হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী কল্পনা করে—না-খেতে পেয়ে ক-জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! ক-জন মরমর হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌছেছে—তাদের মধ্যে সোনা বৌঠান একজন হতে পারে—তার সাড়ে সাত সের চালের দু-মুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে সারাজীবন মরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে, আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো—সর্বনাশ!

সঙ্গে কিছু ছোলাও আছে। সন্ন্যাসী তাই কিছু ছোলা চিবিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে রাত্রেই রওনা দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদকে মোটে ক্ষয় করেছে চারটি তিথি। এখন জবর জ্যোৎস্নায় নরম পথে হেঁটে মনের মতো কষ্ট পাওয়া অসম্ভব; শালা, কী টানেই বাড়িটা টানছে তাকে! অনেকেই হয়তো সেখানে ভূত হয়ে গেছে মরে, সোনা বৌঠানসুদ্ধ।

প্রথম গাঁ সালাতিতে বরাবর একপাল কুকুর থাকত। পথিককে গাঁ ভেদ করে যেতে গেলেই তাদের সমবেত চিৎকারে ঘুমন্ত রাত চিরকাল জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনোদিন কাউকে তারা কামড়ায় নি, তাড়াও করে নি, শুধু হল্লা করেছে প্রাণপণে। তবু ভয় একটু করেছে পথিকের, হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। সন্ন্যাসীর হাতে লাঠি ছিল না, গাঁয়ে ঢুকবার আগে একটা ভাঙা বাড়ির বেড়া থেকে একখণ্ড বাখারি সে সংগ্রহ করে নিয়েছিল। কিন্তু থপথপ পা ফেলে গাঁয়ের সীমানা সে পার হয়ে গেল, কুকুরের সে প্রচণ্ড

কলরব তার কানে এল না। দু–চারটে খেঁকিকুকুর শুধু নির্জীব ভাঙা আওয়াজে একটু সাড়া জানিয়েই চুপ হয়ে গেল।

মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার ও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার এই অতি ঠাণ্ডা খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর জ্বরো অনুভূতি ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল—গাঁ পেরিয়ে যাবার পর। এখানের দুপাশে শুধু মাঠ আর জলা। সামলে নিতে থমকে দাঁড়িয়ে এলোমেলো নিশ্বাস নিতে নিতে সন্ন্যাসী চারদিকে তাকায়, স্পষ্ট বুঝতে পারে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল এই নির্জন বিস্তৃতির মধ্যে মনটা তার ছোট হয়ে গেল। তারই আতঙ্কে মনটা কুঁচকে গেল, ভাঁজ হয়ে গেল। শালা, চোখেও যে ঝাপসা দেখছে!

মাথা ঘুরে পড়ে যাবার আগেই সন্ন্যাসী কায়দা করে বসে পড়ে পথে কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা নামিয়ে দিল হাতের তালুতে। কতকাল সে পেট ভরে খায় নি, প্রাণপাত করে শুধু খেটেছে। মাঝে মাঝে এ রকম হয়, তার খানিক পরেই কেটে যায়।

খানিক পরে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার চলতে শুরু করল। হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হল শরীর যেন তার হালকা হয়ে গেছে, তার কোনো বোঝা নেই। চালের পুঁটুলি কাঁধে নেই, সেই পুঁটুলির বাড়তি কাপড়টুকুতে বাঁধা ছোলাগুলিও সেইসঙ্গে গেছে। কোথায় পড়ল? কখন পড়ল? কুরু কুরু কুরু করতে লাগল সন্ন্যাসীর পিঠের খানিকটা মেরুদণ্ড। তার হিসাব, তার কল্পনা সব ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথা ঘুরে পড়তে গিয়ে যেখানে বসে পড়েছিল সেইখানেই সে পুঁটুলি দুটির থাকার সম্ভাবনা বেশি, এটুকু খেয়াল করে আশান্বিত হবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই।

একটা মৃতদেহকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার মতো নিজের দেহটাকে সে উল্টোদিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু গিয়েই পুঁটুলিটা পড়ে আছে দেখেও তার বিশেষ ভাবান্তর হল না। পুঁটুলির পাশে বসে মস্ত একটা আটকানো নিশ্বাস ফেলে সে শুধু নিশ্চল হয়ে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করল।

পলাশমতির কাছে পৌঁছে সন্ন্যাসীর মনে হল, সে যেন আবার আগের গাঁ সালাতিতেই ঢুকতে যাচ্ছে। পথের ধারে সালাতির যে প্রথম ভাঙা বেড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাখারি সংগ্রহ করেছিল, পলাশমতিতে প্রবেশপথের ধারেও তেমনি একটি ভাঙা বাড়ি আছে, কেবল বেড়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কানা বাঞ্ছার বাড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় বাড়িটা শূন্য, মানুষ নেই।

'বাঞ্ছা!'

সাড়া না পেয়ে অনুমানকে প্রত্যয় করে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল তখন। একটি দুস্থ কুকুরের ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসছে। কোন বাড়িতে মানুষ আছে কোন বাড়িতে নেই নির্ণয় করতে আর সে সময় নষ্ট করবে না। সোজা বাড়ি চলে যাবে—নিজের বাড়িতে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে দেখতে। বামুনপাড়ার নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল কে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'কে?' সন্ন্যাসী সাড়া দিল না। ঘোষালদের আমবাগান থেকে শুকনো পাতায় চারপেয়ে কোনো কিছুর চলার খচমচ শব্দের সঙ্গে তীব্র একটা পচা গন্ধ ভেসে এল। পরের পাড়ার তিনটি বাড়ি পেরিয়ে তাদের টিনের চালার তিনটি ঘরওয়ালা বাড়ি। আট–ন বছর মেরামত হয় নি। তবে যা–কিছু থাকবার কথা প্রায় সবই আছে, ভেঙে পড়ে নি এখনো। বেড়া নেই। পাশের ছোট কলাবাগান আর সবজি ক্ষেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ–কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য।

দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল সন্ন্যাসী। বেড়া আর মাচা নিশ্চয় উনানে পুড়েছে। উনানে

আগুন জ্বলছে তার বাড়িতে, রান্না হয়েছে। হয়তো সবাই বেঁচে আছে বাড়িতে, একজনও মরে নি। কোনোমতে কুড়িয়ে পেতে একমুঠো-দুমুঠো খেয়ে মরমর অবস্থায় ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই বেঁচে আছে।

'মনাদা!'

প্রথমবার একটু আস্তেই ডাকল সন্ন্যাসী। তারপর জোরে।

'মনাদা!'

সাড়া নেই।

'সুবল কাকা!'

সাড়া নেই।

'সুখী-পিসি!'

সাড়া নেই।

সন্ন্যাসী একটু দম নিল।

'সোনা বোঠান!'

সাড়া নেই।

'সোনা বোঠান! সোনা বোঠান!'

গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখ পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আরেকটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।

ভিতরের দুটি ঘরের একটিতে দরজার উপরে শিকলে তালা আঁটা, দরজার পাট থেকে ভেঙে খসে এসে শিকলটা ঝুলছে। অন্য ঘরটির দুয়ার সপাটে খোলা।

কোনো ঘরে কেউ নেই, তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে। সবাই? দাওয়ায় সাড়ে সাত সের চালের পুঁটুলি নামিয়ে সন্ন্যাসী হিসাব আর কল্পনা দিয়ে ব্যাপারটার হদিস পেতে বসল। সবাই যখন বেঁচেছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বোঠানসুদ্ধ? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল? কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বৌঠানসুদ্ধ?

ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে এক সময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।

মাসি–পিসি

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাঁটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিন জনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাঁটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দুহাত চওড়া হয় কি না হয়। দু–মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটোসাঁটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

'মাসি–পিসি ফিরছে কৈলেশ', বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসি–পিসির সালতি দুহাতের মধ্যে এসে গেছে।

'ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।'

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসি–পিসি সালতির গতি ঠেকায়, আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, 'বেলা আর নেই কৈলেশ।' পিছনে থেকে পিসি বলে, 'অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।'

মাসি–পিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দুমাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

'বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি', কৈলাশ শুরু করে, 'মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ–আপদ ঘটে যদি তো—'

মাসি বলে, 'খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দাকথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে কী?'

পিসি বলে, 'খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।'

মাসি–পিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, 'জগুর সাথে দেখা হল কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এট্টু—মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।'

মাসি বলে, 'চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী?'

পিসি বলে, 'শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বার মাস, সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?'

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে, তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসি–পিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, 'মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সে জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।'

মাসি বলে, 'পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে দিনভর রাতভর?'

পিসি বলে, 'লাথির চোটে ফের গভ্ভোপাত হতে? না মরতে?'

'গভ্ভোপাত?' কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, 'ফের গভ্ভোপাত? সত্যি নাকি মাসি? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হল পিসি?'

মাসি বলে, 'কিসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলেশ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসে নি ঘন ঘন ওকে নিতে? থাকে নি দুদিন চার দিন করে?'

পিসি বলে, 'মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখি নি জামাই–আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াই নি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?'

মাসি বলে, 'ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।'

পিসি বলে, 'না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।'

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায় নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে, 'তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্য। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছ। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জান মাসি, জান পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।'

আহ্লাদী একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কয়েক বার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, 'জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?'

বলে মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাঁটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি!

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি-পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন—খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসি-পিসির সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি-বা সম্ভব অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসি-পিসি আহ্লাদীর জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে না-পেল যদি তো না-খেয়েই। অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারদিকে না-খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি; একদিন মাসি বলে পিসিকে, 'একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।'

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয়তো মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসি-পিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসি–পিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখ–দুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে, কেই–বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হত এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হত তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হত এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হত, মাসি–পিসিও বিশেষ কিছু বলত কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসি–পিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বৌ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, 'ডরাস্‌নি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?'

পিসি বলে, 'দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলি নি কৈলেশকে।'

মাসি বলে, 'চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা। মা–মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।' পিসি বলে, 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মতো, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে। রাতদুপুরে চুর হয়ে এসে হাতে পায়ে ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী—খোকা যেতে পাগলের মতো দিবারাত্তির মাল খেয়ে খেয়ে নিজেও গেল।'

মাসি বলে, 'তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।'

পিসি বলে, 'তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের?'

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসি–পিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয় নি, শুয়েবসেই দিন কেটেছে। তবু মাসি–পিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসি–পিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসি–পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কি না যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসি–পিসির কাছে। মাসি–পিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়ে নি। মাসি–পিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসি–পিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসি–পিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসি–পিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়গড় হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা, আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসি–পিসি—আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সেই এখানকার কর্তা, সেই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসি–পিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দুজনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসি–পিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসি–পিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।'

মাসি বলে, 'এত রাতে?'

পিসি বলে, 'মরণ নেই?'

কানাই বলে, 'দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

মাসি–পিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠালগাছের ছায়ায় তিন–চার জন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসি–পিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে।

ওরা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, 'মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?'

পিসি বলে, 'আমি যাই চলো?'

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসি–পিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, 'কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।'

পিসি বলে, 'সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।'

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, 'কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এতরাতে কাছারিবাড়ি যেতে লজ্জা করে। কাল সকালে যাব।'

পিসি বলে, 'এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?'

কানাই ফুঁসে ওঠে, 'না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।'

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, 'বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।'

পিসি বলে, 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু–একটার।'

দু–পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসি–পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসি–পিসির।

মাসি বলে, 'শোনো কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েনোক পারব না জানি কিন্তু দুটো–একটাকে মারব জখম করব ঠিক।'

পিসি বলে, 'মোরা নয় মরব।'

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসি–পিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, 'ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনাদ্দন! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী...'

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরো নিঝুম আরো থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসি–পিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসি–পিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করে নি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসি–পিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, 'জান বেয়াইন, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি।'

পিসি বলে, 'তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।'

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে।

মাসি বলে, 'সজাগ রইতে হবে রাতটা।'

পিসি বলে, 'তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।'

আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গরুটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরোনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরো জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি–পিসি।

টিচার

রাজমাতা হাইস্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত টিচারদের কিছু সদুপদেশ দেওয়া স্থির করল। বুড়ো বয়সে এমনিতেই তার ঘুম হয় কম, তার ওপর এইসব যাচ্ছেতাই খাপছাড়া ব্যাপারে মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় কদিন আর ঘুম হয় নি। টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকি থাকে বলে, এটা সেটা হরেকরকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে। বাপের জন্মে রায়বাহাদুর এমন কথা শোনে নি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙড় যে ধর্মঘট করবে?

শুধু তার স্কুলে এসব গোলমালের সম্ভাবনা ঘটলে সে অবশ্য ব্যাপারটা গ্রাহ্য করত না। দুটো ধমক দিয়ে একটা মিষ্টি কথা বলে, সকলকে খেপাচ্ছে কোন মাথাপাগলা ইয়ং টিচারটি সন্ধান নিয়ে তাকে একচোট মজা দেখিয়ে সব ঠিক করে দিত অনায়াসে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের সব স্কুলের টিচাররা জোট বেঁধেছে, সম্মেলন করছে। খেতে পায় না ব্যাজ পরছে। করুক, পরুক। যা খুশি করুক অন্য স্কুলের টিচাররা, তার স্কুলে সে ওসব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেবে না, ওসব হীনতা স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকতে পারবে না তার পবিত্র শিক্ষায়তনে।

স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বরণ করে, বিদ্যালয়ের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব; তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দেবে, শিক্ষা–দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর ধাঙড়ের মতো হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না, রায়বাহাদুর তা বিশ্বাস করে না। মোটামুটি এই ধরনের সদুপদেশ। রায়বাহাদুর শোনাল শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর। অবশ্য অনেক ফেনিয়ে–ফাঁপিয়ে, দমক–গমক–মূর্ছনা আমদানি করে, গুরু–গম্ভীর চালে।

'আপনারা কী বলেন?'

কে কী বলবে? সকলে চুপ করে থাকে। রায়বাহাদুরের ধৈর্য বড় কম, বিশেষত এখন এত লম্বা বক্তৃতা দেবার পর এই গরম একফোঁটাও আছে কি না সন্দেহ, কেউ কিছু বলতে গেলে হয়তো গালাগালি দিয়ে বসবেন, গালে চড় বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়। কিছু বলার দরকারও ছিল না। টিচারদের দাবি–দাওয়া সম্পর্কে এটা অফিসিয়াল মিটিং নয়, রায়বাহাদুরের নিজস্ব সদুপদেশ দানের সভা। চুপচাপ বসে শোনাই এখানে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় হেডমাস্টার শশাঙ্ক কেবল একবার মাথা চুলকিয়ে বলে, 'আজ্ঞে তা বৈকি। শিক্ষক জীবনের মহান আদর্শের কথা কি তারা ভুলতে পারে।'

সভার শেষে শশাঙ্ক একান্তে আবার বলে, 'গত মাসের বাকি মাইনেটার জন্য একটু, যে রকম দিনকাল, সংসার চালানোই—'

'কে উসকানি দিচ্ছে জানেন?'

ক-বছর আগে হলে শশাঙ্ক হয়তো দু-একটা নাম উচ্চারণ করে ফেলত। কিন্তু শশাঙ্কবাবুও আর সে শশাঙ্কবাবু নেই, অনেক বদলে গেছে।

'আজ্ঞে, উসকানি কে দেবে। একজন দুজনের উসকানির ব্যাপার নয়, আপনি তো জানেন, দেশজুড়ে এ রকম চলছে।'

স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে থেকে রায়বাহাদুর বলে, 'গিরীন খুব পলিটিক্স করে বেড়ায় নাকি?'

বুকটা ধড়াস করে ওঠে শশাঙ্কর, গিরীন তার জামাই। মনে মনে আরেকবার গিরীনকে অভিশাপ দিয়ে বলে, 'পলিটিক্স করে না। মিটিং-ফিটিং হলে হয়তো কখনো শুনতে যায়। আর স্কুলে পলিটিক্স নিয়ে কিছুই হয় না।'

'হয় না? সেদিন স্ট্রাইক করে ছেলেরা স্কুলের মাঠে যে মিটিং করল?'

'আজ্ঞে সেটা ঠিক পলিটিক্যাল মিটিং নয়। প্রোটেস্ট মিটিং মাত্র। কলকাতায় স্টুডেন্টদের ওপর গুলি চালানো হল, তারই প্রোটেস্ট—'

'কলার কাঁদিটা বাড়তি হয়েছে না? এবার কেটে ঝুলিয়ে রাখলে পেকে যাবে দু-এক দিনের মধ্যে, কী বলেন?'

'কাল মালিকে বলব। রাতারাতি যেন চুরি হয়ে যায় না, দেখবেন।'

রায়বাহাদুর হাসল।

সন্ধ্যার পর গিরীন বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে রায়বাহাদুর আশ্চর্য হল না। গিরীনের সম্পর্কে তার প্রশ্নে ভড়কে গিয়ে শশাঙ্ক নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দোষ কাটাতে, কথায় কথায় তাকে জানিয়ে দিয়ে যেতে যে ভুলচুক যদি সে করেই থাকে তিনি যেন ক্ষমা করে নেন, এবার থেকে সে সাবধান হবে। তাই যদি হয় তবে ভালোই।

গিরীন কিন্তু ওসব কথার ধার দিয়েও যায় না। খুব বিনীত ও নম্রভাবে পরদিন তার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন জানায়। রায়বাহাদুর অবশ্য বুঝতে পারে তার মানেও তাই। খানিকটা স্পষ্টভাবে জানানোর বদলে ইঙ্গিতে জানানো যে সে অনুগতই, রায়বাহাদুর যা অপছন্দ করেন তা থেকে সে তফাত থাকবে, তাকে চটাবে না।

'অন্নপ্রাশন? ছোট ছেলের? তা বেশ, কিন্তু আমি নেমন্তন্নে যাই না, বুড়ো শরীরে সয় না ওসব।' রায়বাহাদুর অমায়িকভাবে হাসে।

'আপনাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।' গিরীন বলে নাছোড়বান্দার জোরালো অনুনয়ের সুরে, 'সকাল সকাল গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবেন শুধু, একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড় আঘাত পাব না গেলে।'

রায়বাহাদুর যেতে রাজি হয়েছে ধরে নিয়েই যেন একটু ইতস্তত করে গিরীন আবার বলে, 'একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা উপহার কিছু নিয়ে আসবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের রীতি আছে, কোনো কাজে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কারো কাছে সামান্য উপহারও নেওয়া চলবে না। ঠাকুরদা বা তাঁর বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন, একগাছি তৃণ নিলে নাকি বংশের সর্বনাশ হবে।'

'বল কী হে?'

একটা দুশ্চিন্তা কেটে যায়, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গেলে কিছু দিতে হবে এ চিন্তাটা ছিল রায়বাহাদুরের। এবারে একটু ভেবে গিরীনের একান্ত আগ্রহ দেখে, রাজি হয়ে বলল, 'এত

করে যখন বলছ–

সে কিছু খাবে না, কিন্তু এই সুযোগে মিষ্টি প্রভৃতি তার সঙ্গে কি দেবে না গিরীন? রায়বাহাদুর ভাবে। অনেকেই দেয়।

প্রায় দশটায় রায়বাহাদুর গিরীনের বাড়ি পৌঁছল। বাড়ি দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসবের চিহ্ন না দেখে আরো বেশি। এত ছোট, এত পুরোনো, এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ি হয়, রায়বাহাদুর জানত না। কারণ, এর চেয়েও খারাপ বাড়ি চারদিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও সে কোনোটার দিকে কখনো তাকিয়ে দেখে নি—এ ধরনের বাড়ির অধিবাসী কস্মিনকালেও তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায় নি। ছেলের অন্নপ্রাশন রীতিমতো একটা উৎসবের ব্যাপার। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্যান্ড বেজেছিল। মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে সে অন্তত সানাই বাজায়। লোকে গিজগিজ করে তার বাড়িতে, ছেলের বেলা বেশি হোক, মেয়ের ছেলের বেলা কম হোক, গিজগিজ করে। গিরীনের বাড়িতে লোক আছে বলেই মনে হয় না। ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসে ছোট একটা ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্না।

গাড়ির আওয়াজে বেরিয়ে এসে গিরীন তাকে অভ্যর্থনা জানায়, 'যথাসাধ্য আয়োজন করেছি, দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন।'

যথাসাধ্য আয়োজন? বৈঠকখানার ভাঙা তক্তপোশে, বিছানো ছেঁড়া ময়লা শতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী-পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবুথবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোমওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তপোশ ছাড়া বসবার আসন আছে আর একটি, কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত হয় তার প্রমাণ, গুটানো কাঁথা-মশারির বান্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে, তক্তপোশের নিচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধিটা বোধ হয় কারো মাথায় আসে নি।

'ইনি আমার বাবা', গিরীন পরিচয় করিয়ে দেয়, 'দুবছর ভুগছেন। আর বছর ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে, পেরে উঠি নি, সাত-আটশ টাকার ব্যাপার।'

জবুথবু বৃদ্ধ কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। দুটি হাত একত্র করে নমস্কার জানাবার মতোই যেন চেষ্টা করে মনে হয়। ক্ষীণকণ্ঠে কী বলে ভালো বোঝা যায় না।

'আসুন। ভেতরে চলুন।'

রায়বাহাদুরকে গিরীন বাড়ির মধ্যে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। উঠান পেরিয়ে যাবার সময় এদিক-ওদিক তাকায়, তাকিয়ে রায়বাহাদুর যথাসাধ্য আয়োজনের কোনো চিহ্নই দেখতে পায় না। রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়িতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ির ঝিয়ের মতোই, তবে রায়বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়িরই কোনো বৌ-ঝি। ওপাশে রান্নাঘরে খুন্তি দিয়ে কড়ায় ব্যান্নন নাড়ায় রত বৌটির শাঁখা-পরা হাতটি শুধু চোখের এক পলকে দেখেই কী করে যেন রায়বাহাদুর টের পেয়ে যায় যে সে গিরীনের বৌ।

চার ভিটেয় চারখানা ঘর তোলার সুযোগ থাকলেও, বৈঠকখানাটি বাদ দিলে ভেতরে ঘর মোটে দুখানা—রান্নাঘরের চালটি ছাড়া। গিরীনের শোবার ঘরখানার নমুনা দেখেই

রায়বাহাদুর বুঝতে পারে অন্য ঘরখানা কেমন, নড়াচড়ার স্থান কতটা, কী রকম আলোবাতাস আসে।

জলচৌকিতে পাতা পুরোনো কার্পেটের আসনে বসে রায়বাহাদুরের দম আটকে আসে। ছোট ছেলে বা মেয়ের কান–চেরা কান্নাটা এখন খুব কাছে মনে হয়।

'কে কাঁদে?'

'ছেলেটা কাঁদছে, ছোট ছেলেটা। যার মুখে ভাত, জ্বর আসছে বোধ হয়, জ্বর আসবার সময় এমনি করে কাঁদে। জ্বর এসে গেলে চুপ করে যাবে।'

রায়বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করে, এদিক–ওদিক তাকায়, একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে মনে হয় তার। গিরীন নীরবে তাকে লক্ষ করে, ফাঁদে–পড়া হিংস্র জন্তুর দিকে শিকারি ব্যাধের মতো শান্ত নির্বিকারভাবে মুখ তার থমথম করে মনের আপসহীন মনোভাবে।

'আপনি তো ভালো হোমিওপ্যাথি জানেন। সবাই বলে যে ডাক্তারি পাস করেন নি বটে, কিন্তু আপনার ওষুধ একেবারে অব্যর্থ।' সে বলে ব্যঙ্গ ও তোষামোদের সুরে। 'ছেলেটাকে দেখে দিন না একটু ওষুধ? বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে ছেলেটা।'

রায়বাহাদুর যেন রাজি হয়েছে তার ছেলেকে দেখে ওষুধ দিতে এমনি ভাবে দরজার কাছে গিয়ে গিরীন ডাকে, 'শুনছ? খোকাকে নিয়ে এসো শিগগির। আহ, এসো না নিয়ে! দেরি করছ কেন?'

নিজের অতিরিক্ত ধৈর্যের কৈফিয়ত দেবার জন্যই যেন রায়বাহাদুরের কাছে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'আর পারি না এদের সঙ্গে। আপনার সামনে আসবে যা পরে আছে তাই পরে, তাতেও লজ্জা। সম্বল তো সেই বিয়ের একখানা শাড়ি, এক ঘণ্টা লাগবে এখন সেখানা বার করে পরতে। আর পারি না সত্যি।'

সে এসে কৈফিয়তের বিরক্তি জানানো শুরু করতে না করতেই ছোট একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাঁশুটে রঙের রোগা একটি বৌ দরজা দিয়ে ঢুকছিল। একনজর তাকিয়েই রায়বাহাদুর টের পায় পরনের কাপড় বদলে বিয়ের সময়কার একমাত্র শাড়িটি সে পরে আসে নি। এটাও সে টের পায় যে ওকে আসতে দেখেই গিরীন তার কাছে এসে শোনাচ্ছে তার বৌয়ের মানুষের সামনে বার হবার উপযুক্ত কাপড়ের অভাবের কথা। তার প্রায় পিছুপিছুই বৌটি ঘরে ঢুকেছে। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রায়বাহাদুরের। তার ভয় করে।

'ও তুমি এসেছ', গিরীন বলে নির্বিকারভাবে, 'এইখানে শুইয়ে দাও।'

রায়বাহাদুরের উলের মোজা আর পালিশ–করা দামি চকচকে জুতো–পরা পায়ের কাছে মেঝেটা সে দেখিয়ে দেয়। বৌ তার ইতস্তত করে, বড় বড় জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তার মুখের দিকে। এত শীর্ণ বৌটি, এমন শুকনো বিবর্ণ তার রক্তশূন্য মুখ, কিন্তু তার রূপ দেখে ভেতরে ভেতরে মুচড়ে যায় রায়বাহাদুর। তার বাড়ির মেয়েরা, ফুলি ঝিটা পর্যন্ত যেন শুধু মেদ আর মাংস। গিন্নির কথা ধর্তব্যই নয়। তিনি প্রায় গোলাকার। তাঁর মেজ মেয়ে আর মেজ ছেলের বৌ রোগা ছিপছিপে, বড় ছেলের বৌটাও ছিপছিপে ছিল বিয়ের সময়, আজকাল মুটোচ্ছে। গিরীনের ক্ষীণাঙ্গী বৌটির সাথে মিলিয়ে রায়বাহাদুর বুঝতে পারে। তার মেয়ে–বৌদের গড়নটাই শুধু ছিপছিপে, অতি বেশি মেদ–মাংসেই তারা গড়া, প্রত্যেকে তারা তার গিন্নিরই সূচনা। সত্যিকারের রোগা, ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভালো লাগে—রায়বাহাদুরের এত তীব্র ইচ্ছা করে টিপেটুপে ছেনেছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে।

'কী করছ?' গিরীন বলে বৌকে অনুযোগ দিয়ে, 'ওখানে শুইয়ে দাও। উনি পায়ের

ধুলো ছোঁয়াবেন, আশীর্বাদ করবেন। ওষুধ দেবেন।'

'না! মা!' রায়বাহাদুর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমি ওকে ওষুধ দিতে পারব না। ওর ভালো চিকিৎসা দরকার। ওকে তুমি ডাক্তার দেখাও, ভালো ডাক্তার দেখাও।'

'বিনা ফী-তে কোন ডাক্তার দেখবে বলুন?' গিরীন যেন আমোদ পেয়ে মুচকে মুচকে হাসে।

ভয় করে রায়বাহাদুরের। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে ওঠে। কতক্ষণ খেলা করবে গিরীন তার সঙ্গে কে জানে, তারপর এই বর্বর নিষ্ঠুর খেলার শেষে কী করবে তাই বা কে জানে। এরা বিপ্লবী, এরা খুনে, এরা সব পারে। শশাঙ্কর জামাই বলে, তার স্কুলের একজন টিচার বলে বিশ্বাস করে একা একা এই ছদ্মবেশী খুনের খপ্পরে এসে পড়ে কী বোকামিটাই সে করেছে।

সব অবস্থাতে যেভাবেই হোক নিজেকে বাঁচানোর কৌশল খুঁজে বার করে কাজে লাগানোর চেষ্টা রায়বাহাদুরের মজ্জাগত। রায়বাহাদুর মাথা হেঁট করে থাকে কয়েক মুহূর্ত, সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করে। হাতের তালুতে মুছে নেয় নিজের কপাল। তারপর মুখ তুলে বলে, 'মা, খোকাকে শুইয়ে দাওগে। কিছু তুমি ভেবো না মা। বৌমাই বলি তোমাকে, গিরীন আমার ছেলের মতো। তোমার কোনো ভাবনা নেই বৌমা, ছেলে তোমার ভালো হয়ে যাবে, আমি তোমার ছেলের চিকিৎসার ভার নিলাম। আমি এক্ষুনি গিয়ে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

'এখুনি যাবেন? তা হবে না, ফলটল একটু মুখে না দিয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে আমাদের মনে। অকল্যাণ হবে আমাদের। আপনার মতো মানুষ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—'

গিরীনের বিনয়ে বুকটা ধড়াস ধড়াস করে রায়বাহাদুরের। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পায়ের চকচকে জুতোর দিকে। অতি কষ্টে বলে, 'বেলা মন্দ হয় নি। নিমন্ত্রিতেরা আর কেউ?'

'আজ্ঞে বলি নি আর কাউকে। ইচ্ছা ছিল বলবার, ভেবেছিলাম ওনার হাতের দুগাছা চুড়ি আছে তার একটা বেচে দিয়ে কয়েকজনকে বলব, স্কুলমাস্টারের স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলেই ঢের। তারপর ভাবলাম ছেলের মুখে-ভাতে শেষ সম্বলটুকু খোয়াব, তার চেয়ে বরং সম্বলটা থাক, ও মাসেও পুরো মাইনে না পেলে উপোসটা ঠেকানো যাবে।'

বুড়ো হলেও বুদ্ধির ধার একেবারে পড়ে যায় নি রায়বাহাদুরের। জীবনে উঠতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছে অনেকবার, নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই নিজের মুশকিল আসান করেছে। আজকের বিপদের ধরনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এটাই হয়েছে ফ্যাসাদ। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছে না গিরীনের। নিজের দুর্দশা চোখে দেখিয়ে তার দয়া জাগাবার সাধ থাকলে চোখে এভাবে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি কেউ তা দেখায়, পাগল ছাড়া? তাকে বিরক্ত করে, চটিয়ে এমন টিটকারি দেওয়ার ভঙ্গিতে দেখায়, এমন উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে কাল টিচারদের সভায় কিছু না বলে গিরীন যেন ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি টেনে এনে বাস্তব প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার বক্তৃতার, ব্যঙ্গ করছে তাকে। কিন্তু কেন করছে সেটা তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রায়বাহাদুরের। তার স্কুলের একজন টিচার কি এত বড় গাধা যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না। এভাবে তার কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ আদায় করা যায় না। এতে বরং তারই বিপদ, সমূহ বিপদ?

মুখের ভাবে গলার সুরে সহানুভূতি আনবার চেষ্টা করে রায়বাহাদুর বলে, 'তোমার অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশন দিও, ও মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। তুমি ভালো পড়াও শুনেছি। আর বাকি মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।'

গিরীন ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলে, 'তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের

মুখে–ভাতের ছলে আপনাকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার।'

চোখের পলক আটকে যায় রায়বাহাদুরের, ঢোক গিলতে গিয়ে দেখে সেটাও আটকে গেছে। ঘরের যে অসীম দৈন্য ভিখারির সকরুণ আবেদনের মতো এতক্ষণ তাকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা দাবিদারের শাসানির মতো ফুঁসে উঠেছে। উঠানে তিনটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে খেলা করছে ধুলামাটি নিয়ে, খেলা যেন ছল ওদের, রায়বাহাদুরকে ওরা অবজ্ঞা জানাচ্ছে। ও–ঘরে জ্বরো ছেলেটার কান্না ঝিমিয়ে এসেছে—কিন্তু সেও যেন ভয় দেখাল রায়বাহাদুরকে, কান্না নিস্তেজ হয়ে আসা যেন ঘোষণা বাচ্চাটার যে কান্না সে চিরতরে থামিয়ে দেবে, সে মরবে, মরে দায়ী করে রেখে যাবে তাকে।

তাকে আরো শাসানো দরকার বলেই যেন গিরীনের পরিবারের আরো দুজনে এবার আসরে নামে। প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একটি কুমারী মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে।

'দ্যাখ গিরীন, দ্যাখ, ধেড়ে মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ। ডাল ধুতে দিয়েছি, লুকিয়ে কাঁচা ডাল চিবোচ্ছে!'

গিরীনের মা থেমে যান, জিভ কাটেন। মেয়েটি পালিয়ে যায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে। এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মাও সরে যান।

'আমি এবার উঠি গিরীন।'

'একটু বসুন।'

গিরীন বেরিয়ে যায়। গিরীন ফিরে আসবার একটু পরে সেই চুপি চুপি ডাল–খাওয়া মেয়েটি একটি রেকাবিতে দুটি সন্দেশ, একটি কলা, কয়েক টুকরো আপেল ও শশা নিয়ে জড়সড় হয়ে ঘরে আসে। বাঙালি গেরস্তঘরের হিসাবে বিয়ের বয়স তার পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। মেয়েটি রোগা, পুষ্টির অভাবে সত্যিকারের রোগা। সত্যিকারের রোগা মেয়ের দিকে তাকাবার মোহ কিন্তু তখনকার মতো কেটে গিয়েছিল রায়বাহাদুরের, নীরবে সে দু–এক টুকরা ফল মুখে দিতে থাকে।

বৈঠকখানা দিয়ে যাবার সময় চৌকির প্রান্তের জরাজীর্ণ মানুষটি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়, রায়বাহাদুর একনজর দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যায় বাইরে।

সোমবার গিরীন নোটিশ পায়, বরখাস্তের নোটিশ। সে প্রত্যাশা করছিল। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিত রায়বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায়বাহাদুর ভুলতে পারে না, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলো, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা, দয়া–মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।

ছিনিয়ে খায় নি কেন

'দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায় নি। কেন জানেন বাবু?'

'এক জন নয়, দশ জন, শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বরবাদ হয়ে গেছে। ভিক্ষের জন্য হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্য, কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায় নি। অথচ হাত বাড়ালেই পায়। দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে খাবার, সামনে রাস্তায় ধন্না দিয়েছে ফেলে-দেওয়া ঠোঙার রসটুকু, খাবারের কণাটুকু চাটবার জন্যে। হাটবাজারে রয়েছে ফলমূল তরিতরকারি, দোকানে আড়তে চাল ডাল তেল নুন, লুকানো গুদামে চালের পাহাড়, বড়লোকের ভাঁড়ারে দশ বিশ বছরের ফুড—ফুড কথাটা চালু হয়েছে বাবু আপনাদের কল্যাণে, ভোঁতকা গাঁয়ের হোঁতকা তাঁতিও জানে কথাটা আর কথাটার মানে। গরিবের মুখে না উঠে যে চাল ডাল তেল নুন গুদোম থেকে গুদোমে কেনাবেচা হয়ে চালান যায়, তাকে বলে ফুড। হ্যাঁ, মাছ-মাংস, দুধ-ঘিও ফুড বটে। দশটা জিনিসের দশটা নাম বলতে লিখতে কষ্ট হয় বলে আপনারা ফুড চালিয়েছেন, চেঁচিয়েছেন ফুড সমস্যার বিধান চাই। তা, অত কষ্টে কাজ কী ছিল। ফুড না বলে চাল বললেই হত। শুধু চাল কাঁড়া-আকাঁড়া, পোকায় ধরা, যেমন হোক চাল। মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, তেল-নুন এ সব দশটা জিনিস তো চায় নি যারা না-খেয়ে মরেছে। শুধু দুটি চাল দিলে হত তাদের, ফুডের জন্য মাথা না ঘামিয়ে। গাছে পাতা আছে, জঙ্গলে কচু আছে। তারা মরত না। রোজ দুটি আসেদ্ধ শুকনো চাল চিবিয়ে খেলেও মানুষ মরে না। আপনি মানবেন না, কিন্তু সত্যি মরে না বাবু। যত নেতিয়ে যাক, ধুকধুক প্রাণডা নিয়ে জীবন্ত থাকে।'

চালার বাইরে ক্ষেতখামার আম-জাম কাঁঠাল-ঘেরা খড়ো ঘরগুলোতে বেলাশেষের ছায়া গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যায়। উবু হয়ে বসে আনমনে যোগী জোর টানে তামাকের ধোঁয়ায় বুক ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা বার করে দিতে থাকে। সামনেই টানছে তামাক, আড়াল খোঁজে নি, একটু পিছু ফিরে বা একটু ঘুরেও বসে নি। এটা লক্ষ করবার বিষয়। তামাক সেজে আগে অবশ্য আমাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাতে খেলো হুঁকোটা ধরে, বাঁ হাতে সেই হাতের কনুই ছুঁয়ে থেকে। জলহীন হুঁকোয় অত কড়া তামাকের তপ্ত ধোঁয়া টানবার ক্ষমতা প্রথম বয়সে ছিল, এখন আর পারি না। সিগারেট ধরিয়ে যোগীকেও একটা অফার করেছিলাম। মৃদু হেসে সিগারেটটা নিয়ে সে গুঁজেছিল কানে।

শুনেছিলাম সে নাকি নামকরা ডাকাত, তার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারাটা মোটেই মেলে নি তার সঙ্গে। বেঁটেখাটো লোকটা, শরীরটা খুব শক্তই হবে, আর কিছুই নয়। বাবরি ছাঁটা ঝাঁকড়া চুল পর্যন্ত নেই। জেলে হয়তো ছেঁটে দিয়ে থাকবে কদমছাঁটা করে, এখনো বড় হবার সময় পায় নি। এদেশের রণ-পা চড়া, লাঠি

ঘুরিয়ে বুলেট ঠেকানো, নোটিশ দিয়ে ধনী জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করতে যাওয়া, বড়লোকের ওপর ভীষণ নিষ্ঠুর, গরিবের ওপর পরম দয়ালু, খেয়ালি, ধূর্ত, উদার বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনীতে তাদের বিরাট দেহ আর অদ্ভুত অমানুষিক শক্তির কথা পড়েছি। যাদের ভীষণ আকৃতি দেখলেই লোকের দাঁতকপাটি লাগত, হুঙ্কার শুনলে কয়েক মাইল তফাতে গর্ভপাত হত স্ত্রীলোকের। বড়লোকের টাকা লুটে তারা গরিবকে বিলিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথেঘাটে মুমূর্ষুর, সুযোগমতো চুরি-ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে শোনা যায়। সাতকোশি খালে সরকারি চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু-বছর জেল হয় তার।

যোগী কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে বুঝে মনে করিয়ে দিলাম, 'মরছে তবু ছিনিয়ে খায় নি কেন—যে কথা বলছিলে?'

'ও, হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ। আমি জানি কেন ছিনিয়ে খায় নি, শুধু আমি, একমাত্র আমিই জানি। কেউ জানে না আর। আপনার মতো অনেক বাবুকে শুধিয়েছি, তারা সবাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এটা-সেটা বলেন, বড় বড় কথা। আবোল-তাবোল লম্বাচওড়া কথা। আসল ব্যাপারে সেরেফ ফাঁক। বোঝেন না কিছু, জানেন না কিছু, বলবেন কী। এক বাবু বললেন, বেশিরভাগ তো গরিব চাষি, নিরীহ গোবেচারা লোক, কোনোকালে বেআইনি কাজ করে নি। লুট করে কেড়ে নিয়ে খাবার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। শুনলে গা জ্বলে বাবু। সাধ যায় না, চাঁছা গালে একটা থাপড় দিয়ে কানডা মলে দিতে? বেআইনি কাজ, বেআইনি! যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেব করেছে কাজটা আইনি না বেআইনি, ছিনিয়ে খেলে তাকে পুলিশ ধরবে, তার জেল হবে। জেলে যেতে পারলে তো ভাগ্যি ছিল তার? মেয়ে বৌকে ভাড়া দিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, সুযোগ পেলে তার চেয়ে কমজোরি মর-মর সাথির গলা টিপে মেরে ফেলেছে যদি একমুঠো খুদ জোটে, তার কাছে আইন। আরেক বাবু বললেন, ওটা কী জান যোগী, ওরা সব মুখ্যু গরিব, চাষাভুষো মানুষ, অদেষ্ট মানে। না-খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান, উপায় কী—এই ভেবে মরেছে না-খেয়ে, লুটেপুটে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে নি। শুনেছেন বাবু কথা, আঁতজ্বালানি পণ্ডিতি কথা? সাপে কাটে, রোগে ধরে, আগুন লাগে,বন্যা হয়, আকাল আসে—সব অদেষ্ট বটেই তো, কে না জানে সেটা? তাই বলে সাপে কাটলে বাঁধন আঁটে না, ওঝা ডাকে না? রোগে বড়ি-পাঁচন, শিকড়-পাতা খায় না, মানত করে না? ঘরে আগুন লাগলে দাওয়ায় বসে তামুক টানে? ফসল বাঁচাতে যায় না বন্যা এলে? আকাল অদেষ্ট বলে কেউ ঘরে বসে হাতপা গুটিয়ে মরেছে একজন কেউ ওদের? যা কিছু আছে বেচে দেয় নি বাঁচার জন্যে, ছেলেমেয়ে, বৌ, বোনসুদ্ধ? ছুটে যায় নি শহরে, বাবুদের রিলিফখানায়? অদেষ্ট মানে, হ্যাঁ, অদেষ্টে মরণ থাকলে মরবে জানে, হ্যাঁ, তাই বলে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারলে চেষ্টা করে দেখবে না একবারটি? আরেক বাবু বললেন—'

'বাবুরা কী বলেন জানি যোগী। তোমার কথা বলো।'

'শোনেন না বাবু মজার কথা, হাসি পাবে শুনলে। বললেন কী? না আধপেটা খাওয়া, উপোস দেয়া ওদের চিরকেলে অভ্যাস। ঘটিবাটি, জমিজমা তো চিরজন্মই বেচে আসছে পেটের জন্যে। আকাল তো ওদের লেগেই আছে বছর বছর। বলতে বলতে গলা সত্যি ধরে এসেছিল তেনার, দুঃখীর তরে দরদ ছিল বাবুর। নাক ঝেড়ে, গলা খাঁকরে তারপর বললেন, বড় আকাল এল, ওরাও এইভাবে লড়াই করল বাঁচতে, চিরকাল যেমন করে

এসেছে, ঘরে ভাত না থাকলে যা করা ওদের অভ্যেস। আমি বললাম, তা নয় বুঝলাম বাবু, না-খাওয়াটা ওদের অভ্যেস ছিল। কিন্তু মরাটাও কি অভ্যেস ছিল বাবু?'

যোগী হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে। বুঝতে পারি অনেকবার অনেককে শোনালেও এই পুরোনো মর্মান্তিক রসিকতার রস তার কাছে জলো হয় নি।

'বললাম, ধরুন একটা দোকান, তাতে কিছু চাল আছে। লোক মোটে দুটো কি তিনটে দোকানে। সাত দিন উপোস দিয়ে আছে এক কুড়ি দেড় কুড়ি লোক, জানে যে চাল কটা পেলে বাঁচবে নয়তো মিত্যু নিশ্চয়। অত সব নয় নাই জানল, পেটে তো খিদে ডাকছে। হানা দিয়ে চাল কটা ছিনিয়ে নিলে ঠেকাবার কেউ নেই। তা না করে ফেউ ফেউ করে শুধু ভিক্ষে চাইল কেন ওরা? দোকানি দূর-দূর করে খেদিয়ে দিতে আবার গেল কেন অন্য জায়গায় ভিক্ষে চাইতে? এমন কত দেখেছি সহজে ছিনিয়ে নেবার খাসা সুযোগ কিন্তু ছিনিয়ে না নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে দয়া চেয়েছে, না পেয়ে মরেছে। বাবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দিলেন। সেই অভ্যেসের কথা, দশজনে মিলে দল বেঁধে লুট করতে কি ওরা জানত, না কথাটা ভাবতে পেরেছে, খুদকুঁড়ো নিয়ে বরং মারামারিই করছে নিজেদের মধ্যে। আসল কথাটার জবাব নেই। জানলে তো বলবেন? জবাবটা জানি আমি। শুধু আমি। আর কেউ জানে না। তবে বলি শুনুন।'

'ডাকতেছ?'

ঘরের ভিতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটি প্রদীপ জ্বলতে সেদিকে নজর পড়েছিল। প্রদীপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল কালোপেড়ে কোরা শাড়ি পরা ঢ্যাঙা একটি যুবতী। মনে হল, যোগীর উদ্ধার-করা মেয়েদের একজন নয় তো? তার পরেই খেয়াল হল, যোগী প্রায় দুবছর জেলে কাটিয়ে মোটে মাস তিন-চারেক আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

'তামাক দে।'

প্রদীপটা চৌকাটে বসিয়ে দিয়ে সে তামাক সাজতে গেল।

'আমার পরিবার', যোগী বলল, 'হারিয়ে গেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এক মাস দেড় মাস ধরে খুঁজে খুঁজে বার করেছি সদরে।'

ব্যাপারটার ইঙ্গিত বুঝে চুপ করে রইলাম। বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে প্রায় গোটা চাঁদটার জোছনা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'যা বলছিলাম বাবু। সর্বনাশা দিনগুলোর কথা জানেন তো সব, নিজের চোখে দেখেছেন সব। আপনাকে বলতে হবে না বন্ননা করে। আমি তখন হকচকিয়ে গেছি। না খেয়ে লোক পথেঘাটে মরছে দেখে মনে বড় কষ্ট। আর গায়ে জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, সা জোতদার, নন্দ আড়তদার, সরকারি কর্তা করিম সায়েব, পুলিনবাবু—এদের কাণ্ডকারখানা দেখে এলাম। কলকাতা গিয়ে পর্যন্ত কাটিয়ে এলাম সাত দিন, সাত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। বুঝি না ব্যাপারটা কিছু, যত ভাবি মাথা গুলোয়ে যায়, অন্নের তো অভাব কিছু নেই, এত লোক মরে কেন ছিনিয়ে না খেয়ে? গরুছাগল তো মাঠে ঘাস না পেলে ক্ষেতে ঢোকে, মার খেয়ে নড়তে চায় না সহজে, বাগানে ফুলগাছ খায়, ঘরের চালা থেকে খড় টেনে নেয়। এগুলো মানুষ হয়ে করছে কী? ধান-চাল লুট করি দু-এক জাগায়, বিলিয়ে দি এদিক ওদিক, মন মানে না। একা আমি দু-চার জনকে নিয়ে লুটেপুটে কটাকে খাওয়াব? বাঁধা দল আমার ছিল না বাবু কোনোকালে, পেশাদার ডাকাত আমি নইকো, যাই বলুক লোকে আর পুলিশে আমার নামে অকথা কুকথা। আপনার কাছে লুকাব না, মাঝে দল গড়ে হানা দিয়ে লুট করেছি টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি, মারধর করেছি, কিন্তু মানুষ একটা মারি নি বাপের জন্মে, বাপ যদি

জন্ম দিয়ে থাকে মোকে। কাজ ফতে করে দল ভেঙে দিয়েছি ফের। টাকা-পয়সার বদলিতে ধানচাল লুটের জন্য দল একটা গড়তে চাইলাম, স্যাঙাতেরা কেউ স্বীকার গেল না দুজন ছাড়া। ডাকাতি করব সোনাদানার বদলে ধানচালের জন্যে, তাও আবার বিলিয়ে দেব, শুনে ওরা ভাবল হয় মাথাটা মোর বিগড়ে গেছে একদম, নয় তামাশা করছি ওদের সাথে। দুজন যারা এল, তারা ছোকরা বয়সী, ওস্তাদ বলে মোকে মানত। দুজনকে নিয়ে মোটা দাঁও কী মারব বলুন, ছুঁক-ছাঁক দু-দশ মণ চাল তো পেলে কেড়ে নি, বিলোতে গিয়ে শুরু করতে না করতে ফুরিয়ে যায়। দেশজুড়ে সবার পেটের চামড়া চামচিকে, কজনকে দেব আমি? ভাবলাম দুত্তোর! এ শখের কেরামতি দেখিয়ে আর কাজ নেই। মোর দুমুঠো বালির বাঁধে কি এই মড়কের বন্যা ঠেকানো যাবে? তার চেয়ে এক কাজ যদি করি তবে হয়তো ফল হবে কিছুটা। না-খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে। নিজের পেট ভরাবার ব্যবস্থা নিজে যদি না ওরা করতে পারে আমার গরজ! না, কী বলেন বাবু?'

সদরের মন্দ বস্তি থেকে খুঁজে উদ্ধার করে আনা যোগীর পরিবার ফুঁ দিতে দিতে কলকে এনে দেয়। কলকের আগুনে লালিয়ে লালিয়ে ওঠা তার ভোঁতা লম্বাটে মুখে মন্দ মেয়ের বস্তির জীবনের কোনো ছাপ চোখে পড়ে না, বরং শান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভর খুঁজে পাই।

'সেই থেকে বসে আছেন', যোগী বলে কলকেটা হুঁকোয় বসিয়ে, তার পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে কথা শেষ হবার অপেক্ষায়, 'একটু চা দিয়ে যে ভদ্রস্থতা করব তার ব্যবস্থা নেই গরিবের ঘরে। দুটো চিড়ের মোয়া খাবেন বাবু, নতুন গুড়ের টাটকা মোয়া?'

ভদ্র অতিথিকে নিয়ে তার বিপন্ন ভাব অনুভব করে বলি, 'খাব না? এতক্ষণ বলতে হয়। জোর খিদে পেয়েছে, আমি ভাবছি কী ব্যাপার, মুড়ি চিড়ে কিছু কি নেই যোগীর, খেতে বলছে না।' যোগীর পরিবারের হাসিটা আধা দেখতে পাই প্রদীপের আলোয়।

'সদরে রিলিফখানা খুলেছে, খিচুড়ি বিলি করে। সটান গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। সেজেগুজে গেলাম, ছেঁড়া নেংটি পরে, উদলা গায়ে, মোচদাড়ি না কামিয়ে। তবু অন্নের অভাব তো ভোগ করি নি কোনো একটা দিন দু-চার বছরের মধ্যে, ওসব কাঁকলাসের সাথে কি মিশ খায় মোর। আড়চোখে আড়চোখে তাকায় সবাই, ভাবে যে এ আবার কোত্থেকে এল। ঝোলের মতো ট্যাকটেকে পাতলা খিচুড়ি যে বিলোয় সে ব্যাটাচ্ছেলে মোকে দেখলেই বলে, হারামজাদা, তুই এখানে কেন, খেটে খাবি যা। মেয়েছেলে দু-একটা দেখেশুনে ভাব জমাতে চেষ্টা করে মোর সাথে, ভাবে যে মোর বুঝি সঙ্গতি আছে অন্তত দু-চার বেলা খাবার—চুপিচুপি শার্ট গায়ে দিয়ে ধুতি পরে শহরে ঢুঁরতে বেরুবার সময় হয়তো-বা দেখে ফেলতে পারে। কান্না পেত বাবু মেয়েছেলে কটার রকম দেখে। মেয়েছেলে। হাড়ে জড়ানো সিঁটে চামড়া, তাতে ঘা-প্যাঁচড়া। আধ-ওঠা চুলের জট খ্যাপার মতো চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গের মতো শুকনো বোঁটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মতো, খোঁচানো হাড্ডি। আর কী দুর্গন্ধ গায়ে, পচা ইঁদুর, মরা সাপের মতো। তাদের চেষ্টা পুরুষের মন ভুলিয়ে একটা বেলা একটু খাওয়া জোগাড় করা পেট ভরে।'

যোগী গুম খেয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পরিবার ডালায় আট-দশটা চিঁড়ার মোয়া আর ছোটখাটো নৈবিদ্যের মতো নারকেল নাড়ু সাজিয়ে এনে আমার সামনে ধরে। পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাঙা ছিপছিপে—তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাঁজে ছোট মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।

মারাত্মক গুম খাওয়া ভাবটা কেটে যায় যোগীর। ওর দিকে তাকিয়েই বলে, 'বাবুকে কি রাক্ষস ঠাওরালি নাকি, আঁ? দুটো মোয়া, দুটো। নাড়ু রেখে তুলে নিয়ে যা সব। গেলাস

নেই তো কী হবে, ঘটিটা মাজা আছে, টিউবওয়েলের জলের কলসি থেকে জল এনে দে ঘটিতে।' একটু থেমে বিনয়ের সুরে হঠাৎ অন্য একটা কৈফিয়ত সে বলে তার পরিবারকে, 'মাছ আর আজ আনা হল না, বিন্দি।'

'মাছের তরে মরছি।' বিন্দি এতক্ষণে এবার প্রথম মুখ খোলে ঝংকার দিয়ে।

'সবাইকে বলি, ছিনিয়ে নিয়ে খাও না? এসো, আমরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়ে খাই। ব্যাপার বুঝছ তো, মোদের খিচুড়ি ভোগের জন্য যে চাল ডাল আসে তার বেশিরভাগ চোরাগোপ্তা হয়ে যায়, নইলে খিচুড়ি এমন নুন জলের মতো লাগে? এমনিও মরব, ওমনিও মরব, এসো বাঁচার তরে লড়াই করে মরি। কর্তারা ভোজ খাবেন, মোরা না খেয়ে মরব! কেড়ে খাই এসো। এমনিভাবে কত করে কত রকমে বুঝিয়ে বলি, কেউ যেন কান দেয় না কথায়। কান দেয় না ঠিক নয়, কানে যেন যায় না কথা। ঝিমোতে ঝিমোতে বলে, 'আঁ, আঁ, কী বলছিলে?' বলে আবার ঝিমোয়, জলো খিচুড়ি এক চুমুকে খাবার খানিক পরে যদি-বা কেউ কেউ একটু উৎসাহ দেখায়, একটু জ্বালা জানায় যে সত্যি এত অন্ন থাকতে তারা না-খেয়ে মরবে এ ভারি অন্যায়—বিকালে তারা নিঝুম হয়ে যায়। রিলিফখানায় সারি দিতে আগুপিছু নিয়ে কামড়াকামড়ি করে, ছোট এক মগ সেদ্ধ চালডালের ঝোলের জন্যে—ছিনিয়ে নিয়ে পেট ভরে ডালভাত খাবার জন্যে কারো উৎসাহ দেখি না।

'একদিন খবর পেলাম, রিলিফখানার জন্যে মোটামতো সরকারি চালান আরেকটা এয়েছে এ্যাদ্দিন পরে, সাত দিন কেন পুরো আধ মাস সত্যিকারের ঘন খিচুড়ি বিলানো চলবে। কিন্তু দেখেশুনে তখন অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে বাবু। যত চালান আসুক, একটা দিনের বিলানো খিচুড়িও সত্যিকারের খিচুড়ি হবে না, চাল ডাল বেশিরভাগ চলে যাবে চোরাবাজারে। সদরে জানাচেনা লোক ছিল কটা। মানে আর কি, আপনার কাছে ঢাকঢাক গুড়গুড় করব না, শহরের চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা বজ্জাত, চোরাগোপ্তা ছোরামারা-গোছের লোকের সর্দার কজন আরকি। ওপরওলাদের সাথে খাতির ছিল ওদের, ওদের ছাড়া চলে না সরকারি বেসরকারি বড়কর্তাদের চোরাকারবার। ওদের একজন একটা ব্যাপারে সাথে ছিল মোর ক-বছর আগে, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছিলাম দু-দশ বছরের জেল থেকে। একটু খাতির করল, খানিকটা মাত্তর। ওর মারফতে আর দু-চার জনকে জড়ো করে, তারাও চিনত জানত মোকে, চাল চেলে, ভাঁওতা মেরে কাণ্ড করিয়ে দিলাম একটা রেলের ইস্টিশানে। চাদ্দিকে হইচই পড়ে গেল। চালানি চালডাল সব গেল রিলিফখানার গুদামে, শেষ বস্তাটি [...।]

'বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, পুরো চারটে দিন ঘন খিচুড়ির সাথে একটা করে আলুসেদ্ধ খেল ভিখিরির দলকে দল সবাই। আদ্দেক লোককে দিতে না দিতে ফুরিয়ে গেল না খিচুড়ি, কেউ বলল না ধমক দিয়ে, ওবেলা আসিস, এখন ভাগ শালার ব্যাটা শালা। আর এটাই আসল কথা মন দিয়ে শোনেন বাবু। ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কানে তোলে নি, দুটো দিন দু-বেলা এক মগ চাল ডাল আর একটা করে আলুসেদ্ধ খেয়ে সকলে কান পেতে শুনতে লাগল আমার কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বজ্জাতরা, কেড়ে নিতে হবে সব, পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে হবে দু-বেলা। আমি যা বলি, সবাই সায় দিয়ে তাই বলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যায়। পরদিন যেন উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। পরের দিন তাদেরই কজন আমার কাছে এসে বলে যে তারা গুদোম থেকে চাল ডাল ছিনিয়ে নিতে রাজি, নিজেরা রেঁধেবেড়ে খাবে। আমি অ্যাদ্দিন জপাচ্ছি তাদের, আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে হবে কখন কীভাবে কোথায় কী করতে হবে গুদোম থেকে মালপত্তর সব লুটপাট করে নিতে হলে।

'কী বোকামিটাই করলাম সেদিন বাবু। ভাবলাম কী, এমন আবোলতাবোল ভাবে নয়, মাঝে মাঝে তিন বন্দুকওয়ালা জমিদারের বাড়ি হানা দেবার আগে যেমনভাবে দল গড়েছি শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে, তেমনিভাবে এদের গড়ে তুলব টাকা-পয়সা লুটতে নয়, ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কায়দা। এই-না ভেবে পিছিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে যাওয়াটা কদিনের জন্যে। রাতারাতি মিলিটারি লরিতে চালান হয়ে গেল রিলিফখানার গুদোমের আদ্দেক মাল। পরদিন সেই রং-করা জলো খিচুড়ি।

'তাতে যেন জোর বেড়েছে মনে হল সকলের দল বেঁধে ছিনিয়ে খাওয়ার সাধটার। মোকে ঘিরে ধরে শ-দেড়েক মাগীমদ্দ বলতে লাগল, চলো না যাই, ছিনিয়ে আনি ধানচাল। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তড়পাতে লাগল।

'বৈকুণ্ঠ সার গু—মে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম। চালান দেবার ব্যাপারে কত্তাদের সাথে ভাগবাটোয়ারার মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদোমে মাল শুধু জমছিল মাসখানেক। গুদোমটার হদিস টদিস নিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দুটো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কীভাবে কী মতলব করেছি সা-র গুদোমের জমানো অন্ন ছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এল না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদ্দিকের কম করে হাজারটা ভুখা মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচবার উপায় হবে বললাম, সায় এল কেমন মনমরা ঝিমানো মতন।

'পরদিন কেউ যেন কান দিল না আমার কথায়। জলো খিচুড়ি বাগাবার ভাবনায় সবাই যেন ফের আবার মশগুল হয়ে গেছে, আর কিছু ভাববার ক্ষেমতা নেই, মন নেই।

'সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এত লোক না-খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায় নি কেন। এক দিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকায় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু-চার দিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দুদিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চর্য কী। এ তো সহজ সোজা কথা। কেউ বোঝে না কেন তাই ভাবি। শাস্তরে বলে নি বাবু, অন্ন জল প্রাণ? খেতে না পেলে গরু দুধ দেয় না বলদ জমি চষে? কয়লা না-খেয়ে ইঞ্জিন গাড়ি টানে? মহাভারতে সেই মুনির কথা আছে। না-খেয়ে তপ করেন, একদিন দ্যাখেন কী, গর্তের মুখে পুতুলমতো জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ঝুলছে ঘাসের শিকড় ধরে, শিকড়গুলো দাঁতে কাটছে ইঁদুর। মুনি বললে, করছ কী তোমরা সব, ইঁদুরে শিকড় কাটছে দেখছ না, গর্তে পড়বে যে ধপাস করে? খুদে খুদে লোকগুলো বললে, বাপু, মোরা তোমার পূর্বপুরুষ। বংশে শুধু তুমি আছ। তুমি হলে এই শিকড়টা, যা ধরে মোরা ঝুলছি, হা দ্যাখো—নিচে নরক। শিকড় যিনি কাটছেন চোখা ধারালো দাঁত দিয়ে, তিনি হলেন ধম্ম মশায়। বিয়ে করো, পুত্তুর জন্মাও, মোদের বাঁচাও নরক থেকে। মুনি ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে এক রাজার মেয়েকে, রাজভোগ খেয়ে পুষ্ট মেয়ে, চটপট ছেলে হবে, পূর্বপুরুষ উদ্ধার পাবে। বছর কাটে দুটো তিনটে, গব্‌ভ হয় না রাজার মেয়ের। মুনি চটে বলে, এ কী কাণ্ড বলো তো বৌ, তুমি বাঁজা নাকি? রাজার মেয়ে বলে ঝংকার দিয়ে, নজ্জা করে না বলতে? উপোস করে শুকনো কাঠি হয়ে উনি বনে গিয়ে তপস্যা করবেন, এক রাত্তির খেতে শুতে বসবাস করতে পারবেন না বিয়ে-করা বৌয়ের সাথে, ফের বলবেন যে ছেলে হয় না কেন, বৌ তুমি বাঁজা নাকি। নজ্জা করে না? না-খেয়ে না-খেয়ে নিজে বাঁজা হয়েছ। শক্তি নেই, ক্ষেমতা নেই, বৌকে বাঁজা বলতে নজ্জা করে না? কথার মানে বুঝে, তপস্যা করে যে সোজা কথা বোঝে নি, সেটা চট করে বুঝে নিয়ে মুনি ঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বিত্তি চায় রাজার কাছে। দুধ-ঘি,

লুচি–মাংস, পোলাও–কালিয়া খায় পেট ভরে যত খেতে পারে। বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, এক বছরে ছেলে বিয়োয় মুনির বৌ—'

'রাত হয় নি? যেতে হবে না বাবুকে দেড়কোশ পথ?' যোগী ডাকাতের পরিবার এসে বলে।

মনে হয়, সত্যি কি মিথ্যা জানি না, মেয়েটার গড়ন এমন রোগাটে ছিপছিপে বলেই বোধ হয় আগামী মাতৃত্ব এতখানি স্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় তিন–চার মাসের মধ্যে যোগী ডাকাতকে সে ছেলে বা মেয়ের বাপ করবেই। জোছনায় গেঁয়ো পথে চার মাইল দূরের স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, যোগী কি এতই বোকা, সে এত জানে আর এই সহজ সত্যটা জানে না খুব কম করেও কটা মাস অন্তত লাগে মেয়েমানুষের মা হয়ে ছেলে বা মেয়ে বিয়োতে?

আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর সাথে। আলোর বাঁকে হোঁচট খাই, কাটা ধানের গোড়ার খোঁচায় ব্যথা পাই, কাঁচা মাটির রাস্তায় উঠতে দেড় হাত নালায় পড়ে যাই। যোগী সামলে–সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাব–নিকাশ। বিশ্লেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। স্বর্গ নরক তার কল্পনায় আছে কি নেই সন্দেহ। বংশ রক্ষায় সে মোটেই ব্যগ্র নয়। ইংরেজের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুঁজে খুঁজে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বৌকে ফিরে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুশি হতে নারাজ যে, বৌ তার যে–ছেলে বা মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের বাচ্চার, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা। আজেবাজে খেয়ালে—যেসব খেয়াল তাদেরই মানায়, তাদেরই ফ্যাশান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা–বাপ ছেলে–মেয়ে—অনর্থক অখুশি হতে রাজি নয় মানুষ।

তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যে ভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো? তারপর আর কোন কথা আছে?

আর না কান্না

'কান্না' গল্পের সাত বছরের ছিচকাঁদুনে মেয়েটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা, তেমনি মেয়ে। শুধু কান্না আর কান্না। যত চাও রুটি খাও শুনে কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, ভাববে যাকগে, আজকে পেটটা আমার ভরবেই ভরবে—তা নয়, একমুঠো ভাতের জন্য কান্না। রেশনের চালের ভাত! রুটি এমনি চিবোলে মিঠে লাগে, একটু গুড় পেলে মাখিয়ে নিলে হয়ে যায় একেবারে পাটিসাপটা পিঠে। রুটি খেয়ে পেট ভরে জল খাও, তার কাছে নাকি ভাত খাওয়ার পেট ভরা! ছিটেফোঁটা ডাল, এইটুকু তরকারি, তাই দিয়ে ছিরি আছে নাকি ভাত খাওয়ার?

প্রাণটা ভাত চেয়ে চোঁ চোঁ করে বৈকি ভেতো মনিষ্যির। বড়দের আরো বেশি করে। কিন্তু ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসলে প্রাণটা যে আবার লাগসই পরিমাণে ডাল তরকারি মাছ চায় মশাই! শুধু ডাল হোক, শুধু একটা তরকারি হোক, তাই দিয়ে এক দিস্তে রুটি মেরে দেওয়া যায় (যেন এক দিস্তে রুটি গরিবদের মেরে দিতে দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ-পোষক সদাশয় কংগ্রেস সরকার)। রুটি স্রেফ ভুলিয়ে দেয় মাছের শোক। বাটিভরা ডাল নেই, ভাজা নেই (তেল লাগে), চচ্চড়ি, শুক্ত, মরিচঝোল, ডালনা-ফালনার যে-কোনো একটা যদি থাকে তো দু-গেরাসের বেশি ভাত মাখার মতো নেই, নাকে একটু আঁযটে গন্ধ নেই—সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাত এগারটায় হয় কাদার মতো গলা গলা আর নয়তো কড়কড়ে শক্ত ভাত খেতে পেয়ে কে যে সুখে একদম গদগদ হয় বাংলায়?

ঠাণ্ডা বরফ ভাত!

সেটা ভুললে চলবে না। রান্না হয় সন্ধ্যায়—গুদাম-পচা সরকারি চালের বোটকা গন্ধেই বুঝি ন্যাকা মেয়ের ভাতের জন্য কান্না বাড়ে।

কর্তাকে গরম গরম ভাত দিয়ে খুশি করতে যে গিন্নি রাত এগারটা পর্যন্ত উনানে কয়লা পোড়াবে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে যে কর্তাব্যক্তিটা সকাল আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত খেটে মরে সে মানুষটা গিন্নির সাথে কাব্যি করবে না, মারবে এক চাঁটি।

গা-ঘেঁষা ঘর। যতীনের একগণ্ডা ছেলেমেয়ে আব্দার তোলে শুনতে পাই, 'এবেলা রুটি করো মা, রুটি করো। করো না রুটি? আটা কম তো কম করে করো না! ভাতের সঙ্গে একটা দুটো করে খাব।'

'বাবারে বাবা, কী রুটিই তোরা খেতে পারিস।'

'একটা করে দিও।'

'দাঁড়া দেখি হিসেব করে।'

হিসাব ছাড়া পথ নেই। সব বিষয়ে সবকিছুর গোণা-গাঁথা ওজন করা হিসাব দিয়ে কোনোমতে দিন গুজরান। আটার পরিমাণ দেখে অবলা তার জীর্ণ পুরোনো সেলাই-করা

ব্লাউজটা গা থেকে খুলে ফেলে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

'নাহ, এবেলা রুটি হবে না।'

শুধু এ বেলা নয়, এ হপ্তার বাকি কটা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, ভাতের সঙ্গে দুখানা-একখানাও নয়। সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত এগারটায় ফিরবে যে মানুষটা, কদিন তার বাইরে খাবার জন্য রুটি করে দিতেই এ আটাটুকু লেগে যাবে। বাইরে কিনে খেতে বড্ড খরচ।

তবু আব্দারের কলরব ওঠে—ছোট দুজনের। তারা এখনো ভাবজগতের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠে বাস্তব জগতের কঠোরতা সম্পূর্ণ মানতে পারে নি, এখনো বুকে আশা নিয়েই আব্দার করে। তবে এক ধমকে তারা থেমে যায়।

সাত বছরের মেজ মেয়েটা ফোঁস করে ওঠে, 'তুমি সব বাবার জন্যে রেখে দেবে। আমরা ভেসে এসেছি? বাবা বলে কত কিছু কিনে খায়—'

তার গালে একটা চড় পড়ে সশব্দে।

চড়চাপড় এই মেয়েটাই খায়। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো, খিদেও বেশি—ও-ই বেশি খাই-খাই করে। অন্য তিন জনেই রোগা দুর্বল—দশ বছরের বড় মেয়েটা তো প্যাঁকাটির মতো দেখতে। ওদের গায়ে হাত তুলতে ভরসা হয় না—হয়তো মরেই যাবে, খিদেয় কাতর বাপের চড় খেয়ে চাষির যে ছেলেটার মরে যাবার খবর খবরের কাগজে বেরিয়েছে তার মতো।

অন্য তিন জনকে বশে আনতে অনেক সময় শাসন জোটে একা ওই সাত বছরের মেজ মেয়েটার।

রোগা ক্ষীণজীবী বড় মেয়েটা দু-চারখানা বাসন মাজে, ঘটিতে করে জল তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়, দোকানে যায়। পুতুলখেলা ফেলে মেজ বোন দিদির সাথে হাত লাগায়। পুতুলখেলার চেয়ে তার ভালো লাগে টুকটাক সংসারের কাজ করার খেলা।

সে দিদির কাজ করে, মার কাজ নয়। মার সঙ্গে তার বিবাদ।

সে মিনতি করে বলে, 'দিদি, আমায় দে না বাটিটা মাজি।'

মা বাটিটা এগিয়ে দিতে বললে সে শুনতে পায় না। ধমক দিয়ে হুকুম করলে অনিচ্ছার সঙ্গে ওঠে, পুতুলকে বলে যায়, 'বোস বাছা একটু, পরে খেতে দেব। রাক্ষুসী ডাকছে।'

আটটা বাজবার আগেই ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে চার জন।

সেটাও মেজাজ বিগড়ে দেয় অবলার, কিন্তু বেচারিরা করবে কী?

খাদ্যে মেটে ক্ষয়ের পূরণ আর পুষ্টির প্রয়োজন ঘুম, তাই ঘনিয়ে আসে আরো বেশি ক্ষয় ঠেকাতে। এ বিষয়ে প্রকৃতি ছেড়ে কথা কয় না কাউকে। ওই তেতলা বাড়ির ভুঁড়িওলা মালিক ঘনশ্যামবাবু, সাত জন ভাড়াটের কাছে লোকটা মাসে বাড়ি ভাড়াই পায় চারশ টাকার মতো—অনিদ্রা রোগ খুব বেশি বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে তাকেও মাছ-মাংস মিঠাইমণ্ডা একেবারে বাদ দিয়ে উপোস করতে হয়। অতিপুষ্ট শরীরটা তার যথারীতি পুষ্টি না পেয়ে আপসে একটু ঘুম এনে দিয়ে নিদ্রাহীনতার অসহ্য কষ্টে তাকে পাগল হতে দেয় না।

চারজনে একসঙ্গে খেতে বসে। তার মানে চার জনকেই একসঙ্গে বসানো হয়, একসঙ্গে চুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।

অবলারও সহ্যের সীমা আছে তো।

'আমি আলু পাই নি মা।'

'আমায় ডাঁটা দিলে না যে?'

'এট্টুখানি ডাল দাও মা, শুধু এট্টুখানি।'

'পেট ভরে নি।'

'আমারও ভরে নি।'

'খা। খা। খা। আমার হাড়মাস চিবিয়ে খা তোরা।'

রোগা বড় মেয়েটা চুপচাপ খায়। এবার সে তার ক্ষীণকণ্ঠ যতদূর পারে চড়িয়ে বলে 'তুমি যেন কেমন কর মা। রুটি দিলে না একখানা, আরেক হাতা করে ভাত দাও না আমাদের? খিদের চোটে রাতে ওরা কাঁদলে ফের মারবে তো?'

ঘরে বসে মেয়েটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। একটু বাঁকা মেরুদণ্ডটা সে সোজা করেছে। শীর্ণমুখে যেটুকু ক্ষোভের স্ফুরণ হয়েছে, খাঁটি দরদীর চোখে ছাড়া নজরেই পড়বে না। ছোট ছোট চোখ, সে চোখে ভর্ৎসনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণ চোখের কথা ভুলে গিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন।

'তোমরা সব চেটেপুটে খাবে, আমরা উপোস দেব? দ্যাখ তো হাঁড়িতে ভাত আছে কতটুকু? তোদের জন্যে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলছি, আমি খাব না?'

মাকে কৈফিয়ত দিতে হয় ছেলেমেয়ের কাছে, প্রচার করতে হয় যে মা হওয়া কি মুখের কথা! বাপ হওয়া কি সহজ কাজ! মায়ের কত ত্যাগ, বাপের কত ত্যাগ, তাতেই মুগ্ধ সন্তুষ্ট থাকা উচিত সন্তানের।

মেজ মেয়েটা ছ্যাঁচড়। সভ্যতা ভব্যতা ভদ্রতা কিছু শেখে নি সাত বছর বয়সে। সে ফ্যাঁস করে ওঠে, 'ইস্! তোমরা খাবে না–খাবে আমাদের কী? আরো ভাত রাঁধ নি কেন? তোমরা খাও–না যত খুশি, আমরা না করেছি? আমাদের খালি মারবে, আমাদের খালি পেট ভরে খেতে দেবে না!'

হে রাত আটটার তারায় ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে!

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে যতীন দু–দণ্ডের জন্য আমার ঘরে বসে। আড্ডা দিতে নয়—সারাদিন যা করেছে তার একেবারে বিপরীত কাজ আহার এবং নিদ্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। যে খাটে সে জানে যে খাটুনি শেষ করেই খিদের চোটে দিশেহারা হয়ে খেতে নেই। তাতে অসুখ হয়। শোষণের স্তর থেকে একেবারে পোষণের স্তরে আছাড় খেয়ে পড়লে সামঞ্জস্য ঠুনকো কাচের মতো ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

আমার দেওয়া বিড়িটা ধরায়। টানতে গিয়ে কাশে। গায়ে বাতাস লাগায়। হাঁফ ছাড়ে। দেহমনের টান করা তন্ত্রী আর স্নায়ুগুলি ঢিল করে দেয়। আমার চোখের সামনে দু–দণ্ডে জীবন্ত মানুষটা ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে। এও বাঁচার লড়াইয়ের কৌশল। সকাল থেকে চলেছে সক্রিয় লড়াই—এখনকার লড়াই নিষ্ক্রিয় বিরামের। চিন্তা ভয় ক্ষোভ দুঃখ স্নেহ মমতা আনন্দ উদ্দীপনা ন্যাকামি কোনো অজুহাতেই আর একবিন্দু বাড়তি শক্তি ক্ষয় করা নয়।

খেতে বসে টের পায় নিজের ভাগ কমিয়ে অবলা তার পাতে ভাত বেশি দিয়েছে। দুটো রসগোল্লা নয়, পেটে খিদে নিয়ে পেট ভরবে না জেনে দুমুঠো ভাত বেশি দেওয়া। এ

ত্যাগের আগের দিনের মূল্য দেবার সাধটা মনের কোণে একবার উঁকি দিয়া যায় বৈকি, দরদ দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় বৈকি যে 'তুমি আমায় রাক্ষস বানাবে!'

কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিছক আগের দিনের জের টানার জন্যেই ন্যাকামি করা কি পোষায় মানুষের?

খেতে শুরু করে খাঁটি দরদ দেখিয়ে বলে, 'তুমিও বসে যাও? মিছে রাত করবে কেন?'

'হ্যাঁ, আমিও বসি।'

ফাঁকা আদর আর মিছে চোখে জল আসার চেয়ে কত মনোরম এই বোঝাপড়া। ভোরে উঠে উনান ধরাতে হবে অবলাকে, রাতের আবছা আঁধার বজায় থাকা ভোরে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বলাটাই সবচেয়ে সুমিষ্ট আদর।

অবশ্য অবস্থাটা এ রকম বলে।

তারা শোয়। তাদের চোখে গাঢ় ঘুম ঘনিয়ে আসে। ঘুমোতে কেন, শ্বাস উঠে মরতেও দু–চার মিনিট সময় লাগে মানুষের। সেই ফাঁকে মেজ মেয়েটা উঠে চলে যায় রান্নাঘরে।

খিদের আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার ঘুম। অন্ধকারে কোথায় গেল, কী করতে গেল মেয়েটা? অবলাই ওঠে গায়ের জোরে। বলে, 'মাগো, আর তো পারিনে!'

রুটি পায় নি মেজ মেয়েটা। অন্ধকারে আটা নিয়ে সে জলে গুলে খাচ্ছে। খানিক ছড়িয়েছে মেঝেতে।

এঁটো হাতাটা তুলে নিয়ে অবলা প্রাণপণে বসিয়ে দেয় তার পিঠে। আর্ত কান্নায় চিরে যায় রাত্রির অন্ধকার।

হট্টগোলে চমকে জেগে কেঁদে উঠেই কান্না থামায় ক্ষীণজীবী রোগা বড় মেয়েটা।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখে কী, বোনটি তার আকাশ–চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আটার হাঁড়িটা কাত করে ফেলে হাতপা ছুড়ে তছনছ করে উড়িয়ে দিচ্ছে আটাগুলি, বাবা তার দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো, মা হাতাটা উঁচু করেছে মেয়েকে আরেক ঘা বসিয়ে দেবার জন্য।

রোগা মেয়েটা দুহাতে হাতাটা চেপে ধরে কেড়ে ছিনিয়ে নেয়। যাকে মারবার জন্য হাতা উঁচু করা, হাত–ধরা হাত দুটো তারই মায়ের, তাই রোগা কাটি মেয়েটার ক্ষীণ শক্তিটুকুই হাতাটা কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। সপ্তমে তোলা তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজে বলে, 'পেতলের হাতা দিয়ে মারলে যে মরে যাবে মা?'

'ও! বড় যে দরদী আমার।'

বলে রোগা মেয়েটার গালে চড় কষিয়ে দেবার জন্য অবলা হাত তুলেছে, যতীন তার হাতটা চেপে ধরে।

'কী করছ?'

অবলা ঠাণ্ডা হয়ে বলে, 'আর সয় না, এবার আমি মরব।'

মেয়ে বলে, 'মরবে তো নিজে মরো না? আমাদের মারছ কেন।'

কেরানির বৌ

সরসীর মুখখানি তেমন সুশ্রী নয়! বোঁচা নাক, ঢেউ তোলা কপাল, ছোট ছোট কটা চোখ। গায়ের রং তার খুবই ফরসা, কিন্তু কেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সরসীর গড়ন কিন্তু চমৎকার। বাঙালি গৃহস্থ সংসারের মেয়ে, ডাল আর কুমড়ার ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইয়া যারা বড় হয়, একটা বিশেষ বয়সে মাত্র তাদের একটুখানি যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাকি সবটাই অসামঞ্জস্য। সে হিসাবে সরসী বাস্তবিকই অসাধারণ। তার শরীরের মতো শরীর সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কবিকে সে অনায়াসে মুগ্ধ করিতে পারে। একটু নিচুদরের ব্রহ্মচারীর মনে ঘোমটা খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগা আশ্চর্য নয়।

ঘটনাটা নিছক মাতৃমূলক। সরসীর মার অনেক বয়স হইয়াছে, চল্লিশের কম নয়; কিন্তু এখনো তার শরীরের বাঁধুনি দেখিলে আপনার বিস্ময় বোধ হয় এবং তিনি লজ্জা পান।

তের বছর বয়সে সরসী টের পায় যে অহঙ্কার করার মতো গায়ের রং তো তার আছেই, কিন্তু আসল রূপ তার গায়ের রঙে নয়, অস্থিমাংসের বিন্যাসে। টের পাইবার পর সরসীর কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া সকলে অবাক!

'ও কী লো? ও আবার কী ঢং?'

'ঢং আবার কোথায় দেখলে?'

'ওকী কাপড় পরার ছিরি তোর? সং সেজেছিস কেন?'

'বেশ করেছি। তোমার কী?'

'মুখে আগুন মেয়ের!—যাসনে, সং সেজে ঢং করে পাড়া বেড়াতে তুই যাসনে সরি! মেরে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব।'

পাড়া বেড়ানোর শখ সরসীর আপনা হইতেই গেল।

একদিন বাড়ি ফিরিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তার কী কান্না!

'কী হয়েছে লো?'

সরসী বলিতে পারে না। অনেক চেষ্টায় একটু আভাস দিল। বাকিটুকু মা জেরা করিয়া জানিয়া নিলেন।

জানিয়া মাথায় যেন তার বাজ পড়িল। এ কী সর্বনাশ! রাগের মাথায় মেয়ের পিঠেই গুম্ গুম্ করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, 'সেইকালে বারণ করেছিলাম সারা দুপুর টো টো করে ঘুরে বেড়াসনে সরি, বেড়াসনে। হল তো এবার? মুখে চুনকালি না দিয়ে ছাড়বি, তুই কি সেই মেয়ে!'

সরসী খুব কাঁদিল। রাত্রে ভাত খাইল না। কারণ অভিমানে ভাবিতে লাগিল, মা আমাকেই মারল কেন? আমার কী দোষ?

সংসারের অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, কিন্তু এ ব্যাপারটা তার কাছে চূড়ান্ত রকমের রূঢ় ঠেকিল। তার কোনোই অপরাধ নাই, সুবলদার মতলব বুঝিতে পারা মাত্র তার হাতে কামড়াইয়া দিয়া পলাইয়া আসিয়াছে সে এত ভালো মেয়ে। তবু তাকেই মার খাইতে হইল। সকলের ভাব দেখিয়া বোঝা গেল এই একটা অপকর্ম করিয়াছে, দোষ আগাগোড়া তারই!

সুবলের কী শাস্তি হয় দেখিবার জন্য সরসী ব্যগ্র হইয়া রহিল, কিন্তু সুবলের কিছুই হইল না। সুবলের বাবাকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিবার পরামর্শ পর্যন্ত মার যুক্তিতর্কে বাতিল হইয়া গেল। সরসীর প্রতিই শাসনের অবধি রহিল না। আপনজন যে বাড়ি আসিল সকলের কাছে একবার করিয়া ব্যাপারটার ইতিহাস বলিয়া তাকে লজ্জা দেওয়া হইতে লাগিল। এ বাড়িতে দুজনকে চুপি চুপি কথা বলিতে দেখিলেই সরসী বুঝিতে পারে, তার কথাই আলোচিত হইতেছে। নিদারুণ কড়াকড়ির মধ্যে পড়িয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সরসী হাঁপাইয়া উঠিল।

সময়ে শাসনও একটু শিথিল হইল, সরসীরও সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে সে এমন ভীরু হইয়া পড়িল বলিবার নয়।

ছেলেবেলা হইতে চেনা ছেলেরা বাড়িতে আসিলে একা তাদের সঙ্গে কথা বলিতে সরসী ভয় করিতে লাগিল। লোকে দোষ দিবে, ভাবিবে, কী জানি মনে ওর কী আছে! একা পাশের বাড়ি যাওয়ার সাহস পর্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিল। দুপুরবেলা সে মার কাছে শুইয়া থাকে, ঘুম আসে না, অন্য ঘরে গিয়া একটু একা থাকিতে ইচ্ছা করে, তবু সে শুইয়া থাকে। কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি বলে যে বাড়িতেই ছিল, পাশের ঘরে ছিল, কোথাও যায় নাই, মা হয়তো সে কথা বিশ্বাস করিবে না।

সংসারের আর সমস্ত মেয়ের মতো সে নয়, কুমারীধর্ম বজায় রাখার জন্য তার ওদের মতো যথেষ্ট ও প্রাণপণ চেষ্টা নাই; সকলের মনে এমনি একটা ধারণা জন্মিয়াছে জানিয়া সরসী দিবারাত্রি সজ্ঞানে নিজের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

সকলের চুরি চুরি খেলার মধ্যে চুরি না করিয়াও বেচারা হইয়া রহিল চোর।

উপদেশ শুনিল : মেয়েমানুষের জীবনে আর কাজ কী মা? চাদ্দিকে পুরুষ গুণ্ডা হাঁ করে আছে, পা পিছলে না ওদের খপ্পরে পড়তে হয়,—ব্যস এইটুকু সামলে চলা।

ছড়া শুনিল : পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই!

শুনিয়া শুনিয়া সরসীর ভয় বাড়িয়া গেল। সংসারের নারী–সংক্রান্ত নিয়মগুলি এখন সে মোটামুটি বুঝিতে পারে। ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে খারাপ হওয়াটাই প্রত্যেক মেয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; মেয়েদের খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য। এই আশ্চর্য কাজটা করাই নারী–জীবনের একমাত্র তপস্যা।

সাবধানী হইতে হইতে সরসী ক্রমে ক্রমে অতি–সাবধানী হইয়া গেল। ভালো হইয়া থাকাটা তার কাছে আর ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বিবেচনার অন্তর্গত হইয়া রহিল না। সকলে চায়, শুধু এই জন্যই নারীধর্ম পালন করিয়া যাওয়ার জন্য নিজেকে সে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া নিল।

তারপর, ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস আগে রাসবিহারীর সঙ্গে সরসীর বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, রাসবিহারী কেরানি।

বলা বাহুল্য এই জন্য যে সরসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, বরাবর গাঁয়ে থাকার জন্য খানিকটা গেঁয়ো আর কথামালা পড়া বিদ্যায় লুকাইয়া নভেল পড়ার জন্য একটু শহুরে,

অসামান্য অঙ্গ–সৌষ্ঠবের জন্য তার শুধু স্বাস্থ্য ভালো এবং গায়ের রঙের জন্য সে একটু মূল্যবতী। কেরানি ছাড়া এসব মেয়ের বর হয় না। রাসবিহারীর মাহিনা যে এখন একশর কাছে এবং একদিন দু–শর কাছে পৌছানোর সম্ভাবনা আছে, সে শুধু সরসীর ওই রংটুকুর কল্যাণে।

রাসবিহারীর সাইজ মাঝারি, চেহারা মাঝারি, বিদ্যা মাঝারি, বুদ্ধি মাঝারি। যাকে বলে মধ্যবর্তী, তাই। সরসীকে সে মাঝারি নিয়মে ভালবাসিল, কখনো মাথায় তুলিল, কখনো বুকে নিল, কখনো পায়ের নিচে চাপিয়া রাখিল। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে রাগের মাথায় দুই একবার চড় চাপড়টা দিতে যেমন কসুর করিল না, নভরি সোনার একছড়া হার এবং মধ্যে মধ্যে ভালো কাপড়ও তেমনি কিনিয়া দিল।

রাসবিহারী আর তার দাদা বনবিহারী এক বাড়িতেই বাস করিতেছিল। মাসের পয়লা তারিখে রাসবিহারী বরাবর মাহিনার তিনের চার অংশ দাদার হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে, বিবাহের বৎসর দুই পরে সেটা কমাইয়া কমাইয়া অর্ধেক করিয়া আনায় বনবিহারী তাকে পৃথক করিয়া দিল।

পটলডাঙ্গায় একটা বাড়ির দোতলায় একখানা শয়নঘর, একটি রান্নাঘর ও খানিকটা বারান্দা ভাড়া নিয়া রাসবিহারী উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

সরসীকে বলিল, 'চালাতে পারবে তো?'

সরসী বলিল, 'ওমা! তা আর পারব না?'

বলিয়া বিবাহের পর এই প্রথম হাসিমুখে যাচিয়া দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীকে চুম্বন করিল।

স্বাধীনতার, বেশি নয়, অল্প একটু স্বাধীনতার লোভে সরসীর খুশির সীমা ছিল না। স্বামী তো তাহার আপিস যাইবে? সে বাড়িতে থাকিবে,—একা! একেবারে একা! চাকরের চোখের সামনে কলতলায় স্নান করিলে কেহ তাকে গাল দিবে না, দুই বেলা পাশের বাড়ি গেলে কেহ জানিবে না, খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিলে আর রাস্তার অজানা, অচেনা, ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় লোকদের নিজেকে দেখাইলে কেহ কিছু মনে করিতে আসিবে না।

বনবিহারীর স্ত্রী চারটি সন্তান প্রসব করিয়া আর অজস্র পানদোক্তা খাইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, রাসবিহারীর যাওয়ার দিন সে স্বামীকে বলিল, 'যাই বল বাবু, বাঁচলাম।'

এবং এক সময় রাসবিহারীকে একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলিল :

'তোমার ভালোর জন্যই বলা।'

রাসবিহারী কৌতূহল প্রকাশ করিলে এদিক–ওদিক চাহিয়া নিচু গলায় :

'বৌকে একটু সামলে চলো।'

'কেন?'

'কেমন যেন বাড়াবাড়ি। সেদিন রাখাল এসেছিল জান, নিচে আমি খাবার–দাবার করছি, বললাম, ও ছোটবৌ, বাড়িতে একটা লোক এসেছে, দুটো কথাবার্তা বলগে, একা একা চুপ করে বসে থাকবে? তা ছোটবৌ কী জবাব দিলে শুনবে? বললে, 'পারব না দিদি, আমার লজ্জা করছে!' আমার ভাইয়ের,—বয়েস এখনো ওর আঠার পোরে নি, ভগবান সাক্ষী,—আমার ভাইয়ের কাছে ওর লজ্জা কী বলো তো?'

রাসবিহারী বলিল, 'কি জানি।'

'অথচ আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার কামাই নেই! কী তাকানি, যেন গিলে খাবে!'

রাসবিহারী বলিল, 'তা তোমার ভাইকে দেখলে দোষ কী?'

বনবিহারীর স্ত্রী একটু হাসিল। অনেক পানদোক্তা খাওয়ার জন্য মুখের হাসি পর্যন্ত তার

ঝাজালো।

বলিল, 'তারপর শোনো। এদিকে ছাতে কাপড়টি মেলে দিয়ে আসতে বললে যায় না, বলে, চাদ্দিক থেকে তাকায় দিদি, আমি যাব না। আমি মরি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, ভাবি, আহা ছেলেমানুষ, না যায় না যাক, পাড়ার লোকগুলোও তো পোড়ারমুখো নয় কম। ওমা, এদিকে দুপুরবেলা চোখ বুজিছি কি বুজি নি, অমনি তুড়ুক করে ছাতে গিয়ে হাজির!'

রাসবিহারী বলিল, 'ছাতে গিয়ে কী করে?'

'কে জানে বাবু কী করে। কে খোঁজ নিতে যায়? একদিন মাত্র দেখেছি, মাথার কাপড় ফেলে, চুল এলো করে মহারানী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'চুল শুকোচ্ছিল হয়তো।'

'হবে। কিন্তু লুকিয়ে যাবার দরকার! যাব না বলে শরমের কাঁদুনি গাইবার দরকার!'

সরসীর কৌতূহল প্রচণ্ড। বাড়ির কোথাও গোপনে কিছু ঘটিবার জো নাই। রাত্রে বনবিহারী কতক্ষণ হুঁকা টানে, বড়বৌ তাকে কী বলে না বলে, কী নিয়া মধ্যে মধ্যে তাদের বচসা হয়, এসব খবরও সরসী অনেক রাখে। আড়ালে দাঁড়াইয়া বড়বৌয়ের কথাগুলি শুনিতে সে বাকি রাখিল না। তখনকার মতো সরসী চুপ করিয়া রহিল। বড়বৌ চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে চুল বাঁধিল, সিঁদুর পরানোর পর যথানিয়মে তাকে প্রণামও করিল। জিনিসপত্র অধিকাংশই সকালে সরানো হইয়াছিল, বিকালে গাড়ি ডাকিয়া বাকি জিনিস উঠাইয়া রাসবিহারী যখন শেষবারের মতো নিচে গিয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া সরসী বড়বৌকে বলিল, 'সকালবেলা ওঁকে কী বলেছিলে দিদি?'

'কাকে? ঠাকুরপোকে? কই, কিছু বলি নি তো!'

'তোমার মুখে কুঠ্ হবে।'

'কী বললি?'

'বললাম তোমার মুখে কুঠ্ হবে। কুঠ্ কাকে বলে জান না? কুষ্ঠব্যাধি।'

'কার মুখে কুঠ্ হবে ভগবান দেখছেন। আমি তোর গুরুজন, আমাকে তুই—'

'আ মরি মরি, কী গুরুজন। মুখে আগুন তোমার মতো গুরুজনের! বানিয়ে বানিয়ে কথা শুনিয়ে স্বামীর মন ভারি করে দিতে একটু বাধে না, তুমি আবার গুরুজন কিসের? পাবে পাবে, এর ফল তুমি পাবে। যে মুখে আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছ সে মুখে যদি পোকা না পড়ে তো চন্দ্র সূর্য আর উঠবে না দিদি, ভগবানের সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে। আমি যদি সতী হই তো—' ভাবাবেগে সরসী কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু বলিতে ছাড়িল না,—'আমি যদি সতী হই তো আমার যতটুকু অনিষ্ট তুমি করলে ভগবান তোমাকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবেন। অঙ্গ তোমার খসে খসে পড়বে দিদি, পচে যাবে, গলে যাবে—ভাসুরঠাকুর দূর দূর করে তোমাকে বাড়ি থেকে দেবেন খেদিয়ে!'

সরসী যে এমন করিয়া বলিতে জানে বড়বৌয়ের তা জানা ছিল না। হেলে সাপকে কেউটের মতো ফোঁস ফোঁস করিতে দেখিয়া সে এমন অবাক হইয়া গেল যে ভালোমতো একটা জবাবও দিতে পারিল না। চোখ মুছিয়া গাড়ি চাপিয়া সরসী বিজয়-গর্বে চলিয়া গেল। মুখ দিয়া উপরোক্ত কথাগুলি স্রোতের মতো অবাধে বাহির করিয়া দিতে পারিয়া নিজেকে তার খুব উচ্চশ্রেণীর আদর্শ স্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল।

নূতন বাড়িতে আসিয়া সরসী সংসার গুছাইয়া বসিল। শোবার ঘরখানা রাস্তার ঠিক উপরে। রাস্তার ওপাশে সামনের বাড়ি হইতে ঘরের ভিতরটা সব দেখা যায়। জানালার আগাগোড়া

সরসী পরদা টাঙাইয়া দিল। রাসবিহারীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—'পরদা সরিয়ো না বাবু, ও বাড়ি থেকে দেখা যায়। ঘরটা একটু অন্ধকার হল,—কী করব!'

রাসবিহারী ভাবিল, বড়বৌয়ের কথাটা মিথ্যা নয়। সরসীর একটু বাড়াবাড়ি আছে।

কাল তারা হোটেলের ভাত আনিয়া খাইয়াছিল। ঘর গোছানো ও জানালায় পরদা টাঙানোর হিড়িকে এবেলাও সরসী রাঁধিতে পারে নাই। রাসবিহারীর আপিসের বেলা হইলে সরসী বলিল, হোটেলে খেয়ে তুমি আপিস চলে যাও, আমি এক ফাঁকে দুটি ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেব।

রাসবিহারী মনে মনে বিরক্ত হইয়া জামা গায়ে দিল। ঘরের দেয়ালে একটু ফুটা থাকার আশঙ্কার কাছে স্বামীর খাওয়া চুলোয় যায়, সব সময় এ গভীর ভালবাসা হজম করা শক্ত।

তবু, বাহিরে যাওয়ার আগে রাসবিহারী বলিয়া গেল, 'ছাতে উঠো না।'

সরসী বলিল, 'না।'

বলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু কাপড় শুকোতে দেব কোথায়?'

'দিও, ছাতেই দিও। দিয়ে চট্ করে নেমে আসবে।'

'আচ্ছা।'

এসব অপমান সরসীর গায়ে লাগে না। অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। খোলা ছাতের চারিদিকে প্রলোভন, চারিদিকে বিস্ময়, চারিদিকে রহস্য। স্বামী তো বারণ করিবেই। কিছু মন্দ ভাবিয়া নয়, তার মঙ্গলের জন্যই বারণ করা।

রাসবিহারী বাহির হইয়া যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সরসী ছাতে উঠিল। ভাবিল, এক মিনিট, এক মিনিট শুধু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আসব।

কিন্তু এক মিনিটে চোখ বুলানো যায় না।

ইটের স্তূপ জড়ো করিয়া মানুষ এই শহর গড়িয়াছে, চারিদিকে সীমাহীন সংখ্যাহীন মানুষের আস্তানা, কোনোদিকে শেষ নাই, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, নীড়ে নীড়ে একটা বিস্ময়কর জমজমাট আলিঙ্গন, ছাতে ছাতে আলিসায় কার্নিশে একটা অবিশ্বাস্য মিলন। এই বিপুলতার বিস্ময় অনুভব করিতেই সরসীর আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, কোনো একটি বিশেষ বাড়িকে বিশেষভাবে দেখিবার অবসর এই সময়ের মধ্যে সে পাইল না,—এ তো তার চেনা শহর, সে বাড়ির ছাত হইতে সকলকে লুকাইয়া,—না, সকলকে লুকাইয়া নয়, অত সাবধানতা সত্ত্বেও বড়বৌ টের পাইয়াছিল,—এই শহরকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু নতুন বাড়ির নতুন ছাতে মাথার কাপড় পায়ের নিচের শুকনো শ্যাওলায় লুটাইয়া মলিন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত পর্যবেক্ষণের সবটুকুই আজ অভিনব।

মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালিতেছে, ছাতের কোথায় এক টুকরা ভাঙা কাচ পড়িয়াছিল সরসীর পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, কোমরে কোনোমতে কাপড় আঁটা আছে কিন্তু দেহের ঊর্ধ্বাংশ একেবারে অনাবৃত, সরসীর খেয়াল নাই। আকাশে একটা চিলের সকাতর চিৎকারে সরসী শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে আজ তার আনন্দের উত্তেজনার বান ডাকিয়াছে, সে উন্মাদিনী। তার বহুদিনের দেয়াল-চাপা দুর্বল প্রাণে খোলা ছাতের এই সকরুণ দুঃসাহস, মানুষকে ভয় না-করার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি বুকের চামড়ায় পিঠের চামড়ায় পৃথিবীর গরম বাতাস আর আকাশের রূঢ় রৌদ্র লাগানোর উগ্র ব্যাকুল উল্লাস তার সহ্য হইতেছে না। তার ইচ্ছা হইতেছে, অর্ধাঙ্গের কার্পাস তুলার বাঁধনটা টানিয়া খুলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, দিয়া পাগলের মতো সমস্ত ছাতে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে।

আর চেঁচায়। গলা ফাটাইয়া প্রাণপণে চেঁচায়। সে যে ঘরের বৌ, সে যে বোবা অসহায়

ভীরু স্ত্রীলোক সব ভুলিয়া বুকে যত শব্দ সঞ্চিত হইয়া আছে সমস্ত বাহিরে ছড়াইয়া দেয়। অথবা আলিসা ডিঙাইয়া নিচে লাফাইয়া পড়ে।

হ্যাঁ, শূন্যে পড়িবার সময়টুকু উন্মত্ত উল্লাসে হাতপা ছুড়িতে ছুড়িতে প্রকাশ্য রাস্তার ধারে ওই শক্ত রোয়াকটিতে আছড়াইয়া পড়িলে ভালো হল। মাথাটা গুঁড়া হইয়া যাইবে কিন্তু শরীরের তার কিছু হইবে না। তার এই কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিবে। রাস্তার লোক ভিড় করিয়া তার অপরূপ দেহের অপূর্ব অপমৃত্যু চাহিয়া দেখিবে।

কোথায় লজ্জা, কোথায় সঙ্কোচ! কে জানিবে এই দেহের মধ্যে যে বাস করিতেছিল নিজেকে লুকাইয়া লুকাইয়া সে দিন কাটাইয়াছে, আঠার বছরের বালকের ভয়ে অবশ হইয়া গিয়াছে, স্বামী ভিন্ন জগতের আর একটি পুরুষের দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিতে সাহস পায় নাই? কে অনুমান করিতে পারিবে সকলের সামনে আত্মোন্মোচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না বলিয়া, আঘাতের ভয়, অপমৃত্যুর ভয়ের চেয়ে সকলের সামনে মরিবার ভয় প্রবলতর ছিল বলিয়া, সে এ কাজ করিতে পারিয়াছে? নিজের অনন্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে এ শুধু তার একটা তীব্র প্রতিবাদ, আপনার প্রতি তার এই শেষ প্রতিশোধ।

স্বামীর সাহায্য ছাড়া, সমাজের চাবুকের সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই সে খাঁটি থাকিতে পারিত না, নিজেকে এমনি একটা কদর্য জীব বলিয়া চিনিয়াছিল, তাই সে নিজেকে এমন ভয়ানক মার মারিয়াছে, এ কথাটাও কি কারো একবার মনে হইবে না?

দুই হাত শক্ত করিয়া মুঠা করিয়া সরসী এখন আপন মনে বিড়বিড় করিতেছে, তার মুখের দুই কোণে সূক্ষ্ম ফেনা দেখা দিয়াছে। হঠাৎ একসময় হাঁটু ভাঙিয়া সে ছাতের উপর বসিয়া পড়িল। দুই করতল সজোরে ছাতে ঘষিতে ঘষিতে সে জোরে জোরে বলতে লাগিল—

'বেশ, বেশ, বেশ! আমার খুশি! আমার খুশি আ—মা—র খু—শি!'

তারপর শূন্যের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিয়া শূন্যকেই সম্বোধন করিয়া আবার বলিল, হল তো?

তাকে ঘিরিয়া সমস্ত জগৎ কলরব করিতেছে, সমস্ত জগৎ একবাক্যে তাকে ছি ছি করিতেছে, তার কথা কেহ শুনিবে না, তার কোনো মুহূর্তের আত্মজয়ের দাম দিবে না, তাকে ঠাসিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকিয়া তারই কটা চামড়ার স্বেদে তারই যৌবনের উত্তাপে তাকে সিদ্ধ করিবে।

সরসীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। লুটানো আঁচল তুলিয়া নিজেকে সে আবৃত করিয়া নিল। ঘষিয়া ঘষিয়া চোখ শুষ্ক করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিস্টিরিয়ার ফিটের পর যেমন সমস্ত জগৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়, মুখে একটা ধাতব স্বাদ লাগিয়া থাকে, সরসীর কানের কাছে তার নিজের রক্তের কোলাহল তেমনিভাবে অকস্মাৎ থামিয়া গিয়াছে, জিভে একটা কটু স্বাদ লাগিয়া আছে।

এখন আর তার কোনো উত্তেজনা নাই। সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তার মনে হইতেছে, এমন একটা কাজ সে করিয়া বসিয়াছে সাধারণ কোনো মেয়ে যা করে না। কাজটা তার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

রাসবিহারীর আদেশ অমান্য করিয়া ছাতে বেড়ানোর জন্য সরসীর কোনো আফসোস নাই, স্বামীর ছোটবড় অনেক আদেশই অমান্য করিতে হয়, নহিলে টেকা অসম্ভব, কিন্তু তারও অতিরিক্ত কিছু সে কি করিয়া বসে নাই? নিজেকে তবে কলুষিত অপবিত্র মনে হইতেছে কেন?

ভাবিতে ভাবিতে সরসী নিচে নামিয়া গেল। ছাতের নিচেকার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ানো মাত্র তার যেন অর্ধেক গ্লানি কাটিয়া গেল। জানালার পরদা টাঙানোর জন্য ঘরের আলো স্তিমিত

হইয়া আছে, বাতাসের মৃদু স্যাঁতসেঁতে ভাব এখনো শুকাইয়া যায় নাই, সরসীর চোখেমুখে আর সর্বাঙ্গে অল্প অল্প স্নিগ্ধতা সিঞ্চিত হইতে লাগিল।

ঘরের অসমাপ্ত কাজগুলি ঠিক যেন তারই প্রতীক্ষায় উন্মুক্ত হইয়া আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সরসী চারিদিকে সস্নেহ দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। কত কাজ তার, কত অফুরন্ত কর্তব্য! তার কি নিশ্বাস ফেলিবার সময় আছে? সংসারে কী হয় আর কী হয় না, তাই নিয়া মাথা ঘামানোর অবসর সে পাইবে কোথায়? স্বামী হোটেলে খাইয়া আপিসে গিয়াছে, এবেলার মধ্যে সমস্ত কাজ তার সারিয়া রাখিতে হইবে, ওবেলা দুটি রাঁধিয়া না দিলে চলিবে কেন? হোটেলের ভাতে পেট ভরানোর জন্য সে তো তাকে ভাত কাপড় দিয়া পুষিতেছে না।

সরসী অবিলম্বে কাজে ব্যাপৃত হইয়া গেল। নোড়া আনিয়া দেয়ালে পেরেক ঠুকিয়া কোনাকুনি একটা দড়ি টাঙাইয়া দিল, জড়ো করা পরনের কাপড়গুলি একটি একটি করিয়া কুঁচাইয়া রাখিল; তাকে খবরের কাগজ বিছাইয়া তেলের শিশি, জুতার বুরুশ, রাসবিহারীর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, তার নিজের মুখে মাখার পাউডার, পায়ে দেওয়ার আলতা, সিঁথিতে দেওয়ার সিঁদুর সমস্ত টুকিটাকি জিনিস গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল।

চুল বাঁধার যন্ত্রপাতিগুলি সাজাইয়া রাখার সময় একটু হাসিয়া ভাবিল, ও ফিরে আসার আগে চুল বাঁধার সময় পাব তো? খাবারটা করেই চট্ করে একটু সাবান মেখে গা ধুয়ে নিয়ে বেঁধে ফেলব চুলটা, যে নোংরাই দেখে গেছে।

চুলগুলি মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, দুই হাতে চুলের গোছা ধরিয়া খালি ঘরে একটা অনাবশ্যক অপচয়িত মনোরম ভঙ্গির সঙ্গে সরসী এলো-খোঁপা বাঁধিয়া নিল।

এবার কোন কাজটা আগে করিবে?

বাক্সগুলি ও-কোণে রাখা চলিবে না, এদিকে সরাইয়া আনিতে হইবে, জলের কুঁজোটা যেখানে আছে সেইখানে।

জলের কুঁজো! সরসীর দুচোখ চকচক করিয়া উঠিল। কী তৃষ্ণাই তার পাইয়াছে!

হাতের কাছে গেলাস ছিল, দেখিতে পাইল না। উবু হইয়া বসিয়া দুই হাতে কুঁজোটা তুলিয়া ধরিয়া সে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। খানিক পেটে গেল, বাকিটাতে তার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল।

কী তৃষ্ণাই সরসীর পাইয়াছিল!

জুয়াড়ির বৌ

ধরিতে গেলে জুয়ার দিকে মাখনের ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা হইতেই। তার অল্প বয়সের খেয়াল আর খেলাগুলির মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের এমন জোরালো মানসিক বিকারের সূচনা অবশ্য কেউ কল্পনা করিতে পারিত না। বাজি ধরে না কে, লটারির টিকিট কেনে না কে, মেলায় গেলে নম্বর লেখা টেবিলে দু-চারটা পয়সা দিয়া ঘূর্ণ্যমান চাকায় লেখা নম্বরের দিকে তীর ছোড়ে না কে? এসব তো খেলা—নিছক খেলা। তবে মাখনের একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কথায় কথায় সকলের সঙ্গে বাজি ধরিত, লটারির টিকিট কেনার পয়সার জন্য বিরক্ত করিয়া করিয়া গুরুজনের মার খাইত, মেলায় গিয়া অন্য জিনিস কেনার পয়সা তীর ছুড়িবার খেলায় হারিয়া আসিত। এই তুচ্ছ ছেলেমানুষি পাগলামি যে একদিন একটা মারাত্মক নেশায় দাঁড়াইয়া যাইবে এ কথা কারো মনে আসে নাই।

প্রকৃত জুয়া আরম্ভ হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। মাখন তখন কলেজে গোটা দুই পরীক্ষা পাস করিয়াছে। নলিনীর দাদা সুরেশ ছিল তার প্রাণের বন্ধু, একদিন সে-ই ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়া গেল।

'আজ একটু রেস খেলি চ' মাখন।'

'রেস? আমার কাছে মোটে দশটা টাকা আছে।'

'আবার কত চাই? লাগে তো আমি দেবখন—আয়।'

সাত টাকা জিতিয়া দুজনের সেদিন কী ফূর্তি! সায়েবি হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ি মাছের মাথা আর মুরগির ঠ্যাং গিলিয়া বায়স্কোপ দেখিয়া সুরেশ বাড়ি গেল আর মাখন ফিরিল তার মেসে। তারপর আর দু-একবার রেস খেলিতে গিয়া কয়েকটা টাকা হারিয়াই সুরেশ যদি-বা বিরক্ত হইয়া মাঠে যাওয়া একরকম বন্ধ করিয়া দিল, একটা দিন যাইতে না পারিলে মাখনের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। সুরেশের কাছে প্রায়ই সে টাকা ধার করিতে লাগিল।

আরেকটা পরীক্ষা কোনোরকমে পাস করিবার পর একদিন হিসাব করিয়া দেখা গেল সুরেশের কাছে মাখন অনেক টাকা ধারে। বন্ধুকে টাকা ধার দিতে দিতে সুরেশের নামে পোস্টাফিসে জমা টাকাগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

'এবার বাড়ি গিয়ে তোর টাকা এনে দেব।'

ছেলেকে একেবারে এতগুলি টাকা দেওয়া মাখনের বাবার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না, তবু তিন-তিনটা পরীক্ষা পাস করা ছেলে চাকরির চেষ্টা করার আগে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেখিতে চায়, সুযোগ না পাইলে ভয়ানক কিছু করিয়া বসিবার মতো প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে চায়, টাকাটা তাকে না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া?

বন্ধুকে দেওয়ার জন্য টাকাগুলি সঙ্গে নিয়া মাখন কলিকাতায় পৌঁছিল শনিবার সকাল দশটার সময়। সমস্ত পথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এতদিন অল্প টাকা নিয়া খেলার জন্য সে হারিয়াছে। বেশি টাকা নিয়া খেলিলে জিতিবার সম্ভাবনা বেশি। বন্ধুর সমস্ত ঋণ একেবারে শোধ করার কি দরকার আছে? আজ যদি কিছু বেশি টাকা টাইগার জাম্পের উপর ধরে—টাইগার জাম্প আজ নিশ্চয় জিতিবে,—ঘোড়াটা ফেবারিট হইলেও তিনগুণ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে! সুরেশকে দিয়া দেওয়ার আগে টাকাটা খাটাইয়া কিছু লাভ করিয়া নিলে দোষ কি আছে? সব টাকা নয়—অর্ধেক। হারুক বা জিতুক অর্ধেক টাকা সে স্পর্শ করিবে না, ঋণ পরিশোধের জন্য থাকিবে।

সন্ধ্যার আগে শেষ ঘোড়দৌড়ের শেষে খালি পকেটে মাখন এনক্লোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পরদিন অনেক বেলায় সে ম্লানমুখে সুরেশদের বাড়ি গেল। দরজা খুলিয়া দিল নলিনী। আগে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিত, আজ কিন্তু মুখখানা তার বড়ই গম্ভীর দেখাইতে লাগিল।

'ছাতে চুল শুকোচ্ছিলাম, আপনাকে আসতে দেখে নেমে এলাম।'

নলিনীর হাসির অভাবটা পূরণ করার জন্য মাখন নিজেই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'বেশ করেছ। সুরেশ কই?'

'দাদা আসছে। টাকা এনেছেন দাদার?'

মাখন থতমত খাইয়া বলিল, 'টাকা? ও, টাকা। তুমি জানলে কী করে টাকার কথা?'

'আমি কেন, সবাই জানে। বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে। আনেন নি তো? তা আনবেন কেন!'—গম্ভীর মুখ অন্ধকার করিয়া নলিনী ভিতরে চলিয়া গেল।

সুরেশ আসিলে টাকার কথাটা উঠিল বড়ই খাপছাড়া ভাবে। মাখন বলিল, 'তোর টাকাটা দিতে পারব না সুরেশ। এক কাজ কর, ওই টাকাটা আমায় পণ দে, আমি নলিনীকে বিয়ে করব।'

কথা ছিল কথাটা গোপন থাকিবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকিল না! বিনা পণে বন্ধুর বোনকে বিবাহ করার জন্য মনে মনে বাড়ির সকলেই একটু চটিয়াছিল—নলিনী তেমন রূপসীও নয়। কথাটার সমালোচনা হইত নানাভাবে—একটু কটুভাবেই। নলিনী যে কী করিয়া মাখনকে ভুলাইল ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। আজকালকার মেয়ে, ফন্দিবাজ বাপের মেয়ে, ওদের পক্ষে সবই হয়তো সম্ভব। আচ্ছা, পয়সাকড়ি যখন দিল না, গয়না কিছু বেশি দেওয়া কি উচিত ছিল না নলিনীর বাপের?

শুনিতে শুনিতে একদিন রাগে নলিনী দিশেহারা হইয়া গেল। বড় গুরুজন কেউ মন্তব্য করিলে রাগে দিশেহারা হইয়াও হয়তো সে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন মন্তব্যটা করিয়াছিল ননদ বিধু। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে কতকটা ভাব হইয়া যাওয়ায় সে বলিয়া ফেলিল, 'পণ দেওয়া হয় নি মানে? পণ তো ওঁকে আগেই দেওয়া হয়েছে।'

তারপর সব জানাজানি হইয়া গেল। প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করিতেই চায় না, কিন্তু সত্য কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপায় কী! মাখনকে জিজ্ঞাসা করায় সেও স্বীকার করিয়া ফেলিল।

রাত্রে মাখন বলিল, 'টাকার ব্যাপারটা বলতে না তোমায় বারণ করেছিলাম? বললে কেন?'

নলিনী বলিল, 'ব্যবসার নাম করে দাদাকে দেবার জন্য টাকা নিয়ে গিয়েছিলে আমায় বল নি কেন? আমার রাগ হয় না বুঝি?'

'হুঁ, রাগ হলে তুমি বুঝি দশজনের কাছে আমার বদনাম করে শোধ তুলবে? তুমি তো কম শয়তান নও!'

বিশ্রী একটা কলহ হইয়া গেল, কথা বন্ধ রহিল তিন দিন। আবার কথা আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা অতগুলো টাকা কী করলে? দাদার কাছ থেকে নিয়েছ, বাবার কাছ থেকে নিয়েছ, টাকা তো কম নয়!'

প্রথমে কৈফিয়তটা ভালো করিয়া নলিনীর মাথায় ঢুকিল না। চুপি চুপি কার সঙ্গে মাখন ব্যবসা করিতেছিল, সব টাকা লোকসান গিয়াছে। তারপর সে টের পাইল মাখন মিথ্যা বলিতেছে। মনটা তার খারাপ হইয়া গেল। স্বামীর মন তো তার ছোট নয়, টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে বরং অতিমাত্রায় উদার। টাকা-পয়সার ব্যাপারেই তার কেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন হইল?

বাপ আর শ্বশুরের চেষ্টায় মাখনের একটা চাকরি জুটিয়া গেল ভালোই। বছর পাঁচেকের মধ্যে বেতন বাড়িয়া দাঁড়াইয়া গেল প্রায় তিনশ টাকায়। এতদিনে নলিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে এবং কতকটা স্বামীর চাকরির জন্যই অতি দ্রুত প্রমোশন পাইয়া পাইয়া স্বামীর সংসারে প্রায় গিন্নির পদ পাইয়াছে। সংসারে বিশেষ অশান্তি নাই, রোগশোক নাই, অনটন নাই—নলিনীর মনেও জোরালো দুঃখ কিছু নাই। কেবল সেই যে তিন দিন কথা বন্ধ থাকার পর মাখনের মিথ্যা বলার জন্য মনটা তার খারাপ হইয়া গিয়াছিল, মৃদু আশঙ্কার মতো একটা স্থায়ী অস্বস্তির মধ্যে সেই মন খারাপ হওয়ারই কেমন যেন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া জের চলিতেছে। কোনো পাপ করে নাই নলিনী তবু ভয়ে রূপান্তরিত পুরানো পাপের মতোই কী যেন একটা দুর্বোধ্য ভার সব সময়েই তার মনকে বহন করিতে হইতেছে।

মাখনের জুয়ার নেশা কাটিয়া যায় নাই, ভালবাসার নেশার মতোই প্রথম বয়সের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহ্য অধীরতার যুগটা পার হইয়া ধীরস্থির হিসাব করা নেশায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পাকা প্রেমিকের অভ্যস্ত প্রেম করার মতো তার জুয়া খেলাটাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা নিয়মিত। টাকা অবশ্য জমে না, অনেক সাধ অবশ্য মেটে না, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকার জন্য সাময়িকভাবে রীতিমতো বিপদে পড়িতে হয়, তবু মোটামুটি সংসার চলিয়া যায়। মাখনের শ-খানেক টাকা বেতন হইলে যেমন চলিত তেমনিভাবে চলিয়া যায়। মাখনের বেতন শ-খানেক টাকা ধরিয়া নিলে অবশ্য অনেক হাঙ্গামাই মিটিয়া যাইত, এর চেয়ে অনেক কম বেতনেও জগতে অনেক লোক চাকরি করে, কিন্তু মুশকিল এই যে তিনশ টাকা যে বেতন পায় তার বেতনের দুশ টাকা কোনো কাজে না আসিলেও বেতন তার শ-খানেক টাকার বেশি নয় এটা ধরিয়া নেওয়া তার নিজের পক্ষেও অসম্ভব, আত্মীয় বন্ধুর পক্ষেও অসম্ভব।

আত্মীয় বন্ধুর রাগ অভিমান বিরক্তি আর উপদেশ উপরোধ সমালোচনা এখনো চলিতে থাকিলেও নলিনী একরকম আর কিছুই বলে না। সে জানে এ রোগের ওষুধ নাই। এ কথাটাও সে জানে যে প্রয়োজন হইলে জুয়ার খরচটা মাখন কমাইয়া দিবে, কিন্তু সত্য সত্যই প্রয়োজন হওয়া চাই। পেট ভরানোর মতো, গা ঢাকা দেওয়ার মতো, রোগের সময় ডাক্তার টাকা ওষুধ কেনার মতো খাঁটি প্রয়োজন। এ রকম আসল প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ববোধের কাছেই কেবল তার জুয়ার নেশা হার মানে।

কত কৃত্রিম প্রয়োজনই নলিনী দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কতবার কতভাবে স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সংসারে এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। মাখন শুধু বলিয়াছে, আচ্ছা আচ্ছা, হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় কিছুই হয় নাই।

বাড়ি বদলানোর জন্য নলিনী অনেকবার ঝগড়া করিয়াছে। বলিয়াছে, 'এ বাড়িতে আমি থাকব না, একটা ভালো বাড়িতে চলো।' বলিয়া রাগ করিয়া বাপের বাড়িতে চলিয়াছে।

তখন অবশ্য মাখন বেশি ভাড়ার একটা ভালো বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার ফলটা নলিনীর পক্ষেই হইয়াছে মারাত্মক। কারণ, জুয়ার খরচ মাখন এক পয়সা কমায় নাই, টান পড়িয়াছে সংসারের খরচেই। আবার উঠিয়া যাইতে হইয়াছে কম ভাড়ার বাড়িতে।

নলিনী বলিয়াছে, 'আমি দুগাছা করে নতুন চুড়ি গড়াব।'

মাখন বলিয়াছে, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তারপর দুবছরের মধ্যে সস্তা একজোড়া দুলও নলিনীর গড়ানো হয় নাই। কারণ, চুড়িও নলিনীর আছে, দুলও আছে।

কিন্তু নলিনী যেদিন বলিয়াছে, 'একটা লাইফ ইনসিওর পর্যন্ত করবে না তুমি?' তার এক মাসের মধ্যে মাখন দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছে এবং এখন পর্যন্ত নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়া আসিলেও বেশি ভাড়ার বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার ফলটা নলিনীকে ভোগ করিতে হয় নাই।

ধরিতে গেলে টাকা-পয়সার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়াই হইয়া গিয়াছে। তবু সেই রহস্যময় মৃদু আতঙ্কের পীড়ন একটু শিথিল হয় নাই। কী যেন একটা বিপদ ঘটিবে—অল্পদিনের মধ্যেই ঘটিবে। কিন্তু কী ঘটিবে? মাখন একদিন জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়া সর্বনাশ করিবে? কিন্তু মাখনের সর্বস্ব তো তার তিনশ টাকার চাকরি, উপার্জনের টাকা জুয়ার নেশায় নষ্ট করা সম্বন্ধে সে যতই অবিবেচক হোক, চাকরি নষ্ট করার মানুষ সে নয়। সে বিশ্বাস নলিনীর আছে। তবে? আরো অনেক বেশি আরামে ও সুখে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ পাইয়াও স্বামীর দোষে কোনোরকমে খাইয়া পরিয়া অতি গরিবের মতো বাঁচিয়া থাকিতে হওয়ার যে জ্বালাভরা অভিযোগ, এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া?

কিন্তু কোথায় জ্বালাভরা অভিযোগ? রাজপ্রাসাদে রাজরানীর মতো সুখে ও আরামে থাকিবার ব্যবস্থা মাখন করিয়া দিক এটা সে চায়, মাখনের ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে চায়, কিন্তু না-পাওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষোভ তো তার নাই।

নলিনী তাই কিছু বলে না। সব বিষয়েই সে একরকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, মাখনের সহজ সাধারণ ভালবাসার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ আনিবার চেষ্টায় পর্যন্ত। চেনা মানুষ স্বামী হইয়াছে, তার কাছে কি অচেনা মানুষের নাটকীয় ভালবাসা আশা করা যায়? এতদিন ছেলেমানুষ ছিল তাই চেষ্টা করিয়াছে, বিবাহের আগে বুদ্ধি কম ছিল তাই তখন ভাবিয়াছে, বিবাহ হইলে হয়তো মাখন বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু জুয়ার নেশায় উত্তেজনা আর অবসাদের মধ্যে যার মনের জোয়ার ভাঁটা, বৌয়ের কথা কি তার মনে পড়ে, বৌয়ের জন্য একবার একটু পাগল হওয়ার সময় কি তার থাকে!

ভাবিতে ভাবিতে নলিনীর সাধারণ ছোট ছোট চোখ দুটিতে অস্পষ্ট স্বপ্নের স্পষ্ট ছায়া এমন অদ্ভুত ভাবালুতার আবরণে ঘনাইয়া আসে যে জগতের সব ডাগর ডাগর চোখগুলিতেও তা সম্ভব মনে হয় না। হয়তো তখন দুপুরবেলায় আঁচল পাতিয়া মেঝেতে গড়ানোর অবসরটা পাওয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়ের একজন খেলায় মত্ত, একজন ঘুমে অচেতন। চোখ বুজিলে কষ্ট বাড়িয়া যায়, নলিনী তাই চোখ মেলিয়া স্বপ্ন দেখে—তার কুমারী জীবনের স্বপ্ন : আত্মহারা আবেগের সঙ্গে তাকে ভালবাসিলে মাখন কী করিত। সম্ভব অসম্ভব কত কথাই নলিনী ভাবে।

তারপর অল্প অল্প অস্বস্তির মধ্যে মৃদু ভয়ের পীড়নে স্বপ্ন শেষ হইয়া চোখ দুটি তার বড় সাধারণ দেখাইতে থাকে। দুটি সন্তান যার তার কেন আর এসব স্বপ্ন দেখা, আর কি এ স্বপ্ন সফল হয়! যদি-বা হয়, কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে আংশিকভাবে সফল হয়, দুদিন পরে

সেটুকু সম্ভাবনাও আর থাকিবে না। আবার ছেলে বা মেয়ে কোলে আসিবে নলিনীর, তারপর সব শেষ। উদাসীন মাখনের মধ্যে প্রেমের উদ্দীপনা জাগানোর কথা ভাবিতে তার নিজেরই কি লজ্জা করিবে না? কী দিয়াই বা সে উদ্দীপনা জাগাইবে।

এখনো কেউ জানে না! দুদিন পরেই জানিবে। মাখন হয়তো খুশি হইয়া আদর-যত্ন বাড়াইয়া দিবে, বলিবে : 'একটু দুধ খেয়ো। এ সময় দুধটুধ খেতে হয়।' কিন্তু তারপর? আরো শ্রান্ত হইয়া পড়িবে মাখন, আরো ঝিমাইয়া পড়িবে। মাথা কপাল খুঁড়িয়া মরিয়া গেলেও আর নলিনী তাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। নলিনীর ভ্রূ কুঁচকাইয়া যায়, সঙ্কুচিত চোখ দুটিতে মরণের চেয়ে গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়ে, শীতের দুপুরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।

কোনো উপায় কি নাই? যে-কোনো একটা উপায়? ব্যর্থ হইলে যদি সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তবু সার্থকতার যেটুকু সম্ভাবনা থাকিবে তারই লোভে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। কিন্তু সেরকম উপায়ই বা কোথায় যাতে সমস্ত শেষ হইয়া যায়, নয় মাখনের ভালবাসা মেলে?

ঠিক সেই সময় দুরু দুরু বুকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে মাঠে রেলিং ঘেঁষিয়া এগারটি ঘোড়ার মধ্যে একটির অগ্রগতি লক্ষ করিতে করিতে ভাবিতেছিল, এবারো না জিতলে বিপদে পড়িবে বটে, কিন্তু যদি জেতে—

সন্ধ্যার পর ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে বন্ধু অবনীর সঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত মাখন ফিরিয়া আসে। সুরেশের মতো অবনী এখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মানুষটা সে একটু বেঁটে, রোগা, লাজুক আর ভীরু। কথার জবাবে পারিলে কথা বলার বদলে মৃদু একটু হাসিয়াই কাজ সারে। কখনো কেউ তাকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। ঘোড়া ছুটিবার সময় মাখন যখন আগ্রহ উত্তেজনায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়াইতে থাকে, অবনী নির্বিকারভাবে বিড়ি টানিয়া যায়। জিতিলে মাখন 'হুররে' বলিয়া প্রচণ্ড একটা চিৎকার করিয়া লাফাইয়া ওঠে, হারিলে ঝিমাইয়া পড়ে। অবনী জিতিলেও মৃদু একটু হাসে, হারিলেও হাসে।

নলিনীর সাজপোশাক দেখিয়া দুজনেই একটু অবাক হইয়া যায়। ফ্যাশন করিয়া শাড়ি পরিয়াছে, রঙিন ব্লাউজ গায়ে দিয়াছে, শুধু ঘষামাজায় খুশি না হইয়া গালে বোধ হয় একটু রঙের আর চোখে একটু কাজলের ছোঁয়াচ দিয়াছে।

মাখন বলে, 'কোথায় যাবে?'

নলিনী একগাল হাসিয়া বলে, 'কোথায় আবার যাব?'

'সেজেছ যে?'

'সেজেছি? কী জ্বালা, কোথাও না গেলে বাড়িতে বুঝি ভূত সেজে থাকতে হবে?' তারপর অবনীর কাছে গিয়া বলে, 'সইকে বুঝি তালা বন্ধ করে রাখেন, আসে না কেন?'

অবনী নীরবে মৃদু একটু হাসে।

'চলুন সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বলিয়া স্বামীর যে-বন্ধুর সঙ্গে তিন হাত তফাতে দাঁড়াইয়া নলিনী সংক্ষেপে কথা বলিত, রীতিমতো তার হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া তোলে এবং মাখনের দিকে একনজর না চাহিয়াই বাহির হইয়া যায়।

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও নলিনী ভিতরের উত্তেজনা গোপন করিতে পারে না। অবনীর বৌ বলে, 'কী হয়েছে সই?'

'কিছু না।'

কোমরে আঁচল জড়াইয়া অবনীর বৌ রান্না করিতেছিল। নলিনীর চেয়ে সে বয়সে বড়, কিন্তু বড়ই তাকে ছেলেমানুষ দেখায়। মানুষটা সে সব সময়েই হাসিখুশি, কাজ করিতে করিতে গুনগুন করিয়া এখনো গান করে। তাকে দেখিলেই নলিনীর বড় হিংসা হয়, মনটা কেমন করিতে থাকে। ওর স্বামীও তো জুয়া খেলে, তার চেয়ে অনেক কষ্টেই ওকে সংসার চালাইতে হয়, দুটি ছেলের মধ্যে একটি ওর মরিয়া গিয়াছে, তবু সব সময় এমন ভাব দেখায় কেন, দুদিন আগে বিবাহ হইয়া আসিয়া স্বামীর আদরে মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না!

অবনীর বৌ বলে, 'এমন সেজেগুজে হঠাৎ?'

নলিনী বলে, 'এমনি এলাম তোমায় দেখতে।'

'কী ভাগ্যি আমার!' ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপাইয়া হাসিতে হাসিতে অবনীর বৌ কাছে আসিয়া বসে।

কথা আজ জমে না। রাত্রির সঙ্গে নলিনীর ভয় বাড়ে, ক্রমেই বেশি অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তবু উঠিবার নাম করে না। যত রাত হইবে মাখন তত বেশি রাগ করিবে—তত বেশি নাড়া খাইবে মাখনের মন। একটুও কি পরিবর্তন আসিবে না? রাগটা যখন পড়িয়া যাইবে তখন?

রান্না শেষ হয়, অবনীর খাওয়া হইয়া যায়, তখনো নলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবনীর বৌ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। হাসিখুশি ভাব মিলাইয়া গিয়া তারও মুখে যেন ভয়ের ছাপ পড়ে।

'আমায় কিছু বলবে সই?'

নলিনী মাথা নাড়িয়া বলে, 'কী বলব? না, না, কিছু বলব না।'

'তোমায় নিতে আসছে না যে।'

'কে জানে। ওর কথা বাদ দাও।'

খানিক পরে অবনীর বৌ বলে, 'ওই তবে তোমায় দিয়ে আসুক আর রাত করে কাজ নেই। পুঁইচচ্ছড়ি বেঁধেছি, মুখে দিয়ে যাবে সই?'

হোক আরেকটু রাত, মাখনের রাগ আরেকটু বাড়িবে। আরম্ভ যখন করিয়াছে, শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না। মরিয়া হইয়া নলিনী সখীর রান্না পুঁইচচ্ছড়ি মুখে দিবার জন্য সখীর সঙ্গে একথালায় খাইতে বসে। দুজনে বেশ পেট ভরিয়া খায়, সকালের জন্য পান্তা না রাখাতেই ভাতে কম পড়ে না, আর ডাল ভাজা মাছ তরকারি যতটুকুই থাক, ভাগাভাগি করিয়া খাওয়ার সময় তো মেয়েদের কখনো কম পড়েই না।

খাওয়ার পরে পান মুখে দিয়া অবনীর বৌ স্বামীকে ডাকিয়া বলে, 'ওগো শুনছ, একটু বেরিয়ে এসো ঘর থেকে। সইকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। বাবা, এগারটা বাজে!'

নলিনীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এতরাত্রে আবার অবনীর সঙ্গে একা ফিরিতে দেখিলে কী রাগটাই না জানি মাখন করিবে! করুক রাগ, রাগাইবার জন্যই তো সাজিয়া গুজিয়া এভাবে সে বাহির হইয়াছে, এখন সেজন্য ভয় পাইলে চলিবে কেন? নিজেকে নলিনী অনেক বুঝায় কিন্তু বুকের ঢিপঢিপানি কিছুতেই কমে না।

দু-বন্ধুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। রিকশায় মিনিট দশেক লাগে। অবনীর বাড়ির কাছেই গলির মোড়ে রিকশা পাওয়া যায়। অবনী দুটি রিকশা ভাড়া করিতেছিল, নলিনী বারণ করিল, 'মিছিমিছি কেন বেশি পয়সা দেবেন? একটাতেই হবে।'

'না না, দুটোই নিই—'

নলিনীর গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, এসব খাপছাড়া উত্তেজনা কী তার সহ্য হয়! তবু মরিয়া হইয়া সে বলিল, 'আসুন না, একটাতে বসে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

গল্প কিছুই হয় না, সমস্ত পথ দুজনেই যতটা সম্ভব পাশের দিকে হেলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। বাড়ির দরজার সামনে রিকশা থামামাত্র নলিনী তড়াক করিয়া নামিয়া যায়। অবনীকে বলে, 'ওঁকে ডেকে দিয়ে আপনি এই রিকশাটা নিয়ে ফিরে যান।'

দরজা খুলিয়া দিতে আসিয়া মাখন দেখিতে পাইবে এতরাত্রে বৌ তার এক রিকশায় অবনীর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে, নলিনীর এই আশা বা আশঙ্কা পূর্ণ হইল না। দরজা খুলিয়া দিল চাকর।

ঘরে গিয়া নলিনী দেখে কী, মেয়েটাকে কোলে নিয়া আনাড়ির মতো থাপড়াইয়া থাপড়াইয়া মাখন তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করিতেছে। বৌয়ের সাড়া পাইয়া মাখন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, 'কী আশ্চর্য বিবেচনা তোমার! দুজনকে ফেলে রেখে এত রাত পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এলে? খুকিকে তো অন্তত নিয়ে যেতে পারতে সঙ্গে।'

মেয়েকে নামাইয়া দিয়া মাখন নিজের বিছানায় উঠিয়া শ্রান্তভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। খুব যে রাগ করিয়াছে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

'তুমি কাউকে পাঠালে না কেন? অবনীবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে—'

'কাকে পাঠাব? শম্ভু এতক্ষণ খুকিকে রাখছিল।'

দুমিনিট আগে দরজা খুলতে যাওয়ার সময় শম্ভু তবে মেয়েকে মাখনের কোলে দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে মাখনকে মেয়ে রাখিতে হয় নাই! নলিনী জিজ্ঞাসা করিল না, মাখন নিজে কেন তাকে আনিতে যায় নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়া কী হইবে? নিজের চোখে বৌ আর বন্ধুকে জড়াজড়ি করিতে দেখিলেও বোধ হয় তার রাগ হইবে না। এমন বদমেজাজি মানুষ, এক গ্লাস জল দিতে দেরি হওয়ায় আজ সকালেই শম্ভুকে মারিতে উঠিয়াছিল, শুধু বৌকে তার এত অনুগ্রহ কেন? একদিন কি সে রাগের মাথায় বৌয়ের গালে একটা চড় বসাইয়া দিতে পারে না, যাতে খানিক পরে ভালবাসার জন্য না হোক অন্তত অনুতাপের জন্যও অনেকগুলি চুমু দিয়া চড়ের দাগটা মুছিবার চেষ্টা করা চলে?

বাহিরটা একবার তদারক করিয়া আসিয়া নলিনী ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুইয়া পড়ে। মাখন বলে, 'খেলে না?'

নলিনী বলে, 'ওদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া যায়, তারপর মাখন যেন ভয়ে ভয়েই আস্তে আস্তে বলে, 'আজ অনেকগুলি টাকা জিতেছি।'

নলিনী সাড়া দেয় না।

'প্রায় সাতশ।'

নলিনী তবু সাড়া দেয় না।

'তোমায় একটা গয়না গড়িয়ে দেব—যা চাও।'

নলিনী চুপ করিয়া থাকে। নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে 'কে শুনতে চায় তুমি হেরেছ কি জিতেছ, কে চায় তোমার গয়না, একবার কাছে ডাকতে পার না আমায়?'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাখন বলে, 'রাগ করেছ? না না, ঘুমোও আর জ্বালাতন করব না।'

শৈলজ শিলা

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিধবা মাসির খোশামোদ করা। মাসি মরিল। সুতরাং জীবনটা উদ্দেশ্যহীন হইয়া গেল।

উদ্দেশ্যহীন জীবনটা নিয়া কী যে করিব ভাবিয়া পাই না।

বন্ধুবান্ধবের কুপরামর্শে একদা সুপ্রভাতে মেয়ে দেখিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলাম। মেয়ে অবশ্য সুন্দরী, ফিরিঙ্গি স্কুলের প্রবেশিকা ক্লাসেও পড়ে, কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তো?—হবু বরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া আতঙ্কে মুখ কালো করিবার কী তার অধিকার? সারাদিন রাগে গজগজ করিলাম এবং পাশের বাড়ির কালো মেয়েটাকেই বিবাহ করিব স্থির করিয়া বিকালে ছাদে উঠিলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র মুচকি হাসিয়া মেয়েটা তৎক্ষণাৎ নিচে চলিয়া গেল।

কবে যেন মাদুর পাতিয়া ছাদে শুইয়াছিলাম, কয়েক দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাদুরটা ছাদের সঙ্গে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে। মস্ত একটা হাই তুলিয়া ইহার উপরেই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অপরাহ্ণের ওই চকচকে আকাশটা যে আয়না নয় এ জন্য কত জন্ম ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম কে জানে!

আকাশে উঠিয়া পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সাঁতার দিতে থাকিলে কোথাও গিয়া পৌছানো যায় কি না এমনি একটা অবাস্তব চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—স্বপ্ন দেখিলাম পাহাড়ের। তরুহীন শষ্পহীন ধূসরবর্ণ রাক্ষসের মতো গাদাগাদি করিয়া রাখা পাহাড়গুলির চাপে স্বপ্নেই আমার উপত্যকার প্রেম গুঁড়া হইয়া গেল। তিন দিন বাদে পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া চলিয়া গেলাম দার্জিলিং এবং একদা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখিয়া সূর্যের উদ্দেশ্যেই কয়েক দিনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

ইহাতে আমার যে কী শাস্তি হইল শুনিলে আপনাদের চোখে জল আসিবে। এক ঘণ্টার ভিতরে সূর্যদেব কোন দিকে ওঠেন তাহা তো ভুলিয়া গেলামই, পাক খাইতে খাইতে আমি নিজে কোন দিকে চলিলাম তাহার পর্যন্ত কিছু স্থিরতা রহিল না। নিজেকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া একটা খাড়াইয়ের উপর তুলিয়া কোন দিকে নামিলে যে হাতপা ভাঙিয়াও প্রাণটা বজায় রাখা যাইবে ঠিক করিতে পারি না, যেদিক দিয়া উঠিয়াছি, সেদিকে নামার কথা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। হাত আর হাঁটুর চামড়া ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, মাস্‌লগুলি ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিল, এমন মাথা ঘুরিতে লাগিল যেন পৃথিবীর ঘূর্ণিত গতি প্রত্যক্ষ করিতেছি!

অবশেষে একবার যখন হাত ফসকাইয়া কুড়ি ফিট আন্দাজ গড়াইয়া একটা গাছের গুঁড়িতে আটকাইয়া গেলাম, তখন আর উঠিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া মনে মনে বলিলাম, থাক যথেষ্ট হইয়াছে। সেইখানে শুইয়া শুইয়া পকেট হইতে বিস্কুটের গুঁড়া বাহির করিয়া মুখে

পুরিতে লাগিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম।

ভাবিলাম, একেবারে শুকনা শিলার গায়ে এই গাছটা গজানো না জানি কোন নিষ্ঠুর দেবতার কীর্তি। ওই তো তলা দেখা যাইতেছে, গড়াইয়া পড়িলেই হইত! জীবনের উদ্দেশ্যটা তাহা হইলে কিছু কিছু বোঝা যাইত নিশ্চয়।

ঘণ্টাখানেক ঝিমাইবার পর উঠিবার চেষ্টা করিলাম। কোনোমতে গাছটা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম নিজের ইচ্ছায় যেটুকু নামি নাই শত ইচ্ছা করিলেও সেটুকু আর উঠিতে পারিব না। নানাবিধ কসরতের সাহায্যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নিচে নামিয়া পড়িলাম।

সোজা হইয়া দাঁড়াতেই দেখি, চমৎকার! ত্রিশ গজ তফাতে পাহাড়ি উনুনে একটা ভাতের হাঁড়ি চাপানো রহিয়াছে এবং নিকটে যে রাঁধুনি বসিয়া আছেন তিনি নিঃসন্দেহে বাঙালি ভদ্রলোক।

মাতালের মতো হেলিয়া দুলিয়া নিকটে গেলাম। প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি এখানে?'

ভদ্রলোকের মুখ আমসির মতো শুকাইয়া গেল। বলিলেন, 'আজ্ঞে, আপনাকে তো চিনলাম না!'

হাসিয়া বলিলাম, 'এখানেই জীবন কাটিয়েছেন নাকি? মানুষ দেখেন নি কখনো? আমি আপনার মতোই মানুষ। এত জায়গা থাকতে এখানে এসে ভাত রাঁধছেন কেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পাবার জন্য বুঝি এখানে শুভাগমন করেছেন?'

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'আমার বড় বিপদ মশাই।'

'সে আমারও' বলিয়া বসিলাম। নিকটবর্তী গুহাটায় চোখ পড়িল উনানের ধোঁয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া।

'বাহ বাহ এ যে দেখছি গুহা! আপনি ওখানে তপস্যা করেন নাকি? পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ করেছেন?'

'আজ্ঞে না। বিপদ তো ওইখানে।'

শুনিয়া ভদ্রলোকের আপত্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গুহায় উঁকি দিলাম। একটি যুবতী মেয়ে মাদুরে শুইয়া বেদনায় কাতরাইতেছে!

ভড়কাইয়া লোকটির কাছে ফিরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিলাম, 'এ যে বিষম কাণ্ড মশাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর ছেলে হচ্ছে।'

'হচ্ছে নাকি?' বলিয়া আমি প্রকাণ্ড একটা হা করিয়া ফেলিলাম এবং বহুক্ষণ অবধি সে হা বন্ধ করিতে খেয়াল হইল না।

যত দুর্গম পথ দিয়াই আমি আসিয়া থাকি এখানে আসিবার একটা সুগম পথও আছে দেখা গেল। এই পথ দিয়া প্রত্যহ দুবেলা পাঁচ-ছয় মাইল চড়াই-উতরাই ভাঙিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার ভারটা আমার উপরেই পড়িল। ভদ্রলোকটি দেখিলাম বেজায় কুঁড়ে। দুবেলা রান্না করেন, খান আর গুহামুখে মস্ত একটা পাথরে ঠেস দিয়া বসিয়া চুপচাপ আকাশ-পাতাল ভাবেন। একেবারেই অকর্মণ্য।

গুহা আলো করা একটি মেয়ে হইয়াছে। ট্যা ট্যা করিয়া কাঁদে, চুক চুক করিয়া দুধ খায় আর চোখ বুজিয়া ঘুমায়। আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি।

বলি, 'লোকজন ডেকে এবার লোকালয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যাক, কী বলেন মশায়?'

লোক ডাকার কথা শুনিলে লোকটা কেমন কাঁদ-কাঁদ হইয়া যায়, শহরে ইহাদের বিপদের কথা প্রচার করিব বলিলে একেবারে কাঁদিয়া ফেলে।

স্ত্রী তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর দশ ঘণ্টা কাঁদিয়াই কাটায়। ভিতরে কিছু গোলমাল আছে বুঝিতে পারি, মেয়েটার চুলপাড় শাড়ি আর সিঁদুরহীন সিঁথি দেখিয়া সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়! স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'আঁতুড়ে কি সিঁদুর পরতে আছে?' স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে!

বড়ই জটিল ব্যাপার। নকল দুঃস্বপ্নের মতো।

দিন দশেক বাদে কিন্তু সব সরল হইয়া গেল। খাদ্য ও দুগ্ধের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখি কচি মেয়েটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে, মা-বাপ কাহারো চিহ্ন পর্যন্ত নাই! মেয়েটার কাছে একটা চিঠি পড়িয়াছিল। যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি ভীষণ। আমার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া নামধাম না দিয়া লোকটি রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে। যুবতীটি নাকি লোকটির স্ত্রী নয়, বালবিধবা কন্যারত্ন।

পাপটাকে যাহাতে গুহাতেই মরিতে দিয়া পলাইয়া গিয়া জগতের কল্যাণ করি, শেষের দিকে এরূপ একটা অনুরোধও জানানো হইয়াছে।

খুকিকে কোনো প্রকারে একটু দুধ খাওয়াইয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম। অনুপস্থিত বিধবাটি এবং তাহার বাপের উদ্দেশে আমার গালাগালি শুনিয়া গুহার পাথরগুলিও বোধ হয় সেদিন লজ্জা পাইয়াছিল।

পনের বছর পরে ভূমিকম্প!

বাৎসল্যের সিমেন্ট দিয়া যৌবনের শক্ত গারদ করিয়াছিলাম, তাহা ফাটিয়া একেবারে চৌচির!

মেয়েটা গুহা আলো করিয়া জন্মিয়াছিল, এখন আমার বাড়িটা এমন আলো করিয়াছে যে, এই প্রৌঢ় বয়সে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

একরাশি কালো চুল পিঠে জড়াইয়া ফরসা একখানি কাপড় পরিয়া চঞ্চলপদে সারাদিন চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার পর আলোর সামনে পড়িতে বসিয়া ছটফট করে, আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি। মেয়েটা যে এত সুন্দর এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কী মনে হয়। পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াই, ওর ওই টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব-গঠন তনু আমাকে সেইখানে আটকাইয়া রাখে।

রাতদুপুরে তার ঘরের দরজায় টোকা দিয়া অদ্ভুত গলায় ডাকি, 'শিলা!'

সে অবশ্য ঘুমাইয়া থাকে, সাড়া দেয় না, আমার মুখের ডাকে আমারই ভবিষ্যৎ ভূতটা যেন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, অকস্মাৎ এমন আতঙ্ক হয় যে বলিবার নয়। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় শুইয়া পড়ি। অন্ধকারে হাতড়াইয়া চুরুট দেশলাই খুঁজিয়া নিয়া তাড়াতাড়ি চুরুট ধরাইয়া টানিতে গিয়া কাশিতে আরম্ভ করিয়া দিই। কাশিতে কাশিতে হাসি পায়, আমার হাসির শব্দে অন্ধকার যেন নড়িয়া ওঠে, বাড়িটা যেন বিরক্তিতে একবার একটু কাঁপে, আমার গা যেন ছমছম করে। গলা চাপিয়া হাসি থামাইতে গিয়া গোঁ গোঁ শব্দ

হয়, তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া নিয়া আমি উঠিয়া বসি।

খোলা জানালায় শব্দ হয়, 'দাদু!'

'কী রে শিলা?'

'আমার ভয় করছে দাদু। কে যেন হা হা করে হাসছিল।'

শুনিয়া শিহরিয়া উঠি। চৌকির প্রান্তটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলি, 'ভয় আবার কিসের? ঘুমোগে যা।'

'আমি তোমার ঘরে শোব দাদু, দরজা খোলো।'

মেয়েটে বলে কী! এই নিস্তব্ধ রাত্রি, অনুভূতিতে ঘা–মারা এই গাঢ় অন্ধকারে অর্ধোন্মাদ এই নিদ্রাহীন তৃষিত প্রৌঢ়, এ–ঘরে শুইতে চায় ও কোন হিসাবে? রাতদুপুরে জ্বালাতন করিতে নিষেধ করিয়া এমন জোরে ধমক দিয়া উঠি যে, নিজেরই চমক লাগে।

মিনিটখানেক ঘড়িটার টিকটিক শব্দ ছাড়া সব স্তব্ধ হইয়া থাকে, তারপর শুনিতে পাই অবাধ্য মেয়েটা জানালা ছাড়িয়া এক পাও নড়ে নাই, অধিকন্তু ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলি, ভূত আর আমার ভয়ে শিলা ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছে না, দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া জানালার নিচে বসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া আমার হৃদয় হিম হইয়া যায় এবং আমি স্পষ্ট অনুভব করি সেখানে অতনুর মুর্ছা হইয়াছে।

ও–ঘর হইতে বিছানা টানিয়া আনিয়া নিজেই শয্যা রচনা করিয়া দিই। চোখ মুছাইয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া দিতেই শিলা নীরবে গিয়া শুইয়া পড়ে।

আমি ক্ষণকাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকি। খানিক দূরে তেতালা বাড়িটার মাথা ডিঙাইয়া গিয়া বড় বড় কয়েকটা তারার সংবাদ নিয়া ফিরিয়া আসার পূর্বেই জলীয় কুয়াশায় আমার দু–চোখ আত্মহারা হইয়া যায়। ভিজা স্যাঁতসেঁতে তাহার আর্তি!

পাড়া প্রতিবেশীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, 'এবার নাতনির বিয়ে দাও। অমন টুকটুকে নাতনি তোমার!'

নাতনি টুকটুকে বলিয়া নয়, আমার টুকটুকে নাতনি বলিয়া ইহাদের বিস্ময় যেন বেশি! শুনিলে রাগে গা জ্বলিয়া যায়। আমার তিলোত্তমা বৌ থাকা যেন অসম্ভব! আমার সুন্দরী মেয়ে যেন ছিল না। টুকটুকে নাতনি যেন আমার থাকিতে নাই!

বলি, 'আমার নাতনির বিয়ের ভাবনা আমিই ভেবে উঠতে পারব মিত্তির মশায়।'

সান্যাল বলে, 'তা অত ভাবাভাবির দরকার কী? তুমি নিজেই বিয়ে করে ফেলো না হে! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এমন শক্ত সমর্থ দাদু—নাতনি তোমার বর্তে যাবে।'

খুশি হইয়া সান্যালের পিঠ চাপড়াইয়া বলি, 'তা মন্দ বল নি সান্যাল! আমিও মাঝে মাঝে ওই কথাই ভাবি। একটা বেরসিক ছোঁড়ার হাতে ওকে দিতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।'

ইহাদের ভিতর চাটুজ্যে লোকটা অতি বদ। বলে, 'না না; এ ঠাট্টার কথা নয়। মেয়েটি ডাগর হয়েছে, এবার বিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আমাদের এই ভূপেনের সঙ্গে সম্বন্ধ করো না?'

ভূপেন ছোঁড়া পাড়ার হৃদয় ডাক্তারের পুত্র এবং পাড়ার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে সুপাত্র। অন্দরে ঢুকিতে দিই না, তবু নিত্য আমাদের এই আড্ডায় হাজির হয়। বোধ হয় পান জল দিবার জন্য শিলা যে বাহিরে আসে সেই সময় তাহাকে দেখিবার লোভে। চাটুজ্যের কথায় ছোঁড়ার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়া ফেলি এবার হইতে পান জল দিবার বরাতটা চাকরের উপরেই থাকিবে।

মুখুজ্যে চাটুজ্যে অপেক্ষাও পাজি। স্মিতমুখে ভূপেনের দিকে চাহিয়া বলে, 'বড় ভালো ছেলে, বড় ভালো ছেলে। পাড়ার সবগুলি ছেলে এ রকম হলে—'

ঠিক এমনি সময়ে পান নিয়া ঘরে ঢুকিয়া শিলা প্রশংসাগুলি সব শোনে। ইচ্ছা করে মেয়েটাকে অন্দরে ছুড়িয়া দিয়া লাঠি নিয়া সকলকে মোড় পর্যন্ত তাড়াইয়া নিয়া যাই আর ভূপেনের মাথায় বসাইয়া দিই সেই লাঠি। পুলিশের হাত এড়াইতে শিলাকে নিয়া তার সেই আঁতুড়ের গুহাতে চিরকাল লুকাইয়া থাকি। সেই অপরিসর গুহার ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া রাত কাটানোর সমর্থন পাইলে আমি কী না করিতে পারি?

সকলকে বিদায় দিয়া ভিতরে গিয়াই শিলাকে বলি, 'বিয়ে করবি শিলা?'

সে মাথা নাড়িয়া বলে, 'না দাদু বিয়ে আমি করব না।'

'তবে কী করবি?'

'তোমার কাছে থাকব।'

'তা থাকিস। কিন্তু চিরকাল নাতনি হয়েই থাকবি? বৌ হয়ে থাক না!'

'দূর ছোটলোক!' বলিয়া সে হাসে।

তাহার মুখ হইতে যে দৃষ্টি সরাইতে পারি না, তাহা এমনি মুখর যে চক্ষু মার্জনার ছলে ঢাকিয়া দিতে হয়। আফসোস করিয়া মরি যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া ওর দাদু হইয়া স্নেহ শিখাইয়াছি, স্বামী হইয়া প্রেম শিখাই নাই। আজ তাহা হইলে—

চিন্তাটা বড় জটিল। আমার স্নেহের পুত্তলি আমাকে এমনভাবে ঠকাইবে কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল?

ইচ্ছা হয় জন্মের কাহিনী শুনাইয়া মেয়েটাকে ভাঙিয়া দিই। উহার মুখের নিষ্পাপ সরলতা ঘুচিয়া গিয়া আমার পথ পরিষ্কার হোক।

'মার কথা শুনবি শিলা?'

'বলো দাদু।'

আমি বলিতে আরম্ভ করি। গুহার আবছা আলোয় শিলার জন্মকথা। কিন্তু যতবারই বলি আসল বক্তব্যটা গোপন থাকিয়া যায়, শেষ করি একটা মিথ্যা বলিয়া। অযত্নে অচিকিৎসায় ঠাণ্ডায় না-দেখা মার শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী শুনিয়া শিলার চোখ দিয়া জল পড়ে!

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, বদমাইশ তো কোনোদিন ছিলাম না, পারিব কেন! অন্যায় করিবার অক্ষমতায় আত্মপ্রসাদ জন্মে, যথালাভ মনে করিয়া তাহাতেই খুশি থাকিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু পারিলাম না। শিলাকে চুম্বন করিবার মতো অবস্থাটা কিছুকালের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়া গেল। কেমন করিয়া গেল তাহা এত বেশি সূক্ষ্ম যে ভাষার মোটা ইঙ্গিতে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার দুঃখে কলম ছুড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শিলার বয়স আর পনের নাই, ষোল হইয়াছে।

কিছুকাল হইতেই দেখিতেছি সে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কী এক না-জানা ভয়ে চোখ দুটি চঞ্চল। মুখ যেন বর্ষণহীন শ্রাবণের আকাশ, ক্রমাগতই কালো কালো মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। সকালবেলা আমি টাকা-পয়সার হিসাব নিয়া ব্যস্ত থাকি, মুখ তুলিতেই দেখি একটা অদ্ভুত বিষণ্ন মুখভঙ্গি করিয়া সে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আমাকে চাহিতে দেখিলে সরিয়া যায়।

আমার হিসাব যায় গুলাইয়া, ডাকি, 'শিলা শোন।'

আমি ডাকিলেই শিলা দুড়দাড় ছুটিয়া আসিত, এখন এমন মন্থর গতিতে আসে যেন পদে পদে পা বাঁধিয়া যাইতেছে। খানিক তফাতে থাকিয়াই বলে, 'কী দাদু?'

'কাছে আয়।'

শিলা কাছে আসে না, আসিতে থাকে। নাগালের মধ্যে আসিলেই খপ করিয়া তার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া দিই। বলি, 'তুই বড় লক্ষ্মী মেয়ে, শিলা।'

শিলা জোর করিয়া একটু হাসে। বলি, 'আমাকে তুই ভালবাসিস, শিলা?'

পরম আশ্বস্ত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'বাসি দাদু। ঘামাচি মেরে দেব বুঝি?'

সুতরাং ওইখানেই থামিতে হয়, যদিও সে থামার অর্থই নেপথ্যে অগ্রসর হওয়া। বলি, 'ঘামাচি কই রে? আমার আর ঘামাচি হয় না। দুবেলা কত সাবান মাখি তা জানিস?'

খিলখিল করিয়া হাসিয়া শিলা বাঁচে এবং ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া সে আগের মতো হাসিখুশি হইয়া কাটায়। এই পরিবর্তন কিন্তু সাময়িক পরিবর্তনটাকে তাহার নিকটেও স্পষ্টতর করিয়া তোলে। তাহার শঙ্কা-সংকোচহীন জীবনপ্রবাহ আবার অবাধে বহিতেছে দেখিয়া আমিও এদিকে ঝিমাইয়া পড়ি। হাই তুলিয়া মোড়ামুড়ি দিয়া ও-মেয়েটার নারীত্ব যে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, ইহা আমার ভালো লাগে না।

আবার আমার অজস্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের পীড়ন চলে। হাসিখুশি মিলাইয়া গিয়া তাহার কপোল হয় পাণ্ডুর, চোখ করে ছলছল!

এমনিভাবে দিন যায়, অবশেষে একদিন বর্ষা-ব্যাকুল দ্বিপ্রহরে আমার এই পুরু তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঠোঁট দিয়া শিলার হাসিখুশি চিরকালের জন্য মুছিয়া দিলাম। মনে করিয়াছিলাম ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু দেখিলাম ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

'কী দাদু?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল!

কত কথাই বলিতে পারিতাম। দাদামশাই নাতনির ঠোঁটে চুম্বন করিয়াছে, ইহার কত সঙ্গত ব্যাখ্যাই ছিল। চুম্বন যে লভ রাইট-এর সভ্য সংস্করণ এ কথা আজও যে জানে না দুই-চারিটা সস্নেহ বাণী বলিয়া কত সহজেই তাহাকে ভোলানো যাইত। কিন্তু সে সব কিছু না করিয়া আমি দিলাম ছুট!

ছুটিয়া রাস্তায় পড়িয়া হনহন করিয়া পুরা দুই মাইল হাঁটিয়া থামিলাম। পথের ধারে একটা নির্জন গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম আর কত ঘণ্টা পরে বাড়ি ফেরা চলিবে।

হঠাৎ খেয়াল হইল একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুই হাতের ভিতরে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখে কী যেন খুঁজিতেছেন। ভালো করিয়া নজর করিতে চিনিলাম।

'আপনি যে! এখনো বেঁচে আছেন দেখছি। বলি, এবারো বিপদ নাকি? এ কিন্তু লোকালয় মশায়।'

'আজ্ঞে বিপদ নয়। সে বেঁচে আছে? বলুন, সে বেঁচে আছে?'

মাথা নাড়িয়া শূন্যে তুড়ি দিয়া বলিলাম, 'বাঁচে কী? আপনিই বলুন! মৃত্যুই যে পৃথিবীতে একমাত্র সত্য! আপনি আমি বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য। আহা, ওখানে বসবেন না মশাই!'

লোকটা মাথায় হাত দিয়া পথেই বসিতে যাইতেছিল, আমার অনুরোধে বসিল না। বলিল, 'মেয়েটা পনের বছর ধরে পাগল হয়ে আছে, আপনাকে সেই থেকে খুঁজছি। দুর্গা দুর্গা, সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল।'

বলিলাম, 'তাই হয়। ওজন্য দুঃখ করবেন না। ষোল বছর পরিশ্রম করে প্রিয়ার মন খুঁজে পেলাম না, আপনার তো মানুষ খোঁজার তুচ্ছ পরিশ্রম।'

লোকটাকে ফাঁকি দিবার জন্য নানা রাস্তা ঘুরিয়া বাড়ি ফিরিলাম। দেখি, শিলা আমার জন্য ময়দা মাখিতেছে! মুখখানি তার যেমন বিষণ্ন তেমনি শান্ত!

একগাল হাসিয়া বলিলাম, 'আমি ভাবলাম, তুই রাগ করেছিস, শিলা।'

সে মুখ কালো করিয়া বলিল, 'খেতে দিচ্ছ, পরতে দিচ্ছ, রাগ আর কী করে করি দাদু।'

আপনারা শুনিলেন? খাইতে পরিতে দিই বলিয়া আমি যেন কত জোর খাটাই। জোর খাটাইতে পারিলে আমার ভাবনা কী ছিল বলুন তো?

উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আধ ঘণ্টা পরে ক্ষুধার তাগাদায় শিলাকে তাগাদা দিতে নিচে নামিয়া দেখি, সে তখনো লুচি ভাজিতেছে আর সলজ্জে অদূরে দাঁড়ানো ভূপেনের প্রশ্নের জবাব দিতেছে। আমি বাড়ি না থাকিলে আমাকে ডাকিতে আসিয়া ছোঁড়া সদর হইতে শিলার সঙ্গে দুই–চার মিনিট কথা কহিয়া যায় সম্প্রতি ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে অন্দরে চড়াও হওয়া!

আমাকে দেখিয়া দুজনেই খাসা লজ্জা পাইল। আমতা আমতা করিয়া ভূপেন বলিল, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, দাদু।'

'তা আমাকে ডাকলেই হত।' বলিয়া সটান বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম। এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও কি ছোঁড়া বুঝিতে চায়! হাঁক দিয়া বাইরে ডাকিয়া আনিলাম, তবে শিলার সঙ্গে তার গল্প ফুরাইল। বেহায়া!

'কী কথা বলতে চাও শুনি? চটপট বলো।'

মুখ লাল করিয়া কোনোমতে কথাটা বলিতেই চটিয়া উঠিলাম—'বটে! তা বিয়ে করে ওকে খাওয়াবে কী শুনি? এম. এ. ডিগ্রির ডিপ্লোমাখানা?'

ছোঁড়া যে ইতিমধ্যে সাড়ে তিনশ টাকার চাকরি বাগাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া আসিয়াছে, আমি কি সে সংবাদ রাখি? প্রথমটা বেশ ভড়কাইয়া গেলাম, কিন্তু মুহূর্তে সামলাইয়া নিয়া বলিলাম, 'তা হোক, তোমার সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেব না।'

'কেন দাদু?'

'সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব কেন হে বাপু! বাধা আছে এইটুকু শুনে রাখো।' বলিয়া আমি ফের রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলাম!

দিন চারেকের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া শিলাকে বলিলাম, 'তল্পি বাঁধ শিলা, এখানকার বাস তুলতে হল।'

শিলা সজল চোখে বলিল, 'কেন দাদু? বেশ তো আছি এখানে।'

বেশ থাক আর যাই থাক, পরের দিন জিনিসপত্র সব গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শিলাকে ভিতরে বসাইলাম। কিছু ফেলিয়া গেলাম কি না দেখিতে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়ির ভিতরে গিয়াছি, ইহর মধ্যে ভূপেন আসিয়া গাড়ির সামনে দাঁড়াইয়াছে।

শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম, 'ভূপেন যে! আমরা তো চললাম।'

'একটা কথা শুনুন দাদু' বলিয়া সে আমাকে একান্তে নিয়া গেল।

'কোথায় যাচ্ছেন? শিলাও জানে না বললে।'

হাসিয়া বলিলাম, 'কোথায় যে যাচ্ছি আমিও জানি না হে! কোনো গুহাটুহায় আশ্রয় নেব ভাবছি।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ভূপেন বলিল, 'আপনার মত কি কোনোদিন বদলাবে না দাদু? এ বিয়ে না হলে আপনার নাতনিও অসুখী হবে।'

গম্ভীর হইয়া বলিলাম, 'দেখো বাপু কবি, তোমায় একটা সৎ উপদেশ দিই। শুধু কাব্যচর্চা করে জীবনটা মাটি কোরো না। জীবনে আরো ঢের বড় বড় সাধনার সুযোগ

আছে।' বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। আমার সামনেই শিলা যতক্ষণ দেখা গেল ভূপেনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হে পাঠক হে পাঠিকা, কৈফিয়ত আমি দিব না। শুধু কয়েকটা কথা বলি। শিলাকে নিয়া আমি যে আদি কাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেয়ে বড় এ কথা মানা আমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্যঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কী লাভ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়িব! বিলাইয়া দিবার জন্যে এত কষ্টে এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া? আপনারা ন্যায় বিচার করিবেন!

আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শিলাকে আমি ভালবাসি। আমার যেমন প্রকৃতি আমার ভালবাসাও তেমনি। দেড়শ কোটি মানুষের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যা নই, আমার এই ভালবাসাও তেমনি মিথ্যা নয়।

আমার এ প্রেম যেন গোড়া ঘেঁষিয়া কাটা তরুর মতো—শাখা নাই, কিশলয় নাই, পাতা নাই, ফুল নাই, শুধু আছে মাটির উপর শক্ত গুঁড়ি আর মাটির নিচে সরস সতেজ মূল, যাহার রস সঞ্চয় কেবল নিজেকে পুষ্ট করিবার জন্যই। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই ইহার মধ্যে আমিও নাই শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত শাশ্বত প্রেম, পশুপাখি মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে-প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক। দু-দিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিশাইব এ প্রেম তখনো পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।

তাছাড়া শিলার পবিত্রতায় আমার শ্রদ্ধা নাই। ওর বিধবা মাকে আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারি না। তার সেই শুভ্রবাসা শীর্ণা-ক্রন্দসী মাতা আমার মনে একটা স্পষ্ট প্রেরণার মতো জাগিয়া আছে। দুই হাতে অন্ধকার ঠেলার মতো, সেই কলঙ্কিনী মাতার কন্যা আমার প্রেমেরই যোগ্য এই অন্ধ যুক্তি আমি ঠেলিয়া দিতে পারি না।

পশ্চিমে একটা শহরের প্রান্তে নিরালা বাগানবাড়িতে শিলাকে নিয়া নীড় বাঁধিয়াছি। রোমান্স একেবারে রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে।

আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর হইয়া শিলা আমার তেমনি সেবা করিতেছে। পরিহাস করিলে হাসে না, মিষ্টি কথা বলিলে শ্রান্ত চোখ তুলিয়া তাকায়, হাত ধরিয়া সোহাগ করিতে গেলে কাগজের মতো সাদা আর পাথরের মতো শক্ত হইয়া ওঠে!

ইঙ্গিতে বলি, 'বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই শিলা।'

সে বলে, 'মরাটাও তো কঠিন নয় দাদু!'

তা বটে। বলি, 'তবু যার আর অন্যথা নেই তাকে মানতে হয়।'

সে বলে, 'জানি। কিন্তু মানার পথটা আমি তোমার কাছে শিখব না দাদু। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে আমি কী করে বাইরে যাই বলো তো?'

দিনের ব্যাপারটা এখন এইরকম দাঁড়াইয়াছে। রাত্রির ব্যাপার অন্যরূপ।

বাহিরে কোনোদিন জোছনা থাকে, কোনোদিন থাকে না, কোনোদিন বৃষ্টি পড়ে কোনোদিন পড়ে না। দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকি। ঘুম আসে না, আসিবে না জানি, সে জন্য ভাবিও না। কিন্তু ঘরের বাতাস যেন নিশ্বাসের পক্ষে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। উপরে কাঁটা নিচে কাঁটা দিয়া কে যেন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়াছে মনে হয়।

তারপর এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া শিলার দরজা ঠেলিয়া বলি, 'তোর আজকাল ভয় করে না কেন শিলা?'

'চব্বিশ ঘণ্টাই তো ভয় করে দাদু।'

'তবে দরজা খোল। ভয় মিটিয়ে নে।'

শিলা কঠিন স্বরে বলে, 'ঘুমোও গে যাও দাদু। এমন যদি কর, যে দিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।'

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়ি। শৈলে যার জন্ম, শিলা যার নাম, সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া ওঠে।

রাসের মেলা

আজ রাস পূর্ণিমা। রাসের মেলা বসেছে শহরতলির খালধারের এই রাস্তা আর দু-পাশে যেখানে যেটুকু ফাঁকা ঠাঁই আছে তাই জুড়ে। নামকরা মস্ত মেলা, প্রতিবছর হয়। দোকানপাট বসে অনেক, দূর থেকে বহু লোক আসে কেনাবেচা করতে, অনেকে সারা বছরের দরকারি মাদুর পাটি বঁটি-দা হাতা খুন্তি ঝুড়ি ধামা কুলো ঝাঁটা গেলাস বাটি থালা কেনে এই মেলাতে। মনোহারি কাজের জিনিস ও শখের জিনিস, জামাকাপড়, খেলনা পুতুল, খাবারদাবার এসব যতই কেনাবেচা হোক আসলে গেঁয়ো কারিগরের তৈরি গেরস্তের ওইসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কেনাবেচাটাই মেলার বৈশিষ্ট্য। পাশে ফাঁপতে পারে না, রাস্তা চওড়া কম, একপাশে নর্দমার খাতটা আরো সংকীর্ণ করেছে রাস্তাটাকে, মেলা তাই লম্বায় বড় হয়। হরদম লরিগাড়ির চলনে এবড়োখেবড়ো বড় রাস্তাটা খাল ডিঙিয়েছে কংক্রিটের পুলে উঠে। পুলের খানিক এদিকে ডাইনে গেছে মেলার রাস্তা খালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আধমাইল দূরে রেললাইনের তল দিয়ে উত্তরমুখে সোজা। মেলা বসে রাস্তার এ-মাথা থেকে রেলের পুল ছাড়িয়ে আরো প্রায় পোয়া মাইল দূর তক। মেলা সবচেয়ে জমাট হয় মাঝামাঝি স্থানে, সেখানে ওদিকে আছে রাস্তা থেকে খাল পর্যন্ত অনেকটা ফাঁকা জায়গা, আর এদিকে আছে পাশের রাস্তাটার ফাঁপালো মোড়। ফাঁকা জায়গায় থাকে নাগরদোলা, পুতুলনাচ আর সার্কাস, মজার খেলা ও নাচগানের তাঁবু! লোক গিজগিজ করে এখানে।

রাস্তা আর খালের মধ্যে টিন-ছাওয়া ছোটবড় গোলা ও আড়ত, মাঝে মাঝে দু-একটি জরাজীর্ণ পুরোনো দালান। এখানে যে লাখ লাখ টাকার কারবার চলে, ভাঁটার সময় খালের কাদা ঠেলে সালতি ছাড়া ছোট নৌকা চলতে না পারলেও এও বন্দরতুল্য, দেখে তা মনে হয় না—ঠাকুরদাদার জীবদ্দশার শৈথিল্য যেন শুধু মরচে পড়ে মরছে এখানে, আর কিছু নয়! এ পাশের দোকান ও বাড়িঘরগুলি অনেক উন্নত, যেহেতু আধুনিক।

লড়াইয়ের আঁধার বছরগুলিতে মেলা জমে নি। আলো না জ্বালাতে পারলে কি মেলা জমে, দিনে দিনে পাততাড়ি গুটোতে হলে। এ বছর শুধু ওই সাঁঝের বাতি না জ্বালাবার হুকুমটা বাতিল হতেই মেলা জীবন্ত হয়েছে আশ্চর্যরকম। সবাই যেন হা করে অপেক্ষা করছিল লড়াই শেষ হবার জন্য যতটা নয়, লড়াই শেষ হলে সাঁঝবাতি জ্বালিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে মেলা করার জন্য। গায়ে গায়ে ঘেঁসে দোকান বসেছে তিন পো মাইল রাস্তার যেখানে ঠাঁই মিলিছে সেখানে, ভদ্রলোকের বাড়ির সামনের এক হাত চওড়া রোয়াকটুকু পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে। চৌকি পেতে, কাঠের তক্তায় কিংবা স্রেফ বাঁশ দিয়ে মঞ্চ বেঁধে, চাঁচের বেড়া ও হোগলার চালা তুলে হয়েছে কোনো দোকান, কারো ছাউনি একখানি কুড়িয়ে আনার মতো মরচে-পড়া ঢেউটিনের, কারো দুখানা রিজেক্ট পিপে, কেটেকুটে হাতুড়ি পিটে সোজা করা ছাদ, কারো খোলা আকাশের নিচে ড্যাম রোদবিষ্টি ড্যাম ফ্যাশনের দোকান—যেন পটারি

কারখানার নলভাঙা কেটলি, চটলা–ওটা হাতলহীন কাপ ইত্যাদির দোকান—দোকানটাই যেন ঘোষণা যে বড়লোক বাবুদের জিনিস, একটু খুঁতওলা জিনিস, তাতে আর কী হয়েছে, এখানে কিনতে পাবে এমন সস্তায় তোমার পয়সায় কুলোয়, এ সুযোগ ছেড়ো না, টিনের মগে চা না খেয়ে বাবুরা যে কাপে খান সেই কাপে, শুধু একটু চটলা–ওঠা হাতলহীন কাপে, চা খাও! আর সত্যি কথা, কাপ কেটলির দোকানে কী ভিড় মেয়েপুরুষের, চা খাওয়া যাদের নমাসে ছমাসে সর্দিকাশির ওষুধ হিসেবে, বিয়োনি মেয়ের ব্যথার জোর বাড়িয়ে তাকে রেহাই দেবার টোটকা হিসাবে।

খাদু বলে, 'মেলা নাকি? মেলা? মেলায় তো যামু তবে আইজ!'

দত্তগিন্নির গা জ্বলে যায় শুনে,—প্রায় দেড় বছর কাজ করছে যে মনমরা খাটুনে ভালো ঝিটা হঠাৎ মেলার নাম শুনেই তাকে আহ্লাদে উল্লাসে ডগমগিয়ে উঠতে দেখে।

মুখ ভার করে বলে, 'খাদু, কী করে মেলায় যাবি আজ? আমার শরীর ভালো না। উনি আজ একটায় আসবেন, খেয়েদেয়ে উঠে আমায় একটু না পেলে, খোকা গোলমাল করলে—'

দত্তগিন্নি হেসে ফেলে, 'বুঝছিস তো খাদু? হপ্তায় একটা দিন দুপুরের ছুটি, তাও আধখানা। খোকা কাঁদাকাটা করলে বড্ড রাগেন। উনি বিকেলে বেরোবার আগে তো মেলায় তোর যাওয়া হয় না।'

'অ মা!' খাদু বলে অবাক হয়ে, 'তা ক্যান যামু? বেলা না পড়লে নি কেউ মেলায় যায়!'

মেলায় যাবার নামেই যেন বদলে গেছে খাদু। দুর্ভিক্ষের বন্যায় কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে এই শহরে বাবুদের বাড়ি ঝিগিরিতে। কোথায় দেশ গাঁ আপনজন, জানাচেনা অবস্থায় অভ্যাসের ধাঁচে দিন কাটানোর সুখ আর কোথায় এই বিদেশে খাপছাড়া না–বনা মানুষের ঘরে দাসীপনা, এই দুঃখে সে একেবারে মিইয়ে ছিল। আজ যেন ডাক দিয়েছে আগের জীবন, ছেলেমানুষি ফূর্তি আর উত্তেজনা জেগেছে। চুলে ভালো করে তেল মেখে স্নান করে খাদু। দত্তগিন্নির সাবানটা একফাঁকে মুখে হাতে ঘষে নেয় একটু। টিনের ছোট তোরঙ্গে তোলা সাফ থানটি বার করে রাখে। শেমিজটা বড় ময়লা হয়েছিল, স্নানের আগেই সাবান দিয়ে সাফ করে রেখেছে।

একটা কথা ভেবে খাদু একটু দমে যায়। এই ঘটির দেশের মেলা না জানি কেমন হবে! খোকাকে কোলে নিয়ে গিন্নিমার পিছু পিছু এক্‌জিবিশনে ঘুরে এসেছে সেদিন, সাজানো গোছানো আলোয় ঝলমলে চোখ ঝলসানো কাণ্ড বটে সেটা, থ' বানিয়ে দেয় মানুষকে, কিন্তু মেলার মজা নেই একফোঁটা, প্রাণ ভরে না ঘুরে ঘুরে। ওমনি এক্‌জিবিশনকে এদেশে মেলা বলে কি না কে জানে!

বাবু বেরিয়ে যেতে না যেতে শেমিজ কাপড় পরে খাদু বলে, 'যাই মা?'

দত্তগিন্নি মুখ ভার করে বলে, 'যাবার জন্য তড়পাচ্ছিস দেখি! যা, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবি, দেরি করিসনে।'

কংক্রিটের পুলটার নিচে মেলার এ মাথায় পৌঁছে খুশিতে হাসি ফোটে খাদুর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে মিশিঘষা কালো মজবুত দাঁতে। এ মেলা মেলাই। গরিব গেঁয়ো মেয়ে–পুরুষের ভিড়, রঙিন কাগজের ঘুর্ণি, ফুল, বাঁশের বাঁশির ফেরিওলা, মাটির ডুগডুগি বেহালা, পুতুল, কাঠের খেলনা, তেলেভাজার দোকান, হোগলার নিচে মাটিতেই যা–কিছু হোক বিছিয়ে পসরা সাজানো—সব আছে! পুলকে কেমন করে ওঠে মনটা খাদুর। হায় গো, কেউ যদি একজন সাথী থাকত তার।

পায়ে পায়ে এগোয় খাদু এদিক–ওদিক চেয়ে চেয়ে থেমে থেমে ঘুরে ঘুরে পিছু ফিরে এপাশ–ওপাশ গিয়ে গিয়ে। কিনবার জন্য, যা–কিছু হোক কিনবার জন্য, মনটা তার নিশপিশ করে। পিঠে সে অনুভব করে আঁচলে–বাঁধা একটা টাকা আর খুচরো এগার আনার চাপ। কোমরের আঁচলের কোণেও বাঁধা আছে এক টাকার চারটে নোট। জীবনে আর কখনো কোনো মেলায় খাদু এত টাকা–পয়সা নিয়ে যায় নি, তাও আবার সব তার নিজের রোজগারের টাকা–পয়সা। বাপভায়ের কাছে চেয়েচিন্তে, একরকম ভিক্ষে করে কয়েক গণ্ডা পয়সা নিয়ে সে মেলায় যেত, আজ এসেছে নিজের কামানো পাঁচ টাকা এগার আনা নিয়ে! টাকা থাকার মজাটা যেন খেয়ালও করে নি খাদু এতদিন, আজ যেন তার প্রথম মনে পড়ে যে দত্তগিন্নির কাছে তার দেড়–দুবছরের মাইনের অনেক টাকা জমা আছে, দু–এক টাকার বেশি কোনো মাসেই সে নেয় নি। সে কত টাকা হবে কে জানে! টাকার জোরে বুকের জোর যেন বেড়ে যায় খাদুর, আজ মেলায় এসে নিজের পয়সা যেমন খুশি খরচ করতে পারবে খেয়াল হওয়ায়।

সেইসঙ্গে এতদিন পরে একটা ভয় ঢোকে খাদুর মনে। এতকালের মাইনের টাকাগুলি জমা রেখেছে দত্তগিন্নির কাছে, হিসেবও জানে না সে কত টাকা হবে, দত্তগিন্নি যদি তাকে ফাঁকি দেয়, যদি একেবারে নাই দেয় টাকা? বোকার মতো কাজ করেছে, খাদু ভাবে মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে নিজের কাছে টিনের তোরঙ্গে রাখে নি বলে আফসোস করে খাদু। হায় গো, টাকাগুলি যদি মারা যায় তার!

কী কিনবে ভাবতে ভাবতে সোনার একটা আংটি কিনে বসে খাদু বার আনা দিয়ে। খাঁটি সোনার নয় কিন্তু ঠিক যেন সোনা, কী সুন্দর যে মানিয়েছে তার বাঁ হাতের সেজো আঙুলে। বিয়েতে একটা আসল সোনার আংটি পেয়েছিল খাদু, বছর না ঘুরতে সে আংটি কেড়ে নিয়েছিল বরটা তার, ফিরে দেবে বলেছিল বটে কিন্তু আরো যে বছরখানেক বেঁচেছিল তার মধ্যে দেয় নি। ও মিছে কথা, বেঁচে থাকলেও দিত না, খাদু জানে। তারপর কতকাল আংটি পরার শখটা খাদু চেপে রেখেছিল, এতদিনে মিটল। কিন্তু না গো, মিটেও যেন মিটল না, প্রথম বয়সের সাধ কি আর মেটে মাঝ বয়সে, নিজে নিজের সাধ মেটালে, কেউ আদর করে কিনে না দিলে।

বজ্জাতেরা তাকায়, গায়ে গা ঘসে যায় ছলে কৌশলে, খানিক আগে থেকেই পিছু নিয়েছে ওই বাবুসাজা লোকটা। ফিনফিনে পাঞ্জাবির নিচে গেঞ্জিটা যেমন স্পষ্ট ওর মতলবও স্পষ্ট তেমনি। খাদু ওসব গায়ে মাখে না, রাগ করে না, বিচলিত হয় না। মেলাতে এ রকম হয়, কতকগুলি লোক এই করতেই আসে মেলায়, মেয়েলোকের গায়ে একটু গা ঠেকিয়ে মজা পেতে, পুরুষ হয়ে চোরের মতো এইটুকু নিয়ে বর্তে যায়—কী ঘেন্না মাগো! আসল বজ্জাত ওই লোকটা যে পিছু নিয়েছে একলা মেয়েলোক দেখে, গুণ্ডা না হলে কেউ কখনো গাড়োয়ানের চেহারা নিয়ে বাবু সাজে। নিক পিছু, ঘুরুক সাথে সাথে। বোকা হাবা মেয়ে ভেবেছে খাদুকে, টের পাবে ভাব করতে এলে, এই ভিড়ের মাঝে খাদু যখন গলা ছেড়ে শুরু করবে গাল দিয়ে ওর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে।

পড়ন্ত রোদের মতো তেজ কমে কমে আসে খাদুর আনন্দ ও উত্তেজনার, নিভে যেতে থাকে উন্মাদনা। একা আর কতক্ষণ ভালো লাগে মেলা, কথা কওয়ার কেউ একজন সাথে নেই।

খিদে পায়। এত লোকের মাঝে খেতে লজ্জা করে খাদুর। ভাজা পাঁপড় কিনে আঁচলের তলে লুকিয়ে ফেলে বাঁ হাতে, ডান হাতে এক–এক টুকরো ভেঙে নিয়ে এমনভাবে মুখ দিয়ে

চিবোয় যে কেউ টেরও পাবে না পানসুপুরি মুখ দিয়ে চিবোচ্ছে না কিছু খাচ্ছে। এমন সময় কাণ্ড দেখো কপালের, খাদু সোজাসুজি সামনে পড়ে যায় দত্তবাবুর।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে দত্তবাবু উদাসীনের মতো এগিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে, আস্তে আস্তে থামে, ফিরে কাছে গিয়ে বলে, 'মেলা দেখতে এয়েছিস?'

যেন মেলাতে মেলা দেখতে আসে নি খাদু, এসেছে ঘাস কাটতে। তিরিশের ওপরে বয়স হবে দত্তবাবুর, বিয়ের চার বছর পরে জন্মেছে খোকাটি, খোকার তিনবারের জন্মদিন বলে কমাস আগে খাওয়াদাওয়া হল বাড়িতে। টুকটুকে ফরসা রঙের না-মোটা না-রোগা সুন্দর চেহারা দত্তবাবুর, মুখখানা ফ্যাকাশে, চুপসানো। দেখে এমন মায়া হয় খাদুর। গিন্নিমা শুষে শুষে শেষ করে দিয়েছে বাবুকে, টাকার জন্য আপিসে খাটিয়ে আর বাড়িতে নিজের রাক্ষুসী হিড়িম্বার খিদে মিটিয়ে। আড়ি পেতে সব শুনেছে, সব জেনেছে খাদু। বৌ-বর খেল দেল শুতে গেল মিলল মিশল ঘুমাল, এই তো নিয়ম জানে খাদু, গিন্নিমা যেন মাগী মাকড়সার মতো তাতে খুশি নয়, রাত বারটায় শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অবসাদে মর-মর বরটাকে যে করে হোক জাগিয়ে তুলে খাবেই খাবে, বেশি যদি নেতিয়ে পড়ে তো ঝাঁঝিয়ে ঝাঁঝিয়ে বলবে, মেয়েবন্ধু তো গাদা গাদা, কার সাথে কারবার করে এলে আজ যে বিয়ে-করা বৌকে এত অবহেলা?

আড়ি পেতে বাবুর কাতরতা দেখতে দেখতে যেন একশ বিছে কামড়েছে খাদুকে, চিৎকার করে বলতে সাধ গেছে, লাথি মেরে রাক্ষুসীকে বার করে দিয়ে ঘুমো না, কেমন ধারা পুরুষ তুই!

'এই কআনা পয়সা নে, কিছু কিনিস', দত্তবাবু বলে খানিকটা কাঁচুমাচু ভাবে, 'আর শোন খাদু, বাড়িতে যেন বলিস না আমায় মেলায় দেখেছিস।'

পয়সা পেয়ে খাদু মুচকে হেসে মাথা নাড়ে। দত্তবাবু এগিয়ে গেলে পিছু থেকে জিভের ডগাটুকু বার করে তাকে অবজ্ঞার ভেংচি কাটে। এমনও পুরুষ হয়, বৌয়ের ভয়ে মনখুশিতে মেলায় আসতে ডরায়!

মেলার মাঝখানে জমজমাট অংশে আটকে যায় খাদু, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এইখানেই। মোড়ের মাথায় মন্দিরের বদলে একটা চেপ্টা ঘরের মধ্যে সিঁদুরলেপা দাঁত-খিচানো ভীষণাকৃতি দানবরূপী প্রকাণ্ড দেবতা, খাদু ভক্তিভরে প্রণাম করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পুতুলনাচ দেখে, রামায়ণ মহাভারতের রাজা রানীদের চেয়ে দেখে, তার মজা লাগে শণের দাড়িওলা মুনিগুলো আর হনুমানকে। নুলো খঞ্জ অন্ধ ভিখারিদের দিকে না তাকিয়ে সে দুটি পয়সা দেয় জোয়ানমর্দ ভিখারিকে, কেঁদে কেঁদে ভগবান ভালো করবেন বলার বদলে সে হেঁড়ে গলায় সবাইকে শাসিয়ে ভিক্ষা চাইছে, তাকে না দিলে তুমি মরবে, তোমার সর্বনাশ হবে। অনেক কিছু কেনার এত সাধ নিয়েও ওই আংটি আর একটি আরশি ছাড়া আর কিছুই কেনা হয় নি খাদুর। কিছু কিনতে গেলেই মনে হয়েছে, কার জন্য কিনবে, তার কে আছে, কী কাজে লাগবে তার জিনিসটা। তার ঘর নেই, সংসার নেই, সাজাগোজা নেই, আরামবিরাম নেই। কী করতে সে মেলায় এল, কী সুখটা তার হল মেলায় এসে। আপন মনে এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে কি ভালো লাগে মেলায়। এত লোকের হাসি আনন্দ উৎসবের মধ্যে থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে মনটাতে ব্যস্ততা এনে শুধু খাঁ-খাঁ করানো।

মেয়েছেলেরাও উঠেছে নাগরদোলায়, দুজন চারজনে একসঙ্গে নয়তো পুরুষ সাথীর সঙ্গে, লজ্জাশরম ভুলে আওয়াজ ছাড়ছে অদ্ভুত, দিশেহারা হয়ে আঁকড়ে ধরেছে সাথীকে,

খিলখিলিয়ে হাসছে যেন ভূতে-পাওয়ার হাসি। একসঙ্গে ওই ভয় আর ফুর্তি, ওপরে উঠে নিচে নেমে দোল খাওয়ার ওই বিষম মজা আর তীব্র সুখের শিহরন যে কেমন খাদু কি আর জানে না। সাথী কেউ থাকলে সেও একটু নাগরদোলায় চাপত, অনেকদিন পরে আবার একটু চেখে দেখত কেমন লাগে নিজের ভেতরে ওই শিরশির করা।

'কী ভাব?'

মাঝখানে কোথায় সরে গিয়েছিল, আবার পিছু নিয়েছিল লোকটা পুতুলনাচ দেখবার সময়, এখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে। ঝেঁজে উঠত খাদু সন্দেহ নেই ফোঁস করে উঠে এক নিমিষে টের পাইয়ে দিত বাড়াবাড়ি করতে গেলেই বিষদাঁতে সে ছোবল দেবে। কিন্তু কথা হল কী, লোকটার কথায় তার দেশি টান। দেশগাঁয়ের চেনাজানা কেউ যেন ছদ্মবেশে তাঁকে এতক্ষণ ঠকিয়ে এবার নিজেকে জানান দিল কথা কয়ে। তাই শুধু মুখটা গোমড়া করে বলতে হয় খাদুকে, 'কী ভাবুম?'

'দেইখাই চিনছি দেশের মানুষ তুমি।'

'চিনছ তো চিনছ।'

পাতলা পাঞ্জাবির নিচে শুধু গেঞ্জি নয়, গেঞ্জি আঁটা চওড়া মোটা শক্ত বুক আর কাঁধ আছে, ঘনকালো কিছু লোম দেখা যায় গেঞ্জির ওপরে। জবরদস্ত গর্দান লোকটার। মুখের চামড়া ক্ষেতমজুরের মতো পুরু আর কর্কশ। দু-এক নজরে দেখে খাদু আবার ভাবে আফসোসের সঙ্গে, চাষাভুষোর এমনধারা বেমানান বাবু সাজা কেন?

'দোলায় চাপবা?'

'না।'

'ডর নাই, আমারে কোনো ডর নাই তোমার।' লোকটা বলে হঠাৎ আবেগের সঙ্গে, পুবের আকাশের যেখানে আড়াল থেকেই পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাশে করে রেখেছে সন্ধ্যাকে সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একটা বিড়ি ধরায়। সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেও আবার পকেটে রেখে বিড়িটা বার করে।

'তোমারে ভাবছিলাম বাবুগো মাইয়া বুঝি, কথা কইবার চাইয়া ডরাইছি। তবু মনডা কইল কী, না, বাবুগো ঘরের মাইয়ালোক সাহস পাইব কই যে একা আসব মেলায়? কথা কমু ভাবি, ডরাই। শ্যাষে অখনে কইলাম। ডর নাই, আমারে ডর নাই।'

'ডরে তো মরি।' লোকটার কথা শুনে বিষম খটকা লাগে খাদুর মনে। সেও কি তবে বেমানান সাজ করেছে লোকটার মতো খাপছাড়া আর হাস্যকর, চাষাভুষো ঘরের মেয়ে হয়ে বাবুর রাঁড়ীর বেশ ধরে? ছোট একটা তাঁবুতে পরীর নাচ আর ম্যাজিক দেখাচ্ছে। নাচের নমুনা ধরা হয়েছে সবার সামনে। রোগা-ক্যাংটা কালো কুৎসিত তিনটি মেয়ে মুখ গলা হাতে পুরু করে রং লেপে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাঁবুর সামনে ছোট বাঁশের মঞ্চে ভঙ্গি করছে নাচের, গলা ছেড়ে পাঁচমেশালি সুরে গান ধরেছে ভাঙা হারমোনিয়ামের সঙ্গে—একজন ওদের মধ্যে হিজড়ে। মাঝে মাঝে তাঁবুর সামনের পরদা সরিয়ে দেখানো হচ্ছে যে শুধু এরা নয় আরো অপ্সরা আছেন ভেতরে, দু আনা-চার আনায় ওই পরীদের মজাদার নাচ দেখার সুযোগ ছেড়ো না, তার সঙ্গে ম্যাজিক, ভাঁড়ামি। চলা আও, চলা আও—দো দো আনা, চার চার আনা।

'আমার পয়সা আমি দিমু কইলাম।' গায়ে-পড়া ঝগড়ার সুরে খাদু বলে দুআনা পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে। নাচ দেখতে ভেতরে যাবার তাদের মধ্যে কথাও হয় নি তখন পর্যন্ত, তার হয়ে লোকটির টিকিটের পয়সা দেবার কথা দূরে থাক।

'দিও, তুমিই পয়সা দিও।' লোকটি বলে আমোদ পেয়ে, 'কিন্তু অ্যানে কী দেখবা? খালি ফাঁকিবাজি, ঠকাইয়া পয়সা নেওনের ফিকির। দেখবা যদি, চীনাগো সার্কাস দেখি গা চলো। খাসা দেখায়, পয়সা দিয়া খুশি হইবা।'

'দেখি না কী আছে।'

সব দেখবে খাদু এবার, ভালোমন্দ যা কিছু দেখার আছে; এত মানুষ ঠকছে সাধ করে, সেও নয় ঠকবে, বিশ্বাসী সাথী যখন পেয়েছে একজন। বিশ্বাস রাখবে কি না শেষ পর্যন্ত ভগবান জানে, কী বিপদ আজ তার অদৃষ্টে আছে তাও জানে ওই পোড়ারমুখো ভগবান, তবে মেলায় কোনোরকম নষ্টামি গুণ্ডামি যে করবে না লোকটা এটুকু খাদু জানে। বুঝদার বিশ্বাসী সাথীর মতোই সে সাথে থাকবে, মনখোলা আলাপী কথায় হাসি-তামাশায় খুশি থাকবে দুজনেই, ভালো লাগবে মেলা দেখা। মতলব যা আছে তা মনেই থাকবে ওর চাপা-পড়া।

ঘেন্না জন্মে যায় সস্তা নাচ, বাজে ম্যাজিক, বগলে লাঠি খুঁচিয়ে কাতুকুতু দেওয়ার মতো ভাঁড়ামি দেখে। তবু শেষ পর্যন্ত থাকে খাদু, উপভোগও করে। এও মেলারই অঙ্গ জেনে শুনে কত বাজে জিনিস কেনে পয়সা দিয়ে, অন্য সময় যেভাবে পয়সা নষ্ট করার কথা ভাবলেও গা জ্বালা করত, নইলে আর মেলার উন্মাদনা কিসের। নিজের ভিতর উথলাচ্ছে আনন্দ আর উত্তেজনা, তাই দিয়ে ফাঁকিকেও সার্থকতা দেওয়া যায়। মেলায় না হলে একটা পয়সা দিয়েও কি কেউ দেখতে চাইত এসব!

বয়সের পাকামি আছে, সে যাবার নয়, তবে ছেলেবয়সের আবেগপুলকের বন্যাও থইথই করছে মনে। ফাঁকি যাচাই করতে করতেও উৎসুক লোভী মন নিয়ে খুশি হয়েই খাদু দেখে হিমালয় পারের অজগর সাপ, এক ছেলের দুই মাথা, জন্ম থেকে জোড়া-লাগা দুই মেয়ে।

অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কয় খাদু, ছেলে কাঁখে বৌটির সঙ্গে, কুলো আর পাখা হাতে বিধবাটির সঙ্গে একপাল বৌ ছেলে নাতিনাতনি নিয়ে বেসামাল সধবা গিন্নিটির সঙ্গে। দেখা হয় চেনা মানুষের সঙ্গে। সুবলের মা পাড়ার তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। চুপি চুপি শুধোয় সুবলের মা, 'সাথে কে?'

'দ্যাশের মানুষ, কুটুম।' খাদু বলে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, নিচে অসংখ্য আলো জ্বলছে মেলার। এক্জিবিশনের চোখ ঝলসানো বাড়াবাড়ি আলো নয়, কাছে তেল মোম গ্যাসের শিখা, কোনোটা কাচের মধ্যে কোনোটা খোলা, তফাতে জোছনারাতের তারার মতো।

'আরো দেখবা?'

'দেখুম না; চীনা সার্কাস? তুমিই তো কইলা।'

চীনা সার্কাসের তাঁবুটা অনেক বড়। চার আনা টিকিটের দাম। লোক টানবার জন্য সামনে খেলার নমুনা দেখানো হচ্ছে এখানেও, ভিন্ন রকম নমুনা। মেয়ে আছে তিনটি, দুজন হলদে রঙের চীনা, একজন কালো রঙের বাঙালি। কালো হলেও ছিরি ছাঁদ আছে মেয়েটির, রং মেখে ভূতও সাজে নি, সস্তা ঢঙের ভঙ্গিও নেই। চীনা মেয়ে দুটিকে বড়-ছোট বোন মনে হয় খাদুর। পিছু বেঁকে পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে, হাতের ভরে শূন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে, ছোট লোহার চাকার ভেতর দিয়ে কৌশলে গলে গিয়ে ওরা খেলার নমুনা দেখাচ্ছে! আঁটোসাঁটো জোয়ান বয়সী চীনাটি দুহাতের দুটি ছড়ির ডগায় বসানো প্লেট দুটিকে বন-বন করে ঘোরাচ্ছে। আরেকজন, তাকে ওর ভাই মনে হয় খাদুর, পাঁচ ছটা লোহার শিকের আস্ত চাকা নিয়ে চাকার সঙ্গে চাকা আটকে আবার খুলে ফেলছে, কী করে কে জানে! ভেতরে গিয়ে

খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় খাদু। পাঁচ–ছ বছরের একটা ছেলে, সে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে মাটি না ছুঁয়ে শূন্যে পাক খেয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বড় একজনের মাথায় হাতের ভর দিয়ে শূন্যে পা তুলে দিচ্ছে, এসব দেখে রোমাঞ্চ হয় খাদুর। টেবিলে কাঠের গোলায় বসানো তক্তার দুপাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তক্তা গড়িয়ে গড়িয়ে একটি মেয়ের দোল খাওয়া দেখে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেজো চীনা মেয়েটিকে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে টেবিল ডিঙোতে দেখে, আগুনের চাকার মাঝখান দিয়ে গলে যেতে দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়, ভাবে, কত কাল ধরে কী ধৈর্যের সঙ্গে তপস্যা করে না জানি এসব কসরত আর কায়দা ওরা আয়ত্ত করেছে।

খাদু সবচেয়ে অভিভূত হয় ভেবে যে এক সংসারের বাপ ছেলে মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে এমন চমৎকার সার্কাস দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে দলের সবাইকে দেখার পর এতে আর তার সন্দেহের লেশটুকু নেই। চেহারার মিল নয় নাই ধরতে পারল সে ওদের, বয়স কখনো সবার খাপ খায় এমনভাবে এক পরিবারের না হলে—বুড়ো একজন বাপ, মাঝবয়সী, জোয়ান, কিশোর আর ছেলেবয়সী এই চার ছেলে; তিন–চার বছর বয়সের ফারাকের দুটি জোয়ান আর ন–দশ বছরের একটি, এই তিন মেয়ে। মা বুঝি নেই ওদের। বৌ মরেছে বুড়ো বেচারার। আহা।

জোয়ান মেয়ে দুটির দুজনেই মেয়ে, না একজন ছেলের বৌ আর একজন মেয়ে কিংবা দুজনেই ছেলের বৌ, এই একটু খটকা থাকে খাদুর। সিঁদুরও দেয় না যে আন্দাজ করে নেবে। কালো মেয়েটা এদের সঙ্গে কেন, সেও আরেক ধাঁধা খাদুর।

'আমাগো মাইয়াটা কী করে চীনাগো লগে?' সে শুধোয় সঙ্গীকে।

'ভাড়া করছে।'

এরা নাকি সাধারণত অল্প বয়সে চুরি–করা অথবা অনাথা মেয়ে, সংসারে যাদের দেখবার শুনবার কেউ নেই। বড় হলে কাউকে দিয়ে করানো হয় দেহের ব্যবসা, কেউ শেখে চুরিচামারির কায়দা, কেউ শেখে কসরত। এ মেয়েটা হয়তো ভাড়াও খাটছে, নতুন খেলাও শিখছে চীনাদের কাছে, পরে আরো দাম বাড়বে। অবাক হয়ে শোনে খাদু। বিরাট এ জগৎ সংসার, অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার সীমা নেই তাতে। কোথাকার এই বিদেশী পরিবার সার্কাস দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছে, কোথায় কার ঘরে জন্মে আজ ওদের সঙ্গে খেলা দেখাচ্ছে এই কালো মেয়েটা। এক দুর্বোধ্য বিস্ময়কর অনুভূতিতে বুকটা তার কেমন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে ভাবে, মানুষ কী যে করে সংসারে আর কী যে করে না!

নাগরদোলায় বুক–শিরশির–করা সুখটা তিন–চার পাকের বেশি সয় না খাদুর, কাতর হয়ে বলে, 'নামুম। থামান যায় না?'

'যায় না?'

জোরে হাঁক দিয়ে নাগরদোলা থামাতে বলে লোকটি, যেন হুকুম দেয়। আর এমন আশ্চর্য, তার হুকুমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামতে আরম্ভ করে দোলা। পাশ থেকে উঠে লোকটি আগে নামতে গেলে খাদুর খেয়াল হয়, লজ্জাশরম ভুলে দুহাতে কীভাবে ওকে সে আঁকড়ে ধরেছে।

'ডর করে নাকি?'

'না।' খাদু জোর দিয়ে বলে, 'গা গুলায়।'

মেলায় মানুষ কমতে শুরু করেছে। বিকালে মানুষের জোয়ার এসেছিল, তাতে ধরেছে ভাঁটার টান। মেলা আর ভালো লাগে না, শ্রান্তি বোধ করে খাদু। মেলায় ছড়ানো নিজেকে

এবার গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়। ফিরে গেলে ঘ্যানঘ্যান করবে দত্তগিন্নি, কৈফিয়ত চাইবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর দত্তবাবুর বুড়ি মায়ের ঘুপচি ঘরটির মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে শোয়া। সারারাত বুড়ি কাশবে, বার বার উঠবে। ভাবলেও মনটা বিষণ্ন হয়ে যায় খাদুর।

কিন্তু বাড়ি সে যে যাবে, বিশ্রাম সে যে করবে, সে তো এতক্ষণের সাথীটি রেহাই দিলে তবেই? এবার সময় হল ওর মতলব হাসিলের। বেশ ভালো করেই জড়িয়ে জড়িয়ে ফাঁদে ফেলেছে তাকে। এতক্ষণ ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগিয়েছে, এবার কোন ভয়ংকর স্থানে নিয়ে যাবে কে জানে, যা খুশি করবে তাকে নিয়ে, হয়তো ছেড়ে দেবে দলের খুনে গুণ্ডাদের হাতে, হয়তো শেষরাতে গলাটা কেটে ফাঁক করে ভাসিয়ে দেবে খালে। বুকটা ঢিপঢিপ করে খাদুর। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা কিছুক্ষণ থেকে, বার বার চোখ বুলোচ্ছে তার পা থেকে মাথা অবধি। গায়ে কাঁটা দেয় খাদুর।

'যাইগা অখন রাইত হইছে।' সে বলে ভয়ে ভয়ে।

'যাইবা? রাইত হয় নাই বেশি।' ক্ষুব্ধ চিন্তিতভাবে লোকটা খাদুর নতুন ভাবসাব লক্ষ করে, 'চলো যাই, দিয়া আসি তোমারে। কলাপাড়া নন্দ লেন কইলা না?'

'আমি যাইতে পারুম।' ক্ষীণস্বরে খাদু বলে।

'পারবা না ক্যান? বাড়িটা চিনা আসুম, বুঝলা না?'

বোঝে না? সব বোঝে খাদু। চলুক সাথে, বড় রাস্তা ধরে সে যাবে, রাস্তায় এখন গাড়ি ঘোড়া লোকজনের ভিড়। পাড়ায় গিয়ে নির্জন গলিতে ঢুকবে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে তার ভয়টা কী, লোকজন জেগেই আছে সব বাড়িতে এখন।

'কী কিনা দিমু কও।'

'তিণ্যটি না।

'তোমার খালি না আর না।' লোকটা বলে বেজার হয়ে।

কংক্রিটের পুলের গোড়ায় বড় রাস্তার পাড়ে লোকটা রিকশা ডেকে বসে একটা, খাদুকে চমকে আর ভড়কে দিয়ে।

'না, না, রিকশা লাগব না।'

'লাগব।' ধমকে দিয়ে বলে এবার লোকটা, 'সব কথায় না না কর ক্যান? উইঠা বসো রিকশায়, কও তো হাঁইটা যামুনে আমি লগে।'

খাদু কিছু বলে না, কী আর বলবে। লোকটা তার পাশে উঠে বসে। আংটিপরা হাতে একবার হাত বুলিয়ে দেয়, ধমক দেবার দোষ কাটিয়ে সান্ত্বনা দিতে। ঘেমে জল হয়ে গেছে খাদুর গা তখন, হাতপা যেন অবশ হয়ে এসেছে।

রিকশা চলে ঘণ্টা বাজিয়ে, চলতে চলতে লোকটা হঠাৎ বলে রিকশাওয়ালাকে, 'ডাইনে যাও।'

'না, না, বড় রাস্তায় চলুক।'

'এইটা রাস্তা না?'

রিকশা ঢোকে ডাইনের রাস্তায়। এটা সোজা পথ কলাপাড়া যাবার খাদু জানে, কিন্তু বড় রাস্তা ছেড়ে রিকশা যখন ঢুকেছে এই গলিতে তখনি খাদু জেনেছে কলাপাড়ায় নন্দ লেনে দত্তবাড়িতে আর সে পৌঁছবে কি না সন্দেহ। দু-পাশে ঘিঞ্জি বস্তি, টিন আর খোলার চালে জোছনা, সরু সরু গলিতে অন্ধকার। ওর মধ্যে কোথায় যেন জোরালো হল্লা চলেছে, মেয়েমানুষ গানও গাচ্ছে হারমোনিয়ামের সঙ্গে! এর মধ্যে নিয়ে যাবে কি লোকটা তাকে? এ

অঞ্চল পেরিয়ে রিকশা রাস্তায় বাঁক ঘুরলে খাদু একটু স্বস্তি পায়। এ অঞ্চলটা শান্ত, দু-পাশে কাঁচাপাকা বাড়িতে গেরস্ত, আধা-গেরস্তের বাস।

কিন্তু খানিক এগিয়েই লোকটা থামতে বলে রিকশাওয়ালাকে। ঘনিষ্ঠ সুরে বলে, 'আমার ঘরখান চিনাইয়া দেই তোমারে, কী কও?'

পুরোনো একটা পাকা গ্যারেজ ঘর, দরজা এখন তালাবন্ধ। এখানে সে থাকে, রাঁধে বাড়ে খায়, ঘুমোয়। পাশে গায়ে-গায়ে লাগানো টিনের চাল ও টিনের বেড়ার একটা ঘর, সামনে দোকানের মতো মস্ত দু-পাট কপাট, ওপরে-নিচে দুটো তালা সাঁটা। ওপরে একটা তেরাবাঁকা সাইনবোর্ড, দু-পাশে সাইকেলের দুটো পুরোনো টায়ার ঝুলছে। এটা তার সাইকেল মেরামতি দোকান—দামোদর সাইকেল ওয়ার্কস।

'নাম কই নাই তোমারে? আমার নাম দামোদর।'

রিকশার জোয়াল নামিয়ে রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে তাদের নামবার অপেক্ষায়। শক্ত করে পাশটা চেপে ধরে ঝোঁক ঠেকিয়ে খাদু কাঠ হয়ে বসে থাকে।

'নামবা না?'

'না। তুমি নামো।'

চাঁদের আলোয় পথের আলোয় বেশ দেখা যায় মুখে যেন তপ্ত রাগের ছ্যাঁকা লেগেছে দামোদরের। একহাতে সে খাদুর আংটিপরা হাতের কব্জি চেপে ধরে, এত জোরে ধরে যেন খেয়াল নেই ওটা মেয়েছেলের নরম হাত, হাড় ভেঙে যেতে পারে মট করে, আরেক হাতে সে মুঠো করে ধরে খাদুর বুকের কাপড় শেমিজ।

'মারো। আমারে মাইরা ফেলাও।' খাদু কেঁদে ফেলে হুস করে, জোরে নয়, চেপেচুপে, কহাত দূরে রিকশাওয়ালাও টের পায় কি না পায়! আগে থেকে সে যেন তৈরি হয়েই ছিল এমনিভাবে কাঁদবার জন্য।

দামোদর ভড়কে গিয়ে বুকের কাপড় হাতের কব্জি ছেড়ে দেয় তৎক্ষণাৎ। থ'বনে গিয়ে গুম হয়ে থাকে কয়েক লহমা। তারপর রিকশাওয়ালাকে চলতে বলে কলাপাড়ার দিকে।

রিকশাওয়ালা চলতে আরম্ভ করলে খাদুকে বলে, 'ব্যারাম স্যারাম নি আছে মাথার?'

সে রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় পড়ে রিকশা, আবার ইটের রাস্তায় বাঁক নেয় শহরতলির শান্ত নিঝুম উঠতি ভদ্রপাড়ার এলাকায় । মাঠ, পুকুর বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো নতুন বাড়ি, ছোট সীমায় ঠাসা গরিবের পুরোনো বস্তি। শরীর-জুড়ানো হাওয়া বইছে অবাধে, শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক, কোনো বাড়ির ছাদ থেকে ভেসে আসা বাঁশির বাবুয়ানি মিহি সুর। আকাশে মুখ তুলে চাঁদ দেখতে হয় না, চারদিকে চাঁদেরই আলো চোখের সামনে ছড়ানো।

নন্দ লেনের মোড়ে ঘন তেঁতুলগাছর ছায়া। খাদু দাঁড়াতে বলে রিকশাওয়ালাকে। 'তোমার লগে দেখলে বাড়ির লোক কী কইব? আমি নামি।'

'নামো।'

খাদু রিকশায় বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে দত্তবাবুর বাড়ির হদিস তাকে বাৎলে দেয়, বলে, 'ডাইনা দিকে তিনখান বাড়ির পরের বাড়িখান, দোতালা বাড়ি। দেইখাই চিনবা।'

'বাড়ি চিনতে হাঙ্গামা কী।' দামোদর বলে উদাস গলায়, 'নন্দ লেনে দত্তবাবুর বাড়ি খুঁইজা নিতে পারতাম না?'

ফুরফুরে হাওয়ায় তেঁতুলগাছের ছায়া ঘেঁষে জোছনায় দাঁড়িয়ে খাদু যেন চোখের সামনে দেখতে পায় দত্তবাড়ির অন্তঃপুর, খোকার কান্নায় স্বামীর পাশে শুতে দেরি হচ্ছে বলে রেগে গজর গজর করে শাপছে তাকে, মাছের মতো মরা চোখে চেয়ে দেখছে ঘুমকাতুরে গাল-

চুপসানো দত্তবাবু, নিচের ঘরে চৌকিতে কাঁথার বিছানায় বসে দত্তবাবুর বুড়ি মা কেশে চলেছে খক খক করে আর মেঝেতে শুয়ে খাদু ঝি এপাশ ওপাশ করছে অজানা কষ্টে। আজ রাতে কব্জিটা টন টন করবে।

'হাতটা মুচরাইয়া দিছ একেবারে, ব্যথা জানায়।' আহত কব্জি তুলে ধরে খাদু তাতে অন্য হাতের তালু ঘষে আস্তে আস্তে।

'ষাইট, সোনা ষাইট।' দামোদর বলে ব্যঙ্গ করে, 'কবিরাজি ত্যাল আইনা লাগাইও, মাথায়ও মাইখো ঘইষা ঘইষা।'

লোক আসতে দেখে খাদু তেঁতুলগাছের ছায়ায় পিছিয়ে যায়। রিকশা আর গাছের ছায়ায় তার আবছা মূর্তির দিকে চাইতে চাইতে মানুষটা চলে গেলে এগিয়ে আসে। রিকশাওয়ালা তখন জোয়াল তুলে ধরেছে রিকশার।

'আসি গো ঠাইরান।' বলে খাদুর কাছে বিদায় নিয়ে দামোদর রিকশাওলাকে বলে, 'যাও জোরসে চলো। বকশিশ দিমু।'

খাদু বলে, 'শোনো, শুনছ? একটা কথা ভাবতেছিলাম।'

রিকশা থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে দেয় দামোদর।

খাদু বলে, 'তুমি তো বাড়ি চিনা গেলা আমার। কই দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনলা আমারে, তোমার ঘর চিনা নিতে পারুম কি না ভাবি।'

'কী করবা তবে?' দামোদর জিজ্ঞেস করে ভয়ে উৎকণ্ঠায় গলা কাঁপিয়ে।

'গিয়া দেইখা চিনা আসুম?' খাদু বলে প্রায় অস্ফুট স্বরে। দামোদর স্পষ্ট শুনতে পায় প্রত্যেকটি কথা। রাসপূর্ণিমার বিনিদ্র রাত্রি হলেও সেখানে তাদের আশপাশে আর তো কোনো শব্দ ছিল না।

রোমান্স

কলসি কাঁখে পাতলা ছিপছিপে একটি বৌ বেগুনক্ষেতের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কলসির ভারে একটু সে বাঁকা হয়ে পড়েছে। পিতলের প্রকাণ্ড কলসি, মাজা ঘষা চকচকে। বৌটির পরনের কাপড়খানি ভেজা, এখানে ওখানে গায়ে এঁটে গেছে, লটপট করছে। গড়ন পাতলা হলেও স্বাস্থ্য তার খুব ভালো। গায়ে রীতিমতো জোর না থাকলে অতবড় কলসির ভারে কোমর তার মচকে যেতে পারত।

সূর্য এখন প্রায় মাথার উপর। রোদের তাপে পায়েচলা সরু পথটির পাশে ঘাসে-ঢাকা মাটি পর্যন্ত তেতে গেছে। ভিজে গামছা ভাঁজ করে বৌটি মাথায় বসিয়েছে।

বেগুনক্ষেতের পরে ছোটখাটো আম-কাঁঠালের বাগান। গাছে গাছে বাগানটি জমজমাট। কিন্তু কেমন যেন শুকনো নিষ্ফল চেহারা গাছগুলির, কয়েকটি গাছে শুধু কাঁচাপাকা দু-চারটি আম ঝুলছে। বাগানের ওপাশে টিনের চাল আর দরমার বেড়ার বাড়ি আছে টের পাওয়া যায়, গাছের ফাঁকে ভালো করে চোখ পড়ে না। বাকি তিনদিকে দূর বিস্তৃত মাঠ আর ক্ষেত, এখানে-ওখানে বাড়িঘর গাছপালার ছোট ছোট চাপড়া বসানো। বেগুনক্ষেতের চারদিক নির্জন, দিনে-রাতে সবসময় কারো কারো এখানে কমবেশি গা ছমছম করে।

বেগুনক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পুরোনো প্যাঙাসে আলপাকার উর্দি আর কোলবালিশের সরু খোলের মতো প্যান্টালুন-পরা মাঝবয়সী একটি লোক জোরে জোরে আম-কাঁঠালের বাগানটির দিকে চলছিল। বারবার সে বৌটির দিকে চেয়ে দেখছে। গোঁফদাড়ি চাঁছা এবং কানের ডগা পর্যন্ত জুলপি তোলা তার লম্বা ফরসাটে মুখে চোখ দুটি বেশ বড় বড়, যদিও ছোট হলেই মানাত বেশি।

বাগানে একটা কাঁঠালগাছের নিচে সে বৌটির পথ আটকাল। পাশ কাটিয়ে যাবার পথ অবশ্য চারদিকে অনেক ছিল। পায়েচলা যে সরুপথটি ধরে বৌটি আসছিল সেটাও কাঁঠালগাছটির হাত তিনেক তফাত দিয়েই গিয়েছে। বৌটি নিজেই সরে তার সামনে আসায় এগোবার আর পথ রইল না।

'ওমা, সুবলবাবু যে! পেন্নাম।'

'এ তোমার কেমন ব্যাভার সুখময়ী?'

'তোমারই বা এ কেমন ব্যাভার সুবলবাবু, দিনদুকুরে নাগাল ধরা?'

দুহাতে কানা ধরে কলসিটা যে নামিয়ে রাখল। সে কাঁখে কলসি ছিল তার উল্টো দিকে বেঁকে বেঁকে সোজা করে নিল কোমরটা। সুবলের ক্রুদ্ধ নালিশভরা দৃষ্টি দেখে একবার সে অপরাধিনীর মতো একটু হাসল। অবহেলার সঙ্গে কাঁধে ফেলা ভিজে আঁচলটি নামিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আবার ভালো করে গায়ে জড়াল।

'গোড়ায় তো ডরিয়ে গেলাম, কোন মুখপোড়া উঁকি মারছে গো? শেষে দেখি মোদের সুবলবাবু। নিশ্চিন্দি হয়ে তখন সাঁতার কেটে চান করলাম।' ফিক করে হেসে লজ্জায় মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার জন্যে। সত্যি তোমার জন্যে—কাল ফিরে যেতে হল তোমার!'

সুবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'কাল তো প্রথম নয়। ফিরেই তো যাচ্ছি। এলে না কেন কাল? রাতদুপুর তক শিরীষতলায় মশার কামড় খেলাম। মা মনসা না করুন',— দুহাত জড়ো হয়ে সুবলের কপালে ঠেকে গেল—'সাপের কামড়ে মরব একদিন।'

সুখময়ী আফসোসের আওয়াজ করল চুকচুক, 'বালাই ষাট। কিন্তু কী করি, তেনা যে ফিরে এল গো!'

'একবার জানান দিয়ে তো যেতে পারতে, সবাই ঘুমুলে পর? ঘুরঘুটি আঁধারে একটা মানুষ হাঁ করে—'

'ঘুমিয়ে পড়লাম যে! ওনার সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'ঝগড়া হল? বেশ, বেশ! তা ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?'

'সোয়ামির সাথে মেয়েমানুষের আবার কী নিয়ে ঝগড়া হয়? শড়ি গয়না নিয়ে।'

সুবল হঠাৎ উত্তেজিত, উৎসুক হয়ে বলল, 'তুমি যত শাড়ি গয়না চাও—'

'ইস? ফতুর হয়ে যাবেন!' ছায়ায় চাপা আলো লেগে সুখময়ীর পান-খাওয়া দাঁতের ঘষামাজা অংশগুলিতে ভোঁতা ঝকমকি খেলে গেল।—

'ফতুর নয় হলে। মোর তরে ফতুর হতেই তো চাইছ তুমি হাজারবার। কিন্তু শাউড়ি সোয়ামি যখন শুধোবে মোকে, অ বৌ, শাড়ি গয়না কোথা পেলি লো, কী জবাব দেব শুনি? বলব নাকি, কুড়িয়ে পেইছি গো, ঘাটের পথে কুড়িয়ে পেইছি? তার চেয়ে এক কাজ করো না? শিরীষতলায় মশার কামড় খেয়ে তোমারও কাজ নেই, শাড়ি গয়না পরে বেড়ালে কেউ যে শুধোবে তাতেও মোর কাজ নেই—এমনি কিছু করো?'

সুবলের মুখখানা লম্বাটে হয়ে গেল।—'তা জানি, তোর শুধু গয়না শাড়িতে মন।'

'না গো না, গয়না শাড়ি আমি চাইনে। আমার মনটি তোমার।'

'তাই যদি হত সুখী—'

'হত মানে? তুমি ভাব গয়নার লোভে তোমায় মন দিইছি। কত গয়না দেবে তুমি? কত মুরোদ তোমার? কলকাতায় নিয়ে সেজবাবু সোনায় মুড়ে রানী সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তা গিইছি আমি? আমি বলি—না, যাকে মন দিইছি তার সাথেই চুলোয় যাব, চুলোয় যদি যাই।'

'হুঁ'।

'বিশ্বেস হয় না, না? বেশ তো, চলো না এখুনি যাই। এক কাপড়ে এখুনি গিয়ে গাড়ি ধরি তিনটের। তুমিও ফকির, আমিও ফকির।'

পাতার ফাঁক দিয়ে সুবলের সর্বাঙ্গে চাকাচাকা আলো আঁকা হয়ে গেছে। ভিজে গামছা দিয়ে সুখময়ী তার মুখ আর ঘাড়ের ঘাম সযত্নে মুছে দিল। কিন্তু সুবল খুশি হয়েছে মনে হল না, সুখময়ীর কাছ থেকে এ রকম ছোটখাটো আদর পাওয়ার বিশেষ দাম যেন নেই, পুরোনো হয়ে গেছে।

'অমন যার মন হয় সে একবারটি শিরীষতলায় আসে। কাল নিয়ে চারবার ঠকালে আমায়।'

'ওগো মাগো, ঠকালাম! আমি তোমায় ঠকালাম! ভেস্তে গেল তো কী করব আমি?

হাতপা বাঁধা মেয়েলোক বৈ তো নই! ঘরের বৌ, পরের দাসী, কী খ্যামতা মোর আছে বলো? তোমায় ঠকাব, তোমার জন্যে মরণ হয়েছে আমার? কিছু ভালো লাগে না সুবলবাবু, একদণ্ড ঘরে মন বসে না। মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি। মন করে কী, দূর ছাই, ঘর–সংসার ফেলে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই।'

বড় একটা ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ সুখময়ীর মুখ ঘেঁসে কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে পড়েছে। আবেগ আর উত্তেজনায় এতক্ষণে যেন চোখ দুটি তার সেই আলোতে জ্বলজ্বল করে উঠল। সুবল কথাটি বলে না। উশখুশ করে আর এ পা থেকে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

'দেশ গাঁ ছেড়ে দূর দেশে পালিয়ে যাই, দেশে কেউ মোদের চিনবে না। সব বালাই চুকিয়ে দুজনে ঘরকন্না করি।'

'তা হয় না সুখময়ী। চাদ্দিকে বড় নিন্দে হবে, আর ফেরা যাবে না।'

'কে ফিরছে হেথা? জমি–জায়গা সব বেচে দিয়ে আমায় নিয়ে পালাবে। মোদের ফিরবার দরকার!'

'মোক্তারি করে দুটো পয়সা পাচ্ছি—'

এখানে গাছের ছায়াতে গুমোটে গরম, সুবলের কপাল ঘেমে চোখে এসে পড়তে চায়। আঙুল দিয়ে সে কপালের ঘাম মুছে মুছে ঝেড়ে ফেলতে থাকে। সুখময়ীর ভিজে চেহারায় ঘাম টের পাওয়া যায় না। আগ্রহ উত্তেজনা ফুরিয়ে গিয়ে সে শান্ত হয়ে গেছে। ঝুঁকে কাপড় তুলে সে একবার হাঁটুর কাছে চুলকে নিল, সোজা হয়ে হাঁটু চুলকানো আঙুলেরই একটার ডগা কামড়ে ধরল। ঘাড় তার কাত হয়ে গেল ভাবনায়।

কলসির কানা ধরে তুলতে গিয়ে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। সুখময়ীর রাগ হয়েছে। কলসি ছেড়ে পাক দিয়ে সোজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার ফোঁস করে ফণা তুলে সাপের কামড়ে দিতে চাওয়ার মতো। কী মিষ্টি হাসিই সুখময়ী হাসল। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দ্বিধা–সঙ্কোচের ভঙ্গি করে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বুক দিয়ে সে সুবলকে গাছের সঙ্গে চেপে ধরল, মুখ উঁচু করল, সুবলের মুখের কাছে কিন্তু পৌছল না। গাছে পিঠ দিয়ে সুবল তখন কাঠ হয়ে গেছে।

'মোর চেয়ে তোমার মোক্তারি বড় হল?'

'কত কষ্টে পসার করেছি, দুটো পয়সা পাচ্ছি—'

সুখময়ী এতক্ষণে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। সুবল নরম হয়ে আসছে। একটি হাত তার সুখময়ীর পিঠে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'তুমি না ফতুর হতে পার আমার জন্যে? ঘর বাড়ি জমি জায়গা বেচে ঢের টাকা পাবে, ব্যবসা করে রাজা হয়ে যাবে তুমি! রানীর মতো খাটে শুয়ে আমি হাই তুলব, আর চাকরানী মাগীগুলোকে হুকুম করব। চানের ঘরে তুমি আমার চান দেখবে—সত্যি দেখাব, দিব্যি গালছি।'

'আচ্ছা, তাই যাব সুখময়ী, সব বেচে দিয়ে তোমায় নিয়ে বিদেশে যাব। কিন্তু সে তো দু–চার দিনে হবে না—'

'মোক্তারি জান বটে তুমি সুবলবাবু। দাঁড়াও আমি আসছি কলসি রেখে।'

কাঁখে কলসি তুলতে গিয়ে সুখময়ী আজ বোধ হয় এই প্রথম টলে পড়ে গেল। কলসির জল শুষে নিল মাটি, আর তার ভিজে কাপড় কুড়িয়ে নিল মাটির লাল ধুলো।

'অদেষ্টে কত আছে!' বলে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভোঁতা গলায় সে বলল, 'দাঁড়াও বাবু। একটু সাবুন আনি, নইলে এ মেটে রং ওঠবার নয়। ফের নাইতে হবে।'

বাড়ির অঙ্গন শূন্য, ঘরের বাইরে কেউ নেই। বাইরে কেউ থাকেও না এ সময়। সুখময়ী রেঁধেবেড়ে খাইয়েছে সবাইকে, আর কোনো কাজ কারো নেই। রসুইঘরের দাওয়ায় একতাড়া মাজা বাসন। ঘাটে গিয়ে বাসন মেজে এনে তবে তার কলসি নিয়ে নাইতে যাবার ছুটি হয়। কলসি ভরে জলটি আনা চাই। পুবের ঘরে নটবর হুঁকো টানছে, কথা বলছে পাড়ার কানাই ধরের সঙ্গে। শাশুড়ি শুয়েছে, নটবরের বৌ-মরা ভাই তার সঙ্গে পরামর্শ করছে আগামী বিয়ের—জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতুই আসতে মাসেক সময় নেই!

বাড়ির কুকুরটা উঠে এসে লেজ নেড়ে অভ্যর্থনা জানাতেই সুখময়ী তাকে একটা লাথি কষিয়ে দিল। আর সেই অবোধ প্রাণীর কেঁউ কেঁউ আর্তনাদ শেষ হবার আগেই রসুইঘরের দাওয়ায় বাসনের গাদায় আছাড়িয়ে পড়ে শুরু করল নিজের আর্তনাদ—একটু চাপা, একটু অস্বাভাবিক সুরে। ভয়ে তার গা কাঁপছিল।

সবাই ছুটে এল। একসঙ্গে শুধোতে লাগল, কী হয়েছে? বৌকে জড়িয়ে ধরে নটবরের মা জুড়ে দিল কান্না। কুকরটা তখনো কেঁউ কেঁউ করে মরছে! সুখময়ীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছিল। কী থেকে কী হবে তা ভগবান জানেন, এই তার শেষ লড়াই।

সুখময়ী কেঁপে কেঁপে কেঁদে কেঁদে বলল, 'বড্ড ভয় পেইছি মা। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। কত বলি একলাটি ঘাটে যেতে ডর লাগে, কেউ তো যাবে না সাথে। নইলে কী ওই মুখপোড়া সুবল মোক্তার—'

শুনে সবাই একসাথে চুপ মেরে গেল। ইতিমধ্যে পাশের দুবাড়ির মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসেছিল। তারাও হঠাৎ চুপ হয়ে গেল জন্ম-বোবার মতো। নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি ছাড়া কী আর করার আছে এমন একটা অসম্পূর্ণ খবর শুনে? নটবরের মার কান্না থেমে গিয়েছিল, প্রথমে অধীর হয়ে শুধোল, 'কী করেছে সুবল মোক্তার? অ বৌ, বলনা কী করেছে সুবল মোক্তার?'

'বাগানে একলাটি পেয়ে হাত চেপে ধরেছিল গো, কলসি ফেলে পালিয়ে এইছি। ছুটতে ছুটতে আছাড় যা খেইছি কবার—হা দ্যাখো।'

হাতের তালু আর কাপড়ে রক্তমাটি ও রক্তের দাগ সে দেখিয়ে দিল। কয়েকজনের চাপা নিশ্বাস পড়ল একটু নিরাশার সঙ্গে, কতবড় সম্ভাবনার এই পরিণতি! শুধু হাত ধরেছিল! দুপুরবেলা জনহীন বাগানে মেয়েমানুষকে নাগালে পেয়ে শুধু হাত ধরেছে সুবল মোক্তার? মামলা মোকদ্দমা হবে না, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে আজকালের মধ্যে। এ কি একটা ঘটনা!

তবু সবাই ছি-ছি করে আর সুবল মোক্তারকে গাল দেয়। বাগানে গিয়ে তাকে শাসন করে আসার কথাটা কেউ ভাবেও না, বলেও না। শেষে সুখময়ীকেই ঝাঁজ দেখিয়ে বলতে হয়, 'অ ঠাকুরপো, দাঁড়িয়ে শুধু জটলা করবে তোমরা? যাও না, দু-ঘা দিয়ে এসো না বজ্জাতটাকে?'

নটবরের মা বলে, 'চুপ কর মাগী, চুপ কর।'

'কেন চুপ করব? আমার হাত ধরবে, তোমরা তা চুপ করে সয়ে যাবে!'

নটবর বলল, 'ও শালা কি আর আছে, পালিয়ে গেছে।'

'থাকতে তো পারে? কলসি আনতে ফিরে যাব ভেবে থাকতে তো পারে ঘুপচি মেরে? যাও না একবার, দেখে এসো!'

তখন নটবর, শশধর, নিতাই আর পাড়ার একজন সুবলকে খুঁজতে যায়, নটবরের মা চেঁচিয়ে বলে দেয়, 'কলসিটা আনিস কেউ। শুনছিস কলসিটা আনিস।'

সুখময়ীকে ঘিরে মেয়েদের জটলা চলতে থাকে। চারদিকে তারা রটাবে, তবু তারাই বলে যে এমন হইচই করা উচিত হয় নি সুখময়ীর, জানাজানি হওয়া কি ভালো! চুপিচুপি শাউড়ি বা সোয়ামিকে বললেই পারত সে, পুকুরঘাটে যাওয়ার সময় একজন কেউ সঙ্গে যেত। সুখময়ী শুনে যায়, কথা বলে না। নটবরের মার চাপা আফসোস আর গালাগালির জবাবে শুধু ফোঁস করে ওঠে।

সুবলকে পাওয়া গেল কাঁঠালবাগানেই, কিন্তু ধরে মারবার সাহস হল না একজনেরও।

নিতাই নেহাত বদরাগী মানুষ, সে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'বৌ-ঝির হাত ধরে টানা কেন মোক্তারবাবু?' সুবল রেগে বলল, 'তোর তো বড় বাড় হয়েছে নিতাই, যা মুখে আসে তাই বলিস!' শশধর মৃদুভাবে সাবধান করে দিল, 'আর যেন এসব না ঘটে মোক্তারবাবু।'

সুবল আর কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে গেল। মুখখানা তার একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সুখময়ী ফুরিয়ে গেল, চিরতরে সরে গেল তার জীবন থেকে। একটু কলঙ্ক তার রটবে—কিন্তু তীব্র অস্বীকারের জোরে সে তা উড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু আবার যদি এমন কিছু ঘটে দুর্নাম তার জোর পাবে।

বড় একটা মামলা ছিল সুবলের এ সময়, মনটা একেবারে খিচড়ে গেল! নাহ, মনটা একটু শক্ত করতে হবে তার। সবে প্র্যাকটিস জমছে। বাকি দিনটুকুতে ছোট মহকুমা শহরের চারিদিকে যে তাদের নামে ঢিঢি পড়ে গেছে, সেটা সুখময়ী টের পেল সন্ধ্যার পর নটবরের হাতে বাখারি খেয়ে। বাকি দিনটা বাড়ির সকলে মুখ ভার করে থেকেছে, তাকে বাদ দিয়ে করেছে জটলা। বিকেলে আড্ডা দিতে বেরিয়ে সন্ধ্যার পর মুখ অন্ধকার করে নটবর ফিরে এল, গর্জাতে গর্জাতে মা আর ভাইকে জানিয়ে দিল সহরসুদ্ধ লোক কী বলাবলি করছে এবং খবরটা ভালো করে শুনবার আগ্রহে সুখময়ী কাছে এসে দাঁড়াতে সরু একটা বাখারি তুলে তার পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। সরু বাখারির বেতের মতো ধার, পিঠ কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল সুখময়ীর।

কিন্তু সে তীব্র ব্যথা তার কাছে অতিরিক্ত ঝাল-খাওয়া সুখের মতো লাগল। কলঙ্ক তবে রটেছে! তবে আর এখন কী বাধা রইল সুবলের তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার? এ বদনাম সয়ে সে তো টিকতে পারবে না এখানে। যেতে হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না কেন?

নটবরের মা বলল, 'থাক, থাক। মারধর করে কাজ নেই। ও-বৌকে তো আর ঘরে রাখা যাবে না। কাল সকালে খেদিয়ে দিস। মামার বাড়ি যাক, নয়তো চুলোয় যাক।'

শুনে একটু ভাবনা হল সুখময়ীর। সত্যি তাকে তাড়িয়ে দেবে নাকি? গালাগালির জন্য সে তৈরি হয়েই ছিল, তার উপর নয় কিছু মারধর হয়েছে। কিন্তু খেদিয়ে দিলে তো মুশকিল! সুবলের যদি বেশিরকম রাগ হয়ে থাকে, তাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে না চায়! পুরুষের মন তো, বিগড়ে যেতে কতক্ষণ! তবে তো তার একূল-ওকূল দুকূল যাবে, মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে না জগতে। মামা কি ঠাঁই দেবে তাকে? মামারও তো শুনতে বাকি থাকবে না এ কেলেঙ্কারির কথা।

ভাবে আর সুবলের প্রেমে বিশ্বাস হারিয়ে সে পিঠের জ্বালায় কাতরায়। চুলোর ধোঁয়ায় তার চোখ জ্বলে আর ভাতের হাঁড়ির বাষ্পে জগৎ ঝাপসা হয়ে যায়। আগুনের আঁচে মাঝে মাঝে শরীরটা শিউরে ওঠে, জ্বর আসবার মতো উদ্ভট শিহরন। জল ছুঁতে গিয়ে গা ছমছম করে। জ্বর কি একটু এসেছে তাহলে তার? সকলকে ভাত দিয়ে হেঁসেল তুলে খাওয়ার অনিচ্ছা নিয়ে খিদের জ্বালায় কিছু খায়। রসুইঘর বন্ধ করে কুপি হাতে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ায় কুপিটা নিভিয়ে রেখে ঘরে ঢোকে। চৌকিতে বসে নটবর তামাক টানছে। কাল

তাকে খেদিয়ে দেবে নটবর। এতকাল সোহাগ করে কাল তাকে দূর করে দেবে। সুবলের সঙ্গেই পালিয়ে গিয়ে বা তার তবে কী লাভ হবে? বৌকে যদি মানুষ খেদিয়ে দিতে পারে, দুদিন পরে সুবল কেন তাকে ফেলে পালাবে না?

নটবরকে একটু নরম করার চেষ্টার কথা মনে আসে, কিন্তু সুখময়ী উৎসাহ পায় না। রাগ কমিয়ে কতবার সে নটবরের সোহাগ আদায় করেছে, কৌশল তার অজানা নয়, কোনোদিন ব্যর্থও হয় নি। আজ সে মনে জোর পায় না। বাখারির মার খেয়েছে বলে নয়। মার খেলেও মান বাঁচিয়ে সোহাগ যাচা যায়। নিজের উপরেই আজ তার বিশ্বাস নেই। নিজেকে কেমন রূপহীনা, কুৎসিত মনে হচ্ছে। তার যেন কাটির মতো সরু আর কাঠের মতো শক্ত দেহ। কী দিয়ে সে নটবরকে নরম করবে? তার চেয়ে শুয়ে পড়া ভালো। মাথা ঘুরছে, পিঠ জ্বলছে, শরীর ভেঙে পড়ছে, চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে রাতটা কাটানো যাক। সুবল নটবর সকলের ভরসাই যখন তার ফুরিয়ে গেছে, কী আর হবে আকাশপাতাল ভেবে।

চৌকিতে উঠতে তার ভরসা হল না। মেঝেতে মাদুর বিছাতে গেল। তখন কথা কইল নটবর।

'দোর দে, হুঁকোটা রাখ।'

সুখময়ী দুয়ার বন্ধ করে হুঁকোটা রেখে মাদুরে শুয়ে পড়ল। পিঠে ব্যথা ছিল, মনে খেয়াল ছিল না, অভ্যাসমতো চিৎ হয়ে শুয়েই মৃদু আর্তনাদ করে সে পাশ ফিরল। চৌকিতে বসে প্রদীপের আলোতে নটবর তাকে খানিক দেখল, পা গুটিয়ে কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে বৌটা তার শুয়েছে!

'পিঠ ব্যথা হয়েছে নাকি বৌ? গোসা হয়েছে? আর মারব না তোকে। কোন শালা আর তোর গায়ে হাত তোলে!'

'আমায় কাল তাড়িয়ে দেবে?'

'দূর পাগলী। ও কথার কথা বলছিলাম। তোকে ছেড়ে কি থাকতে পারি?'

সুখময়ী নিজেই স্বামীকে বুকে টেনে নিয়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুজল। মাদুরের ঘষায় পিঠে যেন তার করাত চলতে লাগল অনেকগুলি। একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আবার চেতনা ফিরে এল, তবু সে শব্দ করল না। আর্তনাদগুলি বুকে চেপে, গোঙানিগুলি গলায় আটকে রেখে দিল। নটবর ছেড়ে দেওয়ামাত্র সে পাশ ফিরল। আলো নিভিয়ে চৌকির বিছানায় শোবার সময় কর্তব্যবোধে নটবর বলল, 'গা যেন তোর গরম দেখলাম, জ্বর হয়েছে নাকি?'

'একটু হয়েছে।'

'মেঝেতে কেন তবে? চৌকিতে আয়।'

'যাই।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৌকিতে সে গেল না। আলো নেবার আগে সে দেখেছে, পিঠের রক্তে মাদুর লাল হয়ে গেছে।

নটবর ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঘুম গাঢ় হয়ে এলে তার নাক ডাকতে আরম্ভ করল। তখন চুপিচুপি দরজা খুলে সুখময়ী বাইরে বেরিয়ে গেল। রাত বেশি হয় নি, শশধর জেগে আছে। পাড়ার লোকও হয়তো জেগে আছে অনেকে। থাক জেগে! কতক্ষণ লাগবে তার সুবলকে দুটি কথা শুধিয়ে আসতে? বাগান হয়ে বেগুনক্ষেত পার হলেই সুবলের বাড়ি।

ডুবুডুবু চাঁদের জোছনা এখনো একটু আছে। বাগানের গাঢ় অন্ধকার কোনো রকমে পার হলে পথের চিহ্ন নজরে পড়ে। সুখময়ী তরতর করে বেগুনক্ষেতের বেড়া ঘেঁসে এগিয়ে

গেল। তাড়াতাড়ি ফেরা চাই, নটবরের ঘুম ভেঙে গেলে যাতে সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়তটা দেওয়া যায়। সুবলের বাড়ির ঘরে ঘরে আলো নিভেছে। তার ঘরের পাশে গাঁদাফুলের বাগান। একটু তার ফুলের বাগান করার শখ আছে। বাড়ির সামনের বাগানটি তার দেখবার মতো, এখান থেকে নানা ফুলের মেশানো গন্ধ নাকে আসে। প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়ে সুবল বেরিয়ে এল।

'চুপ। আস্তে! আবার কেন?'

'দ্যাখো, তোমার জন্যে কী মারটা মেরেছে আমায়।'

'তোমার জন্যে আমার বদনাম হল সুখময়ী। কত ভালো বলত লোকে আমায়, কত সম্মান করত, তোমার জন্যে সব গেল।'

'চলো আমরা পালিয়ে যাই দু–চার দিনের মধ্যে। সব বেচে দাও—'

'তোমার খালি বাজে কথা। সব বেচে মোক্তারি ফেলে কোথায় যাব?'

'এত কেলেঙ্কারি হল, চারিদিকে ঢিঢি পড়ে গেল, তবু থাকবে? কী করে থাকবে?'

'আস্তে আস্তে ভুলে যাবে লোকে।'

সুখময়ী আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসছিল, সুবল তার হাত চেপে ধরল।

'শিগগির ফিরতে হবে।'

'একটু বসে যাও? বৌ মরে গেছে কবে, এতকাল বিয়ে করি নি তোমার জন্যে। একটু বসে যাও।'

সুবলের ঘাট বাঁধানো। মোক্তারির টাকায় সবে ঘাট বাঁধিয়েছে, এখনো কোথাও ফাটল পর্যন্ত ধরে নি। ঘাটের ধোয়ামোছা–পরিষ্কার সিমেন্টও সুখময়ীর পিঠের রক্তে লাল হয়ে গেল। সমস্ত ঘাট নয়, সুখময়ীর পিঠের নিচেকার অংশটুকু।

পরদিন নাইতে এসে লোকে বলল, কুকুর বা বিড়াল ছানা বিইয়েছে সেখানে। কিংবা বুনো শেয়াল।

ফাঁসি

সন্দেহ নাই যে, ব্যাপারটা বড়ই শোচনীয়। কে কল্পনা করিতে পারিত, বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক শান্ত জীবন যাপন করিবার পর গণপতি শেষ পর্যন্ত এমন একটা ভয়ানক ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িবে। শিক্ষিত সদ্বংশের ছেলে, কথায় ব্যবহারে ভদ্র ও নিরীহ, জীবনে ধরিতে গেলে, এক রকম সব দিক দিয়াই সুখী, সে কিনা একটা লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডের আসামি হিসাবে ধরা পড়িল! লোকে একেবারে থ' বনিয়া গেল। চরিত্রবান সংযত প্রকৃতির ভদ্রলোকের মুখোশ পরিয়া কী ভাবেই সকলকে এতদিন খুনিটা ঠকাইয়া আসিয়াছিল। কী সাংঘাতিক মানুষ,—এ্যাঁ? জগতে এমন মানুষও থাকে?

গণপতিকে পুলিশে ধরিবার পর ভীত-বিব্রত ও লজ্জায় দুঃখে আধমরা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে পরিচিত ও অর্ধপরিচিত অনাত্মীয় মানুষগুলির উত্তেজনাই যেন মনে লাগিল প্রখরতর। বিচারের দিন আদালতে ভিড় যা জমিতে লাগিল বলিবার নয়! টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চে মিথ্যা নাটকের অভিনয় দেখার চেয়ে আদালতে নারীঘটিত খুনি মোকদ্দমার বিচার দেখা যে কত বেশি মুখরোচক, সে শুধু তারাই জানে—রোজ খবরের কাগজে আগের দিনের আইন-আদালতের কার্যকলাপের বিবরণ পড়িয়াও যাদের কৌতূহল মেটে না, বেলা দশটায় খাওয়াদাওয়া সারিয়া উকিল মোক্তারের মতো যারা আদালতে ছুটিয়া যায়।

বাড়িতেই গণপতির তিনজন উকিল। তার বাবা রাজেন্দ্রনাথ এককালে মস্ত উকিল ছিলেন, মাসে একসময় তিনি দশ হাজার টাকাও উপার্জন করিয়াছেন—এখন, সত্তর বৎসর বয়সে আর কোর্টে যান না। বড়ছেলে পশুপতি বছর বার প্র্যাকটিস করিতেছে—বাপের মতো না হোক নামডাক তারও মন্দ নয়। গণপতির ছোটভাই মহীপতিও উকিল, তবে আনকোরা নতুন। বড় উকিলের বড় উকিল বন্ধু থাকে—সমব্যবসায়ী কি না! গণপতির পক্ষ সমর্থনের জন্য অনেকগুলি নামকরা আইনজ্ঞ মানুষ একত্রিত হইলেন, যে তাতেও মামলার গুরুত্ব গুরুতর রকম বাড়িয়া গেল। তবে গণপতিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো চলিবে কি না সে বিষয়ে ভরসা করিবার সাহস এঁদের রহিল কম। মুশকিল হইল এই যে, মামলাটা একেবারেই জটিল নয়। মামলা যত জটিল হয়, আইনের বড় বড় মাথাওয়ালা লোক মামলাকে জটিলতর করিয়া খুশিমতো মীমাংসার দিকে ঠেলিয়া দিবার সুযোগ পান তত বেশি!

সহজ সরল ঘটনা। বাহির হইতে ঘরে শিকল তোলা ছিল আর স্বয়ং পুলিশ গিয়া খুলিয়াছিল—সে শিকল। ভিতরে ছিল মাত্র রক্তমাখা মৃতদেহটা আর ভয়ে আধপাগলা গণপতি। গোটা দুই টিকটিকি আর কয়েকটা মশা ছাড়া ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। মশা অবশ্য মানুষ মারে,—মানুষ যত মানুষ মারে তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি, তবু কেন যেন এই খুনের অপরাধটা মশার ঘাড়ে চাপানোর কথাটা গণপতির পক্ষের উকিলেরা একবার

ভাবিয়াও দেখিলেন না। তারা শুধু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, মৃতদেহটা আগেই ঘরের মধ্যে ছিল, পরে গণপতিকে ফাঁকি দিয়া ঘরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হয়।

'বড় বিপদ, দয়া করে একবার আসবেন?'—এই কথা বলিয়া গণপতিকে ফাঁকি দিয়াছিল একটি লোক, যার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ, পরনে ছিল কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি আর পালিশ করা ডার্বি স্যু। গোঁপদাড়ি কামানো, চোখে পুরু কাচের চশমা, বিবর্ণ ফরসা রং—লোকটাকে দেখতে নাকি অনেকটা ছিল কলেজের প্রফেসরের মতো! (কলেজের প্রফেসর হইলেই মানুষের চেহারা কোনো বৈশিষ্ট্য অর্জন করে কি না গণপতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে জবাব দিতে পারে নাই, বোকার মতো হাঁ করিয়া বিচারকের দিকে চাহিয়া ছিল।) এই লোকটি ছাড়া আরো তিন জন লোককে গণপতি দেখিতে পাইয়াছিল, বাড়ির সরু লম্বা বারান্দাটার শেষে। তিনতলার সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে কারা দাঁড়াইয়াছিল। (অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিলে গণপতি তাদের দেখিতে পাইল কেমন করিয়া?—বিচারক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে গণপতি এতক্ষণ বোকার মতো চুপ করিয়া থাকিয়া এমন জবাব দিয়াছিল যে বিচারক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন।)

গণপতি যে কৈফিয়ত দিল, সেটা যে একেবারে অসম্ভব—তা অবশ্য বলা যায় না, অমন কত মজার ব্যাপার এই মজার জগতে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আট-দশ জন দেশপ্রসিদ্ধ উকিল ব্যারিস্টারের চেষ্টাতেও এটা ভালোমতো প্রমাণ করা গেল না। গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল।

ফাঁসি! বিচারক হুকুমটা দিলেন ইংরাজিতে, বাঙলায় যার মোটামুটি চুম্বক এই যে, গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া গণপতিকে যথাবিধি ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে, যতক্ষণ সে না মরে। তবে হুকুমটা যদি গণপতির পছন্দ না হয়, সে ইচ্ছা করিলে আপিল করিতে পারে।

বুড়ো রাজেন্দ্রনাথের ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় অন্ধ হইয়া গেল। গণপতির বোনেরা ও বৌদিরা যে কান্নার রোল তুলিল—সমস্ত পাড়ার আবহাওয়াটা যেন তাতে বিষণ্ণ হইয়া আসিল। গণপতির বৌ রমার এত ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল যে, তার যে গাল দুটি লজ্জা না পাইলেও সারাক্ষণ গোলাপের মতো আরক্ত দেখাইত, একেবারে কাগজের মতো ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া রহিল। গণপতির বিধবা পিসি ঠাকুরঘরে এত জোরে মাথা খুঁড়িলেন যে, ফাটা কপালের রক্তে চোখের জল তাহার খানিক খানিক ধুইয়া গেল।

যথাসময়ে করা হইল আপিল।

অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের দ্বারা গণপতির পক্ষে আরো কয়েকটি সাক্ষী এবং প্রমাণও সংগ্রহ করা হইল। তার ফলে, সন্দেহের সুযোগে গণপতি পাইল মুক্তি। যে লোকটিকে খুন করার জন্য গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, তাহাকে কে বা কাহারা খুন করিয়াছে—পুলিশ তাহারই খোঁজ করিতে লাগিল।

বাড়ি ফিরিবার অধিকার জুটিল অপরাহ্ণে—আকাশ ভরিয়া তখন মেঘ করিয়াছে। অপরাহ্ণে খুব ঘটা করিয়া মেঘ করিলে মনে হয় বৈকি যে, এ আর কিছুই নয়, রাত্রিরই বাড়াবাড়ি। গণপতির কান্না আসিতেছিল। আনন্দে নয়, শ্রান্তিতে নয়, বিগলিত মানসিক ভাবপ্রবণতার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকারণে—একটা চিন্তাহীন স্তব্ধ অন্যমনস্কতায়। বন্ধুবান্ধবের হাত এড়াইয়া সে পশুপতির সঙ্গে ব্যারিস্টার মিস্টার দের মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটরের কোণে গা এলাইয়া দিয়া পশুপতি ফোঁস করিয়া ফেলিল একটা নিশ্বাস, তারপর নিজেই

মিস্টার দের পকেটে হাত ঢুকাইয়া মোটা একটা সিগার সংগ্রহ করিয়া সাদা ধবধবে দাঁতে কামড়াইয়া ধরিল। মিস্টার দে একগাল হাসিয়া বলিলেন,—'যাক।'

কী যে তাহার যাওয়ার অনুমতি পাইল বোঝা গেল না। হয়তো গণপতির দুর্ভোগ, নয়তো অসংখ্য মানুষের পাগলামি-ভরা দিনটা—আর নয়তো পশুপতি যে সিগারটা ধরাইয়াছে—তাই। গণপতি পাংশু মুখ তুলিয়া একবার তাহার পরিতৃপ্ত উদার মুখের দিকে চাহিল, তারপর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল বাহিরের দিকে। একবার এই গাড়িতেই সে মিস্টার দের সঙ্গে বসিয়া ছিল, কোথায় যাওয়ার জন্য আজ সে কথা ঠিক মনে নাই। গাড়ি ছাড়িবার আগে মিস্টার দে হঠাৎ হাত বাড়াইয়া ফুটপাতের একটা ভিখারির দিকে একটা আনি ছুড়িয়া দিয়াছিলেন। দানের পুণ্য আলোর মতো সেদিন যেভাবে মিস্টার দের মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ জীবনদানের পুণ্য তো তার চেয়ে প্রখর জ্যোতির রূপ লইয়া ফুটিয়া নাই! অবিকল তেমনি মুখভঙ্গি মিস্টার দের—ভিখারিকে একটা আনি দিয়া তিনি যেমন করেন।

মানুষের অনুভূতির জগতের রীতিই হয়তো এইরকম—মুড়িমুড়কির এক দর! জীবন ফিরিয়া পাইয়া তার নিজেরও তেমন উল্লাস হইল কই? জীবনের কত অসংখ্য ছোট ছোট পাওনা তাকে এর চেয়ে শতগুণে উত্তেজিত করিয়াছে, নিবিড় শান্তি দিয়াছে, আনিয়া দিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী মনোরম উপভোগ। সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রত্যর্পিত অধিকারটা যতভাবে যতদিক দিয়াই, সে কল্পনা করিবার চেষ্টা করুক, জোৎস্নালোকে ছাদে বসিয়া রমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলিবার কল্পনা তার চেয়ে কত ব্যাপক, কত গাঢ়তর রসে রসালো!

দু-ভাইকে বাড়ির দরজায় নামাইয়া দিয়া মিস্টার দে চলিয়া গেলেন। তখন ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বাড়ির সকলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বৃষ্টি না নামিলে হয়তো প্রতিবেশীরাও অনেকে আসিত। গণপতি নামিয়া প্রথমে রাজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবে, পিসিমা তাই সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। গণপতির প্রণাম শেষ হইতেই তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হু-হু করিয়া উঠিলেন কাঁদিয়া। এ কান্না অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়, সকলেই জানিত পিসিমা এমনিভাবে কাঁদিবেন। তাই খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দিল। গণপতির কেমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হইতেছিল। বাড়ি আসিবার জন্য মিস্টার দের গাড়িতে উঠিয়া কাঁদিবার যে জোরালো ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, হঠাৎ কখন তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে। নিজেকে লুকাইতে পারিলে এখন যেন সে বাঁচিয়া যায়। নিজের বাড়িতে আপনার জনের আবেষ্টনীর মধ্যে ক্রন্দনশীলা পিসিমার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিবার সময় জেলখানায় তাহার সেই নিভৃত সেলটির জন্য গণপতির সমস্ত মনটা লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, আর কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিলে তার মাথার মধ্যে একটা কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে।

আর কেহ কাঁদিতেছে না দেখিয়া পিসিমা একটু পরে আত্মসংবরণ করিলেন। তখন পশুপতির স্ত্রী পরিমল বলিল, 'কী চেহারাই তোমার হয়েছে ঠাকুরপো!'

গণপতি গলা সাফ করিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিল, 'আর চেহারা... ?'

যার জীবন যাইতে বসিয়াছিল, চেহারা দিয়া সে কী করিবে—এই কথাটাই গণপতি এমনিভাবে বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শোনাইল অন্যরকম, মনে হইল, বৌদির স্নেহপূর্ণ উৎকণ্ঠার জবাবে সে যেন ভারি রূঢ় একটা ভদ্রতা করিয়াছে। গণপতিও হঠাৎ তাহা খেয়াল করিয়া মনে মনে অবাক হইয়া গেল! এমন শোনাইল কেন কথাটা? রোগ হইয়া যার জীবন যাইতে বসে, সে ভালো হইয়া উঠিলে এমনিভাবে যখন কেহ তাহার চেহারা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা

প্রকাশ করে, তখন অবিকল এমনিভাবেই তো জবাব দিতে হয়! চেহারা কেন খারাপ হইয়াছে, উভয় পক্ষেরই যখন তাহা জানা থাকে, চেহারা সম্বন্ধে এই তো তখন বলাবলির রীতি। অথচ আজ এই কথোপকথন তার এতগুলি আপনার জনের কানে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

কারণটা গণপতি যেন বুঝিতে পারিল, রোগে যে রোগা হয়, চেহারা খারাপ হওয়ার অধিকার তাহার আছে, সেটা তার দোষ নয়। কিন্তু খুনের দায়ে জেলে গিয়া রোগা হইয়া আসিবার অধিকার এ জগতে কারো তো নাই—সে তো পাপের ফল,—অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া তার দুর্বল দেহ ও পাংশু মুখ যে শুধু এই কথাটাই ঘোষণা করিতেছে,—অতি লজ্জাকর একটা খুনের দায়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিল।

মাথাটা ঘুরিতেছিল, গণপতি একবার বিহ্বলের মতো সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণে তাহার চোখ পড়িল রমার দিকে। আর সকলে তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমা কিন্তু কাছে আসে নাই, পাশের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিবার দরজাটার আড়ালে সে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া আছে,—অনেক দূরে... দীর্ঘ ব্যবধানে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ব্যবধানটা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তারপর লুপ্ত হইয়া গেল অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরিয়া পরিমলের সঙ্গে একটা কথা বলিয়াই গণপতি যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল—এতে কারো অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। আহা! প্রায় ছমাস ধরিয়া বেচারা কি কম সহ্য করিয়াছে! কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে নিজের জীবন লইয়া ভাগ্যের লটারি খেলার অনিশ্চিত ফলাফলের প্রতীক্ষায় একাকী দিন কাটানো তো শুধু নয়,—বাহিরের অদৃশ্য জগতের কাছে ঘাড় মোচড়ানো অফুরন্ত কাল্পনিক লজ্জা ভোগ করাও তো শুধু নয়, গণপতি যে অনেকগুলি দিন ধরিয়া ফাঁসির দিনও গুণিয়াছে। ফাঁসি! ভাবিতে গেলেও নিরাপদ সহজ মানুষের দম আটকাইয়া আসে না? মূর্ছিত হইয়া পড়িবে বৈকি গণপতি! অনেক আগেই তার দুবার মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল। একবার যখন সে নিজের ফাঁসির হুকুম শোনে—আর যখন সে জানিতে পারে, এ জীবনের মতো ফাঁসিটা তাহার বাতিল হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্যরকম শক্ত মানুষ বলিয়াই না মূর্ছাটা সে এতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল।

সহ্যশক্তি রমারও কম নয়। আজ কতকাল সে খুনি-আসামির বৌ হইয়া বাঁচিয়া আছে—অপাপবিদ্ধ পবিত্র মানুষের ঘরকন্নার মধ্যে পাড়ার একপাল ভদ্রমহিলার কৌতুক ও কৌতূহল-মেশানো সহানুভূতির আকণ্ঠ আবর্তে। কতদিন ধরিয়া সে অহোরাত্রি যাপন করিয়াছে—স্বামীর আগামী ফাঁসির তারিখের বৈধব্যকে ক্রমাগত বরণ করিয়া করিয়া! আপিল যদি না করা হইত—আজ রাত্রি প্রভাত হইলে কারো সাধ্য ছিল না রমাকে বৌ করিয়া রাখে। তবু এখনো লাইব্রেরিঘরে ঢুকিবার দরজার আড়ালে পাষাণপ্রতিমার মতো তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গি দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। না আছে চোখে ভয়, না আছে দেহে শিহরন। পাষাণপ্রতিমার মতোই তার কাঠিন্য যেন অকৃত্রিম। গণপতি যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, তাতেও যেন তার কিছু আসিয়া গেল না। এক পা আগানো দূরে থাক, এক পা পিছাইয়া লাইব্রেরিঘরের ভিতরে আত্মগোপন করাটাই সে যেন ভালো মনে করিল। স্বামীর,—সত্যবানের মতোই যে স্বামী তাহার—মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর মূর্ছা ভাঙিবার কী আয়োজন হইল, একবার তাহা চাহিয়া দেখিবার শখটাও অন্ততপক্ষে রমার গেল কোথায়? এ কৌতূহল যে-মেয়েমানুষ দমন করিতে পারে—ধরিত্রীর

মতো তার সহ্যশক্তিও সত্যই অতুলনীয়—মৃত ও অসাড়!

মাথায় জল দিতে দিতে অল্পক্ষণ পরেই গণপতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জামাকাপড় বদলাইয়া এক বাটি গরম দুধ খাইয়া সে সকলের সঙ্গে ভিতরের বড় ঘরে গিয়া বসিল। পশুপতি একবার প্রস্তাব করিয়াছিল যে, গণপতি নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করুক। গণপতি নিজেই তাহাতে রাজি হইল না। মূর্ছা ভাঙিবার পর নিজেকে লুকানোর ইচ্ছাটা কী কারণে যেন তাহার কমিয়া গিয়াছে। অনেক জল ঢালবার ফলে মাথাটা বোধ হয় তাহার ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, সকলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য এতক্ষণে সে একটু একটু আগ্রহই বরং বোধ করিতে লাগিল।

অল্পে অল্পে একথা–সেকথা হইতে কথাবার্তা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। ছ–মাসের মধ্যে আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই বহুবার গণপতির দেখা হইয়াছে, তবু সে এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন ওই সময়কার পারিবারিক ইতিহাসটা ঘুণাক্ষরে জানিবার উপায়ও তাহার ছিল না। তিন মাস আগে জেলে বসিয়া পশুপতির কাছে বাড়ির যে ঘটনার কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়াছিল, আজ পিসিমার মুখে সেই ঘটনার কথা শুনিয়া সে নবজাগ্রত বিস্ময় বোধ করিল, এমনকি—যে ব্যাপার এখানে সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া জেলে গিয়াছিল—পরিমল তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলে, আজই যেন প্রথম শুনিতেছে এমনিভাবে শুনিয়া গেল। স্মৃতি, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি গণপতির ভিতরে কমবেশি জড়াইয়া গিয়াছে সত্য, তবু জানা কথা ভুলিবার মতো অন্যমনস্কতা তো ফাঁসির আসামিরও আসিবার কথা নয়! কিন্তু এই অভিনয়ই গণপতির ভালো লাগিতেছিল। এমনই উৎসুকভাবে একথা–সেকথা জানিতে চাহিলে এবং তার জবাবে যে যাই বলুক গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাই শুনিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে তার নিজের ও অন্যান্য সকলেরই যেন বিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে দীর্ঘকালের জন্য সে দূরদেশে বেড়াইতে গিয়াছিল। এতদিন তার গৃহে অনুপস্থিত থাকিবার আসল কারণটা সকলে ভুলিয়া যাইবে।

হয়তো তাই যাইতে লাগিল এবং সেইজন্য হয়তো যখন আবার ওই আসল কারণটা মনে পড়িবার অনিবার্য কারণ ঘটিতে লাগিল, সকলেই যেন তখন হঠাৎ একটু একটু চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। গণপতিকে পুলিশে ধরিবার অল্প কিছুদিন আগে মহাসমারোহে তার ছোটবোন রেণুর বিবাহ হইয়াছিল। গণপতি একসময় রেণুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সকলের এমনি সচকিতভাব দেখা গেল। এ ওর মুখের দিকে চাহিল—কিন্তু বয়স্ক কেহ জবাব দিল না। শুধু পশুপতির সাতবছরের মেয়ে মায়া বলিল, 'পিসিমাকে শ্বশুরবাড়িতে রোজ মারে, কাকা।'

গণপতি অবাক হইয়া বলিল, 'মারে?'

মায়া বলিল, 'তুমি মানুষ মেরেছ কিনা তাই জন্যে।'

তিন–চার জন একসঙ্গে ধমক দিতে মায়া সভয়ে চুপ করিয়া গেল। মনে হইল, ধমকটা যেন গণপতিকেই দেওয়া হইয়াছে। কারণ, মায়ার চেয়েও তার মুখখানা শুকাইয়া গেল বেশি। আবার কিছুক্ষণ এখন তাহার কারো মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতা হইবে না।

পশুপতি গলা সাফ করিল। বলিল, 'ঠিক যে মারে তা নয়, তবে ওরা ব্যবহারটা ভালো করছে না।'

বড় বোন বেণু বলিল, 'বিয়ের পর সেই যে নিয়ে গেল মেয়েটাকে এ পর্যন্ত আর একবারও পাঠায় নি। মহী দু–বার আনতে গেল।'

মহীপতি বলিল, 'আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেও দেয় নি। বললে—'

রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, 'আহা, থাক না ওসব কথা, বাড়িতে ঢুকতে না-ঢুকতে ওকে ওসব শোনাবার দরকার কী! ও তো আর পালিয়ে যাবে না।'

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। বাহিরে বাদল মাঝখানে একটু কমিয়াছিল, এখন আবার আরো জোরের সঙ্গে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। ঘরের মধ্যে এখন ভিজা বাতাসের গাঢ়তম স্পর্শ মেলে। রমা এবারো ঘরে আসে নাই, এবারো সে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে—পাশের ঘরের দরজার ওদিকে। তবে এবার আর সে দাঁড়াইয়া নাই, মেঝেতে বসিয়াছে। একতলার রান্নাঘর হইতে ডালসম্ভারের গন্ধ ভিজা বাতাসকে আশ্রয় করিয়া আসিয়া এ ঘরে জমা হইয়াছে, বেণুর বড় মেয়ে শৌখিন সুহাসের অঙ্গ হইতে এসেন্সের যে গন্ধ এতক্ষণ পাওয়া যাইতেছিল তাও গিয়াছে ঢাকিয়া। পিসিমা কয়েক মিনিটের জন্য ঠাকুরঘরে গিয়াছিলেন, প্রসাদ ও প্রসাদি ফুলের রেকাবি হাতে তিনি এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। সকলের আগে গণপতিকে বলিলেন, 'জুতো থেকে পা-টা খোল তো বাবা।'

জুতার স্পর্শ ত্যাগ করিয়া গণপতি পবিত্র হইলে, পিসিমা প্রসাদি ফুল লইয়া তাহার কপালে ঠেকাইলেন, তারপর হাতে দিলেন প্রসাদ এবং আজও আধা-মমতা আধা-ধমকের সুরে তাহার চিরন্তন অনুযোগটা শুনাইয়া দিলেন—'ঠাকুরদেবতা কিছু তো মানবি নে, শুধু অনাচার করে বেড়াবি।'

এ ঘরে কেহ কিছু বলিল না; কিন্তু পাশের ঘরের দরজার ওদিক হইতে অস্ফুট কণ্ঠে শোনা গেল, 'মাগো।'

পিসিমা চমকাইয়া বলিলেন, 'কে গো ওখানে বৌমা?'

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হল রে রমা?'

রমার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরিমলের কোলের ছেলেটি মেঝেতে হামা দিতে দিতে নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, গণপতি হাত বাড়াইয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইল—ওকে আদর করিবার ছলে মাথা হেঁট করিয়া থাকা সহজ। রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, 'দ্যাখ্ তো সুহাস, মেজ-বৌমার কী হল? ফিট-টিট হল নাকি?'

'পরিমল বলিল, তুই বোস, আমি দেখছি।'

উঠিয়া গিয়া নিচুগলায় রমাকে কী যেন জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সে ফিরিয়া আসিল; বলিল, 'না, কিছু হয় নি।'

কিছু না। একেবারেই কিছু হয় নাই। কী হইবে ওই পাথরের মতো শক্ত মেয়েমানুষটার? এই যে এতকাল গণপতি জেলখানায় আটক ছিল, ফাঁসি এড়ানোর ভরসা কয়েকদিন আগেও তাহার ছিল না,—রমা কি একদিন আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ননদ, জা কারো বুকে একবার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, কারোকে টের পাইতে দিয়াছিল—তার কিছুমাত্র সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে? এ কথা সত্য যে, যেদিন হইতে গণপতিকে পুলিশে ধরিয়াছিল, সেদিন হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দিনের পর দিন কথা কমাইয়া কমাইয়া প্রায় বোবা হইয়া গিয়াছে, রোগা হইতে হইতে সোনার বরন তাহার হইয়া গিয়াছে কালি। তা, সেটা আর এমন কী বেশি! দুঃখের ভাগ তো সে দেয় নাই, সান্ত্বনা তো নেয় নাই, লুটাইয়া বুকফাটা কান্না তো কাঁদে নাই।

একদিন বুঝি কাঁদিয়াছিল। শুধু একদিন!

গভীর রাত্রে বাড়ির সকলে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—সুহাস ছাড়া। সেদিন সুহাসের বর আসিয়াছিল, তাই বর-বৌ দুজনেরই হইয়াছিল অনিদ্রা-রোগ। অত রাত্রে ঘর ছাড়িয়া

বাহির হইয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া রমার ঘরের সামনে দিয়া তাদের কোথায় যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল—সে কথা বলা মিছে। নিজের ঘরে রমা একা থাকিত, এখনো তাই থাকে। অনেক বলিয়া অনেক বকিয়াও তাকে কারো সঙ্গে শুইতে রাজি করা যায় নাই। এমনকি শ্বশুরের অনুরোধেও না।

যাই হোক, রমার ঘরের সামনে সুহাস থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কান পাতিয়া ঘরের মধ্যে বিশ্রী একটা গোঙানির আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে বেচারির স্বামী-সোহাগে তাতানো দেহটা হইয়া গিয়াছিল হিম। বরকে ঘরে পাঠাইয়া, তারপর সে ডাকিয়া তুলিয়াছিল পরিমলকে; বলিয়াছিল, 'বড়মামি, ঘরের মধ্যে মেজমামি গোঙাচ্ছে, শিগগির এসো।'

'গোঙাচ্ছে? ডাক ডাক তোর মামাকে ডেকে তোল, সুহাস! —কী হবে মা গো!'

পশুপতিকে পিছনে করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া পরিমল খানিকক্ষণ রুদ্ধ দরজায় কান পাতিয়া রমার গোঙানি শুনিয়াছিল। তারপর জোরে জোরে দরজা ঠেলিয়া ডাকিয়াছিল, 'মেজ-বৌ! ও মেজ-বৌ, শিগগির দরজা খোল।'

প্রথম ডাকেই গোঙানি থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তারপর অনেক ডাকাডাকিতেও রমা প্রথমে সাড়া দেয় নাই। শেষে ধরা গলায় বলিয়াছিল, 'কে?'

'আমি। দরজা খোল তো মেজ-বৌ, শিগগির।'

'কেন দিদি?'

পরিমল অবশ্য সে কৈফিয়ত দেয় নাই, আরো জোরে ধমক দিয়া আবার দরজাই খুলিতে বলিয়াছিল। রমারও আর দরজা না খুলিয়া উপায় থাকে নাই।

'কী হয়েছে দিদি?'

'তুই গোঙাচ্ছিলি কেন রে, মেজ-বৌ?'

রমা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়াছিল, 'গোঙাচ্ছিলাম? কে বললে?'

বারান্দার আলোয় রমার মুখে চোখের জলের দাগগুলি স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। একটু থামিয়া ঢোক গিলিয়া পরিমল বলিয়াছিল—'আমি নিজে শুনেছি, তুই তবে কাঁদছিলি?'

'না, কাঁদি নি তো! কে বললে কাঁদছিলাম?'—বলিয়া পশুপতির দিকে নজর পড়ায় রমা লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল।

তখন পরিমল বলিয়াছিল, 'আমি আজ তোর ঘরে শোব রমা?'

রমা বলিয়াছিল, 'কেন?'

কী কৈফিয়তই যে মেয়েটা দাবি করিতে জানে! অফুরন্ত!

পরিমল ইতস্তত করিয়া বলিয়াছিল, 'ভয়টয় যদি পাস—'

রমা বলিয়াছিল, 'ভয় পাব কেন? আমার অত ভয় নেই,... বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি।'

বলিয়া সকলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কী রূঢ় ব্যবহার! মনে করলে আজও পরিমলের গা জ্বালা করে।

যাই হোক, তার পর হইতে রাত্রে বাহিরে গেলে বাড়ির অনেকেই চুপিচুপি রমার ঘরের দরজায় কান পাতিয়া ভিতরের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আর কোনোদিন কিছু শোনা যায় নাই।

শোনা যাইবে কী, রমা কি সহজ মেয়ে! হোক না স্বামীর ফাঁসি, সে দিব্যি মস্ত একটা ঘরে সারারাত একা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারে। আজ হঠাৎ অস্ফুট স্বরে একবার 'মাগো' বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ওর যে কিছু হইয়াছে—এ কথা মনে করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

মিস্টার দের কড়া সিগার টানিয়া পশুপতির বোধ হয় গলাটা খুসখুস করিতেছিল, সে

আর একবার গলা সাফ করিয়া বলিল, 'রেণুর জন্য তুমি ভেবো না গনু। ওকে আসতে দেয় নি বটে, কিন্তু ওকে কষ্ট ওরা দেয় না।'

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়া আর আসিতে না দিলে, ষোল বছরের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া হয় কি না, গণপতি ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না; কিন্তু বোনটার জন্য তার নিজের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, 'ওকে একটা তার করে দিলে হত না?'

পশুপতি বলিল, 'তোমার কথা? থাকগে, কাজ নেই, কী আর হবে ওতে? মাঝখান থেকে বাড়ির লোকে হয়তো অসন্তুষ্ট হবে। কাল খবরের কাগজেই সব পড়তে পারবে।'

খবরের কাগজ? তা ঠিক, খবরের কাগজে কাল সব খবরই বাহির হইবে বটে। কিন্তু রেণু কি খবরের কাগজ পড়িতে পায়? ভাই খুনের দায়ে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অতটুকু মেয়েকে যারা আটক করিয়া রাখিতে পারে—এতখানি উদার কি তাদের হওয়া সম্ভব? গণপতি পরিমলের ছেলেকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'তবু আপিলের ফলটা আগে থাকতে জানতে পারলে—'

রাজেন্দ্র বলিলেন, 'তাই বরং দাও পশু, রেণুর শ্বশুরকে একটা তার করে দাও। লিখে দিও 'প্লিজ ইনফর্ম রেণু'—নয়তো সে ব্যাটা হয়তো মেয়েটাকে কিছু জানাবে না।'

তার লিখিতে পশুপতি আপিসঘরে গেল।

মানুষের মধ্যে খোঁজ করিলে সব সময়ে মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পাশবিকতা দিয়া হোক, দেবত্ব দিয়া হোক, কে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? বত্রিশ বছর যে পরিবারে গণপতি সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়াছে, আজ সেখানে একটা বীভৎস অসাধারণত্ব অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে যে বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিবে এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত মানুষকে খুঁজিয়া পাইতে থাকিবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। পলকে পলকে সে টের পাইতে লাগিল, এরা ভুলিতে পারিতেছে না। বিচার নয় বিশ্লেষণ নয়, বিরাগ অথবা ক্ষুধাও নয়, শুধু স্মরণ করিয়া রাখা—স্মরণ করিয়া রাখা যে, তাদের এই গণপতির অকথ্য কলঙ্ক রটিয়াছে, দেশের ও দশের কাছে সে পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে। আইনের আদালতে ভালোরকম প্রমাণ না হোক, মানুষের আদালতে তার পাশবিকতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির হুকুম রদ হোক, এ ব্যাপারের এইখানে শেষ নয়, এখনো অনেক বাকি, অনেক মন ও মানের লড়াই। প্রত্যেকের ভিতরের মানুষটি এই অনিবার্য ক্ষতি ও বিপদের চিন্তায় ভীত ও বিমর্ষ হইয়া আছে, এই যে মানুষ, ভিতরের মানুষ, এ বড় দুর্বল, বড় স্বার্থপর—তাই এ কথাটাও কে না ভাবিয়া থাকিতে পারিয়াছে যে, এর চেয়ে ফাঁসি হইয়া গেলেই অনেক সহজে সব চুকিয়া যাইতে পারিত। যে নাই, কতকাল কে তার কলঙ্ককাহিনী মনে করিয়া রাখে? মনে করিয়া রাখিলেই বা কী? গণপতি না থাকিলে, এ বাড়িতে কেন তার কলঙ্কের ছায়াপাত হইবে? সেটা নিয়ম নয়। লোকে শুধু এই পর্যন্ত ভাবিতে পারিত যে, এ বাড়িতে একটা বদলোক থাকিত, যে একটা স্ত্রীলোকঘটিত অপরাধে জড়িত হইয়া একটা মানুষ খুন করিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু সে লোকটা এখন আর নাই, এই বাড়ির আবহাওয়া এখন আবার পবিত্র, এ বাড়ির মানুষগুলি ভালো।

আর তা হইবার নয়! দুষ্ট মানুষ ঘরে আসিয়াছে, তার দোষে ঘরের আবহাওয়া দূষিত হইয়াছে, দূষিত আবহাওয়া মানবগুলিকে করিয়াছে মন্দ! অন্তত লোকে তো তা-ই ভাবিবে।

এত স্পষ্টভাবে না হোক, মোটামুটি এই চিন্তাগুলিই গণপতির অনুসন্ধান তার মনে আনিয়া দিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা রমার জন্য তার মনে দেখা দিল—গভীর

মমতা! জেলে বসিয়া রমার কথা ভাবিয়া তার খুব কষ্ট হইত, কিন্তু সে ছিল শুধু তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া—রমা যে যাতনা ভোগ করিতেছে, তাই ভাবার কষ্ট। কিন্তু এখন হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল, স্বামীর জন্য শুধু ভাবিয়াই রমা রেহাই পায় নাই, নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎটার পীড়ন সহিয়াই তার মহাশক্তির পরীক্ষা শেষ হয় নাই, আরো অনেক কিছু জুটিয়াছে। বাহিরের জগৎ নরঘাতকের স্ত্রীকে যা দেয়। সে সব যে কী এবং সে সব সহ্য করিতে একটি নিরুপায় ভীরু বধূর যে কতখানি কষ্ট হইতে পারে—ধারণা করিবার মতো কল্পনাশক্তি গণপতির ছিল না। যেটুকু সে অনুমান করিতে পারিল তাতেই বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, যাক, রমার একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা তো দূর হইয়াছে! স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া আজ তো মনে তার আনন্দের বান ডাকিয়াছে। এতদিন সে যদি অকথ্য দুঃখ পাইয়াই থাকে আজ আর সেকথা ভাবিয়া লাভ কী? প্রতিকারের উপায়ও তাহার হাতে ছিল না যে, রমার দুঃখ কমানোর চেষ্টা না-করার জন্য আজ আফসোস করিলে চলিবে। জেলে বসিয়া রমার দুঃখটা সে ঠিকমতো পরিমাপ করিতে পারে নাই; অন্যায় যদি কিছু হইয়া থাকে তা শুধু এই। তা এ অন্যায়ের জন্য রমার আর কি আসিয়া গিয়াছে। সে বুঝিলেই তো রমার দুঃখ কমিত না।

রাত্রি দুটার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইলে, পাড়ার দু-একজন ভদ্রলোক এবং পাড়ার বাহিরের দু-চার জন বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিলেন। পশুপতির ইচ্ছা ছিল, গণপতি আজ কারো সঙ্গে দেখা না করে—সে-ই সকলকে বলিয়া দেয় যে, গণপতির শরীর খুব খারাপ, সে শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গণপতি এ কথা কানে তুলিল না, নিচে গিয়া সকলের সঙ্গে দেখা ও বসিয়া আলাপ করিল। রমার কথা নূতনভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিবার পর গণপতি নিজের মধ্যে একটা নূতন তেজের আবির্ভাব অনুভব করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, যা-ই ঘটিয়া থাক, ভীরু ও দুর্বলের মতো হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; নিজের জোরে আবার তাহাকে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভূমিকম্পে বাড়ি অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে বলিয়া মাঠে বাস করিলে তো তাহার চলিবে না? বাড়িটা আবার মেরামত করিয়া লইতে হইবে। লজ্জায় সে যদি এখন মুখ লুকায়, তার লজ্জার কারণটা যে লোকে আরো বেশি সত্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিবে, আরো বড় বলিয়া ভাবিতে থাকিবে।

যাঁরা আসিয়াছিলেন, গণপতির মুক্তিতে আনন্দ জানানোর ছলে কৌতূহল মিটাইতেই তাঁদের আগমন। গণপতির সঙ্গে কথা বলিয়া সকলে একটু অবাক হইয়াই বাড়ি গেলেন। মানুষটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব যে নীচে নামিয়াছে—কারো তা মনে হইল না। সে নিজেই একরকম চেষ্টা করিয়া প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা কাটাইয়া আনিল। বেশি বকিল না, বেশি গম্ভীর হইয়া থাকিল না, গোঁয়ারের মতো ফাঁসির হুকুম পাওয়ার ব্যাপারটাকে অবহেলা করিয়া একেবারে উড়াইয়াও দিল না, আবার এমন ভাবও দেখাইল না যে, ফাঁসির হাত এড়ানোর আনন্দে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগবান তো আছেন, বিনা দোষে একজনকে তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন? এমন আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে এমনভাবে গণপতি একবার এই কথাগুলি বলিল যে, শ্রোতাদের মনে তার প্রতি সত্য সত্যই একটু শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল, মনে হইল—আসিবার সময় লোকটার সম্বন্ধে যে ধারণা তাঁদের ছিল, লোকটা হয়তো সত্যই অতটা খারাপ নয়।

আগন্তুকদের মধ্যে এই পরিবর্তনটুকু টের পাইতে গণপতির বাকি রহিল না। জয়ের গর্বে ও আশার আনন্দে তার বুক ভরিয়া গেল। এবার তাহার বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, সে

পারিবে, তার ভাঙা মানসম্ভ্রমকে আবার সে নিটোল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তার নামে চারিদিকে যে ঢিঢি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে—ক্রমে ক্রমে একদিন সে শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া একেবারে মিলাইয়া যাইবে। তার সম্বন্ধে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব মরিয়া গিয়া মানুষের মনে আবার জাগিয়া উঠিবে প্রীতি ও শ্রদ্ধা—মানুষের মাঝখানে মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিতে আর তার কোনো অসুবিধা থাকিবে না।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছিল, বাহিরের সকলে চলিয়া গেল, গণপতি আর বেশি দেরি না করিয়া সামান্য কিছু খাইয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। নবজীবনের সূচনা করিতে বাহিরের কয়েকটি লোকের কাছে খানিক আগে সে যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তখনো তার মন হইতে তার মাদকতাভরা মোহ কাটিয়া যায় নাই এবং খানিক পরে সেই জন্যই রমার সঙ্গে তার বাধিল বিবাদ।

বিবাদ? এমন প্রত্যাবর্তনের পর রমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার রাত্রে—বিবাদ? হয়তো ঠিক তা নয়; কিন্তু রমা ঘরে আসিবার ঘণ্টাখানেক পরে দুজনের মধ্যে যেসব কথার আদান-প্রদান হইল, সেগুলি বিবাদের মতোই একটা কিছু হইবে।

আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সাহস দুজনের কাহারো ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া রমা তাই যেমন ধীরপদে তার কাছে আসিল, সেও তেমনি ধীরভাবেই তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিল। রমার ওজন অর্ধেক হালকা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গণপতি সেটা ভালোরকম টের পাইল না। তার গায়ের জোরও যে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে!

'রমার দুচোখ দিয়া আস্তে আস্তে জলের ফোঁটা নামিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, তোমায় ফিরে পাব ভাবি নি।'

গণপতি তার মাথাটা কাঁধের পাশে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমিও ভাবি নি আবার এ ঘরে তোমার কাছে ফিরে আসতে পাব।'

শুধু রমার কাছে নয়, এ ঘরে রমার কাছে ফিরিয়া আসিবার সাধ! রমাকে দেখিবার ফাঁকে ফাঁকে এখনো গণপতি ঘরখানাকেও দেখিতেছিল। প্রায় কিছুই বদলায় নাই ঘরের। বাগানের দিকে দুটি জানালার কাছে, যেখানে যেভাবে খাট পাতা ছিল আজও সেইখানে তেমনিভাবে পাতা আছে। ও-কোণে দেওয়ালে বসানো আলোটার ঠিক নিচে রমার প্রসাধনের টেবিল,—ছমাস কি সে প্রসাধন করিয়াছিল? এখানে খাটে বসিয়া আজও আয়নাটাতে তাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে : রমা আগে মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'ওরা কে গো? আমাদের দেখছে না তো?' দেওয়ালে তাদের বিবাহের বেশে তোলা ফটো এবং এ বাড়ির ও রমার বাড়ির কয়েকজনের ফটো টাঙানো আছে। কেবল পুরোনো যে তিনটি দামি ক্যালেন্ডার ছিল তার একটির বদলে আসিয়াছে দুটি সাধারণ ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। তার অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে একটা বছর কাবার হইয়া গিয়া নতুন একটা বছর যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আরো একটা পরিবর্তন হইয়াছে ঘরের। ঘরের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া গিয়াছে। মেঝেটা সেরকম ঝকঝকে নয়, ফটো আর ছবিগুলোতে অল্প অল্প ধুলা আর ঝুল পড়িয়াছে, চারিদিকে আরো যেন আসিয়া জুটিয়াছে কত অদৃশ্য মলিনতা।

'কী দেখছ?'—রমা একসময় জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে।

গণপতি বলিল, 'ঘর দেখছি।'

রমা বলিল, 'ঘর দেখে আর কী হবে? এ ঘরে তো আমরা থাকব না।'

'থাকব না? কোন ঘরে যাব তবে?'

'আমরা চলে যাব।'

রমা বিছানায় নামিয়া একটু সরিয়া ভালো করিয়া বসিল! বিবাদ শুরু হইয়া গিয়াছে।

গণপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কোথায় চলে যাব রমা?...'

অনেক বিনিদ্র রাত্রি ব্যাপিয়া রমা এ প্রশ্নের জবাব ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'যেদিকে দুচোখ যায়—অনেক দূর অচেনা দেশে, কেউ যেখানে আমাদের চেনে না, নাম ধাম জানে না—সেখানে গিয়ে আমরা বাসা বাঁধব। আজ রাত্রেই সব বেঁধে-ছেঁদে রাখি, কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব, কেমন? আর একটা দিনও আমি এখানে থাকতে পারব না।'

গণপতি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?...'

রমা স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'বুঝতে পারছ না? সবাই আমাদের ঘেন্না করবে, আমরা এখানে থাকব কী করে?'

এমনিভাবে শুরু হইল তাহাদের কথা-কাটাকাটি। গণপতি বলিল যে, এমন পাগলের মতো কি কথা বলিতে আছে, বাড়ি-ঘর আত্মীয়স্বজন অর্থোপার্জন সব ফেলিয়া গেলেই কি চলে? কী-ই বা দরকার যাওয়ার? দু-চার দিন লোকে হয়তো একটু কেমন কেমন ব্যবহার করিতে পারে, তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। এত ভাবিতেছে কেন রমা? বিবাদ করার মতো করিয়া নয়, আদর করিয়া—খুব মিষ্টি ভাষাতেই গণপতি তাহাকে কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরের ঘরে, বাহিরের কয়েকটি লোকের মন হইতে অন্ধকার ভাব সে যে মোটে আধঘণ্টার চেষ্টাতে প্রায় দূর করিয়া দিয়াছিল, এ কথা গণপতি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। দেশ ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য বহুদূরদেশে—অজানা লোকের মাঝে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা রমার, তাই তার মনে হইতেছিল ছেলেমানুষি।

রমা শেষে হতাশ হইয়া বলিল, 'যাবে না?'

গণপতি তাহাকে বুকে টানিয়া আনিল, সস্নেহে তাহার পাংশু কপোলে চুম্বন করিয়া বলিল, 'যাব না বলেছি, পাগলী? চলো না দু-জনে দু-চার মাসের জন্য কোথা থেকে বেড়িয়ে আসি।'

রমা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'দু-চার মাসের জন্য আমি কোথাও যাব না। চিরদিনের জন্য।'

'আচ্ছা, কাল এসব কথা হবে রমা।'

'না, আজকে বলো যাবে কি না, এখুনি বলো। কাল ভোরে উঠে আমরা চলে যাব।

গণপতি এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো? এমন করে কেউ কখনো যায়?'

রমা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তবে থাকো।'

গণপতি আরো খানিকক্ষণ তাহাকে আদর করিল, আরো খানিকক্ষণ বুঝাইল। কিন্তু দুর্বল শরীরটা তাহার শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাই আধঘণ্টাখানেক পরে ছেলেমানুষ বৌকে আদর করা ও বোঝানো দুটাই যথেষ্ট হইয়াছে, মনে করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকিলের বাড়িতে একটা বিরাট হইচই শোনা গেল। বাড়ির মেজ-বৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।

স্বামী–স্ত্রী

রাত দশটায় মেনকা ঘরে এল। এ বাড়িতে সকাল সকাল খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা চুকে যায়।

ছোট ঘর, চওড়ার চেয়ে লম্বায় দুহাতের বেশি হবে না। মেনকার বিয়েতে মেনকার স্বামী গোপালকে দেওয়া খাটখানাই ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে। খাটের সঙ্গে কোনাচেভাবে পাশ কাটানোর কৌশলে পাতা আছে গোপালের ক্যাম্পচেয়ার, চারদিকেই চেয়ারটির পাশ কাটিয়ে চলাফেরা সম্ভব। সামনে ছোট একটি টুলে পা উঠিয়ে এই চেয়ারে চিৎ হয়ে গোপাল আরাম করে বিড়ি মেশাল দিয়ে সিগারেট খায় আর বই পড়ে। পপুলার বই—উঁচুদরের বই যাঁরা লেখেন তাঁদের পর্যন্ত—যে –বই পড়ে সময় কাটিয়ে মনকে বিশ্রাম দিতে হয়। ঘরের এককোণে ট্রাংক ও সুটকেস—স্টিল, চামড়া আর টিনের। ট্রাংকটি মেনকার বিয়ের সময় পাওয়া। রং এখনো উজ্জ্বল, তবে কিসে ঘা লেগে যেন একটা কোণ থেবড়ে গেছে। দেয়ালে কয়েকটি বাজে ছবি আর মেনকা ও গোপালের বড় একটি ফটো টাঙানো। শাড়ি, শাড়ি পরার ঢং, গয়নার আধিক্য আর চুল বাঁধার কায়দা ছাড়া ফটোর মেনকার সঙ্গে যে মেনকা ঘরে এল তার বিশেষ কোনো তফাত চোখে পড়ে না। গায়ে একটু পুরন্ত হয়েছে মনে হয়, আবার সন্দেহও জাগে। ফটোর গোপালের চেয়ে ক্যাম্পচেয়ারের গোপাল কিন্তু অনেক রোগা। এতে ফটোর ফাঁকি নেই, বিয়ের পর সত্যই গোপাল রোগা হয়ে গেছে। বিয়ে করার জন্য অথবা চাকরি করার জন্য বলা কঠিন, চাকরি আর বিয়ে তার হয়েছে প্রায় একসঙ্গে।

ঘরে এসে দরজায় খিল তুলে দিয়ে মেনকা শেমিজ ছাড়ল। খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসে জোরে জোরে পাখা চালিয়ে বলল, 'বাবা, বাঁচলাম।'

গোপাল বই নামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সায় দেওয়া হাসি একটু হাসল। তারপর আবার বই তুলে নিল।

'উহ মাগো, সেদ্ধ হয়ে গেছি একেবারে।'

এবার গোপাল বই নামাল না, পড়তে পড়তেই বলল, 'বিশ্রী গরম পড়েছে।'

'টেবল ফ্যানটা তুমি আর কিনলে না।'

'তুমি শাড়িটা না কিনলে—'

'ন্যাংটো হয়ে তো থাকতে পারি না।'

পাখার হাওয়া গায়ে লাগাতে তাই সে এ রকম হয়ে আছে। ঘর যেন নির্জন, একজোড়া চোখও যেন ঘরে নেই। তিন মাস বাপের বাড়িতে কাটিয়ে সাত দিন আগে এখানে এসেছে। প্রথম দিন এভাবে হাওয়া খেতে পারে নি। ছি, লজ্জা করে না মানুষের! একদেহ, একমন, একপ্রাণ যারা, তিন মাসের ছাড়াছাড়ি তাদের এমনি করে দেয়, দেখা হওয়ামাত্র চট্ করে এক হয়ে যেতে পারে না। তিন মাস তারা পরস্পরকে কল্পনা করেছে, কামনা করেছে, ব্যথা আর ব্যর্থতার নিশ্বাস ফেলেছে, মুক্তির আস্বাদ আর স্বাধীনতার গৌরবে আনন্দ অনুভব

করেছে শান্তির মতো, রাত জেগেছে, আবেগের চাপে সময় সময় দম যেন আটকে এসেছে কয়েক মুহূর্তের জন্য। কত অভিনব পরিবর্তন ঘটেছে দুজনের মনেই দুজনের। দেখা হবার পর আবার একদেহ, একমন, একপ্রাণ হতে খিল দেওয়া ঘরে একটা রাতের, অন্তত আধখান বা সিকিখানা রাতের, সময় লাগবে বৈকি। যন্ত্রের পার্টস খুলে আবার ফিট করতে পর্যন্ত সময় লাগে—বিধাতা মিস্ত্রি হলেও লাগে।

শরীরের ঘাম শুকিয়ে গেলে মেনকা পুবের দুটি পরদা লাগানো জানালার একটিতে গিয়ে দাঁড়াল। পাশের একতলা বাড়ির ছাতে গরম জোছনার ছড়াছড়ি। তার পরের তেতালা বাড়ির সাতটা জানালা দিয়ে ঘরের আলো বাইরে আসছে। আজকাল কখন সবগুলি জানালার আলো নেভে কে জানে! বিয়ের পর কিছুদিন এ খবরটা সে জানত। চারটে জানালা অন্ধকার হত প্রায় এগারটায়, দুটি হত বারটার কাছাকাছি, আর তেতালার কোণের জানালাটি নিভত রাত দেড়টা-দুটোর সময়। ওই ঘরটিতে কে বা কারা থাকে তাই নিয়ে সে কত কল্পনাই করেছে। অন্য সম্ভবপর কল্পনাগুলি তার মনে আমল পেত না, পরীক্ষার পড়া করতে ও-ঘরে কাউকে রাত জাগতে দিতে সে রাজি ছিল না, তার কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল তেতালার ওই কোণের ঘরটিতে তাদের মতো এক দম্পতি থাকে, বিয়ে যাদের হয়েছে অল্পদিন। তাদের মতো ভালবাসতে বাসতে কখন রাত দুটো বেজে যায় ওদেরও খেয়াল থাকে না। তারা অবশ্য আলো নিভিয়ে দেয় অনেক আগেই। বাড়ির ভেতরের দিকে তাদের জানালাটি শুধু ঘন শার্সির, ঘরের মধ্যে নজর চলে না কিন্তু আলো জ্বলছে কি না জানা যায়। ওদের তেতলার কোণের ঘরটিতে হয়তো আলো জ্বালিয়ে রাখার অসুবিধা নেই।

বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার দিন তারা প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিল। কিন্তু সেদিন ও-বাড়ির জানালার দিকে তাকাতে খেয়ালও হয় নি। মেনকা আপন মনে আফসোসের অস্ফুট আওয়াজ করল। সে রাত্রে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এক রাত্রে সব একঘেয়ে হয়ে গেল, বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে একটানা ছমাস একসঙ্গে কাটিয়ে যেমন হয়েছিল।

ঘুম আসছিল। আফসোসটাই যেন ঘুম কাটানোর বেশি কী করে দিয়ে গেল মেনকার। স্তিমিত চোখের একটু চমক আর পিঠের ঠিক মাঝখানে মৃদু শিরশির। গোপাল মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। পড়ায় বাধা দিলে সে বড় বিরক্ত হয়। কিছু বলে না, কিন্তু বিরক্ত হয়।

বিছানায় ফিরে গিয়ে মেনকা ইতস্তত করে, যতক্ষণ না তার মনে পড়ে যায় যে বেশি রাত জেগে বই পড়লে গোপালের মাথা গরম হয়ে যায়। ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বড় জ্বালাতন করে গোপাল। মনে হয়, শান্ত সুবোধ মানুষটা যেন বদলে গেছে, মদ খেয়েছে। এমন বিশ্রী লাগে মেনকার, এমন রাগ হয়! সে কি পালিয়ে যাবে? পরদিন সে কি ঘরে আসবে না? দিনের পর দিন? ঘুম ভাঙিয়ে একটা মানুষকে কষ্ট দেওয়া কেন—যার শরীরও ভালো নয়! অথচ সে যদি কোনোদিন দরকারি কথা বলতে মাঝরাতে গোপালের ঘুম ভাঙায়—যেদিন কোনো অজানা কারণে তার নিজের ঘুম আসে না অথবা হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনটা অদ্ভুত রকম খারাপ লাগে আর সমস্ত শরীরটা অস্থির অস্থির করায় ছটফট করতে ইচ্ছা হয়—গোপাল শুধু বলে, কাল শুনব, সকালে শুনব!

তবু যদি সে নিজেকে তার বুকে গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে করতে করুণ সুরে বলে, 'ওগো শুনছ? বুকটা কেমন জ্বালা করছে।'

'একটু সোডা খাও', বলে সে পাশ ফিরে বালিশটা আঁকড়ে ঘুমোতে থাকে। তখন মেনকার বুকটা সত্যি জ্বালা করে। নমাসে ছমাসে একটা রাতে হয়তো এ রকম ঘুম আসে

না অথবা এভাবে ঘুম ভেঙে যায়—হলই বা তা অম্বলের জন্য; কথা কইবার একটা সে লোক পাবে না, পাওনা আদরের একটু তার জুটবে না এই ভয়ানক দরকারের সময়! ইতস্তত করার কয়েক মিনিটে আবার ঘুমটা ফিরে এসেছিল, হাই তুলে মেনকা বলল, 'শোবে না? এত যে পড়ছ, চোখ তো আবার কটকট করবে কাল?'

গোপাল বলল, 'চ্যাপ্টারটা শেষ করেই শোব, পাঁচ মিনিট।'

মেনকা শুয়ে চোখ বুজল। ঘুমে শরীর অবশ হয়ে আসবার আরাম অনুভবের ক্ষমতাটুকু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, বই ফেলে টুল ঠেলে চেয়ার সরিয়ে গোপালের উঠবার শব্দে একটু সচেতন হয়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে একবার গোপালের মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চোখ বুজল। গোপালের মাথা গরম হয় নি, ঘুম পেয়েছে। একনজর তাকালেই মেনকা ওসব বুঝতে পারে। গোপালের চোখমুখের সব চিহ্ন আর সঙ্কেত তার মনের মুখস্থ হয়ে গেছে।

আলো নিভিয়ে মেনকার পা মাড়িয়ে গোপাল নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

মেনকা জড়ানো গলায় শুধোল, 'কাল ছুটি না?'

গোপাল জবাব দিল, 'হুঁ।'

দুজনে মিনিট দশেক ঘুমিয়েছে, এমন সময় ট্যাক্সি করে বাড়িতে এল অতিথি। একেবারে পর নয়, সস্ত্রীক গোপালের ভায়রাভাইয়ের ভাই রসিক। গত অগ্রহায়ণে রসিক বিয়ে করেছে। বৌকে বাপের বাড়ি রেখে আসবার জন্য আজ বারটার গাড়িতে তারা রওনা হয়েছিল, সাড়ে ছটায় কলকাতা পৌঁছে আবার রাত নটার গাড়ি ধরবে। অ্যাকসিডেন্টের জন্য লাইন বন্ধ থাকায় তাদের গাড়ি কলকাতা এসেছে দশটার সময়। এত রাত্রে কোথায় যায়, তাই এখানে চলে এসেছে। নইলে এতরাত্রে কোনো খবর না দিয়ে—

'মনে করে যে এসেছ, এই আমাদের ভাগ্যি!'

স্টোভ ধরিয়ে মেনকা লুচি ভাজতে বসল, গোপালের ভাই সাইকেল নিয়ে বার হল খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে। অন্তত চার রকমের ছানার খাবার আর রাবড়ি আনবে, মোড়ের পাঞ্জাবি হোটেল থেকে আনবে মাংস। ঘরে ডিম আছে, মেনকা মামলেট বানাবে। বাড়িতে কুটুম এসেছে, নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় একটু সমারোহ করা গেল না, ছি ছি।

তবে কাল বিকেলে ওদের গাড়ি, দুপুরে ভালোরকম আয়োজন করা যাবে। মাসের শেষে টাকা ফুরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কুটুম বাড়িতে এলে টাকার কথা ভাবলে চলবে কেন!

পিসিমাকে মেনকা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'একখানা ভালো কাপড় তো বৌকে দিতে হবে, না পিসিমা?'

'দেওয়া তো উচিত।'

বাড়িতে হঠাৎ অতিথি আসার উত্তেজনা ছাপিয়ে গোপালের জন্য এবার মেনকার মমতা জাগে। আবার এ মাসে বেচারিকে টাকা ধার করতে হবে। একটা মানুষ, খেটে খেটে মরে গেল, ভাই বোন মাসি পিসি সবাই লুটেপুটে তার রোজগার খাচ্ছে। তার ওপর আবার কুটুমের এসে অতিথি হওয়া চাই। একটা টেবলফ্যান কেনার সাধ পর্যন্ত বেচারার মেটে না। সেই বা কেমন মানুষ, ঘেমেচেমে অফিস থেকে ফিরলে দশ মিনিট একটু হাওয়া পর্যন্ত করে না তাকে! আজ রাত্রে পাখার বাতাস দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে তবে সে ঘুমোবে। এক হাতে হাওয়া করবে, অন্য হাতে মাথার চুলে—

রসিক খেতে বসল ঘেরা বারান্দায়, রসিকের বৌকে বসানো হল ঘরে। রসিকের কাছে

বসলেন পিসিমা, তার বৌয়ের ডাইনে বাঁয়ে গা ঘেঁসে বসল মেনকার দুই ননদ। পরিবেশন করতে করতে মেনকা লক্ষ করল, এদিকে ওদিকে নড়েচড়ে বেড়াতে বেড়াতে গোপাল রসিকের বৌকে দেখছে, আগ্রহের সঙ্গে দেখছে। প্রথমে রসিকের বৌকে দেখে গোপাল যেন একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। আলাপ করতে গিয়ে লজ্জায় তাকে কাবু হয়ে পড়তে দেখে যেন একটু আহত হয়েছিল। সহজ একটা ঠাট্টায় তাকে ফিক করে হাসিয়ে কথা বলাতে পারায় খুশির যেন তার সীমা ছিল না। লুচি ভাজতে ভাজতে এসব মেনকা লক্ষ করেছে। এখন দুজনের খাওয়া তদারকের ছুতোয় ক্রমাগত বারান্দা থেকে ঘরে গিয়ে চোখ বুলোচ্ছে রসিকের বৌয়ের সর্বাঙ্গে। অন্য কারো চোখে পড়বার মতো কিছু নয়। অন্য কারো সাধ্য নেই গোপালের চলাফেরা আর হাসিমুখে মানানসই কথা বলার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আবিষ্কার করে। মেনকার মতো চোখ তো ওদের কারো নেই। কিন্তু গোপাল এ রকম করছে কেন? রসিকের বৌ সুন্দরী বলে? মেয়েটার রূপ আছে, একটু কড়া ধাঁচের রূপ। যে রূপ কাপড় জামায় বিশেষ চাপা পড়ে না, বরং আরো উগ্র, আরো অশ্লীল হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তার লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির মানুষ সশঙ্ক অবস্থায় দিন কাটায়। আর রূপের অহঙ্কারে রূপসীটির মাটিতে পা পড়ে না।

গোপাল শান্ত, ভদ্র, মিষ্টি রূপ ভালবাসে—মেনকার মতো রূপ। রসিকের বৌকে দেখে তার তো বিচলিত হবার কথা নয়।

ঘরে গিয়ে একটু খোঁচা দিতে হবে। বুঝতে হবে ব্যাপারখানা কী।

অতিথিদের খাওয়া শেষ হতেই তাদের শোয়ার সমস্যা নিয়ে পিসিমা, মেনকা আর গোপালের পরামর্শ হল।

পিসি বললেন, 'ভূপাল আর কানাই এক বিছানায় শোবে। ওর বৌকে অনুবিনুদের ঘরে দেওয়া যাক। একটা রাত তো।'

গোপাল বলল, 'না না, তাই কি হয়! নতুন বিয়ে হয়েছে, ওদের একটা ঘর দেয়া উচিত। ওরা আমার ঘরে থাকবে।'

পিসিমা ঢোক গিলে বললেন, 'তবে তাই কর।'

তারপর রাত একটায় বাড়ির সব আলো নিভল। গোপাল শুল ভূপালের ছোট চৌকির ছোট বিছানায়, মেনকা শুল অনুবিনু দুই ননদের মাঝখানে। রাত্রিবেলা একান্ত দুর্লভ বৌদিকে ঘটনাচক্রে কাছে পেয়ে অনুবিনুর আহ্লাদের সীমা নেই। না ঘুমিয়ে সারারাত গল্প করবে ঘোষণা করে মিনিট দশেক ফোয়ারার মতো এবং তারপর আরো দশ মিনিট ঝিমিয়ে কথা বলে আধ ঘণ্টার মধ্যে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। মেনকা রইল জেগে। গোপালকে তার কত কথা বলার ছিল, কিছুই বলা হল না। আজকের রাতটা কাটবে, এই দীর্ঘ অফুরন্ত রাত, তারপর সারাটা দিন যাবে, কিছুতে কাটতে চায় না এমন একটা দিন, রাত দশটায় সে গোপালের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাবে। ততক্ষণে বাসি হয়ে যাবে সব কথা। বলার কোনো মানে থাকবে না। তাছাড়া, পিসিমা কাল ওদের এখানে থেকে যেতে বলেছেন। কাল দিনটা বড় খারাপ, যাত্রা শুভ নয়। রসিকেরা হয়তো কালও এখানে থেকে যাবে, রাত্রে দখল করবে তার ঘর। তাহলে সেই পরশু রাত্রের আগে গোপালকে সে আর কাছে পাচ্ছে না। কী হতচ্ছাড়া একটা বাড়িই গোপাল নিয়েছে, একটা বাড়তি ঘর নেই। বাড়তি ঘর থাকবেই বা কী করে? ভাই বোন মাসি পিসিতে বাড়ি গিজগিজ করছে। গোপালের দোষ নেই, এই বাড়ির জন্যই মাসে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া গুনছে। সকলের সুখের জন্য খেটে খেটে সারা হয়ে গেল মানুষটা। একটু রোগাও যেন হয়ে গেছে আজকাল।

নিশ্চয় রোগা হয়ে গেছে। পরশু যখন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, কই, আগের মতো জোরে তো ধরে নি! কাছে থাকলে আজকেই পরখ করা যেত কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাল সকালে চেয়ে দেখতে হবে গোপালের চেহারা কেমন আছে। কাল থেকে একটু বেশি মাছ দুধ খাওয়াতে হবে তাকে।

এখন গিয়ে যদি একবার দেখে আসে? ভূপাল আর কানাই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আলো জ্বালালে যদি ওদের ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে গায়ে হাত বুলোতে গেলে গোপাল যদি জেগে যায়।

আজ রাত্রে কিছু হয় না। আজ সে ফাঁদে পড়ে গেছে। হার্টফেল করে এখন সে যদি মরেও যায়, গোপালের একটু আদর পাবে না। কোনো উপায় নেই, কোনো ব্যবস্থা করা যায় না। একটা বাড়তি ঘর যদি বাড়িতে থাকত। রাত্রির স্তব্ধতা মেনকার কানে ঝমঝম শব্দ তুলে দেয়। ছুতো আর কৈফিয়তের আশ্রয় ছেড়ে, যুক্তি আর সঙ্গতির স্তর অতিক্রম করে, চিন্তা তার সোজাসুজি স্পষ্টভাবে গোপালকে চেয়ে বসে। পুরোনো অভ্যস্ত মিলনের পুনরাবৃত্তি। তারপর মেনকা মরে যেতে রাজি আছে।

'শুনছ?'

একসঙ্গে শীত আর গ্রীষ্ম অনুভব করে মেনকা শিউরে উঠল।

জানালার শিকে মুখ ঠেকিয়ে গোপাল গলা আরেকটু চড়িয়ে বলল, 'ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটা অ্যাসপিরিন দিয়ে যাও।'

মেনকা সাড়া দেবার আগেই ঘরের এক প্রান্ত থেকে পিসিমা বললেন, 'কে রে, গোপাল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

'না গরমে মাথা ধরেছে। অ্যাসপিরিন খাব। তুমি উঠো না। উঠো না কিন্তু পিসিমা। তোমার উঠে কাজ নেই।'

মেনকা দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

'অ্যাসপিরিন যে ঘরে রয়েছে?'

'তবে অ্যাসপিরিন থাক। ছাতে গিয়ে একটু শুই। ভূপালদের ঘরটা বড় গরম।'

'খোলা ছাতে শোবে! অসুখ করে যদি?'

'কিছু হবে না। একটা পাটি বিছিয়ে দাও।'

ঘর থেকে মেনকা পাটি আর বালিশ নিয়ে এল—একটি বালিশ। বারান্দা পার হয়ে ছাতের সিঁড়ির দিকে যাবার সময় তাদের ঘরের সামনের শার্সির জানালার কাছে তাকে দাঁড় করিয়ে গোপাল চুপিচুপি বলল, 'দেখেছ? এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে!'

শার্সি অন্ধকার। রসিকের নাক ডাকার শব্দ বাইরে শোনা যাচ্ছে। মেনকা বলল, 'ঘুমোবে না? রাত কি কম হয়েছে!'

ছাতে পাটি বিছিয়ে মেনকা বালিশ ঠিক করে দিল। গোপাল শুধাল, 'তোমার বালিশ আনলে না?'

'আমিও শোব নাকি এখানে?'

গোপাল হাত ধরতেই সে পাটিতে বসে পড়ল।—'সবাই কী ভাববে!'

গোপাল জড়িয়ে ধরতে কিছুক্ষণ তার শ্বাস বন্ধ হয়ে রইল।—'আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। একটা বালিশেই হবেখন।'

তেতালা বাড়ির কোণের সেই ঘরের জানালাটা আলিসার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। এখনো সে ঘরে আলো জ্বলছে।

কালোবাজারের প্রেমের দর

ধনঞ্জয় ও লীলার মধ্যে গভীর ভালবাসা।

কোনো নাটকীয় রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে তাদের ভালবাসা জন্মে নি, প্রেমে পড়ার বয়স হবার পর ঘটনাচক্রে হঠাৎ দেখা এবং পরিচয় হয়েও নয়। অল্প বয়স থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও স্নেহ-মমতার সম্পর্ক বড় হয়ে ক্রমে ক্রমে যে ভালবাসায় পরিণত হয়, তাদের প্রেমটা সেই জাতের।

লীলা যখন স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢুকেছে এবং ধনঞ্জয় ব্যবসায়ে নেমেছে তখনো তারা ভালবাসা টের পায় নি। মাঝখানে ধনঞ্জয় ব্যবসা উপলক্ষে বছর তিনেক বাইরে ছিল—সেই সময় দুজনের মনেই খটকা লাগে যে ব্যাপারটা তবে কি এই? ধনঞ্জয় ফিরে আসা মাত্র সব জল্পনা কল্পনার অবসান হয়ে যায়—প্রথম দর্শনের দিনেই।

তা, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে এত আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বিশেষত এ রকম পাকাপোক্ত বনিয়াদের ওপর অনেককাল ধরে যে ভালবাসা গড়ে ওঠা সেটা বিরাট দালানের মতোই—গাঁথুনি শেষ হবার আগে কে সেটাকে ইমারত বলে মনে করে?

তারপর বছরখানেক ধরে তাদের ভালবাসা জমাট বেঁধেছে। এখন বিয়ের মধ্যে যথারীতি সমাপ্তি ঘটলেই হয়।

একটু বাধা আছে, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। ব্যবসা ধনঞ্জয় মন্দ করছে না। কিন্তু এখনো ততটা ভালো করতে পারে নি লীলার বাবা পশুপতির যেটুকু দাবি। এমন একটা কিছু এখনো ধনঞ্জয় করতে পারে নি যাতে ব্যবসায়ী জাতের বড় বা মাঝারি রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে তুলনায় যতই ছোট হোক অন্তত বড় ব্যবসায়ীর জাতে উঠতে পেরেছে বলে তাকে গণ্য করা যায়।

কথাটা স্পষ্ট করার জন্য ধনঞ্জয় বলেছে, 'যেমন ধরুন লাখ টাকা? কিন্তু সেটা কীভাবে দেখতে চান? কারবারে খাটছে অথবা ব্যাংকে জমা হয়েছে?'

পশুপতি বলেছে, 'না না, এমন কথা আমি বলছি না যে আগে তোমাকে লাখপতি হতে হবে? লাখ টাকার কারবারি কি দেউলে হয় না? সে হল আলাদা কথা। ব্যবসার আসল ঘাঁটিতে তুমি মাথা গলিয়েছ—এটুকু হলেই যথেষ্ট। তারপর তোমার লাক আর আমার মেয়ের লাক। তুমি এখনো যাকে বলে ব্যবসায়ে এপ্রেন্টিস।'

লীলার ইচ্ছা হলে অবশ্য এ বাধাটুকু কোথায় ভেসে যেত। কিন্তু লীলাও এ বিষয়ে বাপের মতের সমর্থক।

সে বলে, 'যাই বল তাই বল; এদিকে ঢিল দিলে চলবে না। তোমার চাড় নষ্ট হয়ে যাবে—আমাকে নিয়ে মেতে থাকবে দিনরাত। তোমার ফিউচার নষ্ট করতে রাজি হব অত সস্তা পাও নি আমাকে।'

ধনঞ্জয়ের ভবিষ্যৎ অবশ্য লীলারও ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভালবাসার মানেও তো তাই। কাজেই, এটা লীলার স্বার্থপরতা মনে করা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। ধনঞ্জয় তা মনেও করে না।

খুব বেশি দুর্ভাবনার কারণও তার নেই। অপূর্ব যে কালোবাজার সৃষ্টি হয়েছে, অপূর্ব যে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে ব্যবসা করে মুনাফা লুটবার, তাতে একবার একটা লাগসই সুযোগ পাকড়াতে পারলে আর দেখতে হবে না, রাতারাতি ব্যবসাজগতে নিজেকে এমন স্তরে তুলে নিতে পারবে যে লীলা বা তার বাবার কিছু বলার থাকবে না।

লীলা মাঝে মাঝে বলে, 'কী করছ তুমি? অ্যাদ্দিনেও কিছু করতে পারলে না, টুকটাক চালিয়ে যাচ্ছ! এদিকে কত বাজে লোক উতরে গেল। লোকেশবাবুর হতভাগা ছেলেটা পর্যন্ত একটা পারমিট বাগিয়ে কী রেটে কামাচ্ছে!'

ধনঞ্জয় বলে, 'তোমরা শুধু ব্ল্যাকমার্কেটটা দেখছ আর এটা বাগিয়ে ওটা বাগিয়ে কত সহজে কে বড়লোক হচ্ছে সেটা দেখছ। ওই বাগানোর জন্য যে কী ভয়ানক কম্পিটিশন, কত কাঠখড় পোড়াতে হয়—সেটা তো দেখছ না।'

লীলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে হেসে বলে, 'তুমি পারবে। বাবা বলেন, মালটা তুমি খাঁটি।'

ধনঞ্জয় হেসে বলে, 'আর তুমি কী বল? ভেজাল?'

'ভেজাল! আমার কাছে ভেজাল চলে? খাঁটি না হলে তোমায় আমি হাত ধরতে দিলাম?'

ইতোমধ্যে ধনঞ্জয়ের আশা-লোলুপতার বৃন্তে ফুল ধরবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। একদিকে যেমন বেড়ে যায় তার কর্মব্যস্ততা আর কমে যায় লীলার সঙ্গে দেখা করা গল্প করার সময়, অন্যদিকে তেমনি তার কথাবার্তা চালচলনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নতুন ধরনের একটা উৎসাহ ও উত্তেজনা।

'কী হয়েছে তোমার?'

লীলার প্রশ্নের জবাবে ধনঞ্জয় তাকে শুধু একটু আদর করে।

'ব্যাপারটা কী?'

'বলব পরে।'

লীলা হেসে বলে, 'বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।'

'বুঝেছ?'

'বুঝব না? বিয়ের তারিখ ঘনিয়ে না এলে পুরুষমানুষের এ রকম ফুর্তি হয়!'

কয়েকদিন পরে তারা দুজনে এক ভাটিয়া কোটিপতির বাড়িতে এক উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরেছে। ধনঞ্জয় বলে, 'একটা মোটা কন্ট্রাক্ট বোধ হয় পাব।'

লীলা গিয়েছিল পশুপতির সঙ্গে, ধনঞ্জয় গিয়েছিল একা। প্রীতি অনুষ্ঠানে ধনঞ্জয় অযাচিত উপেক্ষিত হয়ে ছিল আগাগোড়া—যেটুকু খাতির পেয়েছিল সবটুকুই লীলার জন্য। কিন্তু আজ ধনঞ্জয়ের কোনো ক্ষোভ আছে মনে হয় না।

লীলা খুশি হয়ে বলে, 'খুলে বলো।'

ধনঞ্জয় খুলেই বলে। হাজার আশি টাকার ব্যাপার। পরে কৌশলে আরো কিছু বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

মি. নিরঞ্জন দাস দেবার মালিক, তাকে অনেক চেষ্টায় বাগানো গেছে।

'বাবা কম হাঙ্গামা করতে হয়েছে আমাকে! লোকটা নিজে এতটুকু রিস্ক নেবে না, সব নিয়মদুরস্ত হওয়া চাই! কোনো দিকে ফাঁক থাকলে চলবে না। অথচ এদিকে চাহিদাটি ঠিক আছে। দশ বছরের পুরোনো ফার্ম ছাড়া কন্ট্রাক্ট দেওয়া চলবে না। এ রকম একটা ফার্ম

কোথায় লালবাতি জ্বালতে বসেছে খুঁজে খুঁজে গা বাঁচিয়ে কিনে নেওয়া কি সোজা কাজ!'

'কিনেছ?'

'হ্যাঁ। তবে মোটা রকম ঢালতে হয়েছে। তিনটে দিন মোটে সময়, করি কী। গরজ বুঝে গেল। যাকগে, সব তুলে নেব। হাজার গুণ তুলে নেব।'

লীলা একটু ভেবে বলে, 'সব একেবারে ঠিকঠাক তো?'

ধনঞ্জয় বলে, 'তা একরকম ঠিকঠাক বৈকি!'

'একরকম!'

লীলা ধনঞ্জয়ের একটা কান আদর করে মলে দেয়, 'বাবা যে বলেন তুমি এপ্রেন্টিস, সেটা মিছে নয়। এত টাকা ঢেলে এতদূর এগিয়ে এখনো বলছ একরকম ঠিক! মোটা নিরঞ্জনকে বাঁধ নি বুঝি যাতে কোনোরকম গোলমাল করতে না পারে? কী বুদ্ধি। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি এই বাজারে ব্যবসা করবে!'

ধনঞ্জয় রীতিমতো ভড়কে যেতে লীলা সাহস দিয়ে বলে, 'মোটা নিরঞ্জন তো? গোলমাল করবে না মনে হয়। আমি বরং একটু চাপ দেব। লোকটা খুব শিভালরাস।'

'চাপ দেবে মানে?'

লীলা সশব্দে হেসে ওঠে, 'অমনি ঈর্ষা জাগল? এই মোটা নিরঞ্জনকেও তুমি ঈর্ষা করতে পার আমার বিষয়ে! ধন্য তুমি! মেয়েরা কী করে গা বাঁচিয়ে চাপ দেয় জান না?'

গা বাঁচিয়ে চাপ দিতে গেলেও কাছে যেতে হয়, মিশতে হয়, হাসি আর মিষ্টি কথায় মন ভুলাতে হয়। তার ফলেই সৃষ্টি হল সমস্যা।

প্রেমের সমস্যা।

এতদিন পর্যন্ত তাদের ধারণা ছিল যে জগতে অন্য সমস্ত কিছুর দরদাম আছে, একটা ফুটো পয়সায় হোক বা লক্ষ টাকায় হোক সবকিছুর দাম ঠিক করা যায়—প্রেম অমূল্য। কারণ প্রেম তো কোনো বস্তু নয়—মাল নয় যে দাম দিয়ে কেনা যাবে।

নিরঞ্জন স্বয়ং ক্রেতা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

নিরঞ্জন লীলাকে বিয়ে করতে চায়। কোনোরকম সস্তা বা কুৎসিত মতলব তার নেই, সে শুদ্ধ পবিত্র শাস্ত্রীয় অথবা ততোধিক শুদ্ধ আইনসঙ্গতভাবে লীলাকে গরীয়সী মহীয়সী স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। এর মধ্যে কালোবাজারি কোনো চাল নেই।

সে নিজে কিছু বলে নি। খ্যাতনামা একজনকে ঘটক হিসেবে পাঠিয়েছে পশুপতির কাছে। লীলার কাছে প্রেম নিবেদন করাও সে দরকার মনে করে নি। কারণ সে ভালো করেই জানে যে সোজাসুজি লীলার কাছে কথা পাড়লে লীলা সোজাসুজি জবাব দেবে—'না'।

ধনঞ্জয় গিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার প্রত্যাশায়, নিরঞ্জন তাকে একটু অকারণ লজ্জা মেশানো হাসি দিয়ে খাপছাড়া অভ্যর্থনা জানিয়ে সরলভাবে বলে, 'শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে, কিন্তু বিয়েটিয়ে করে সংসারী হচ্ছি ভাই! তুমি চেন, পশুপতিবাবুর মেয়ে। সামনের মাসেই একটা শুভদিন দেখে যাতে হয় তার প্রস্তাব পাঠিয়েছি।' নিরঞ্জন তাকে একটা সিগারেট দেয়। হাসিমুখেই আবার বলে, 'পশুপতিবাবু অনেকদিন ঘোরাফেরা করছেন—এ পর্যন্ত কিছু করা হয় নি। এবার কিছু করে দিতে হবে। তোমাকে কথা দিয়ে ফেলেছি—অন্য কেউ হলে এই কন্ট্রাক্টই পশুপতিবাবুকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু তোমার কথা আলাদা—তোমাকে তো আর না বলতে পারি না এখন!'

কথাটা সহজেই বুঝতে পারে ধনঞ্জয়। অতি সরল স্পষ্ট মানে নিরঞ্জনের কথার। লীলাকে তার চাই, ধনঞ্জয় যদি ব্যাঘাত ঘটায় তবে বর্তমানের আশি হাজার এবং অদূর

ভবিষ্যতে যা লক্ষাধিক টাকার কন্ট্রাক্ট দাঁড়াবে সেটা ফসকে যাবে ধনঞ্জয়ের হাত থেকে। শুধু তাই নয়, পশুপতিরও ভবিষ্যতে কোনোদিন কিছু বাগাবার আশা ভরসা থাকবে না নিরঞ্জনের মারফতে।

তারপরে কাজের কথায় আসে নিরঞ্জন। বলে, 'খুব সাবধানে হিসেব করে সব করবে! কোনো দিকে যেন কোনো ফাঁক না থাকে। এদিককার সব আমি সামলে নেব।'

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই ঠেকে ব্যাপারটা তাদের কাছে। পরস্পরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে পর্যন্ত দুজনেই তারা ভয় পায়। নিজের নিজের ঘরে একা বসে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে যে কিসে কী হল এবং এখন কী করার আছে!

নিরঞ্জনের প্রস্তাব নিয়ে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি ঘটকালি করতে গিয়েছিল তাকে পশুপতি জানায় যে মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দু-তিন দিনের মধ্যেই নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করবে।

নিরঞ্জনের আপিস থেকে ধনঞ্জয় সোজা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। পশুপতি ধনঞ্জয়কে টেলিফোনে ডেকে পাঠায়।

ধনঞ্জয় বলে, 'আমি সব শুনেছি। কাল সকালে আপনার ওখানে যাব।'

'লীলাকে ডেকে দেব?'

'থাক।'

ধনঞ্জয় ও লীলা দুজনেই সারারাত জেগে কাটায়—মাইলখানেক তফাতে শহরের দুটি বাড়ির দুখানা ঘরে, যে ব্যবধান তারা যে কেউ একজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কয়েক মিনিটে ঘুচিয়ে দিতে পারে!

সকালে ধনঞ্জয় আসে পশুপতির বাড়ি।

পশুপতি বলে, 'লীলার সঙ্গেই কথা বলো। তোমরা ছেলেমানুষ নও, তোমরা যা ঠিক করবে আমি তাই মেনে নেব।'

লীলার চোখ লাল। বোঝা যায় রাত্রে বেশ খানিকটা কেঁদেছে। ধনঞ্জয়ের শুকনো বিবর্ণ মুখ একনজর দেখেই আবার সে কেঁদে ফেলে। চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'বোসো।'

ধনঞ্জয় বসে, ধীরে ধীরে বলে, 'কিছু ঠিক করেছ?'

লীলা বলে, 'তুমি?'

তারপর দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

প্রথমে লীলার কাছেই অসহ্য হয়ে ওঠে এই নীরবতা। বলে, 'নিরঞ্জন ছাড়বে না, সব ভেঙে দেবে।' ধনঞ্জয় বলে, 'সে তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছে।'

'আবার কবে তুমি এ রকম চান্স পাবে। কে জানে! একেবারে পাবে কি না তারও কিছু ঠিক নেই।

ধনঞ্জয় নীরবে সায় দেয়।

লীলা বলে, 'তাছাড়া এদিক ওদিক টাকাও ঢালতে হয়েছে অনেক। সব নষ্ট হবে।'

ধনঞ্জয় বলে, 'তা হবে। এমনিতেও তোমাকে পাবার আশা একরকম ঘুচে যাবে।'

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'তুমি যা ভেবেছ, আমিও তাই ভাবছি। কাল আমরা বিয়ে করতে চাইলে এ জগতে কারো সাধ্য আছে ঠেকায়? কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ নই। বিয়ে নয় হল, তারপর? তোমার আমার দুজনেরই জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো লাভ নেই।'

ধনঞ্জয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'সত্যি লাভ নেই'।

বাগ্‌দি-পাড়া দিয়ে

ভরদুপুরে দুলে বাগ্‌দি নায়েবমশাই শ্রীমন্ত সরকারের ঘরের দাওয়ায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসে আছে। ছেলের মতো যত্নে পাশে তার পাকা বাঁশের লাঠিটি শোয়ানো। কত তেল আর কত স্নেহে পাকানো এই লাঠি, রক্তও যে মাখেনি কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে—এমন নয়।

লাঠিটা হাতে নিয়ে দুলে সকালবেলা বাগ্‌দিপাড়া থেকে বেরিয়েছিল। কাছারিবাড়ি গিয়েছিল কত্তাবাবুকেই তার দুঃখ আর নালিশ জানাতে। জমিদার অনুকূল তার নিবেদন কানেও তোলে নি, তার গুরুতর কিছু বলার আছে টের পেয়েই হুকুম দিয়েছিল, 'শ্রীমন্তর কাছে যা দুলে। যা বলতে চাস শ্রীমন্তকে বল। পরে আমি শুনব খন।'

শ্রীমন্ত বলেছিল, 'কী রে দুলে! বুড়ো বয়সে আবার কোনো ছুঁড়ির সাথে 'অং' (রং) করে ফ্যাসাদে পড়েছিস নাকি? এখন বাবু আমি বড় ব্যস্ত। আমার বাড়ি যা, পুবের বেড়াটা একটু ভেঙে গেছে, সেরে দিবি যা ততক্ষণ। কাছারির কাজ সেরে আসছি, তোর নালিশ শুনব।'

পুবের গাছের মাথাঘেঁসা সূর্য মাথার উপরে চড়া পর্যন্ত দুলে নায়েববাবুর বাড়িতে বেগার খেটেছে, বাগানের বেড়া সারিয়েছে। অন্য বাড়ি চুক্তি করে নিলে এ কাজের জন্য সে কম করে আট আনা মজুরি পেত। কিন্তু বেলগাছে দেবতা থাকেন দুলের, তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান এবং সেই জন্যেই দুলে বাগ্‌দিপাড়ায় প্রধান। ওই বেলগাছের দেবতা বা দৈত্যকে সে মানে বলেই জমিদার আর নায়েব গোমস্তা তাকে পায়ের গোলাম হতে দিয়েছে, বাগ্‌দিপাড়ার প্রধান করেছে। বেগার তাকে খাটতেই হবে। শুধু তাকে কেন, বাগ্‌দিপাড়ার সব মদ্দপুরুষকে খাটতে হবে।

অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে শ্রীমন্ত বলেছিল, 'একটু বোস বাবা। চট্‌ করে নেয়ে খেয়ে নি, তারপর তোর নালিশ শুনব। তোদের ভালো করতে হারামজাদা আমি যে মারা গেলাম!'

দুলে সেই থেকে দাওয়ায় বসে আছে। মাঝদিনের মাথার উপরের সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলতে আরম্ভ করেছে। তবু নীরবে বিনা প্রতিবাদে অপেক্ষা না করে তার উপায় কী। গ্রামের বাইরে যেখানে গোল হয়ে বাঁক নিয়েছে নদী সেইখানে ঘন বাঁশঝাড় জলা জঙ্গল ভরা জমিতে বাগ্‌দিপাড়া, সে পাড়ায় সে প্রধান। সেটা তো বেলগাছের দেবতা, জমিদার আর নায়েববাবুর দয়াতে। তার রাজ্যে, ওই বাগ্‌দিপাড়ায়, আজ যখন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার যখন খটকা লেগেছে ব্রাহ্মণ জমিদার নায়েব ভগবান ইংরেজরাজ তাকে আর কতদিন প্রধান করে রাখতে পারবে, তখন এভাবে শ্রীমন্তর বাড়ি এসে বেগার খেটে ধন্না না দিয়ে তার উপায় কী। তার রাজ্য যে যায় যায়।

কষ্টে তার মাথা ঘুরছে। অর্ধেক দিন প্রতীক্ষা করাল, আধবেলার বেশি বেগার খাটাল,

একমুঠো গুড়মুড়ি জল খেতে দেয় নি। বেলগাছের দেবতার মতোই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচারী বলেই তো এরা দেবতা! তাই হবে!

ভুঁড়িতে আলগা করে লুঙ্গি আটকে হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্ত এসে জলচৌকিটাতে ধপাস করে বসে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'চটপট বল দিকি কী ব্যাপার। প্যানাস নি, এক কথায় বল। তোদের নালিশ শুনতে শুনতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, হারামজাদা বজ্জাতের দল। ঘুম পেয়েছে বাবু আমার।'

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে দুলে ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনে—

আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম
বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে,
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে—

'তবে তুমি ঘুমোবে যাও। নালিশ শুনে কাজ নেই।'

শোয়ানো লাঠি হাতে তুলে দুলে উঠতে যাবে, ব্যাপার বুঝে সচেতন হয়ে শ্রীমন্ত হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বলে, 'রাগিস কেন? তুই আর আমি কি তফাৎ? তুই আমার পুত্রতুল্য! কী বলছিস বল।'

'বলব কী?' দারুণ অভিমানে লাঠি আবার শুইয়ে রেখে হাতজোড় করে দুলে বলে, 'একদল বদ বেজাত যারা কারখানায় কাজ করতে যায় না? বাগ্‌দিপাড়া ওরা নষ্টাৎ করে দিচ্ছে। কী বলে শুনবে?'

'বল না শুনি।'

'বলে, মোরাও মানুষ। রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ, মোরাও মানুষ।'

'বলে তো হয়েছে কী?'

'হয়েছে কী? ঠাকুরথানের বাঁধ কাটতে চায়, এই হয়েছে!' ঠাকুরথানের অপমানের কথা উচ্চারণ করার জন্যই নিজের দুকান মলে দুলে শিউরে ওঠে।

'বলিস কী রে! কবে কাটবে?'

'অনেকে গুঁইগাঁই করছে, তাইতো হঠাৎ ভরসা পাচ্ছে না, নইলে কবে কেটে দিত। তবে রাতদিন জপাচ্ছে, ইয়াকে উয়াকে রাজি করাচ্ছে। বেশিদিন আর সামলানো যাবে মোর ভরসা নাই। তোমরা ইবারে বিহিত করো।'

বাগ্‌দিপাড়া জলার কাছে, প্রায় জলার মধ্যে। প্রতি বছর বর্ষায় জল পাড়ায় ওঠে, আবদ্ধ জল পচতে পচতে এক আঙুল দেড় আঙুল সরতে সরতে আরেক বর্ষার আগে শুধু কিছুদূর তফাতে সরে যায় মাত্র। নিচু জমির স্বাভাবিক জলা, চারদিকে জমি উঁচু, জলা ওখানে থাকবেই। পশ্চিমে জমি শুধু একটু কম উঁচু,—আগে বহুকাল আগে, ওইদিক দিয়ে জলার কিছু বাড়তি জল বেরিয়ে যেত, বর্ষার জল একেবারে পাড়া পর্যন্ত উঠত না। বহুকাল আগে, কতকাল আগে, কারো আজ স্মরণ নেই, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে এক-জায়গায় হাত ত্রিশেক লম্বা, দশ-বার হাত চওড়া এবং পাঁচ-ছ হাত উঁচু একটি বেদি বানায়, ইট আর মাটি দিয়ে। তার নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে বাগ্‌দি সমাজের চিরদিনের কল্যাণের জন্য ওখানে শিবাই ঠাকুরের বেদি স্থাপন করতে হবে। এবং এমনি আশ্চর্য ব্যাপার, স্বপ্নাবেশের খবর শোনামাত্র জমিদার টাকা আর লোক দিয়ে নিজেই বেদিটা বানিয়ে দেয়। মহাসমারোহে বেদিতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, বাগ্‌দিদের মধ্যে নেশা, উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা-পরিসীমা থাকে না। সেই থেকে ওই ঠাকুরের থান তাদের সমস্ত ধর্মকর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সেই থেকে বর্ষাকালে জলার বাড়তি জল ঠাকুরের থান ডিঙিয়ে যেতে

না পেরে পাড়ার মধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে।

শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে, 'হাই তুলে বলে, কী বলে জপাচ্ছে? ঠাকুরের থান তো বেগার খাটা তেভাগা নয়?'

দুলে তার ঝাঁকড়া চুল পিছন দিকে ঠেলে দেয়। চুলে তার কটা রং ধরেছে, বিশেষ পালাপার্বণে কদাচিৎ একটু তেল পড়ে। চুলে অসংখ্য উকুনের বাসা, মাঝে মাঝে যখন সে পাগলের মতো মাথা চুলকায় তখন মনে হয় রাগে বুঝি নিজের চুল ছিঁড়ছে, বাগ্‌দিপাড়ার অবাধ্যতার রাগে!

'শোনো তবে কী বলে। পাপ কথা মুখে উচ্চারণ করতি মোর গা কাঁপে। বলে মোরা খাটি খাই, মোরা ছোট কিসে, মোরা সজ্জাত হব। মোরা বজ্জাতি ধরম করম মানব নাই।'

'সজ্জাত কী রে?'

'ঠাকুরমশাইরা তোমরা বাবুরা যে জাত, তার চেয়ে উঁচু জাত, ভালো জাত।'

'ও, সৎ জাত। উঁচু জাত।'

দুলে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।—'হাঁ সজ্জাত।' বলে, 'বম্ভাণ্ড সংসার পাল্টে গেছে, বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে, মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস। আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন? না, তারা চোর ছ্যাঁচোর। কেন? না যারা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর বেজাতের দেব্‌তা ধর্ম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত।'

বলতে বলতে দুলে বাগ্‌দি কেঁদে ফেলে, 'কুলি খাটা ছোঁড়াছুঁড়ি মোর পাড়া সমাজ বেদখল করলে গো! তুমরা এর বিহিত করো!'

ভাত খেয়ে তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্তের ঢুল আসছিল। বাগ্‌দিপাড়ায় আবার বিদ্রোহ! জোয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেয়াদবি বেড়েছে এই পর্যন্ত, দুটো গুঁতো খেলে ঢিট হয়ে যাবে। সমাজের মাতব্বরকে সবাই মেনে চলবে এটা উচিত এবং দরকার। মাতব্বর নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে অনুগত রাখে। দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দরকার।

শ্রীমন্ত ধমকে বলে, 'কাঁদিস না ব্যাটা, মেয়েছেলের মতো কাঁদতে লেগেছে! সাধে কি তোকে কেউ মানে না?'

দুলে ভাবাবেগ সামলে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বলে, 'তোমরা হলে মা বাপ, তোমাদের ঠেঁয়ে কাঁদতে পারি। না তো দুলে বাগ্‌দি কেমন মরদ দশটা গাঁয়ের মানুষ জানে।'

শ্রীমন্ত ব্যঙ্গ করে বলে, 'মরদ যদি তো ধরে ঠেঙিয়ে দিতে পারিস না ব্যাটা?'

'উই তো মোর পোড়া কপাল!' হাউমাউ করে ওঠে দুলে, 'তোমরা বুঝবে নি। ই যে সামাজিক অমান্যি গো, জেতের ব্যাপার, ঠেঙাব কাকে?'

সামাজিক বৈঠক ডেকে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার চেষ্টা কী আর করে নি দুলে কিন্তু কে মানছে বিচার, কে মাথা পেতে নিচ্ছে শাস্তি? যাদের জাতে ঠেলবে একঘরে করবে তারাই যে বর্জন করেছে যে কজন দুলের পক্ষে আছে তাদের। খুঁটিতে বেঁধে যে ঠেঙাবে, মাথা মুড়োবে, ছ্যাঁকা দেবে, তার উপায় কই? ওরাই যে উল্টে তাদের পিটিয়ে দেবার মতো দলে ভারি। দুলে বরং জাত-ধর্ম ঠাকুর-দেবতা চিরকালের রীতিনীতির কথা বুঝিয়ে বুঝিয়ে, কারণে অকারণে পচাই-খাওয়া সামাজিক পরব-ফুর্তির ব্যবস্থা করে, তাতে মেয়েমদ্দর মেলামেশার নীতিনিয়ম আরো শিথিল করে কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায়

রেখেছে। নইলে সব চুরমার হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু—

'মোর আর খ্যেমতা নাই। ইবারে তোমরা বিহিত করো!'

শ্রীমন্তর আবার ঢুল আসছিল। সে বলে, আচ্ছা, 'আচ্ছা। কে কে পাণ্ডা নাম বল তো। বিশে শিবু?—'

উপরে ভাদ্রশেষের মাথাফাটা রোদ, তলায় বর্ষায় পরিপূর্ণ জলা–পুকুর ভিজে মাটি থেকে গরম ভাপ উঠছে। বাগ্দিপাড়ার দিকে চলতে চলতে দুলে হিংসার আনন্দে চোখে প্রায় ঝাপসা দেখতে থাকে। হোক বিহিত, চরম বিহিত হোক। তার প্রতিপত্তি, তার অধিকার নষ্ট হবার বদলে বাগ্দিপাড়াটাই যদি আগুনে পুড়ে যায়, বাগ্দি জাতটাই ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও দুলের আপত্তি নেই! তার দেবতা অপদেবতাদের কাছে দুলে মাথা কপাল খুঁড়ে প্রার্থনা জানায়। বলি মানত করে।

বাগ্দিপাড়ার জলকাদা শীতকালের আগে শুকোয় না, শুকোবার আগে পচে যায়। গ্রামের বাইরে নিচু জমিতে তাদের কুঁড়ে বাঁধবার ঠাঁই, সাধ করে মানুষ সেখানে থাকে না। গোড়ায় রাজা জমিদারের প্রজা–ঠেঙানো লেঠেল–পুলিশি আর বেগারদারির বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। লাঠি মাঝে মাঝে আজও ধরে, তবে পেশা হিসাবে তুচ্ছ হয়ে গেছে। জমির টুকরো নানাভাবে খসে গেছে, বৃত্তির বদলে পূজাপার্বণে চিঁড়ে–মণ্ডা সিধে পায় কিন্তু রীতি হিসাবে বেগারখাটা ঠিক বজায় রয়ে গেছে। আর আছে তাদের দুর্ধর্ষ বন্য ও বোকা করে রাখার জন্য খাওয়া–পরা চলা–ফেরা ধর্ম–কর্ম সমাজ–গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব বর্বর রীতিনীতি, ব্যবস্থা চাপানো হয়েছিল তার অবশিষ্ট পরিশিষ্ট।

আছে মানে এই সেদিনও ছিল, যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় এখন যায় যায় অবস্থা। কাছাকাছি যুদ্ধকালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচণ্ডভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধা–নিষেধ অমান্য করে খাটতে গিয়ে অনেকে হয়ে এসেছে সমাজ–ভাঙা বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কী অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারের বন্ধ পশুগুলি! তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্দিপাড়ার পচাই–খাওয়া মেয়েপুরুষকে, যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণের ছায়া–ভীরু অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল মারামারিতে পটু ক্ষেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই–বোনা ঘরামি–খাটা বাগ্দিদের। উঁচুতলার মানুষের আচার নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি ভোগের ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্বরতার পাশবিক সাহস—লাঠি হাতে খুন করতে খুন হতে ভয় না পাওয়া—চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করছে তেজে, মুক্তি কামনায়।

এই তেজের প্রমাণ দুলে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক বাগ্দি মেয়েপুরুষ কোদাল খন্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ছে—একপাশে চার–পাঁচ হাত চওড়া সুড়ঙ্গ কাটছে বেদিতে।

এ কী দুঃস্বপ্ন দেখালে ঠাকুর? এ কী সর্বনাশ ঘটালে? বাগ্দি সমাজের বিদ্রোহ দমনের বিহিত করতে এক সকাল সে কত্তাবাড়ি আর নায়েববাবুর বাড়ি ধন্না দিয়েছে, তার মধ্যে জগৎ ওলটপালট হয়ে গেল? অপরাধ কী হয়েছে কোনো? ঠাকুরের থানে ধন্না দিতে সে তো কসুর করে নি, হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে তার যখন মনে হয়েছে ঠাকুর নিজে ফিসফিস করে শিস দিয়ে আদেশ দিলেন কত্তাবাবুর কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার জন্য, শুধু তখনই তো সে ওদিকে ধন্না দিতে গিয়েছে।

উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দুলে চিৎকার করে 'সব্বোনাশ হবে, সব্বোনাশ হবে!

ঠাকুরের থানে কোদাল ছোঁয়ালি?'

শিবু কোদাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাবুদের ঠাকুরঘরে নালা থাকে। মোরা একটা জল নিকেশের নালা করে দিচ্ছি। ঠাকুরের থান তোমার ঠিক রইবে।'

'পালা! পালা সব! কত্তাবাবুকে খবর দিয়ে এয়েছি, পুলিশ আসছে, মিলিটারি আসছে। পালা, পালা, সব পালা!'

সকলে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুলালি কচি বয়সে কারখানায় খাটতে গিয়ে জাত–ধর্ম সব নষ্ট করেছে। উথলে উঠেছে তার যৌবন। খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, 'আরে বুড়া তোর মরণ নাই? খপর দিছিস?'

খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। রক্তে তার রুক্ষ কটা চুলে চাপ চাপ জটা বাঁধতে থাকে। ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

অতসীমামি

যে শোনে সেই বলে, হ্যাঁ, 'শোনবার মতো বটে!'

বিশেষ করে আমার মেজমামা। তাঁর মুখে কোনোকিছুর এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা খুব কম শুনেছি।

শুনে শুনে ভারি কৌতূহল হল। কী এমন বাঁশি বাজায় লোকটা যে সবাই এমনভাবে প্রশংসা করে? একদিন শুনতে গেলাম। মামার কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র সঙ্গে নিলাম।

আমি থাকি বালিগঞ্জে, আর যাঁর বাঁশি বাজার ওস্তাদির কথা বললাম তিনি থাকেন ভবানীপুর অঞ্চলে। মামার কাছে নাম শুনেছিলাম, যতীন। উপাধিটা শোনা হয় নি। আজ পরিচয়পত্রের উপরে পুরো নাম দেখলাম, যতীন্দ্রনাথ রায়।

বাড়িটা খুঁজে বার করে আমার তো চক্ষুস্থির! মামার কাছে যতীনবাবুর এবং তাঁর বাঁশি বাজানোর যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড় আর ভদ্রচেহারা একটা বাড়িতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়িটা যে গলিতে সেটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ যে ইট বার করা তিনকালের বুড়োর মতো নড়বড়ে একটা ইটের খাঁচা! সামনেটার চেহারাই যদি এ রকম, ভেতরটা না জানি কী রকম হবে।

উইয়ে ধরা দরজার কড়া নাড়লাম।

একটু পরেই দরজা খুলে যে লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে মনে হল ছাইগাদা নাড়তেই যেন একটা টকটকে আগুন বার হয়ে পড়ল।

খুব রোগা। গায়ের রংও অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবু একদিন চেহারাখানা কী রকম ছিল অনুমান করা শক্ত নয়। এখনো যা আছে, অপূর্ব!

বছর ত্রিশেক বয়স, কি কিছু কম। মলিন হয়ে আসা গায়ের রং অপূর্ব, শরীরের গড়ন অপূর্ব; মুখের চেহারা অপূর্ব। আর সব মিলিয়ে যে রূপ তাও অপূর্ব। সবচেয়ে অপূর্ব চোখ দুটি! চোখে চোখে চাইলে যেন নেশা লেগে যায়।

পুরুষেরও তা হলে সৌন্দর্য থাকে! ইট বার করা নোনা ধরা দেয়াল আর উইয়ে ধরা দরজা, তার মাঝখানে লোকটিকে দেখে আমার মনে হল ভারি সুন্দর একটা ছবিকে কে যেন অতি বিশ্রী একটা ফ্রেমে বাঁধিয়েছে।

বললেন, 'আমি ছাড়া তো বাড়িতে কেউ নেই, সুতরাং আমাকেই চান। কিন্তু কী চান?'

আমার মুগ্ধ চিত্তে কে যেন একটা ঘা দিল। কী বিশ্রী গলার স্বর! কর্কশ। কথাগুলি মোলায়েম কিন্তু লোকটির গলার স্বর শুনে মনে হল যেন আমায় গালাগালি দিচ্ছেন! ভাবলাম, নির্দোষ সৃষ্টি বিধাতার কুষ্ঠিতে লেখে না। এমন চেহারায় ওই গলা! সৃষ্টিকর্তা যত বড়

কারিগর হোন, কোথায় কী মানায় সে জ্ঞানটা তাঁর একদম নেই।

বললাম, 'আপনার নাম তো যতীন্দ্রনাথ রায়? আমি হরেনবাবুর ভাগ্নে।'

পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিলাম।

এক নিশ্বাসে পড়ে বললেন, 'ইস! আবার পরিচয়পত্র কেন হে? হরেন যদি তোমার মামা, আমিও তোমার মামা। হরেন যে আমায় দাদা বলে ডাকে! এসো, এসো, ভেতরে এসো।'

আমি ভেতরে ঢুকতে তিনি দরজা বন্ধ করলেন।

সদর দরজা থেকে দুধারের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে হাত পাঁচেক এসে একটা হাত তিনেক চওড়া বারান্দায় পড়ে ডান দিকে বাঁকতে হল। বাঁ দিকে বাঁকবার জো নেই, কারণ দেখা গেল সেদিকটা প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা।

ছোট্ট একটু উঠান, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক উঠানের চারটে করে পাশ থাকে, এটারও তাই আছে দেখলাম। দুপাশে দুখানা ঘর, এ বাড়িরই অঙ্গ। একটা দিক প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা, অপরদিকে অন্য এক বাড়ির একটা ঘরের পেছন দিক, জানালা দরজার চিহ্নমাত্র নেই, প্রাচীরেরই শামিল।

আমার নবলব্ধ মামা ডাকলেন, 'অতসী, আমার এক ভাগ্নে এসেছে, এ ঘরে মাদুর বিছিয়ে দিয়ে যাও। ও ঘরটা বড় অন্ধকার।'

এ ঘর মানে আমরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ও ঘর মানে ওদিককার ঘরটা। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী, মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

যতীনমামা বললেন, 'একী! ঘোমটা কেন? আরে, এ যে ভাগ্নে!'

মামির ঘোমটা ঘুচবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বললেন, 'ছি ছি, মামি হয়ে ভাগ্নের কাছে ঘোমটা টেনে কলাবৌ সাজবে?'

এবার মামির ঘোমটা উঠল। দেখলাম আমার নূতন পাওয়া মামিটি মামারই উপযুক্ত স্ত্রী বটে!

মামি এ ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। ঘরে তক্তপোশ, টেবিল, চেয়ার, ইত্যাদির বালাই নেই। একপাশে একটা রংচটা ট্রাংক আর একটা কাঠের বাক্স। দেয়ালে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত দড়ি টাঙানো, তাতে একটিমাত্র ধুতি ঝুলছে। একটা পেরেকে একটা আধময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি লটকানো, যতীনমামার সম্পত্তি। গোটা দুই দু-বছর আগেকার ক্যালেন্ডারের ছবি। একটাতে এখনো চৈত্র মাসের তারিখ লেখা কাগজটা লাগানো রয়েছে, ছিড়ে ফেলতে বোধ হয় কারো খেয়াল হয় নি।

যতীনমামা বললেন, 'একটু সুজিটুজি থাকে তো ভাগ্নেকে করে দাও। না থাকে এক কাপ চা-ই খাবেখন।'

বললাম, 'কিচ্ছু দরকার নেই যতীনমামা। আপনার বাঁশি শুনতে এসেছি, বাঁশির সুরেই খিদে মিটবে এখন। যদিও খিদে পায় নি মোটেই, বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।'

যতীনমামা বললেন, 'বাঁশি? বাঁশি তো এখন আমি বাজাই না।'

বললাম, 'সে হবে না, আপনাকে শোনাতেই হবে।'

বললেন, 'তাহলে বোসো, রাত্রি হোক। সন্ধ্যার পর ছাড়া আমি বাঁশি ছুঁই না।'

বললাম, 'কেন?'

যতীনমামা মাথা নেড়ে বললেন, 'কেন জানি না ভাগ্নে, দিনের বেলা বাঁশি বাজাতে পারি না। আজ পর্যন্ত কোনো দিন বাজাই নি। হ্যাঁ গা অতসী, বাজিয়েছি?'

অতসীমামি মৃদু হেসে বললে, 'না।'

যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এমনিভাবে যতীনমামা বললেন, 'তবে?'

বললাম, 'মোটে পাঁচটা বেজেছে, সন্ধ্যা হবে সাতটায়। এতক্ষণ বসে থেকে কেন আপনাদের অসুবিধা করব, ঘুরেটুরে সন্ধ্যার পর আসব এখন।'

যতীনমামা ইংরাজিতে বললেন, 'Tut! Tut!' তারপর বাংলায় যোগ দিলেন, 'কী যে বল ভাগ্নে! অসুবিধাটা কী হে, এ্যাঁ? পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে অপবাদ দিয়ে, তুমি থাকলে তবু কথা কয়ে বাঁচব।'

আমি বললাম, 'পাড়ার লোকে কী অপবাদ দিয়েছে মামা?'

অতসীমামির দিকে চেয়ে যতীনমামা হাসলেন, 'বলব নাকি ভাগ্নেকে কথাটা অতসী? পাড়ার লোকে কী বলে জান ভাগ্নে? বলে অতসী আমার বিয়ে করা বৌ নয়!—চোখের পলকে হাসি মুছে রাগে যতীনমামা গরগর করতে লাগলেন, লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত লোক পাড়ার ভাগ্নে! রীতিমতো দলিল আছে বিয়ের, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? যত সব—'

ত্রস্তভাবে অতসীমামি বললে, 'কী যা-তা বলছ?'

যতীনমামা বললেন, 'ঠিক ঠিক, ভাগ্নে নতুন লোক, তাকে এসব বলা ঠিক হচ্ছে না বটে। ভারি রাগ হয় কিনা!' বলে হাসলেন। হঠাৎ বললেন, 'তোমরা যে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলছ না গো!'

মামি মৃদু হেসে বললে, 'কী কথা বলব?'

যতীনমামা বললেন, 'এই নাও! কী কথা বলবে তাও কি আমায় বলে দিতে হবে নাকি? যা হোক কিছু বলে শুরু করো, গড়গড় করে কথা আপনি এসে যাবে।'

মামি বললে, 'তোমার নামটি কী ভাগ্নে?'

যতীনমামা সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'এইবার ভাগ্নে, পাল্টা প্রশ্ন করো, আজ কী রাঁধবে মামি? ব্যস, খাসা আলাপ জমে যাবে। তোমার আরম্ভটি কিন্তু বেশ অতসী।'

মামির মুখ লাল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, 'অমন বিশ্রী প্রশ্ন আমি কখ্খনো করব না মামি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার নাম সুরেশ।'

যতীনমামা বললেন, 'সুরেশ কিনা সুরের রাজা, তাই সুর শুনতে এত আগ্রহ। নয় ভাগ্নে?'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইস! ভুবনবাবু যে টাকা দুটো ফেরত দেবে বলেছিল আজ! নিয়ে আসি, দুদিন বাজার হয় নি। বোসো ভাগ্নে, মামির সঙ্গে গল্প করো, দশ মিনিটের ভেতর আসছি।'

ঘরের বাইরে গিয়ে বললেন, 'দোরটা দিয়ে যাও অতসী। ভাগ্নে ছেলেমানুষ, কেউ তোমার লোভে ঘরে ঢুকলে ঠেকাতে পারবে না।'

মামির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল এবং সেটা গোপন করতে চট করে উঠে গেল। বাইরে তার চাপা গলা শুনলাম, 'কী যে রসিকতা কর, ছি!' মামা কী জবাব দিলেন শোনা গেল না।

মামি ঘরে ঢুকে বললে, 'ওই রকম স্বভাব ওর। বাক্সে দুটি মোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজার গেলেন। বললাম, একটা থাক। জবাব দিলেন, কেন? রাস্তায় ভুবনবাবু চাইতে টাকা দুটি তাকে দিয়ে খালি হাতে ঘরে ঢুকলেন।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য লোক তো!'

মামি বললে, 'ওই রকমই। আর দেখো ভাই—'

বললাম, 'ভাই নয়, ভাগ্নে।'

মামি বললে, 'তাও তো বটে! আগে থাকতেই যে সম্বন্ধটা পাতিয়ে বসে আছ! ওঁর ভাগ্নে না হয়ে আমার ভাই হলেই বেশ হত কিন্তু। সম্পর্কটা নতুন করে পাতো না? এখনো এক ঘণ্টাও হয় নি, জমাট বাঁধে নি।'

আমি বললাম, 'কেন? মামি ভাগ্নে বেশ তো সম্পর্ক!'

মামি বললে, 'আচ্ছা তবে তাই। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে ভাগ্নে। তুমি ওঁর বাঁশি শুনতে চেয়ো না।'

বললাম, 'তার মানে? বাঁশি শুনতেই তো এলাম!'

মামির মুখ গম্ভীর হল, বললে, 'কেন এলে? আমি ডেকেছিলাম? তোমাদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেব?'

আমি অবাক হয়ে মামির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কথা জোগায় না।

মামি বললে, 'তোমাদের একটু শখ মেটাবার জন্য উনি আত্মহত্যা করছেন দেখতে পাও না? রোজ তোমরা একজন না একজন এসে বাঁশি শুনতে চাইবে। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়লে মানুষ কদিন বাঁচে?'

'রক্ত!'

'রক্ত নয়? দেখবে?' বলে মামি চলে গেল। ফিরে এল একটা গামলা হাতে করে। গামলার ভেতরে জমাট বাঁধা খানিকটা রক্ত।

মামি বললে, 'কাল উঠেছিল, ফেলতে মায়া হচ্ছিল তাই রেখে দিয়েছি। রেখে কোনো লাভ নেই জানি, তবু—'

আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম, 'জানতাম না মামি। জানলে কখ্খনো শুনতে চাইতাম না। ইস, এইজন্যেই মামার শরীর এত খারাপ?'

মামি বললে, 'কিছু মনে কোরো না ভাগ্নে। অন্য কারো সঙ্গে তো কথা কই না, তাই তোমাকেই গায়ের ঝাল মিটিয়ে বলে নিলাম। তোমার আর কী দোষ, আমার অদৃষ্ট!'

আমি বললাম, 'এত রক্ত পড়ে তবু মামা বাঁশি বাজান?'

মামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'হ্যাঁ, পৃথিবীর কোনো বাধাই ওঁর বাঁশি বাজানো বন্ধ করতে পারবে না। কত বলেছি, কত কেঁদেছি, শোনেন না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

মামি বলে চলল, 'কতদিন ভেবেছি বাঁশি ভেঙে ফেলি, কিন্তু সাহস হয় নি। হয়তো বাঁশির বদলে মদ খেয়েই নিজেকে শেষ করে ফেলবেন, নয়তো যেখানে যা আছে সব বিক্রি করে বাঁশি কিনে না-খেয়ে মরবেন।'

মামির শেষ কথাগুলি যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কথা বলতে গেলাম, কিন্তু কথা ফুটল না।

মামি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'অথচ ওই একটা ছাড়া আমার কোনো কথাই ফেলেন না। আগে আকণ্ঠ মদ খেতেন, বিয়ের পর যেদিন মিনতি করে মদ ছাড়তে বললাম সেই দিন থেকে ও জিনিস ছোঁয়াই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাঁশির বিষয়ে কোনো কথাই শোনেন না।'

আমি বলতে গেলাম, 'মামি—'

মামি বোধ হয় শুনতেই পেল না, বলে চলল, 'একবার বাঁশি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সে কী ছটফট করতে লাগলেন! যেন ওঁর সর্বস্ব হারিয়ে গেছে।'

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। মামি দরজা খুলতে উঠে গেল।

যতীনমামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'দিলে না টাকা অতসী, বললে পরশু যেতে।'

পিছন থেকে মামি বললে, 'সে আমি আগেই জানি।'

যতীনমামা বললেন, 'দোকানদারটাই বা কী পাজি, একপো সুজি চাইলাম দিল না। মামার বাড়ি এসে ভাগ্নেকে দেখছি খালি পেটে ফিরতে হবে।'

মামি ম্লানমুখে বললে, 'সুজি দেয় নি ভালোই করেছে। শুধু জল দিয়ে তো আর সুজি হয় না।'

'ঘি নেই?'

'কবে আবার ঘি আনলে তুমি?'

'তাও তো বটে!' বলে যতীনমামা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। দিব্য সপ্রতিভ হাসি।

আমি বললাম, 'কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মামা, খাবারের কিছু দরকার নেই। ভাগ্নের সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে নেই!'

মামি বললে, 'বোসো তোমরা, আমি আসছি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।'

মামা হেঁকে বললে, 'কোথায় গো?'

বারান্দা থেকে জবাব এল, 'আসছি।'

মিনিট পনের পরে মামি ফিরল। দু-হাতে দু-খানা রেকাবিতে গোটা চারেক করে রসগোল্লা আর গোটা দুই সন্দেশ।

যতীনমামা বললেন, 'কোত্থেকে জোগাড় করলে গো?' বলে, একটা রেকাবি টেনে নিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে তুললেন।

অন্য রেকাবিটা আমার সামনে রাখতে রাখতে মামি বললে, 'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

যতীনমামা নিশ্চিন্তভাবে বললেন, 'কিছু না! যা খিদেটা পেয়েছে ডাকাতি করেও যদি এনে থাক কিছু দোষ হয় নি। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সাধ্বী অনেক কিছুই করে!'

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতে গেলাম, 'কেন মিথ্যে—'

বাধা দিয়ে মামি বললে, 'আবার যদি ওই সব শুরু কর ভাগ্নে, আমি কেঁদে ফেলব।'

আমি নিঃশব্দে খেতে আরম্ভ করলাম।

মামি ও ঘর থেকে দুটো এনামেলের গ্লাসে জল এনে দিলেন।

প্রথম রসগোল্লাটা গিলেই মামা বললেন, 'ওয়াক্! কী বিশ্রী রসগোল্লা! রইল পড়ে খেয়ো তুমি, নয়তো ফেলে দিও। দেখি সন্দেশটা কেমন!'

সন্দেশ মুখে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ এ জিনিসটা ভালো, এটা খাব।' বলে সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বললেন, 'যাও তোমার সুজির ঢিপি ফেলে দিওখন নর্দমায়।'

অতসীমামির চোখ ছলছল করে এল! মামার ছলটুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইল না। কেন যে এমন খাসা রসগোল্লাও মামার কাছে সুজির ঢিপি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হল।

মাথা নিচু করে রেকাবিটা শেষ করলাম। মাঝখানে একবার চোখ তুলতেই নজরে পড়ল মামি মামার রেকাবিটা দরজার ওপরে তাকে তুলে রাখছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মামি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাল, ধুনো দিল। আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে মামি চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

যতীনমামা হেসে বললেন, 'আরে লজ্জা কিসের! নিত্যকার অভ্যাস, বাদ পড়লে রাতে ঘুম হবে না। ভাগ্নের কাছে লজ্জা করতে নেই।'

আমি বললাম, 'আমি না হয়—'

মামি বললে, 'বোসো, উঠতে হবে না, অত লজ্জা নেই আমার।' বলে, গলায় আঁচল দিয়ে মামার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

লজ্জায় সুখে তৃপ্তিতে আরক্ত মুখখানি নিয়ে অতসীমামি যখন উঠে দাঁড়াল, আমি বললাম, 'দাঁড়াও মামি, একটা প্রণাম করে নি।'

মামি বললে, 'না না ছি ছি—'

বললাম, 'ছি ছি নয় মামি! আমার নিত্যকার অভ্যাস না হতে পারে, কিন্তু তোমায় প্রণাম না করে যদি আজ বাড়ি ফিরি, রাত্রে আমার ঘুম হবে না ঠিক।' বলে মামির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

যতীনমামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

মামি বললে, 'দেখো তো ভাগ্নের কাণ্ড!'

যতীনমামা বললেন, 'ভক্তি হয়েছে গো! সকাল সন্ধ্যা স্বামীকে প্রণাম কর জেনে শ্রদ্ধা হয়েছে ভাগ্নের।'

'কী যে বল!'— বলে মামি পলায়ন করল। বারান্দা থেকে বলে গেল, 'আমি রান্না করতে গেলাম।'

যতীনমামা বললেন, 'এইবার বাঁশি শোনো।'

আমি বললাম, 'থাকগে, কাজ নেই মামা। শেষে আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে।'

যতীনমামা বললেন, 'তুমিও শেষে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান আরম্ভ করলে ভাগ্নে? রক্ত পড়বে তো হয়েছে কী? তুমি শুনলেও আমি বাজাব, না শুনলেও বাজাব। খুশি হয় রান্নাঘরে মামির কাছে বসে কানে আঙুল দিয়ে থাকো গে।'

কাঠের বাক্সটা খুলে বাঁশির কাঠের কেসটা বার করলেন। বললেন, 'বারান্দায় চলো, ঘরে বড় শব্দ হয়।'

নিজেই বারান্দায় মাদুরটা তুলে এনে বিছিয়ে নিলেন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশিটা মুখে তুললেন।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমার ভেতরে যেন একটা উন্মাদ একটা খেপা উদাসীন ঘুমিয়ে ছিল, আজ বাঁশির সুরের নাড়া পেয়ে জেগে উঠল। বাঁশির সুর এসে লাগে কানে কিন্তু আমার মনে হল বুকের তলেও যেন সাড়া পৌঁছেছে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আত্মপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌঁছয় নি, বাইরের এই ঘরদোরকেও যেন স্পর্শ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে মৃদুভাবে স্পর্শ করতে করতে যেন দূরে, বহুদূরে, যেখানে গোটাকয়েক তারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে স্বপ্নের মায়ার মধ্যে লয় পাচ্ছে। অন্তরে ব্যথা বোধ করে আনন্দ পাবার যতগুলি অনুভূতি আছে বাঁশির সুর যেন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি আরম্ভ করেছে।

বাঁশি শুনেছি ঢের। বিশ্বাস হয় নি এই বাঁশি বাজিয়ে একজন একদিন এক কিশোরীর কুল মান লজ্জা ভয় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, যমুনাকে উজানে বইয়েছিল। আজ মনে হল, আমার যতীনমামার বাঁশিতে সমগ্র প্রাণ যদি আচমকা জেগে উঠে নিরর্থক এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে সেই বিশ্ববাঁশির বাদকের পক্ষ ওই দুটি কাজ আর এমন কী কঠিন!

দেখি, মামি কখন এসে নিঃশব্দে ওদিকের বারান্দায় বসে পড়েছে। খুব সম্ভব ওই

ঘরটাই রান্নাঘর, কিংবা রান্নাঘরে যাবার পথ ওই ঘরের ভেতর দিয়ে।

যতীনমামার দিকে চেয়ে দেখলাম, খুব সম্ভব সংজ্ঞা নেই। এ যেন সুরের আত্মভোলা সাধক, সমাধি পেয়ে পেয়ে গেছে।

কতক্ষণ বাঁশি চলেছিল ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। হঠাৎ এক সময়ে বাঁশি থামিয়ে যতীনমামা ভয়ানক কাশতে আরম্ভ করলেন। বারান্দার ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে পারলাম, মামার মুখচোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে উঠেছে।

অতসীমামি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, জল আর পাখা নিয়ে ছুটে এল। খানিকটা রক্ত তুলে মামির শুশ্রূষায় যতীনমামা অনেকটা সুস্থ হলেন। মাদুরের ওপর একটা বালিশ পেতে মামি তাকে শুইয়ে দিল। পাখা নেড়ে নীরবে হাওয়া করতে লাগল।

তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আজ আসি যতীনমামা।'

মামা কিছু বলবার আগেই মামি বললে, 'তুমি এখন কথা কয়ো না। ভাগ্নের বাড়িতে ভাববে, আজ থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবে এখন। চলো আমি দরজা দিয়ে আসছি।'

সদরের দরজা খুলে বাইরে যাব, মামি আমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, 'একটু দাঁড়াও ভাগ্নে, সামলে নি।'

প্রদীপের আলোতে দেখলাম, মামির সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। একটু সুস্থ হয়ে বললে, 'ওঁর রক্ত পড়া দেখলেই আমার এ রকম হয়। বাঁশি শুনেও হতে পারে। আচ্ছা এবার এসো ভাগ্নে, শিগগির আর একদিন আসবে কিন্তু।'

বললাম, 'মামার বাঁশি ছাড়াতে পারি কি না একবার চেষ্টা করে দেখব মামি?'

মামি ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, 'পারবে? পারবে তুমি? যদি পার ভাগ্নে, শুধু তোমার যতীনমামাকে নয়, আমাকেও প্রাণ দেবে।'

অতসীমামি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

রাস্তায় নেমে বললাম, 'খিলটা লাগিয়ে দাও মামি।'

কেবলই মনে হয়, নেশাকে মানুষ এত বড় দাম দেয় কেন। লাভ কী? এই যে যতীনমামা পলে পলে জীবন উৎসর্গ করে সুরের জাল বুনবার নেশায় মেতে যান, মানি তাতে আনন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তারও, যে শোনে তারও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিয়ে কি সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি, এ তো ক্ষণিকের! যতক্ষণ সৃষ্টি করা যায় শুধু ততক্ষণ এর স্থিতি। তারপর বাস্তবের কঠোরতার মাঝে এ স্বপ্নের চিহ্নও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ নিরর্থক মায়া সৃষ্টি করে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কী বিচিত্র! আমারও ইচ্ছে করে যতীনমামার মতো সুরের আলোয় ভুবন ছেয়ে ফেলে, সুরের আগুন গগনে বেয়ে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! লাভ নেই? নাই বা রইল।

এতদিন জানতাম, আমিও বাঁশি বাজাতে জানি। বন্ধুরা শুনে প্রশংসাও করে এসেছে। বাঁশি বাজিয়ে আনন্দও যে না পাই তা নয়। কিন্তু যতীনমামার বাঁশি শুনে এসে মনে হল, বাঁশি বাজানো আমার জন্যে নয়। এক–একটা কাজ করতে এক–একজন লোক জন্মায়, আমি বাঁশি বাজাতে জন্মাই নি। যতীনমামা ছাড়া বাঁশি বাজাবার অধিকার কারো নেই।

থাকতে পারে কারো অধিকার। কারো কারো বাঁশি হয়তো যতীনমামার বাঁশির চেয়েও মনকে উতলা করে তোলে, আমি তাদের চিনি না।

একদিন বললাম, 'বাঁশি শিখিয়ে দেবে মামা?'

যতীনমামা হেসে বললে, 'বাঁশি কি শেখাবার জিনিস ভাগ্নে? ও শিখতে হয়।'

তা ঠিক। আর শিখতেও হয় মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে। নইলে আমার বাঁশি শেখার মতোই সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।

অতসীমামিকে সেদিন বিদায় নেবার সময় যে কথা বলেছিলাম সে কথা ভুলি নি। কিন্তু কী করে যে যতীনমামার বাঁশি ছাড়াব ভেবে পেলাম না। অথচ দিনের পর দিন যতীনমামা যে এই সর্বনাশা নেশায় পলে পলে মরণের দিকে এগিয়ে যাবেন এ কথা ভাবতেও কষ্ট হল। কিন্তু করা যায় কী? মামির প্রতি যতীনমামার যে ভালবাসা তার বোধ হয় তল নেই, মামির কান্নাই যখন ঠেলেছেন তখন আমার সাধ্য কি তাকে ঠেকিয়ে রাখি!

একদিন বললাম, 'মামা, আর বাঁশি বাজবেন না।'

যতীন মামা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'বাঁশি বাজাব না? বল কী ভাগ্নে? তাহলে বাঁচব কী করে?'

বললাম, 'গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, মামি কত কাঁদে।'

'তা আমি কী করব? একটু আধটু কাঁদা ভালো।' বলে হাঁকলেন, 'অতসী! অতসী!'

মামি এল।

মামা বললেন, 'কান্না কী জন্যে শুনি? বাঁশি ছেড়ে দিয়ে আমায় মরতে বল নাকি? তাতে কান্না বাড়বে, কমবে না।'

মামি ম্লানমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মামা বললেন, 'জান ভাগ্নে, এই অতসীর জ্বালায় আমার বেঁচে থাকা ভার হয়ে উঠেছে। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, নড়বার নাম নেই। ওর ভার ঘাড়ে না থাকলে বাঁশি বগলে মনের আনন্দে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়ানো-টেড়ানো সব মাথায় উঠেছে।'

মামি বললে, 'যাও না বেড়াতে, আমি ধরে রেখেছি?'

'রাখ নি? বলে মামা এমনিভাবে চাইলেন যেন নিজের চোখে তিনি অতসীমামিকে খুন করতে দেখছেন আর মামি এখন তাঁর সমুখেই সে কথা অস্বীকার করছে।

মামির চোখে জল এল। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললে, 'অমন কর তো আমি একদিন—'

মামা একেবারে জল হয়ে গেলেন। আমার সামনেই মামির হাত ধরে কোঁচার কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠাট্টা করছিলাম, সত্যি বলছি অতসী—'

চট্ করে হাত ছাড়িয়ে মামি চলে গেল!

আমি বললাম, 'কেন মিথ্যে চটালেন মামিকে?'

যতীনমামা বললেন, 'চটে নি। লজ্জায় পালাল।'

কিন্তু একদিন যতীনমামাকে বাঁশি ছাড়তে হল। মামিই ছাড়াল।

মামির একদিন হঠাৎ টাইফয়েড জ্বর হল।

সেদিন বুঝি জ্বরের সতের দিন। সকাল নটা বাজে। মামি ঘুমচ্ছে, আমি তার মাথায় আইসব্যাগটা চেপে ধরে আছি। যতীনমামা একটা টুলে বসে ম্লানমুখে চেয়ে আছেন। রাত্রি জেগে তাঁর শরীর আরো শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল উষ্কখুষ্ক।

হঠাৎ টুল ছেড়ে উঠে মামা ট্রাংকটা খুলে বাঁশিটা বার করলেন। আজ সতের দিন এটা বাক্সেই বন্ধ ছিল।

সবিস্ময়ে বললাম, 'বাঁশি কী হবে মামা?'

ছেঁড়া পাম্পস্যুতে পা ঢুকোতে ঢুকোতে মামা বললেন, 'বেচে দিয়ে আসব।'

'তার মানে?'

যতীনমামা ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'তার মানে ডাক্তার বোসকে আর একটা কল দিতে হবে।'

বললাম, 'বাঁশি থাক, আমার কাছে টাকা আছে।'

প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হেসে যতীনমামা পেরেকে টাঙানো জামাটা টেনে নিলেন।

যদি দরকার পড়ে ভেবে পকেটে কিছু টাকা এনেছিলাম। মিথ্যা চেষ্টা। আমার মেজমামা কতবার কত বিপদে যতীনমামাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন, যতীনমামা একটি পয়সা নেন নি। বললাম, 'কোথাও যেতে হবে না মামা, আমি কিনব বাঁশি।'

মামা ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি কিনবে ভাগ্নে? বেশ তো!'

বললাম, 'কত দাম?'

বললেন, 'একশ পঁয়ত্রিশে কিনেছি, একশ টাকায় দেব। বাঁশি ঠিক আছে, কেবল সেকেন্ড হ্যান্ড এই যা।'

বললাম, 'আপনি না সেদিন বলছিলেন মামা, এ রকম বাঁশি খুঁজে পাওয়া দায়, অনেক বেছে আপনি কিনেছেন? আমি একশ পঁয়ত্রিশ দিয়েই ওটা কিনব।'

যতীনমামা বললেন, 'তা কি হয়! পুরোনো জিনিস—'

বললাম, 'আমাকে কি জোচ্চোর পেলেন মামা? আপনাকে ঠকিয়ে কম দামে বাঁশি কিনব?'

পকেটে দশ টাকার তিনটে নোট ছিল, বার করে মামার হাতে দিয়ে বললাম, 'ত্রিশ টাকা আগাম নিন, বাকি টাকাটা বিকেলে নিয়ে আসব।'

যতীনমামা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে নোটগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা!'

আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যতীনমামার মুখের ভাবটা দেখবার সাধ্য হল না।

যতীনমামা ডাকলেন, 'ভাগ্নে—'

ফিরে তাকালাম।

যতীনমামা হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে ভেবো না, বুঝলে ভাগ্নে?'

আমার চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে মামির শিয়রে গিয়ে বসলাম।

মামির ঘুম ভাঙে নি, জানতেও পারল না যে রক্তপিপাসু বাঁশিটা ঝলকে ঝলকে মামার রক্ত পান করেছে, আমি আজ সেই বাঁশিটা কিনে নিলাম।

মনে মনে বললাম, মিথ্যে আশা। এ যে বালির বাঁধ! একটা বাঁশি গেল, আর একটা কিনতে কতক্ষণ? লাভের মধ্যে যতীনমামা একান্ত প্রিয়বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার বেদনাটাই পেলেন।

বিকালে বাকি টাকা এনে দিতেই যতীনমামা বললেন, 'বাড়ি যাবার সময় বাঁশিটা নিয়ে যেও।'

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'থাক না এখন কদিন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

যতীনমামা বললেন, 'না। পরের জিনিস আমি বাড়িতে রাখি না।' বুঝলাম, পরের হাতে চলে যাওয়া বাঁশিটা চোখের ওপরে থাকা তাঁর সহ্য হবে না।

বললাম, 'বেশ মামা, তাই নিয়ে যাব এখন।'

মামা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নিয়েই যেও। তোমার জিনিস এখানে কেন ফেলে রাখবে। বুঝলে না?'

উনিশ দিনের দিন মামির অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল।

যতীনমামা টুলটা বিছানার কাছে টেনে এনে মামির একটা হাত মুঠো করে ধরে নীরবে তার রোগশীর্ণ ঝরা ফুলের মতো ম্লান মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন, হঠাৎ অতসীমামি বললে, 'ওগো আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।'

যতীনমামা বললেন, 'তা কি হয় অতসী, তোমায় বাঁচতে হবেই। তুমি না বাঁচলে আমিও যে বাঁচব না!'

মামি বললে, 'বালাই, বাঁচবে বৈকি। দেখো, আমি যদি নাই বাঁচি, আমার একটা কথা রাখবে?'

যতীনমামা নত হয়ে বললেন, 'রাখব। বলো।'

বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিও। তিল তিল করে তোমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে দেখে ওপারে গিয়েও আমার শান্তি থাকবে না। রাখবে আমার কথা?

মামা বললেন, 'তাই হবে অতসী। তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশি ছোঁব না।'

মামির শীর্ণ ঠোঁটে সুখের হাসি ফুটে উঠল। মামার একটা হাত বুকের ওপর টেনে শ্রান্তভাবে মামি চোখ বুজল।

আমি বুঝলাম যতীনমামা আজ তাঁর রোগশয্যাগতা অতসীর জন্য কত বড় একটা ত্যাগ করলে। অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত ওই কটি কথা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশি ছোঁব না, অন্যে না বুঝুক আমি তো যতীনমামাকে চিনি, আমি জানি, অতসীমামিও জানে, ওই কথা কটির পেছনে কতখানি জোর আছে! বাঁশি বাজাবার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠলেও যতীনমামা আর বাঁশি ছোঁবেন না।

শেষ পর্যন্ত মামি ভালো হয়ে উঠল। যতীনমামার মুখে হাসি ফুটল। মামি যেদিন পথ্য পেল সেদিন হেসে মামা বললেন, 'কী গো, বাঁচবে না বলে? অমনি মুখের কথা কিনা! যে চাঁড়াল খুড়োর কাছ থেকেই তোমায় ছিনিয়ে এনেছি, যম ব্যাটা তো ভালো মানুষ।'

আমি বললাম, 'চাঁড়াল খুড়ো আবার কী মামা?'

মামা বললেন, 'তুমি জান না বুঝি? সে এক দ্বিতীয় মহাভারত।'

মামি বললে, 'গুরুনিন্দা কোরো না।'

মামা বললেন, 'গুরুনিন্দা কী? গুরুতর নিন্দা করব। ভাগ্নেকে দেখাও না অতসী তোমার পিঠের দাগটা?'

মামির বাধা দেয়া সত্ত্বেও মামা ইতিহাসটা শুনিয়ে দিলেন। নিজের খুড়ো নয়, বাপের পিসতুতো ভাই। মা-বাবাকে হারিয়ে সতের বছর বয়স পর্যন্ত ওই খুড়োর কাছেই অতসীমামি ছিল। অত বড় মেয়ে তাকে কিল চড় লাগাতে খুড়োটির বাধত না, আনুষঙ্গিক অন্য সব তো ছিলই। খুড়োর মেজাজের একটি অক্ষয় চিহ্ন আজ পর্যন্ত মামির পিঠে আছে। পাশের বাড়িতেই যতীনমামা বাঁশি বাজাতেন আর আকণ্ঠ মদ খেতেন। প্রায়ই খুড়োর গর্জন আর অনেক রাতে মামির চাপা কান্নার শব্দে তাঁর নেশা ছুটে যেত। নিতান্ত চটে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন করলেন এবং বিয়ে করে ফেললেন।

মামার ইতিহাস বলা শেষ হলে অতসীমামি ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, 'তখন কি জানি মদ খায়! তা হলে কখখনো আসতাম না।'

মামা বললেন, 'তখন কি জানি তুমি মাথার রতন হয়ে আঠার মতো লেপ্টে থাকবে! তা হলে কখ্খনো উদ্ধার করতাম না। আর মদ না খেলে কি এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করার মতো বিশ্রী কাজটা করতে পারতাম গো! আমি ভেবেছিলাম, বছরখানেক—'

মামি বললে, 'যাও চুপ করো। ভাগ্নের সামনে যা তা বোকো না।'

মামা হেসে চুপ করলেন।

মাস দুই পরের কথা।

কলেজ থেকে সটান যতীনমামার ওখানে হাজির হলাম। দেখি, জিনিসপত্র যা ছিল বাঁধাছাঁদা হয়ে পড়ে আছে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এসব কী মামা?'

যতীনমামা সংক্ষেপে বললেন, 'দেশে যাচ্ছি।'

'দেশে? দেশ আবার আপনার কোথায়?'

যতীনমামা বললে, 'আমার কি একটা দেশও নেই ভাগ্নে? পাঁচশ টাকা আয়ের জমিদারি আছে দেশে, খবর রাখ?'

অতসীমামি বললেন, 'হয়তো জন্মের মতোই তোমাদের ছেড়ে চললাম ভাগ্নে। আমার অসুখের জন্যই এটা হল।'

বললাম, 'তোমার অসুখের জন্য? তার মানে?'

মামা বললেন, 'তার মানে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। যিনি কিনেছেন পাশের বাড়িতেই থাকেন, মাঝখানের প্রাচীরটা ভেঙে দুটো বাড়ি এক করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, 'এত কাণ্ড করলে মামা, আমাকে একবার জানালে না পর্যন্ত! কবে যাওয়া ঠিক হল?'

বাঁধা বিছানা আর তালাবন্ধ বাক্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামা বললেন, 'আজ। রাত্রে ঢাকা মেলে রওনা হব। আমরা বাঙ্গাল হে ভাগ্নে, জান না বুঝি?' বলে মামা হাসলেন। অবাক মানুষ! এমন অবস্থায় হাসিও আসে!

গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আচ্ছা, আসি যতীনমামা, আসি মামি।' বলে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

অতসীমামি উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, 'লক্ষ্মী ভাগ্নে, রাগ কোরো না। আগে থাকতে তোমায় খবর দিয়ে লাভ তো কিছু ছিল না, কেবল মনে ব্যথা পেতে। যে ভাগ্নে তুমি, কত কী হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে ঠিক আছে কিছু?'

আমি ফিরে গিয়ে বাঁধা বিছানাটার ওপর বসে বললাম, 'আজ যদি না আসতাম, একটা খবরও তো পেতাম না। কাল এসে দেখতাম, বাড়িঘর খাঁ-খাঁ করছে।'

যতীনমামা বললেন, 'আরে রামঃ! তোমায় না বলে কি যেতে পারি? দুপুরবেলা সেনের ডাক্তারখানা থেকে ফোন করে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলেই খবর পেতে।'

বাড়ি আর গেলাম না। শিয়ালদা স্টেশনে মামা-মামিকে উঠিয়ে দিতে গেলাম। গাড়ি ছাড়ার আগে কতক্ষণ সময় যে কী করেই কাটল! কারো মুখেই কথা নেই। যতীনমামা কেবল মাঝে মাঝে দু-একটা হাসির কথা বলছিলেন এবং হাসাচ্ছিলেনও। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতর যে কী করছিল সে খবর আমার অজ্ঞাত থাকে নি।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজলে যতীনমামা আর অতসীমাসিকে প্রণাম করে গাড়ি থেকে নামলাম। এইবার যতীনমামা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর বোধ হয় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

জানালা দিয়ে মুখ বার করে মামি ডাকলে, 'শোনো'। কাছে গেলাম। মামি বললে, তোমাকে ভাগ্নে বলি আর যাই বলি, মনে মনে জানি তুমি আমার ছোট ভাই। পার তো একবার বেড়াতে গিয়ে দেখা দিয়ে এসো। আমাদের হয়তো আর কলকাতা আসা হবে না, জমির ভারি ক্ষতি হয়ে গেছে। যেও, কেমন ভাগ্নে?'

মামির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালাম, যাব।

বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দূরের লালসবুজ আলোকবিন্দুর ওপারে যখন একটি চলন্ত লাল বিন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ফিরলাম। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে গেছে।

মানুষের স্বভাবই এই, যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সকলের বড় করে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল, যে যতীনমামা আর অতসীমামির বিচ্ছেদে একুশ বছর বয়সে আমার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল সেই যতীনমামা আর অতসীমামি একদিন আমার মনের এক কোণে সংসারের আবর্জনার তলে চাপা পড়ে যাবেন।

জীবনে অনেকগুলি ওলটপালট হয়ে গেল। যথাসময়ে ভাগ্য আমার ঘাড় ধরে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। নানা কারণে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। বালিগঞ্জের বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে ঋণ শোধ দিয়ে আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি নিয়ে শ্যামবাজার অঞ্চলে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলাম। মার কাঁদাকাটায় গলে একটা বিয়েও করে ফেললাম।

প্রথমটা সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তেতো লাগতে লাগল, জীবনটা বিস্বাদ হয়ে গেল, আশা-আনন্দের এতটুকু আলোড়নও ভেতরে খুঁজে পেলাম না।

তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেল। নূতন জীবনে রসের খোঁজ পেলাম। জীবনের জুয়াখেলায় হারজিতের কথা কদিন আর মানুষ বুকে পুষে রাখতে পারে?

জীবনে যখন এইসব বড় বড় ঘটনা ঘটছে তখন নিজেকে নিয়ে আমি এমনি ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম যে কবে এক যতীনমামা আর অতসীমামির স্নেহ পরম সম্পদ বলে গ্রহণ করেছিলাম সে কথা মনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। সাত বছর পরে আজ কৃচিৎ কখনো হয়তো একটা অস্পষ্ট স্মৃতির মতো তাদের কথা মনে পড়ে।

মাঝে একবার মনে পড়েছিল, যতীনমামাদের দেশে চলে যাওয়ার বছর তিনেক পরে। সেইবার ঢাকা মেলে কলিশন হয়। মৃতদের নামের মাঝে যতীন্দ্রনাথ রায় নামটা দেখে যে খুব একটা ঘা লেগেছিল সে কথা আজও মনে আছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু হয় নি। সেদিন আপিস থেকে ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর কঠিন অসুখ। মনে পড়ে যতীনমামার দেশের ঠিকানায় একটা পত্র লিখে দিয়ে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, ও নিশ্চয় আমার যতীনমামা নয়। পৃথিবীতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অভাব তো নেই। সে চিঠির কোনো জবাব আসে নি। স্ত্রীর অসুখের হিড়িকে কথাটাও আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আরো চারটে বছর কেটে গেছে।

আমার ছোট বোন বীণার বিয়ে হয়েছিল ঢাকায়।

পুজোর সময় বীণাকে তারা পাঠালে না। অগ্রহায়ণ মাসে বীণাকে আনতে ঢাকা

গেলাম। কিন্তু আনা হল না। গিয়েই দেখি বীণার শাশুড়ির খুব অসুখ। আমি যাবার আগের দিন হু-হু করে জ্বর এসেছে। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন নিউমোনিয়া।

ছুটি ছিল না, ক্ষুণ্ণ হয়ে একাই ফিরলাম! গোয়ালন্দে স্টিমার থেকে নেমে ট্রেনের একটা ইন্টারে ভিড় কম দেখে উঠে পড়লাম। দুটি মাত্র ভদ্রলোক, এক কোণে র‍্যাপার মুড়ি দেয়া একটি স্ত্রীলোক, খুব সম্ভব একজনের স্ত্রী, জিনিসপত্রের একান্ত অভাব। খুশি হয়ে একটা বেঞ্চিতে কম্বলের ওপর চাদর বিছিয়ে বিছানা করলাম। বালিশ ঠেসান দিয়ে আরাম করে বসে, পা দুটো কম্বল দিয়ে ঢেকে একটা ইংরাজি মাসিকপত্র বার করে ওপেনহেমের ডিটেকটিভ গল্পে মনঃসংযোগ করলাম।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়ল এবং পরের স্টেশনে থামল। আবার চলল। এটা ঢাকা মেল বটে, কিন্তু পোড়াদ পর্যন্ত প্রত্যেক স্টেশনে থেমে থেমে প্যাসেঞ্জার হিসাবেই চলে। পোড়াদর পর ছোটখাটো স্টেশনগুলি বাদ দেয় এবং গতিও কিছু বাড়ায়।

গোয়ালন্দের পর গোটা তিনেক স্টেশন পার হয়ে একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে ভদ্রলোক দুটি জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। স্ত্রীলোকটি কিন্তু তেমনিভাবে বসে রইলেন।

ব্যাপার কী? একে ফেলেই দেখছি সব নেমে গেলেন। এমন অন্যমনস্কও তো কখনো দেখি নি! ছোটখাটো জিনিসই মানুষের ভুল হয়, একটা আস্ত মানুষ, তাও আবার একজনের অর্ধাঙ্গ, তাকে আবার কেউ ভুল করে ফেলে যায় নাকি?

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পিছনে দৃকপাত মাত্র না করে তাঁরা স্টেশনের গেট পার হচ্ছেন।

হয়তো ভেবেছেন, চিরদিনের মতো আজও স্ত্রীটি তার পিছু পিছু চলেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'ও মশায়—মশায় শুনছেন?'

গেটের ওপারে ভদ্রলোক দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাঁশি বাজিয়ে গাড়িও ছাড়ল।

অগত্যা নিজের জায়গায় বসে পড়ে ভাবলাম, তবে কি ইনি একাই চলেছেন নাকি? বাঙালির মেয়ে নিশ্চয়ই, র‍্যাপার দিয়ে নিজেকে ঢাকবার কায়দা দেখেই সেটা বোঝা যায়। বাঙালির মেয়ে, এই রাত্রিবেলা নিঃসঙ্গ যাচ্ছে, তাও আবার পুরুষদের গাড়িতে!

একটু ভেবে বললাম, 'দেখুন, শুনছেন?'

সাড়া নেই।

বললাম, 'আপনার সঙ্গীরা সব নেমে গেছে, শুনছেন?'

এইবার আলোয়ানের পোঁটলা নড়ল, এবং আলোয়ান ও ঘোমটা সরে গিয়ে যে মুখখানা বার হল দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

কিছু নেই, সে মুখের কিছুই এতে নেই। আমার অতসীমামির মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেক তফাত। কিন্তু তবু আমার মনে হল, এ আমার অতসীমামিই!

মৃদু হেসে বললে, 'গলা শুনেই মনে হয়েছিল এ আমার ভাগ্নের গলা। কিন্তু অতটা আশা করতে পারি নি। মুখ বার করতে ভয় হচ্ছিল, পাছে আশা ভেঙে যায়।'

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'অতসীমামি!'

মামি বললে, 'খুব বদলে গেছি, না?'

মামির সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কাপড়ে পাড়ের চিহ্নও খুঁজে পেলাম না।

চার বছর আগে ঢাকা মেল কলিশনে মৃতদের তালিকায় একটা অতিপরিচিত নামের কথা মনে পড়ল। যতীনমামা তবে সত্যিই নেই।

আস্তে আস্তে বললাম, খবরের কাগজে মামার নাম দেখেছিলাম মামি, বিশ্বাস হয় নি সে

আমার যতীনমামা। একটা চিঠি লিখেছিলাম, পাও নি?'

মামি বললে, 'না। তারপরেই আমি ওখান থেকে দু–তিন মাসের জন্য চলে যাই।

বললাম, 'কোথায়?'

'আমার এক দিদির কাছে। দূরসম্পর্কের অবশ্য।'

'আমায় কেন একটা খবর দিলে না মামি?'

মামি চুপ করে রইল।

'ভাগ্নের কথা বুঝি মনে ছিল না?'

মামি বললে, 'তা নয়, কিন্তু খবর দিয়ে আর কী হত! যা হবার তা তো হয়েই গেল। বাঁশিকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না! তোমার মেজমামার কাছে তোমার কথাও সব শুনলাম, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমায় আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না। জানি তো, একটা খবর দিলেই তুমি ছুটে আসবে।'

চুপ করে রইলাম। বলবার কী আছে? কী নিয়েই বা অভিমান করব? খবরের কাগজে যতীনমামার নাম পড়ে একটা চিঠি লিখেই তো আমার কর্তব্য শেষ করেছিলাম।

মামি বললে, 'কী করছ এখন ভাগ্নে?'

'চাকরি। এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

মামি বললে, 'একটু পরেই বুঝবে। ছেলেপিলে কটি?'

আশ্চর্য! জগতে এত প্রশ্ন থাকতে এই প্রশ্নটাই সকলের আগে মামির মনে জেগে উঠল!

বললাম, 'একটি ছেলে।'

'ভারি ইচ্ছে করছে আমার ভাগ্নের খোকাকে দেখে আসতে। দেখাবে একবার? কার মতো হয়েছে? তোমার মতো, না তার মার মতো? কত বড় হয়েছে?'

বললাম, 'তিন বছর চলছে। চলো না আমাদের বাড়ি মামি, বাকি প্রশ্নগুলির জবাব নিজের চোখেই দেখে আসবে!'

মামি হেসে বললে, 'গিয়ে যদি আর না নড়ি?'

বললাম, 'তেমন ভাগ্য কি হবে! কিন্তু সত্যি কোথায় চলেছ মামি? এখন থাক কোথায়?'

মামি বললে, 'থাকি দেশেই। কোথায় যাচ্ছি, একটু পরে বুঝবে। ভালো কথা, সেই বাঁশিটা কী হল ভাগ্নে?'

এইখানে আছে।

'এইখানে? এই গাড়িতে?'

বললাম, 'হুঁ। আমার ছোট বোন বীণাকে আনতে গিয়েছিলাম, সে লিখেছিল বাঁশিটা নিয়ে যেতে। সবাই নাকি শুনতে চেয়েছিল।'

মামি বললে, 'তুমি বাজাতে জান নাকি? বার করো না বাঁশিটা?—'

ওপর থেকে বাঁশির কেসটা পাড়লাম। বাঁশিটা বার করতেই মামি ব্যগ্রহাতে টেনে নিয়ে একদৃষ্টিতে সেটার দিকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'বিয়ের পর এটাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম, মাঝখানে এর চেয়ে বড় শত্রু আমার ছিল না, আজ আবার এটাকে বন্ধু মনে হচ্ছে। শেষ তিনটা বছর বাঁশিটার জন্য ছটফট করে কাটিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে বাঁশি বাজানো ছাড়তে না বললেই হয়তো ভালো হত। বাঁশির ভেতর দিয়ে মরণকে বরণ করলে তবু শান্তিতে যেতে পারতেন। শেষ কটা বছর এত মনোকষ্ট ভোগ করতে হত না।'

নেকী

পূর্ববঙ্গের মহকুমা শহর।

শহর সন্দেহ নেই, তবে বিশুদ্ধ নয়। গ্রামের খাদ আছে। চারদিকে ঘুরে এলে মনে হয় যেন এ শহর আর গ্রামের আলিঙ্গনবদ্ধ মূর্তি।

বাজার আর আপিস অঞ্চলটুকু দিব্যি শহর। আপটুডেট বাজার,—কলকাতায় কোনো নতুন ফ্যান্সি জিনিস উঠলে এক মাসের ভেতরে স্থানীয় মনিহারি দোকানগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে। একটিমাত্র বাঁধানো রাস্তা, মাইলখানেক লম্বা,—বাজারের বুক ভেদ করে, আদালতের গা ঘেঁসে গিয়ে মাটির রাস্তায় আত্মগোপন করেছে। বাজারের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা শাখাও আছে।

বাজারের কিছু দূরে পাকা রাস্তার ধারে একটি হাইস্কুল। কাছাকাছি পাবলিক লাইব্রেরি, টাউন হল, অফিসারদের ক্লাব, ক্লাবসংলগ্ন টেনিস কোর্ট ইত্যাদি। অভাব নেই কিছুরই। শহর যেমন হয় আরকি।

বাকিটুকু কিন্তু গ্রাম ছাড়া কিছু নয়। বাড়িঘর সবই প্রায় চাঁচের বেড়া এবং টিনের ছাদ দেয়া। কোনো কোনোটার ভিটেটুকু মাত্র পাকা বাঁধানো। শুধু তাই নয়, গ্রামের যা প্রধান প্রধান লক্ষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান পুকুর ডোবা ঝোপ ঝাড় জঙ্গল বেতবন থেকে আরম্ভ করে সাপ, ব্যাং, শিয়াল, বেজি এবং টিকটিকির রাজসংস্করণ গোসাপ পর্যন্ত সমস্তই আছে।

শহরের পশ্চিমপ্রান্তে আগাগোড়া চুনকাম-করা একটি পাকা বাড়ি। বাড়িটা বরাবর স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ দখল করে থাকেন। এখন আছেন হেমন্ত মুখার্জি।

বাড়িটির পিছনে প্রকাণ্ড এক আমবাগান, তারই একদিকে ডোবা সংস্করণ একটি পুকুর। এক গল্পের আরম্ভ ওইখানে, একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়।

ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে স্নান করছিল। পুকুরের চারদিকে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া গাছপালার প্রাচীর। এত ঘন যে আট-দশ হাতের ভেতরে এলেও বুঝতে পারা যায় না এখানে পুকুর আছে। আশপাশে বাড়িঘরও বেশি নেই, একান্ত নির্জন। মেয়েটির শঙ্কা ছিল না, নিত্যকার মতো সমস্ত পুকুরটা সাঁতরে এসে নিশ্চিন্তচিত্তে অঙ্গমার্জনা করছিল। হঠাৎ ওপারে নজর পড়তে দেখল, বছর বাইশ-তেইশের একটি ছেলে, চোখে সোনার চশমা, একটা আমগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রস্তভাবে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে দিয়ে মেয়েটি সংযত হয়ে নিল। জড়সড় হয়ে তেমনিভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ভদ্রলোকের ছেলে, সরে যাবে।

ছেলেটির কিন্তু নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাগে বিরক্তিতে মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে ধরল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জল থেকে উঠে

এল। তারপর ধীরপদে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে গাছের উপর কী দেখছিল, যেন পৃথিবীর আর কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই!

রাগে গা জ্বলে গেল। তিক্তস্বরে মেয়েটি বললে, 'দেখুন—'

ছেলেটি চমকে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটি বললে, 'এত দূর থেকে দেখতে আপনার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে, ঘাটের পাড়েই চলুন না? আমার স্নানের এখনো বাকি আছে।'

'আমায় বলছেন?'

'দ্বিতীয় ব্যক্তি তো কারুকে দেখছি না এখানে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার যদি এ রকম প্রবৃত্তি' — রাগে দুঃখে মেয়েটির কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি আবার বললে, 'আর একদিন আপনি উঁকি মারছিলেন, কিছু বলি নি। কিন্তু এ আপনার কোন দেশী ভদ্রতা? আপনার বাধে না, কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরে যাই। মানুষকে এত নীচ ভাবতেও যে কষ্ট হয়!'

বিবর্ণ মুখে ছেলেটি বললে, 'এ সব আপনি কী বলছেন? আমি—'

ন্যাকামি! ছেলেটির মুখ দেখে মন একটু নরম হয়েছিল, এই ন্যাকামিতে আবার কঠিন হয়ে গেল। কটুকণ্ঠে বললে, 'অন্যায় বলেছি। দুচোখ বড় বড় করে দেখুন, আপনাকে আমি লজ্জা করব না। স্নানের সময় গরু-মহিষও তো মাঝে মাঝে জল খেতে আসে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল। পেছনে ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, 'দাঁড়ান।'

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল।

'আমায় বিশ্বাস করুন, আপনি স্নান করছিলেন আমি তা দেখি নি। আর একদিনের কথা বললেন, কিন্তু আমি কাল মোটে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। আশপাশে যদি দু-একটা পাখি মেলে এই আশায় সকালে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। একটা ঘুঘু এই দিকে উড়ে এসেছিল, কোথায় বসল তাই দেখছিলাম, আপনাকে নয়।'

হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বললে, 'এটা দেখে আপনার বিশ্বাস হওয়া উচিত।'

পিছন ফিরে ঘাটের দিকে চলতে চলতে মেয়েটি বললে, 'ন্যাকামি করবেন না, আমি কচি খুকি নই।'

ছেলেটির মুখ কালো হয়ে গেল। সকালবেলার উজ্জ্বল আলো পর্যন্ত যেন এক সুন্দরী তরুণীর দেয়া কুৎসিত অপবাদের ছাপে মলিন হয়ে উঠল।

ছেলেটি নিশ্বাস ফেলে সরে গেল। পলাতক ঘুঘুটা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে কাছেই একটা ডালে বসল, বন্দুক তুলতে ইচ্ছা হল না। আঁকাবাঁকা সরু পথটি ধরে বাগান পার হয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে সাদা বাড়িটায় ঢুকল। বন্দুকটা বড় ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বিরস মুখে খাটের একধারে বসে পড়ল।

মা বললেন, 'কী শিকার করলি রে অশোক?'

'অপবাদ।'

'অপবাদ?'

'হুঁঃ,' বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অশোক বললে, 'গাঁয়ের মেয়েগুলি ভারি ঝগড়াটে হয়, না মা?'

'কারু সঙ্গে ঝগড়া করে এলি নাকি?'

অশোক বললে, 'আমায় করতে হয় নি, একাই করেছে। বাবু স্নান করছিলেন, ঘুঘু খুঁজতে যেই পুকুর পাড়ে গেছি, জল থেকে উঠে এসে যা মুখে এল শুনিয়ে দিল। ওত পেতে ছিল বোধ হয়! বাপ্‌, থাকো তোমরা এখানে, কাল আমি কলকাতা চম্পট দিচ্ছি।'

মা বললেন, 'কোন পুকুর? বাগানের ভেতরেরটা?'

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'তবে বোধ হয় হৃদয় মোক্তারের ভাগ্নি। খুব সুন্দর দেখলি?'

'দেখলাম? না দেখতেই যা শোনাল, দেখলে বোধ হয় খেয়েই ফেলত।'

অশোকের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মা হেসে ফেললেন, 'না রে, ও খুব ভালো মেয়ে। দোষের ভেতর একটু তেজি আর ঠোঁটকাটা।'

অশোক বললে, 'হুঁঃ!'

মা বললেন, 'মেয়েদের একটু তেজ থাকা ভালো রে, কাজ দেয়। অন্যায় ও মোটে সহ্য করতে পারে না।'

অশোক বললে, 'জানি। খুব ন্যায়বান ও! কাল এলাম আমি এই জঙ্গলে, আর বলে কিনা আরেকদিন উঁকি মারছিলেন!'

'চিনতে পারে নি। নেকী তো প্রায়ই আসে আমার কাছে, চিনলেই দেখিস ক্ষমা চেয়ে নেবে।'

'নেকী? ওর নাম নেকী নাকি?'

'হ্যাঁ, ছেলেবেলা নাকে কাঁদত বলে ওর পিসি ওই নাম রেখেছিল।' মা হেসে ফেললেন।

অশোক বললে, 'নাকে কাঁদত? যে রকম বলছিল মা, আমি আর একটু হলে কেঁদে ফেলতাম।'

আজও যে সন্ধ্যার পর কালবৈশাখী দেখা দেবে, দুপুরবেলার প্রচণ্ড গুমোট সে সত্যটা নিঃসংশয়েই জানিয়ে দিচ্ছিল। কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ ভাপসা গরমে যেন সিদ্ধ করে দিচ্ছে। শুকনো খটখটে গরম বরং সহ্য হয়, এই ভিজে গরম এমন উৎকট লাগে!

বিছানায় শীতলপাটি বিছিয়েও অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে অশোক ঘামছিল। মা বাড়ি নেই, কাছেই এক মুন্সেফের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। রোদ বৃষ্টিতে আর যা কিছু আটকাক মেয়েদের বেড়ানোটা আটকায় না। ছোট ভাই পুলকের সকালে স্কুল, আমবাগানে তার খোঁজ মিলতে পারে।

হাতের বইটা টেবিল লক্ষ করে ছুড়ে দিয়ে অশোক উঠে বসল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গের ঘাম মুছে অর্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাইরের গুমোট স্তব্ধ পৃথিবীর ওপর সূর্যালোকের নিষ্ঠুর অত্যাচারের দিকে চেয়ে রইল।

দুপুরবেলা,—কিন্তু চারদিকে গভীর রজনীর স্তব্ধতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন স্পর্শ করা যায়, অনুভূতির সীমার মাঝে যেন আপনি হাত বাড়িয়ে ধরা দিতে চায়। রাতদুপুরের যা নিজস্ব, আজ দিনদুপুরে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

হঠাৎ চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো সামান্য একটু বাতাস বয়ে যেতেই ভেজানো দরজাটা মৃদু শব্দ করে খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে চাইতেই অশোক অবাক হয়ে দেখল খান দুই বই হাতে করে নেকী উঠান দিয়ে আসছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শাড়ির আঁচলটুকু মাথায় তুলে দিয়েছে।

বড় ঘরে উঁকি মেরে অশোকের মাকে না দেখে 'মাসিমা' বলে ডাক দিয়ে নেকী

অশোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানার উপরের লোকটির দিকে নজর পড়তেই সে রীতিমতো চমকে উঠল।

'আপনি! ও হ্যাঁ। ঠিক।'

অশোক গম্ভীরভাবে বললে, 'মা বাড়ি নেই।'

'বাড়ি নেই? বই দুখানা ফেরত দিতে এসেছিলাম।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে অশোক বললে, 'ওঘরের টেবিলের ওপর রেখে যান।'

নেকীর যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করলে, 'আপনি অশোকবাবু,— না?'

'হুঁ।'

'তা হলে কালকের ঘুঘুর কথাটা বিশ্বাস করতে হল।'

নেকীর মুখের দিকে চেয়ে অশোক বললে, 'আমার সৌভাগ্য। বিশ্বাসটা হল কিসে? আমি অশোকবাবু বলে?'

মৃদু হেসে নেকী বললে, 'হ্যাঁ। মাসিমার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে, বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আপনার আসবার কথা জানতাম, রাগের মাথায় খেয়াল ছিল না। এখানকার কোনো ফাজিল ছোঁড়া মনে করেছিলাম আপনাকে!'

'বেশ করেছিলেন।'

'আপনি ভীষণ চটেছেন দেখছি।'

অশোক কথা বললে না।

নেকী বললে, 'চটার কথাই। মিথ্যে অপবাদ কে আর সইতে পারে? আচ্ছা আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি, তাতে হবে তো?'

'হবে। কেউ বাড়ি নেই, বিকেলে এলে ভালো করতেন।'

'অর্থাৎ, আপনি এখন যান, এই তো?'

অশোক নির্বিকার উদাসীনের কণ্ঠে বললে, 'সেই রকম মানেই তো দাঁড়ায়।'

নেকীর মুখ ম্লান হয়ে গেল, কথা না খুঁজে পেয়ে বললে, 'তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

'না, না, তাড়াব কেন? অতখানি অভদ্রতা করতে পারি আপনার সঙ্গে? আমার বলবার উদ্দেশ্য'— অশোক থেমে গেল।

'উদ্দেশ্য?'

'উদ্দেশ্য মরুক। আসল কথা কী জানেন, আপনাকে আমি ভয় করি। হয়তো বলে বসবেন, একলা পেয়ে আপনাকে আমি অপমান করেছি।'

'বাকিও তো রাখলেন না কিছু।'

'এ অপমান নয়, অন্য রকম।'

অভদ্র উক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত! চারদিকের নির্জনতা অন্য রকম অপমানের অর্থটাকে এমনি স্ফুটতর করে তুলল যে, অপমানে নেকীর মুখ লাল হয়ে উঠল। বই দুটি মেঝের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললে, 'আপনি চাষা। নিজের মনে ময়লা থাকলে সমস্ত পৃথিবীটাকে কালো দেখায়। স্নানের ঘাটেই পরিচয় পেয়েছি। বলে ঝড়ের মতো চলে গেল।'

মিথ্যা অপবাদের জ্বালা আছে, তাতে রাগ হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু এইবার অশোক স্পষ্ট উপলব্ধি করল, সে ভুল করেছে। শ্রদ্ধা যার প্রাপ্য তাকে দিয়েছে অপমান। সে না হয় নজর দিতে যায় নি, কিন্তু অমন কি কেউ যায় না? বাঙালির মেয়ে, লজ্জায় মাটির সঙ্গে

মিশিয়ে গিয়ে কোনোরকমে ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিয়ে যায়। অমন মুখোমুখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে কটি মেয়ে? ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে কটি মেয়ে একান্ত নির্জনে একজন অপরিচিত যুবকের মুখের ওপর বলতে পারে, আপনি গরু, মহিষ, আপনাকে আমি লজ্জা করব না! আজ তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশে সেই মেয়েটিকেই সে অপমান করেছে। তাও সে যখন ক্ষমা চেয়েছে তখন।

বিকালে দুভাইকে খাবার দিয়ে মা বললেন, 'তোর নেকীদি দুদিন এল না কেন রে পুলক?'

পুলক আমে কামড় দিয়েছিল, আমটা সরিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল, 'দাদা বকেছে।' বলে আবার আমটা মুখে তুলল।

'হুঁ।'

'আবার ঝগড়া হয়েছে তোদের? কী হয়েছিল?'

অশোক বললে, 'পরশু তুমি বাড়ি ছিলে না, দুপুরবেলা বই হাতে করে এসে হাজির। যেমনি বলেছি মা বাড়ি নেই, বিকেলে আসবেন, যা মুখে এল বলে চলে গেল।'

সবটুকু দোষ অশোক নির্বিকারে নেকীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। এমনি করে মানুষ নিজের অন্যায় করার জ্বালার সান্ত্বনা খোঁজে! বেদনা দেওয়া সহজ, আঘাত করা ততোধিক! কিন্তু অমন একটা সহজ কাজ করেও সুখ মেলে না। সুন্দরী এবং তরুণী, তার হাসিভরা মুখখানি যে কথার আঘাতে ম্লান করে দিয়েছিল, এই স্মৃতিটা কাঁটার মতো ক্রমাগত বিঁধে চলে!

মা বললেন, 'কী ছেলেমানুষি যে তোরা করছিস অশোক। নেকী তো গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মেয়ে নয়!'

'না। খুব ভালো মেয়ে!'

রোদ পড়ে এলে পুলককে নিয়ে অশোক বেড়াতে বার হল। আমবাগানের পরেই বিস্তৃত মাঠ, আলে আলে পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা সরু পথটি দিয়ে চলতে তার এমনি ভালো লাগে! মাঝে মাঝে লাঙল দেওয়া ক্ষেতে নেমে পড়ে, মাটির ঢেলাগুলি পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যায়। ক্ষেতগুলি সমস্তদিন বৈশাখের বেহিসাবি সূর্যের তাপ চুরি করে সঞ্চিত করে রাখে, সূর্য বিদায় নিলে মৃদুভাবে সেই তাপ বিকীর্ণ করে। অশোক সর্বাঙ্গ দিয়ে সেটুকু অনুভব করে। চষা মাটির অস্পষ্ট সুবাস তার মনকে উদাস করে দেয়। পুলকের হাত ধরে চলতে চলতে অশোক ভাবে, এমনিভাবেই মাটি যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে চায়। নিশ্চল জড় যেন বলতে চায়, সারা জগতের জীবনের রস জোগাই আমি, আমায় চিনে রাখো!

মাঠের পরে বাড়ি থেকে মাইলখানেক তফাতে ছোট একটি নদী, এখন স্রোত নেই। স্থানে স্থানে জল জমে আছে, বাকিটুকু বালিতে বোঝাই। সাদা ধবধবে বালি। এককালে স্রোতের নিচে ছিল, জলের গতি নিপুণ শিল্পীর মতো অপূর্ব নকশা, এঁকে দিয়েছে। কোথায়ও বালির বুকে ঢেউয়ের ছবির হুবহু ছাপ পড়েছে, কোথায়ও বিচিত্র রেখার সমাবেশে সূক্ষ্ম আলপনা গড়ে ওঠেছে। এমনি সূক্ষ্ম এমনি কোমল যে, দেখলে মনে হয় আঁকল কে? অশোক নিত্য এইখানে এসে বসে। পায়ের দাগে বালির কারুকার্য নষ্ট হয়ে যায়, অশোক ব্যথিত হয়ে ওঠে। অথচ ওই কারুকার্য শতকরা নিরানব্বই জনের চোখেই হয়তো পড়ে না। তুচ্ছ বলে নয়, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার মানুষের একটা বিপুল অক্ষমতা আছে বলে।

অশোক আজ সেইখানেই যাচ্ছিল। আমবাগানের ভেতরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাক দিতেই অশোক আর নেকী একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। কাপড় গামছা নিয়ে নেকী

স্নান করতে যাচ্ছিল, চোখাচোখি হতেই তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে সে অশোককে পথ দিল।

অশোক এগিয়ে গেল, কিন্তু পুলক নেকীর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর যে আমাদের বাড়ি যাও না নেকীদি? দাদা আর কিছু বলবে না, মা বকে দিয়েছে।'

অশোক এগিয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে ডাকল, 'পুলক আয়, দেরি হয়ে গেছে।'

নেকী পুলককে কাছে টেনে নিয়ে কী বলতেই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। নেকীর হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বললে, 'তুমি যাও দাদা, আমি যাব না। নেকীদির সঙ্গে সাঁতার কাটব।'

'বেড়াতে যাবি না?'

পুলক ঘাড় নেড়ে বললে, 'রোজ তো বেড়াই, আজ সাঁতার দেব। তুমিও এসো না দাদা, তিন জনে সুইমিং রেস দেব, নেকীদির সঙ্গে পারবে না তুমি।'

অশোক ধমক দিয়ে বললে, 'এই অবেলায় পচা ডোবায় স্নান করলে অসুখ হবে পুলক। এখন বেড়িয়ে আসি, কাল সকালে বড় পুকুরে সাঁতার কাটব।'

পুকুরের ছোট–বড়ত্বের জন্য পুলকের মাথাব্যথা ছিল না, নেকীদির সঙ্গে সাঁতার দিতে পেলেই সে সুখী। নেকীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত চেপে ধরে দাদার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়ে দিল। নেকী তার হাত ধরে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল।

অশোক ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'এই অবেলায় ওকে যে পচা ডোবায় স্নান করবার জন্য নাচালেন, অসুখ হলে দায়ী হবে কে?'

মুখ না ফিরিয়ে নেকী জবাব দিল, 'আমি। ওর অভ্যাস আছে।'

'অভ্যাস আছে কী রকম? ও কি গেঁয়ো ভূত যে পচা ডোবায় স্নান করা অভ্যাস থাকবে?'

'গেঁয়ো ভূত না হোক, শহুরে বাবু নয়।' বলে নেকী পুলককে নিয়ে মোটা আমগাছটার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শহুরে বাবু! মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তাকে শহুরে বাবু ঠাওরাল নাকি! নিতান্ত চটে যত দূরে সম্ভব দূরে দূরে পা ফেলে হন হন করে বাগান পার হয়ে অশোক মাঠে পড়ল।

মাঠে বেড়ানোর আনন্দটুকু মাঠে মারা গেল। অশোক ভাবলে, কী কুক্ষণেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু অস্বাভাবিক রকম ঘন হয়ে এল। সেদিকে অশোকের নজর পড়ল না। নজর পড়লে নদীর চড়ায় বসে থাকবার মতো সাহস তার হত না।

ঈশান কোণের জমাটবাঁধা কালো ছায়াটি যেরকম দ্রুতবেগে আকাশের অর্ধেকটা ঢেকে ফেললে তাতে আর অল্পক্ষণের ভেতরই যে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় রইল না। হলও তাই। আকাশ যখন প্রায় সবটা ঢাকা পড়েছে তখন অশোক হঠাৎ ব্যাপারটি উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল। যতবার শঙ্কিত দৃষ্টি তুলে আকাশের ভয়ানক কালো, ভয়ানক গম্ভীর মূর্তির দিকে চাইল ততবারই তার গতিবেগ বেড়ে গেল। নেকী তো নেকী, ঝড় শুরু হবার আগে কোনোরকমে বাড়ি পৌঁছানোর চিন্তা ছাড়া অন্য সব কথা তার মন থেকে বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেল। এ সময় একরকম নিত্যকার ব্যাপার হলেও ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের কালবৈশাখীর যে পরিচয় পেয়েছিল তাতে এই নির্জন মাঠে সেই কালবৈশাখীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার কল্পনা করেই সে ভয় পেয়ে গেল।

জমাটবাঁধা অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অশোকের দ্রুত চলা দৌড়নোতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

অশোক পুরী গিয়েছিল, দূর থেকে সমুদ্রগর্জন কেমন শোনায় জানত। পিছন থেকে সেই রকম একটা অস্পষ্ট গর্জন কানে আসতেই সে বুঝতে পারল কালবৈশাখী তাড়া করে আসছে এবং তাকে ধরে ফেলতে মাত্র দু-তিন মিনিটের ওয়াস্তা।

হাঁফ ধরে গিয়েছিল। দৌড়ে বিশেষ লাভ নেই বরং উঁচুনিচু মাঠের ভিতর অন্ধকারে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা পুরো মাত্রায়। বাধ্য হয়ে দৌড়ানো বন্ধ করে অশোক দ্রুত চলা শুরু করলে। আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতে অশোক দেখলে আমবাগান তখনো পাঁচ-সাত মিনিটের পথ।

আমবাগান? ঝড় তো ধরে ফেলবে ঠিক, তখন আমবাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অশোকের ইচ্ছা হল একবার থমকে দাঁড়িয়ে কথাটা ভালো করে চিন্তা করে নেয়। কিন্তু পিছনের গর্জনটা খুব কাছে এবং বেশি রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে দাঁড়াবার সাহস হল না। আর দ্বিতীয় পথের সন্ধান তো সে রাখে না! অন্য সময় ঘণ্টাখানেক ধরে খুঁজে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যাবার ভালো রাস্তা আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভব হত, কিন্তু এখন সারারাত ধরে খুঁজলেও যে সে পথের খবর মিলবে না তা ঠিক। আমবাগান ছাড়া পথ নেই। কাঁচা পাকা ঢের ফল গাছগুলি খাইয়েছে, আজ যদি নিতান্তই চাপা দেয় কী আর করা যাবে!

পিছন থেকে মহা কলরব করতে করতে ঝড় এসে অশোককে এমনি জোরে ধাক্কা দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোনোরকমে সামলে নিল। আর জোরে চলবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন হল না, বাতাসেই অশোককে ঠেলে নিয়ে চলল।

ঠিক যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। চিরকাল মাথা উঁচু করেই আছে, কিন্তু গাছগুলি পর্যন্ত সটান শুয়ে পড়বার জন্য আকুলি ব্যাকুলি শুরু করে দিল। লাখখানেক ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রকৃতি যেন বিদঘুটে রকমের ওয়ার-ডান্স আরম্ভ করে দিল, সব ভেঙে চুরমার করে ঠাণ্ডা হবে। মেঘের সংযম রইল না, ফোঁটা ছেড়ে ধারাপাত আরম্ভ হয়ে গেল। সেই পতনশীল বারিধারা নিয়ে পাগলা হাওয়া এমনি খেলা শুরু করে দিলে যে, দেহের অনাবৃত অংশের স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে এবং বিদ্যুতের আলোতে দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে ভালো করে অনুভব করে অশোকের ইচ্ছে হতে লাগল সেই মাঠের ভেতরই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড়ের শব্দ তো আছেই, তার ওপরে আকাশে মেঘেদের অজস্র চকমকি ঠুকে আলো জ্বালবার অবিশ্রাম চেষ্টায় ক্রমাগত যে আওয়াজ হতে লাগল তাতে অশোকের শ্রবণেন্দ্রিয় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করল।

আমবাগানের শেষ প্রান্তে হৃদয় মোক্তারের বাড়ি, অশোকের পথ তার রান্নাঘরের পাশ দিয়ে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বসানো জানালার পাশে আসতেই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, 'অশোকবাবু, দাঁড়ান।' অশোক থমকে দাঁড়াল।

নেকী অশোকের প্রতীক্ষাতেই রান্নাঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিয়েই বাইরে বেরিয়ে অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, 'গলা চিরে ডেকেছি, যে শব্দ! ভাবলাম বুঝি শুনতেই পাবেন না। ঘরে চলুন।'

'না। মা ভাববেন।'

অশোকের পথ আগলে দাঁড়িয়ে নেকী বললে, 'বাগানের ভেতর দিয়ে তো যাওয়া যাবে না, এর ভেতরেই তিন-চারটা গাছ পড়ে গেছে শব্দ শুনেছি। দাঁড়াবেন না, আসুন।'

অশোক তবু দ্বিধা করল, 'কিন্তু মা যে পাগল হয়ে উঠবেন।'

নেকী ব্যাকুল হয়ে বললে, 'সে অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু যদি গাছচাপা পড়েন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবেন।' বলে হাতজোড় করে বললে, 'অন্য সময় যত পারেন রাগ করবেন, আপনার পায়ে পড়ি চলুন।'

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল, সেই আলোতে নেকীর মুখের যে ব্যাকুল ভাবটা অশোকের চোখে পড়ল তাতে আর দ্বিধা করবার অবকাশ রইল না। বললে, 'চলুন।'

নেকী অশোককে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠান পার হয়ে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠল। দরজায় বাহির থেকে শিকল লাগানো ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে শিকল খুলে ফেললে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, দরজা খুলতেই বাতাসে নিভে গেল।

অশোককে হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে নেকী বললে, 'দাঁড়ান, আলো জ্বালছি।' ঘরের একদিকের তাক হাতড়ে একটা ল্যাম্প নিয়ে এসে বললে, 'আপনার কাছে দেশলাই আছে?'

'না।'

'সিগারেট খান না?'

'না।'

'খুব ভালো ছেলে তো! নাহ, আপনার সঙ্গে তা হলে পারা গেল না দেখছি! রান্নাঘরেই যেতে হল। থাকুন অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।' বলে নেকী বাইরে চলে গেল।

দেশলাই নিয়ে ফিরে এসে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই বললে, 'হাত বাড়িয়ে দেশলাই নিয়ে আলোটা জ্বেলে ফেলুন অশোকবাবু। একবার তো দুজনেই খানিকটা করে জল ঢেলেছি, সর্বাঙ্গে যেরকম ধারা বইছে, এবারে ঘরে ঢুকলে মেঝেতে নদী বয়ে যাবে।'

নিকষ কালো আঁধার, কিন্তু তারই ভেতর নেকীর হাতের দু-গাছি সোনার চুড়ি রান্নাঘরের অদৃশ্যপ্রায় আলোয় চিকচিক করছিল! দেশলাই নিয়ে অশোক একটা কাঠি জ্বালিয়ে বললে, 'একেবারে ভিজে গেছেন যে!'

'সেটা উভয়ত; পরে দুঃখ করা যাবে, বাতিটা জ্বালুন।'

আলো জ্বেলে অশোক বললে, 'মেঝেটা সত্যিই ভেসেছে।'

'তা হোক মুছে নিলেই হবে। আলনা থেকে লাল পেড়ে শাড়িটা দিন। বাক্স না খুললে আবার আপনার কাপড় জুটবে না।'

অশোক শাড়িটা এনে দিলে। বারান্দার একদিকে একটু ঘেরা ছিল, শাড়ি নিয়ে নেকী সেখানে চলে গেল।

অশোকের জামাকাপড়ের অতিরিক্ত জলটুকু ইতিমধ্যে প্রায় সবটাই ঝরে গিয়েছিল, কিন্তু ভিজে জামার আলিঙ্গনটা বড়ই বিশ্রী লাগছিল। জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেকীর প্রতীক্ষায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশোক একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রকাণ্ড ঘর। একপাশে দুটি বড় বড় খাট জোড়া লাগিয়ে পাতা রয়েছে। তাতে যে বিছানা আছে খাটের অর্ধেকটাও আবৃত করবার সাধ্য তার নেই। সেকেলে আসবাব, যেমন বিরাট তেমনি কদাকার। এক কোণে গোটা কুড়ি-পঁচিশ হাঁড়ি কলসি, তাতে সংসারের চাল ডাল থাকে বোঝা গেল। পুরোনো রঙচটা একটা কাঠের আলনা, সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হেলে পড়েছে। ফরসা, মলিন, আস্ত এবং ছেঁড়া নানা রকমের নতুন পুরাতন ধুতি শাড়ি শেমিজ যত্ন করে গোছানো রয়েছে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বাঁশের পেরেকে একটা আয়না ঝুলছে, কাছেই একটা চিরুনি গোঁজা। আয়নার নিচে একটা টুল, তার কাছ হাতলভাঙা কাঠের চেয়ার। একটা আমকাঠের সিন্দুক একটা কোণের সবটুকু দখল করে আছে। মাথা নিচু করে

অশোক খাটের নিচে উঁকি মারল। ধুলোয় মলিন বড় বড় পিতলের হাঁড়ি কলসি ডেকচি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে কুলো ধুচুনি পর্যন্ত সেখানে জমা হয়ে আছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দরজার কাছে নেকী খিলখিল করে হেসে ওঠে বললে, 'ভূত দেখছিলেন নাকি?

'না বাঘ। অন্তত একটা শেয়াল যে খাটের নিচে—'

চোখ তুলে অর্ধপথে সে থেমে গেল। মন থেকে রাগের জ্বালা নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, বিদ্বেষশূন্য দৃষ্টি তুলে লণ্ঠনের আলোতে সম্মুখের তরুণী নারীটির মুখের দিকে চেয়ে অশোক মুগ্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসেছে, ভিজে চুল ভালো করে মোছা হয় নি। একগোছা জলসিক্ত কুন্তল গালের পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমে এসে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে, আলো পড়ে মনে হচ্ছে কে যেন মেয়েটার কপাল বেড়ে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতা ভেজা, তার অন্তরাল হতে যে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার যেন তুলনা নেই।

নেকী লাল হয়ে চোখ নত করলে। হঠাৎ,—'আচ্ছা তো আমি! ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন খেয়ালই নেই।' বলে কাঠের সিন্দুকটার কাছে চলে গেল। ধোপদুরস্ত একখানা ধুতি এনে অশোকের হাতে দিয়ে ভিজে জামাটা নিয়ে বলল, 'কাপড় ছেড়ে ফেলুন, আমি আসছি।' বলে বেরিয়ে গেল।

কাপড় ছেড়ে অশোক ডাকল, 'আসুন এবার।'

নেকী এল। দরজা দিয়ে প্রথম থেকেই কিছু কিছু ছাট আসছিল, ঘরে এসে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে নেকী দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে আপনি আপনি করছেন এমন বিশ্রী লাগছে! এতটুকু সাহস নেই যে তুমি বলেন?'

অশোক বললে, 'সাহস আছে কিনা পরিচয় পাবে। ওটা কী হল?' বলে রুদ্ধ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নেকী বললে, 'এই সহজ কথাটা বুঝলেন না? ছাট আসছিল, বন্ধ করে দিলাম। মেঝেটা ভাসিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই কিছু।'

'কিন্তু—'

'সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে অশোকবাবু, আপনি কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে ভাঙা চেয়ারটাতে বসুন। আমার নাম নেকী, কিন্তু ন্যাকামি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আপনার সঙ্গে একা একঘরে যদি থাকতে পারি, দরজা খোলা-বন্ধয় বিশেষ আসবে যাবে না। খোলা থাকলে বরং ঘরটা ভিজবে।'

অশোক বসে বললে, 'তুমিও বোসো, কতকগুলি প্রশ্ন আছে।'

খাটের কোনায় বসে হাসিমুখে নেকী বলল, 'হুকুম করুন।'

'তুমি এখানে একা থাক?'

নেকী হেসে উঠল,—'তাই কি আপনি সম্ভব মনে করেন নাকি?' হাসি থামিয়ে বলল, 'থাকি তিন জনে, মামা পিসিমা আর স্বয়ং। মামা জমি দেখতে পরশুদিন মফস্বলে গেছেন, পিসি বিকেলে কাদের বাড়ি গিয়েছিল ঝড়ের জন্য আটকা পড়ে গেছে। যে আচমকা ঝড় এল আজ! আপনি ফিরছেন না দেখে আমার যা—ঝড়ের সময় মাঠের মাঝে ভারি ভয় হয় অশোকবাবু।'

ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অশোক বললে, 'আমি চললাম।'

নেকী বিস্মিত হয়ে বললে, 'কী হল আবার?'

'আমার মতো মূর্খ আর নেই। ছি ছি, একবারও খেয়াল হল না!'

'কী হল বলুন না?'

'বুঝলে না? কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে—সে ভারি বিশ্রী হবে, আমি যাই।'

নেকী বললে, 'ভাববেন না, এই ঝড়ে কেউ আসবে না। যাবেনই বা কী করে?'

'না না তুমি বুঝছ না। তোমার কত বড় ক্ষতি হবে, জান?'

নেকী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'জানি, বসুন। সে ভয় করলে আপনাকে ডেকে আনতাম না। পাগল হয়েছেন, ভালো দিনে কেউ আসে না, আর ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে!'

অশোক বসলে। বললে, 'তোমার কিন্তু বেজায় সাহস। লোকে নাই জানুক, আমাকে তো একরকম জানই না, কী বলে ডেকে আনলে?'

'আপনাকে জানি না কে বললে?'

'আমি বলছি। এসেছি পাঁচ দিন, দেখা হয়েছে তিনবার, তিনবারই ঝগড়া করেছি। চেনবার সুযোগ পেলে কোথায়? পুকুরপাড়ে বরং—'

নেকী খিলখিল করে হেসে উঠল। ওটা তার স্বভাব। বললে, 'পুকুরের ঘটনাটা ভোলেন নি দেখছি।'

'না ভুলি নি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বলো কী করে চিনলে আমায়?'

নেকী বললে, 'একজনকে চিনতে হলে তার সঙ্গে দু-চার বছর মিশবার দরকার হয় বলে মনে করেন নাকি আপনি? আমার সঙ্গে প্রথম থেকে যে অমনভাবে ঝগড়া করতে পারে তাকে ভয় করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। বুঝলেন?'

অশোক ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

'তবে অন্য রকম করে বলি। আমাদের অনুভূতি বলে একটা জিনিস আছে অশোকবাবু, একবার দেখলেই আমরা মানুষকে চিনতে পারি। আর কী জানেন, মাসিমার ছেলেকে চিনবার দরকার হয় না।'

নেকীর কথায় তার মার প্রতি এমনি একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেল যে, অশোক খুশি হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা নেকী, তোমার ভালো নামটা কী বলো তো?'

'নেকী নামটা পছন্দ হয় না? ও নামটা আমার একেবারে মানায় না, কী বলেন? আপনি না হয় আমাকে লীলা বলবেন।'

'লীলা? বেশ নাম?'

'সত্যি বেশ?'

অশোক জবাব দিলে না, একটু হাসল।

হঠাৎ নেকী বললে, 'আপনার খিদে পেয়েছে? আম খাবেন?'

অশোক ঘাড় নাড়ল।

'আম খাবেন না? তাহলে কী দিই! কাল সন্দেশ করেছিলাম, গোটা চারেক আছে বোধ হয়, তাই খান তবে।'

অশোক আবার ঘাড় নাড়ল।

'ঘাড় নাড়ছেন যে খালি? ইচ্ছেটা কী?'

'ইচ্ছে কিছু না-খাওয়া। বাড়ি থেকে যতদূর সাধ্য খেয়ে বার হয়েছিলাম, খিদে নেই।'

নেকী মুখ গোঁজ করে বললে, 'হুঁ!'

'রাগ হল? আচ্ছা দাও, খাব।'

'থাক। খিদে না থাকলে খেতে নেই।'

অশোক তৎক্ষণাৎ বললে, 'খিদে যেন পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি। কী দেবে দাও, খেয়ে নি।'

নেকী হাসিমুখে খাবার নিয়ে এল। শুধু সন্দেশ নয়, আমও কেটে দিল। ঘরেই ছিল। কোণের কলসি থেকে জল গড়িয়ে দিল।

অশোক নিঃশব্দে আহারে মন দিল।

নেকী বললে, 'খেতে খেতে কথা বলুন, চুপ করে থাকতে ভালো লাগে না।'

'কী বলব?'

'যা খুশি।'

যা খুশি নয়, অশোক নেকীর কথাই পাড়ল। একটু একটু করে নেকীর জীবনের যে ইতিহাস সে শুনল তাতে অবাক হয়ে গেল।

বড়লোকের মেয়ে, কলকাতায় বাবার ব্যবসা ছিল। মা কবে মারা গিয়েছিলেন, নেকীর মনে নেই। পিসিই তাকে মানুষ করেছে। কী সব কারণ ঘটেছিল নেকী জানে না, তার যখন ষোল বছর বয়স, ব্যবসা ফেল পড়ল। বাজারে দেউলিয়া নাম জাহির হবার আগেই বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথাটা ফুটো করে দিয়ে নেকীর বাবা সব দায় এড়িয়ে গেলেন। আপনার বলতে এই মামা, চোখ মুছতে মুছতে বছর দুই আগেই পিসিকে নিয়ে এই মামার আশ্রয়ে এল। পিছনে ফেলে এল আজন্ম-অভ্যস্ত শৌখিন জীবন।

—'নতুন জীবনের ভয় বাবার শোককে পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছিল অশোকবাবু। পাড়াগাঁ চক্ষে দেখি নি, পিসির কাছে শুনে দু-চোখে খালি অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গাঁয়ের মেয়েরা কীভাবে থাকে, ভোর পাঁচটায় উঠে গোবর দিয়ে কেমন করে ঘর নিকোয়, ডোবায় গিয়ে বাসন মাজে, লাউ-কুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে কেমন আরামে দুবেলা পেট ভরায়—পিসির কাছে লম্বা ফিরিস্তি শুনে মনে হয়েছিল, কাজ নেই বাবা বেঁচে থেকে, তার চেয়ে আপিং গুলে খাওয়া সহজ।'

অশোক বললে, 'তারপর যখন সত্যি সত্যি এলে তখন কেমন লাগল?'

নেকী বললে, 'এসে দেখলাম, ভয়ের কারণ নেই। ঘর নিকোবার দরকার হল না,বাসনও মাজতে হল না। রান্নার ভারটাও পিসিমা নিলেন। সেদিক দিয়ে বিশেষ কষ্ট হল না, কিন্তু কপাল মন্দ, আমি আসার তিন মাসের ভেতরেই কয়েকটা মোকদ্দমায় হেরে মামার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। মামা অবশ্য বললেন না, অবস্থা বুঝে আমি নিজেই ঝিকে ছাড়িয়ে দিলাম। বুক বেঁধে একদিন যে ভয়ে আপিং খেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেই গোবর লেপা থেকে বাসন মাজা পর্যন্ত সব কাজগুলি করে ফেললাম। কোথায়ও কিন্তু বাধল না।'

অশোক বললে, 'রান্নাটাও বোধ হয় এখন করতে হয়?'

'হ্যাঁ। পিসিমার বাতের শরীর, পারেন না।'

ঝড়ের বেগ কম পড়তেই নেকী বললে, 'আপনি এখন আসুন অশোকবাবু। একা ফেলে গেছে, পিসি হয়তো ঝড় ঠেলেই এসে পড়বে। এ সামান্য ঝড়ে আর গাছ পড়বে না।'

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'পিসির আসার কথাই ভাবছ, আমি যদি সবাইকে বলে দিই সন্ধেটা কোথায় কাটিয়ে গেলাম?'

নেকী হেসে বললে, 'ওইটুকু আপনি করতে পাবেন না, এই দুঘণ্টার কথা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।'

'মাকে কিন্তু বলতে হবে।'

'তা তো হবেই, মাসিমাকে বলবেন বৈকি! আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম। চলুন, আপনাকে বরং একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অশোক হেসে বললে, 'তারপর তোমাকে কে এগিয়ে দিয়ে যাবে লীলা?'

'আমার দরকার হবে না, একাই আসতে পারব।'

অশোক ঘরের বাইরে পা দিয়ে বললে, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি শিশু নই। দরজা দিয়ে বোসো, এটুকু খুব যেতে পারব।'

'আচ্ছা, আসুন তবে।'

অশোক বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, নেকী বললে, 'বাড়ি গিয়েই কাপড় ছেড়ে ফেলবেন কিন্তু। দুবার ভিজতে হল, অসুখ না হয়।'

'আচ্ছা,' বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠে এল। বললে, 'তোমার ভয় করবে না তো?'

'একটু একটু করবে। আর দাঁড়াবেন না, পিসি এলে ভারি মুশকিলে ফেলবে।'

অশোক উঠানে নেমে গেল। নেকী চেঁচিয়ে বললে, 'আর একটা কথা অশোকবাবু, আপনাতে আমাতে সন্ধি তো?'

উঠান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে অশোক বললে, 'সন্ধিপত্রের খসড়া করে রেখো সই করে দেব।' বলে রান্নাঘরের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেকী সেইখানে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের বেগ কমেছিল, কিন্তু বৃষ্টি সমভাবেই পড়ছিল। ছাট লেগে নেকীর বসনপ্রান্ত ভিজে যেতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল রইল না।

পরদিন সকালে অশোকের জামা আর কাপড় হাতে করে যেতেই অশোকের মা নেকীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। বললেন, 'বাগানের এক-একটা গাছ পড়ার শব্দ শুনছিলাম আর আমার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছিল মা। যে ছেলে, তুই না ডাকলে ওই বাগানের ভেতর দিয়েই আসত!'

সুখে তৃপ্তিতে লজ্জায় নেকীর মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠল। মাথা নত করল।

মা বললেন, 'বোস, খাবার খেয়ে যাবি। ঠাকুরকে ভাঁড়ারটা বার করে দিয়ে আসি।' বলে চলে গেলেন।

আপনার জামার পকেটে এই কাগজপত্রগুলি ছিল অশোকবাবু। ভিজে চুপসে গেছে।

অশোক কাগজগুলি নিয়ে বলল, 'মনিব্যাগটা?'

'মনিব্যাগ? মনিব্যাগ তো ছিল না!'

'ছিল না কী রকম? কাগজ রইল, ব্যাগ উড়ে গেল?'

নেকী হেসে ফেললে, 'যতই করুন অশোকবাবু, আর ঝগড়া বাধবে না, সন্ধি হয়ে গেছে। ঠাট্টা নয়, বেশি টাকা ছিল নাকি?'

'না, গোটা পাঁচেক। দৌড়বার সময় মাঠে পড়েছিল বুঝেছিলাম, তুলে নেবার সুযোগ হয় নি। ভালোই হয়েছে, সারের কাজ দেবে।'

'তা দেবে, টাকার মতো সার আর নেই।'

মাসখানেক কেটে গেছে।

সকালবেলা মা চা করেছিলেন, ঝরা ফুলের মতো পরিম্লান মূর্তি নিয়ে নেকী এসে তার গা ঘেঁসে বসে পড়ল।

মা বললেন, 'জ্বর ছেড়েছে? উঠে এলি যে?'

'জ্বর নেই। আমার এক কাপ চা দিয়ো মাসিমা।'

'এখনো খাস নি কিছু?'

নেকী ঘাড় নাড়ল।

'তবে আগে একটু দুধ খেয়ে নে, তারপর চা খাস। দুদিনের জ্বরে কী চেহারাই হয়েছে মেয়ের!'

স্টোভের ওপর কড়ায় দুধ জ্বাল হচ্ছিল, বাটিতে ঢেলে নেকীর সামনে ধরলেন।

অশোক বললে, 'তিন-চারবার করে পচা ডোবায় স্নান করলে জ্বর হবে না?'

নেকী বললে, 'প্রথম দিন থেকেই ও পুকুরে স্নান করাটা আপনার চক্ষুশূল হয়েছে দেখছি!'

কী মুশকিল! এ মেয়েটা প্রথম দিনের সেই ঘটনাটুকু নিজেও ভুলবে না, অশোককেও ভুলতে দেবে না।

মা কী কাজে উঠে যেতেই বাটির দুধ প্রায় সবটা কড়ায় ঢেলে দিয়ে চোখ কান বুজে বাকিটুকু নেকী উদরস্থ করে ফেললে। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বললে, 'দুধ তো না, বিষ!'

'তাই দেখছি। মাকে বলতে হবে।'

'না লক্ষ্মী, বলবেন না। এক্ষুনি এক বাটি দুধ গিলিয়ে দেবেন।'

'ভালোই তো।'

'ভালো বৈকি! চায়ের কাপটা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, মার আসবার আগেই পালাই তাহলে।'

অশোক বললে, 'না বোসো বলব না।'

'রাঁধতে হবে, পিসিমার অসুখ।'

'এই শরীরে রাঁধবে?'

'না রাঁধলে চলবে কেন? মামা দুদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে রেখেছেন। এ যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বিকালে আপনার আম খাবার নেমন্তন্ন রইল, পুলককে নিয়ে যাবেন।' বলে নেকী চলে গেল।

বিকালে প্রায় ছটার সময় পুলককে সঙ্গে নিয়ে অশোক আম খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। হৃদয় চক্রবর্তী একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন। কী সৌভাগ্য—কথাটাই উচ্চারণ করলেন বার কুড়ি।

চক্রবর্তীর বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মাথায় চুলে পাক ধরেছে। চুল বলা সংগত নয়, কদমফুলের পাপড়ি। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। হাসবার উপক্রম করলেই সেই জঙ্গল ফাঁক হয়ে তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ কতকগুলি দাঁত আত্মপ্রকাশ করে। এমনি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করতে লাগলেন যে, সেগুলি প্রকাশ হয়েই রইল।

বড় ঘরের বারান্দায় সেই ভাঙা চেয়ার আর টুলখানা পাতা হয়েছিল, অশোক আর পুলককে বসিয়ে চক্রবর্তী নিজে একটা পিঁড়ি দখল করে উবু হয়ে বসে ডাকলেন, 'নেকী!'

নেকী ভেতর থেকে সাড়া দিল, 'আম কেটে নিয়ে যাচ্ছি মামা।'

দু-থালা বোম্বাই আম দুজনের সামনে ধরে দিতেই অশোক বললে, 'এ কী ব্যাপার! এত আম খাব কী করে?'

চক্রবর্তী মাথা নেড়ে বললেন, 'কিছু না কিছু না। যুবাকাল, লোহা পেটে পড়লে হজম হয়ে যাবে। খান, লজ্জা করবেন না। আপনার মাঠাকুরুন নেকীকে স্নেহ করেন তাই, নইলে

আমাদের মতো লোকের বাড়ি আপনাকে খেতে বলা—সাহসই হত না!'

নেকী মুচকে হেসে ভেতরে চলে গেল।

'কী যে বলেন!' বলে অশোক একটা আম মুখে তুলে নিলে। বললে, 'খা পুলক, উনি যখন ছাড়বেন না, যা পারি খাই, বাকি নষ্ট হবে।'

চক্রবর্তী মোক্তার মানুষ বকতে পারেন, আসর সরগরম করে রাখলেন। অশোক কখনো হুঁ দিয়ে কাজ সারতে লাগল, কখনো বললে, 'নিশ্চয়!' কখনো মৃদু হেসে বললে, 'তা বৈকি!' বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে চক্রবর্তী কলিকালের লোকের ধর্মজ্ঞানহীনতা এবং উৎকট লোভপরায়ণতার কথা কীর্তন করলেন। বললেন, 'আদালতে এত মামলা মোকদ্দমা কী জন্যে মশায়? ওই লোভ! মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করে কার দু-বিঘে জমি আছে তাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা! কেন রে বাপু? পরের জিনিস নিয়ে টানাটানি কেন? নিজের যা আছে তাই নেড়েচেড়ে খা না।'

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, 'তা বৈকি!'

এইবার চক্রবর্তীর এই চিন্তার উৎসমুখের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা পাজি লোক তাঁর পাঁচ বিঘে জমি যে কী রকমভাবে আত্মসাৎ করবার উপক্রম করেছে এবং অশোকের বাবার কাছেই মিথ্যে দাবির মোকদ্দমা রুজু করেছে, সবিস্তার বর্ণনা করে চক্রবর্তী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। শুনে অশোক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলে।

থালা অর্ধেক খালি করে ঠেলে দিতেই চক্রবর্তী হাতজোড় করলেন। অশোক ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ও কী? ও কী? সত্যি বলছি আর খাবার ক্ষমতা নেই, নইলে ফেলে রাখতাম না।'

লোকটার প্রতি অশ্রদ্ধায় অশোকের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। বাপের বয়সী ভদ্রলোক, বিনয়ের ছলে নিজেকে ক্রমাগত হীন করে ফেলেছেন দেখে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলে।

জোড়হাতেই চক্রবর্তী নিবেদন করলেন, 'তবে দুটি সন্দেশ মুখে দিন।' বলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁকলেন, 'নেকী! নেকী!'

নেকী নিঃশব্দে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল।

'দুটো আম ফেলে দিলেই হবে? একি হেঁজিপেঁজি লোক পেয়েছিস! বাপের তো টাকা ছিল, এটুকু শিক্ষাও হয় নি? সন্দেশগুলো কি তোর জন্যে এনেছি নাকি?'

চারটে প্রশ্ন! নেকী নতমুখে শুধু সন্দেশের সংবাদটাই দিল, 'সন্দেশ নেই!'

'নেই? কী হল? পাখা গজিয়েছে?'

'আছে, দেওয়া যাবে না। হাঁড়ি ভেঙে সন্দেশ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।'

'হাঁড়ি ভাঙল কেন?'

'তাকের ওপর ছিল, বেড়ালে ফেলে দিয়েছে।'

'হুঁ।' বলে চক্রবর্তী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অশোক হেসে বললে, 'বেড়াল ভালো কাজ করেছে, এর ওপর সন্দেশ খেলে ডাক্তার ডাকতে হত।'

চক্রবর্তী সখেদে বললেন, 'ষোল-সতের বছর বয়স হল, কোনোদিকে যদি নজর থাকে! আপনার জন্য কত যত্ন করে আনা! হায়! হায়! আগেই জানি অদৃষ্ট আমার নিতান্তই মন্দ!'

অশোকের ভাগ্যে সন্দেশ জুটল না সেজন্য চক্রবর্তীর অদৃষ্ট মন্দ হতে যাবে কেন, ভেবে অশোকের হাসি পেল। লোকটির কী অপূর্ব বিনয়!

চক্রবর্তী বলে চললেন, 'অদৃষ্ট মন্দ না হলে এমনটা হয়! সাতপুরুষের জমি আমার, তাতে আর একজন ভোগা দেবার চেষ্টা করে! আপনার বাবার কাছে যতক্ষণ মোকদ্দমা আছে

ভাবনা নেই, উনি বিচক্ষণ হাকিম, চট করে সাজানো মামলা ধরে ফেলবেন! কিন্তু তা কী থাকবে! দেবে হয়তো এক দরখাস্ত ঝেড়ে, কোন কাঠখোট্টা হাকিমের হাতে গিয়ে পড়ব ঈশ্বরই জানেন।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আসি চক্রবর্তী মশাই।'

চক্রবর্তীও উঠে দাঁড়ালেন, 'আসবেন? যা তো মা নেকী একটা আলো নিয়ে সঙ্গে।'

'না না, আলো লাগবে না, এখনো তেমন অন্ধকার হয় নি। এটুকু বেশ যেতে পারব।'

চক্রবর্তী জিভ কেটে বললেন, 'আরে বাসরে! তা কি হয়? গ্রীষ্মকাল, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসুক।'

অশোকের ইচ্ছা হল বলে, আপনিই আলো নিয়ে চলুন না মশাই। রোগা মেয়েটাকে না হয় নাই পাঠালেন!

এ রকম ইচ্ছা দমন করতে হয়। অশোকও করল। নেকী একটা আলো জ্বেলে নিয়ে তার সঙ্গে চলল।

বাগানের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নেকী বললে, 'অশোকবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

অশোক হেসে বললে, 'মস্ত ভূমিকা, অনুরোধ ছোট হলে চলবে না।'

'না, ছোট নয়।'

নেকী একটা ঢোক গিললে। আলোটা এমনভাবে ধরলে যে মুখ তার অন্ধকারেই রইল। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'মামা যে জমির কথা বলছিলেন সেটা সত্যি সত্যি আমাদের। আপনার বাবাকে একটু বলবেন?'

সম্মুখে সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, অশোক তেমনি চমকে উঠল।

অন্য অবস্থায় এ অনুরোধটা অশোকের কাছে এত কদর্য ঠেকত না। সরলভাবে নেকী যদি এই অনুরোধ জানাত, অশোক মৃদু হেসে তাকে বিচারকের কর্তব্যের কথাটা বুঝিয়ে দিত! নেকীর অজ্ঞতায় কৌতুক অনুভব করত। কিন্তু এ যে ষড়যন্ত্র! তাকে ভুলিয়ে আদর দিয়ে, নেমন্তন্ন করে খাইয়ে, শতরকমভাবে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করে এমনিভাবে এই নির্জন আমবাগানে এ অনুরোধ করার আর কোনো অর্থই তো হয় না। টাকা নয়, কিন্তু আদর-যত্নও তো ঘুষের রূপ নিতে পারে! হয়তো এই মেয়েটার রূপ—চক্রবর্তীর নিজের মুখে না জানিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে সুন্দরী তরুণীকে দিয়ে এ অনুরোধ করার আর কী মানে হয়? ঘৃণায় অশোকের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল। গম্ভীরকণ্ঠে বললে, 'তোমার এ অনুরোধের অর্থ জান?'

নেকীর গলা কেঁপে গেল, 'আমরা বড় গরিব অশোকবাবু।'

অন্য সময় এই কণ্ঠস্বর শুনলে অশোকের হয়তো করুণা হত, এখন হল রাগ। বললে, 'গরিব বলে তোমাদের জন্য আমাকে অন্যায় করতে হবে নাকি?'

'অন্যায় তো নয়। জমিটা আমাদের। আমার কথা আপনার বিশ্বাস হয় না?'

তিক্তস্বরে অশোক বলল, 'না, হয় না। হলেও, জমি তোমাদের কি অন্যের সে মীমাংসা হবে আদালতে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে। তোমার অনুরোধ যে আমাকে আর আমার বাবাকে কতদূর অপমান করতে পারে সে ধারণা তোমার নেই বলেই নিঃসংকোচে জানাতে পারলে।'

নেকী কী বলতে গিয়ে সামলে নিল। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'চলুন।'

'থাক,' তোমার আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

নেকীর মুখ দেখা গেল না, দেখলে অশোক ভয় পেয়ে যেত। বললে, 'অতিরিক্ত সাধুতা ফলাবেন না অশোকবাবু!'

অহেতুক দংশন। অন্তরে জ্বালা ধরলে, কারণ যাই হোক, এইরকম যুক্তিহীন কথাই মুখ দিয়ে বার হয়। অশোক কিন্তু তা বুঝলে না, বললে, সাধুতা-অসাধুতার তফাৎ বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই এ কথার জবাব দিলাম না। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ লীলা, ভগবানের দেওয়া রূপকে তুমি তুচ্ছ ঘুষের মতো ব্যবহার করলে!

অন্তরে ওই কথাটাই বড় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বিঁধছিল; অসতর্ক মুহূর্তে অশোকের শিক্ষাদীক্ষা মার্জিত বুদ্ধি সকলের বাধা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। এমন বিশ্রী শোনাল যে অশোক নিজেই চমকে উঠল।

নেকীর হাত থেকে আলোটা পড়ে গিয়ে বার কয়েক দপদপ করে জ্বলেই নিভে গেল।

পুলক ভয় পেয়ে গিয়েছিল, অশোকের একটা হাত ধরে বললে, 'বাড়ি চলো দাদা।'

'বাড়ি? চল।'

অশোক মনকে বোঝাল, নতুন একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল, মন্দ কী! ফুলে যে কীট থাকে সে তত্ত্বটা তো জানাই ছিল! এবার থেকে সাবধান হওয়া যাবে। উহ, কী রকম জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধছিল! মুক্তি পেলাম, বাঁচা গেল।

মুক্তিও বটে, বাঁচাও বটে! দুটোর একটার চিহ্নও অশোক খুঁজে পেল না। বাঁধন খসেছে মনে করতেই বাঁধনে টান পড়ল। যা নেই বলে জানল, তারই টানে টানে পাকে পাকে হৃদয় ভেঙে পড়তে চায় দেখে অশোক চমকে গেল।

অশোক দেখে অবাক হয়ে গেল, নেকীকে সে যেভাবে ভাবতে চায় নেকী সেভাবে ধরা দেয় না। মনে হয়, তার বিতৃষ্ণা যেন তার চোখের সামনে কুয়াশা রচনা করে দিয়েছে, সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে নেকীকে সে নিষ্প্রভ দেখছে, কিন্তু কুয়াশার ওদিকে নেকী তেমনি উজ্জ্বল হয়েই আছে।

অশোক ধরতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় কোথায় যেন ভুল হয়েছে। খোঁজে। হদিস মেলে না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে সে আগাগোড়া একবার ভেবে নিল। হঠাৎ ভুলটা ধরা পড়ে গেল।

চক্রবর্তী! হৃদয় চক্রবর্তী! ঠিক।

অশোক ধড়মড় করে বিছানায় ওঠে বসল। মূর্খ, মূর্খ! নিতান্ত মূর্খ সে। সবটুকুই যে হৃদয় চক্রবর্তীর খেলা এটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তার নেই! মামা আদেশ করলে তার কথা নেকী কেমন করে অস্বীকার করবে? আজ এক মাস যার সঙ্গে পরিচয়, যার চরিত্রের এতটুকু অংশ তার কাছে গোপন নেই, তাকে কী করে এতখানি হীন বলে সে মনে করল? নেকীর তো বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই! অশোকের বুক থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। বন্ধনের যে দড়িদড়াগুলি এতক্ষণ বেদনা দিচ্ছিল হঠাৎ সেগুলি হয়ে গেল ফুলের মালা।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই অশোক আমবাগানে চলে গেল। পুকুরধারে ঘাটের কাছে একটা তালগাছ কাত হয়ে পড়েছিল, তার গুঁড়ির ওপর বসে সরু বাঁকা পথটির দিকে চেয়ে রইল।

একগোছা বাসন হাতে নিয়ে ঝোপ ঘুরে পুকুরের তীরে এসে অশোকের দিকে নজর পড়তেই নেকী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক রাত্রে তার ওপর দিয়ে ঝড় হয়ে গেছে। চোখ

লাল, চোখের কোলে কালি! কাল বিকালে অতি যত্নে কবরী রচনা করেছিল, কার জন্য—বুঝে কাল অশোকের খুশির সীমা থাকে নি। আজ সে কবরী বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

অশোকের বুক টনটন করে উঠল। কাছে এসে বললে, 'লীলা, আমায় মাফ করো।'

নেকীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। জবাব দিতে পারল না।

অশোক আবার বললে, 'আমি বুঝতে পারি নি লীলা। তোমার কোনো দোষ ছিল না।'

'ছিল না?'

অশোক ভুল করলে, বললে, 'না। আমি জানি তোমার মামার জন্যেই—'

'আপনার পায়ে পড়ি অশোকবাবু, যে নীচ, ভগবানের দেওয়া রূপকে যে ঘুষের মতো ব্যবহার করে, দয়া করে তাকে নিচেই থাকতে দিন।' বলে নেকী অগ্রসর হল, 'পথ ছাড়ুন।'

অশোক পথ ছেড়ে দিল। তার অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নেকী ঘাটে নেমে গেল।

পরদিন অশোক কলকাতা রওনা হল।

মাস তিনেক পরের কথা।

সকালে মার কাছ থেকে অশোক একখানি চিঠি পেলে। মা লিখেছেন, মাসখানেক ধরে তিনি জ্বরে ভুগছেন, খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া ধরেছে। ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলেছেন, রাঁচি যাওয়া ঠিক হয়েছে। অশোকের বাবার ছুটি নেই, রাঁচি পর্যন্ত যেতে পারবেন না। কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন, কলকাতা থেকে অশোককে সঙ্গে যেতে হবে। সে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে।

চিঠি পড়ে অশোক মিনিট পনের ভাবল, তারপর সুটকেস গোছাতে বসল। সেইদিন রাত্রের সিরাজগঞ্জ মেলে উঠে বসল।

মা বললেন, 'তোর তো আসবার দরকার ছিল না। আমরাই তো কলকাতা যাচ্ছিলাম। যাক, বেশ করেছিস।'

অশোক মুখ নত করলে। কেন যে এল, সে প্রশ্নের বিরামহীন মহলা তো তার মনেই চলেছে! জবাব দেবে কী?

'তোর কি কোনো অসুখ হয়েছিল অশোক?'

অশোক ঘাড় নেড়েই প্রশ্ন করল, 'পুলকের স্কুল তো ছুটি হয় নি? ওকি এখানে থাকবে?'

কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ছেলের প্রয়াস দেখে মার চোখে জল এল। বললেন, 'থাকবে? থাকবার ছেলেই বটে। আর জানিস, নেকী আমাদের সঙ্গে যাবে।'

অশোক চমকে উঠল।

'মেয়েটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে রে! তুই থাকতেই ম্যালেরিয়া ধরেছিল, এখন কালাজ্বরে দাঁড়িয়েছে! অত্যাচারের তো সীমা ছিল না। জ্বর গায়ে কবার যে স্নান করত ঠিক নেই। কী চেহারা হয়ে গেছে!' মা একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

মার চেঞ্জে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য এবার আর অশোকের কাছে গোপন রইল না।

নেকী অল্প অল্প হাঁটতে পারত, কিন্তু আমবাগান পার হয়ে আসবার তার ক্ষমতা ছিল না। মা পালকি নিয়ে গিয়ে নিজে তাকে নিয়ে এলেন। অশোক উঠানে দাঁড়িয়েছিল, পালকির খোলা দরজা দিয়ে তার দিকে চেয়ে নেকী ম্লান হাসি হাসল। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, অভিমান নেই, সারারাত্রি ঝড়ের আঘাত সয়ে রজনীগন্ধার দল ভোরবেলা যেমন শ্রান্ত ক্লান্ত হাসি হাসে সেইরকম হাসি। অশোক মুখ ফিরিয়ে নিল।

নেকীর পিসির অসুখ, চক্রবর্তীর তাই এই সঙ্গে যাওয়া হল না। পিসি একটু ভালো হলেই যাবেন। যাত্রা করবার সময় ভদ্রলোক হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন, অশোকের মাকে উদ্দেশ্য করে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'আমার আর কেউ নেই মা, ওকে আপনি ফিরিয়ে আনবেন।'

চক্রবর্তীর ওপর অশোকের বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না, আজ তার মনে হল এর চেয়ে ভালো লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নেই।

শহরের প্রান্তবাহী ছোট নদীটি বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। স্টিমার ঘাট পর্যন্ত গাড়ি যায় না, নৌকায় যেতে হয়। স্টিমার ঘাট শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

স্টিমারে উঠে নেকী কেবিনে ঢুকতে রাজি হল না। রেলিঙের পাশে ডেক চেয়ার পেতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। অশোক আর তার মা কাছেই বসলেন। নেকী একদৃষ্টে মেঘনার জলরাশির দিকে চেয়ে রইল, স্টিমার এক তীর ঘেঁষে চলেছে, ওপারের তটরেখা অস্পষ্ট। দু-বছর আগে এই পথ দিয়েই সে একটা অতিপরিচিত জীবনকে পিছনে ফেলে দুরু দুরু বুকে অজানা অচেনা জীবনের মাঝে গিয়ে পড়েছিল। আজ আবার সেই পথেই কোন নতুন জীবনের সন্ধানে সে চলেছে কে জানে! দেনা-পাওনা হয়তো মিটবে না, ওপারের তটরেখার মতোই অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে যে চিরন্তন জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সে জীবনে যেতে মন হয়তো তার কেঁদেই উঠবে! কিন্তু যেতে বোধ হয় হবেই।

অশোক শুষ্ক বিষণ্ন মুখে ডেকের পাটাতনের দিকে চেয়ে রইল। মা-ই কেবল মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলতে লাগলেন। পুলকের এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের সুখ-দুঃখের বালাই নেই, রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে সে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'তোরা গল্প কর অশোক, আমার ভারি মাথা ধরেছে, কেবিনে একটু ঘুমিয়ে নিই গে।'

মা উঠে যেতেই অশোকের মুখের দিকে চেয়ে নেকী হাসল। যেন বলতে চায়, রাগ তো তোমারও নেই, তবে কথা বলছ না কেন?

চেয়ারটা নেকীর কাছে সরিয়ে এনে তার মুখের ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে অশোক বললে, 'আমায় মাফ করেছ লীলা?'

নেকী তেমনিভাবে হেসে বলল, 'মাফ করবার কিছুই নেই, সে সব আমি ভুলে গেছি। তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় করে দেখবার আর আমার শক্তিও নেই, সময়ও বোধ হয় নেই।'

অশোকের চোখে জল এল, বললে, 'আমিই তোমায় শেষ করে দিলাম লীলা।'

নেকী তাড়াতাড়ি বললে, 'না না, ও কথা বোলো না। হঠাৎ অশোকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, কতকগুলি সাদা পাখি কেমন সার বেঁধে চলেছে দেখো! বক তো নয়।'

অশোক দেখলে। বললে, 'না। বুনো হাঁস।'

'হাঁস? ওমা! এ আবার কী রকম হাঁস! আচ্ছা ওরা দল বেঁধে কোথায় চলেছে? বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি?'

অশোক বুঝলে। একেবারে নেকীর পাশে সরে গেল। নেকীর একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর গ্রহণ করে বললে, 'ওদের তো বাড়িঘর নেই, ওরা বেড়িয়েই বেড়ায়।'—তুচ্ছ কথার অন্তরালে অনাড়ম্বর চেষ্টায় এতদিনের বিচ্ছেদের সংকোচ মুছে ফেলাই সবচেয়ে সহজ।

'সত্যি? বাড়িঘর না-থাকা কিন্তু বেশ! না?'

বাতাসে একরাশি রুক্ষ চুল নেকীর মুখের ওপর এসে পড়েছিল। অশোক সযত্নে চুলগুলি সরিয়ে দিলে। আরামে নেকীর চোখ বুজে এল। নিঃশব্দে অশোকের আঙুলের মৃদু স্পর্শটুকু সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ করে চোখ মেলে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জিত সুখের হাসি হেসে বললে, 'ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোই?'

'ঘুমোও।'

নেকীর হাতখানি হাতের মুঠোতেই ধরা রইল। নেকীর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নীল আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল শ্বেত চন্দনের ফোঁটার মতো গতিশীল বুনো হাঁসগুলির দিকে চেয়ে রইল।

শ্রাবণের আকাশ, কিন্তু মেঘ নেই। ওপারের অস্পষ্ট তটরেখা অস্পষ্ট হয়েই রইল।

অশোক মনে মনে বললে, তাই থাক। যে তীর ঘেঁষে চলেছি সেই তীর স্পষ্টতর হোক, উজ্জ্বলতর হোক, ওপারের তটরেখা আরো অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাক।

ছেলেমানুষি

ব্যবধান টেকে নি। হাত দুই চওড়া সরু একটা বন্ধ প্যাসেজ বাড়ির সামনের দিকটা তফাত করে রেখেছে, দু–বাড়ির মুখোমুখি সদর দরজাও এই প্যাসেজটুকুর মধ্যে। পিছনে দু–বাড়ির ছাদ এক, মাঝখানে দেয়াল উঠে ভাগ হয়েছে, মানুষ–সমান উঁচু। টুল বা চেয়ার পেতে দাঁড়ালে বড়দের মাথা দেয়াল ছাড়িয়ে ওঠে।

ব্যবধান টেকে নি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবন–যাপনের, সুখদুঃখ, হাসি–কান্না আশা–আনন্দের, ঘৃণা ভালবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন, অপরাহ্নে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন উৎসুক কল্পনা দিন দিন জমে ওঠে একই ধরনের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দি জীবন— রাঁধে–বাড়ে, বাসন মাজে, স্বপ্ন দেখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুর সংসারের। ইন্দিরার কোলে একদিন আসে গীতা। পরের বছর অবিকল তারই বেদনাকে নকল করে হালিমা পৃথিবীতে আনে হাবিবকে।

যদি বা টিকতে পারত খানিক ব্যবধান, দুরন্ত দুটি ছেলেমেয়ে মানুষের তৈরি কোনো কৃত্রিম দূরত্ব মানতে অস্বীকার করে তাও ভেঙে দেয়। কাছে আনে পরিবার দুটিকে। অন্তরঙ্গ করে দেয় ইন্দিরা আর হালিমাকে।

একদিন একটি শুভ লগ্নে দুটি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় পাড়ায়। গীতা পায় নতুন খেলা। মার শাড়ি ভাঁজ করে সে পরে, সিঁদুরের টিপ আর চন্দনের এলোমেলো ফোঁটা আঁকে কপালে আর গালে, পাড় দিয়ে বাবার লাল টুথব্রাশটির মুকুট এঁটে সে কনে সাজে হাবিবের। কপালে চন্দন লেপে গলায় গামছা পাকানো উড়ুনি ঝুলিয়ে দিয়ে হাবিবকে বরবেশে সে–ই সাজিয়ে দেয়। শাশুড়ির অভিনয় করতে হয় ইন্দিরা আর হালিমা দু–জনকেই। উলু দিয়ে বরণ করতে হয় জামাইকে ইন্দিরার, বৌকে হালিমার। খাবার আনিয়ে জামাই–আদরে বৌ–আদরে দুজনকে খাওয়াতে হয় মুখে খাবার তুলে দিয়ে। নইলে নাকি খায় না নতুন বর–বৌ। থেকে থেকে দু–জনে তারা ফেটে পড়ে কৌতুকের হাসিতে। তাতে রাগতে রাগতে হঠাৎ বিয়ের কনের লজ্জা–শরম ভুলে গিয়ে মেঝেতে হাতপা ছুড়ে কান্না শুরু করে গীতা। তারপর থেকে থেকে তাদের হাসতে হয় মুখে আঁচল গুঁজে।

মাকে নকল করে গীতা হাবিবকে ডাকে, 'ওগো? ওগো শুনছ? জামাই। এই জামাই! ডাকছি যে?'

হাবিব বলে, 'অ্যাঁ?'

'অ্যাঁ কী? অ্যাঁ না। বলে কী গো?'

হালিমা আর ইন্দিরা ঢলে পড়ে পরস্পরের গায়ে। মুখ ভার করে থাকে পিসি। হালিমা বাড়ি ফিরে যাওয়ামাত্র বলে, 'এ সব কী কাণ্ড বৌমা?'

'কেন পিসিমা?'

'চা খাওয়ালে, বেশ করলে। তা চা যে খেয়ে গেল কাপে মুখ ঠেকিয়ে, কাপটা শুধু ধুয়ে তুলে রাখলে সব বাসনের সাথে? গঙ্গাজলের ছিটেও দিতে পারলে না? ভিন্ন একটা কাপ রাখলেই হয় ওর জন্যে। জাতধর্ম রইল না আর।'

'গঙ্গাজলে ধুয়েছি।'—ইন্দিরা অনায়াসে বানিয়ে বলে।

এ বাড়িতে নাসিরুদ্দীনের মায়েরও মুখ ভার।

'ও বাড়ি থাকলেই পারতে? এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ওরা পছন্দ করে কি না কে তা জানে।'

হালিমাও হাসিমুখেই বলে, 'চা না খাইয়ে ছাড়লে না। দেরি হয়ে গেল।'

'তুমি তো খেয়ে এলে চা খুশি মনে। তুমি দিও তো একদিন কেমন খায়?'

'চা তো খায়!'

সব কাজ পড়ে থাকে সংসারের, সময়মতো শুরু হয় নি। নাসিরের মার আসল রাগ কেন হালিমা জানে, তাই জবাব দিতে দিতে সে চটপট কাজে লেগে যায়। বিশেষ কিছুই আর শুনতে হয় না তাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যায় ছোট নাতনিকে কোলে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীনের মা আর ছোট নাতি কোলে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তারাপদর পিসি গল্প জুড়েছে সুখ–দুঃখের।

ব্যবধান টেকে নি।

কাজ সেরে দুপুরে হালিমা যেদিন একটু অপরাধিনীর মতোই এসে বসে, সেদিনও নয়। মৃদু অস্বস্তির সঙ্গে বলে হালিমা, 'একটা কাণ্ড হয়েছে ভাই।'

'ওমা, কী হয়েছে?'

'তোমার মেয়ে একটু গোসত খেয়ে ফেলেছে। আজ আমাদের খেতে হয় জান। হাবিব খেতে বসেছে, আমি কিছুতে দেব না, বেটি এমন নাছোড়। হঠাৎ পাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।'

'কিছু হবে না তো?'— ইন্দিরা বলে চমকে গিয়ে।

হালিমার মুখ দেখে তারপর ইন্দিরা হাসে, বলে, 'কী যে বলি আমি বোকার মতো। হাবিবের কিছু হবে না, ওর হবে! খেয়েছে তো কী আর হবে, ওইটুকু মেয়ে। কাউকে বোলো না কিন্তু ভাই।'

'তাই কি বলি?' হালিমা স্বস্তি পায়—'বাব্বা; আমি জানি না? ও রোজ আলি সাব আর তার বিবি এসে কী দাবড়ানি দিয়ে গেল। হাবিব তোমাদের সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, প্রসাদ খেয়েছে, এসব কে যেন কানে তুলে দিয়েছিল।'

'শোনো বলি তবে তোমায় কাণ্ডখানা।—ঘরে কেউ নেই, তবু ইন্দিরা কাছে সরে নিচু গলায় বলে, হাবিব অঞ্জলি দিয়েছে বলে পিসির কী রাগ! উনি শেষে পঞ্জিকা খুলে আবোল–তাবোল খানিকটা সংস্কৃত আউড়ে পিসিকে বললেন, সরস্বতী পুজোয় দোষ হয় না, শাস্ত্রে লিখেছে! তখন পিসি ঠাণ্ডা হয়ে বললে, তাই নাকি!'

শান্ত দুপুর। ফেরিওলা গলিতে হেঁকে যাচ্ছে, শাড়ি–সায়া–শেমিজ চাই। দুজনে তারা খড়ি নিয়ে মেঝেতে কাটাকাটি খেলতে বসে। হাই ওঠে, বুজে আসে চোখ। চোখে চোখে চেয়ে ক্ষীণ শ্রান্ত হাসি ফোটে দুজনের মুখে। আঁচল বিছিয়ে পাশাপাশি একটু শোয় তারা দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনি, দুটি দাসী।

ঘুমোয় না। সে আরামের খানিক সুযোগ জোটে বেলা যখন আরো অনেক বড় হয় গরমের দিনে। আজকাল শুধু একটু ঝিমিয়ে নেবার অবসর মেলে। ঝিমানো চেতনায় ঘা মারে স্তব্ধ দুপুরের ছাড়াছাড়া শব্দগুলি। তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে থাকে ছাতে হাবিব আর গীতার দাপাদাপির শব্দ।

ব্যবধান টেকে নি। কেন যে সেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল আচমকা এমন ভয়ানক এমন বীভৎস রূপ নিয়ে, কেন এত হানাহানি খুনোখুনি চারদিকে বোঝে না তারা, থতমত খেয়ে ভড়কে যায়, দুরু-দুরু করে বুক। সেবার মাঝে মাঝে বুক কেঁপেছিল সাইরেনের আওয়াজে জাপানি বোমার দিনগুলিতে, দূর থেকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসা অনিশ্চিত বিদেশি বিপদের ভয়ে। তার চেয়ে ব্যাপক, ভয়ানক সর্বনাশ আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের বুকে, শহর জুড়ে, পাড়ায় ঘরের দুয়ারে। বুকের জোরালো ধড়ফড়ানি থামবার অবকাশ পায় না আজ, বাড়ে আর কমে, কমে আর বাড়ে।

তবে কথা এই যে, এটা মেশাল পাড়া। নিজেরাই বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে যতটা নিরুপায় নয় তার চেয়ে অনেক বেশি মরিয়ার মতো। এতেই অনেকটা ভরসা খাড়া আছে মারাত্মক আতঙ্ক গুজব আর উসকানির সোজাসুজি প্যাঁচালো আর চোরাগোপ্তা আঘাত সয়ে, যে আঘাত চলেছেই। বাস্তব একটা অবলম্বনও পাওয়া গেছে সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটিতে, বিভ্রান্ত না করে যার জন্মলাভের প্রক্রিয়াটাও জাগিয়েছে আস্থা। কারণ, বড় বড় কথা উথলায় নি সভার আদর্শমূলক ভাবোচ্ছ্বাসে, মিলনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা হয় নি শুধু মিলনের জয়গান গেয়ে, এই খাঁটি বাস্তব সত্যটার উপরেই বেশি জোর পড়েছে যে এ পাড়ায় হাঙ্গামা হলে সবার সমান বিপদ, এটা মেশাল পাড়া।

হয়তো এ পাড়ায় শুরু হবে না সে তাণ্ডব, কে জানে। চারদিকে যে আগুন জ্বলেছে। তার হলকাতে ছ্যাঁকা লেগে লেগেই মনে কি কম জ্বালা। সবহারা শোকাতুর দিশেহারা আপনজনেরা এসে অভিশাপ দিচ্ছে, বলছে : মারো, কাটো, জবাই করো, শেষ করে ফেলো। এ এসে ও এসে বুঝিয়ে যাচ্ছে মারা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

অনেক কালের মেশামিশি বসবাস। হয়তো তেমন ঘনিষ্ঠ নয় মেলামেশা সবার মধ্যে, সেটা আসলে কিন্তু এটা শহর বলেই। পাখা সবারই পঙ্গু, মানুষকে হাঁস-মুরগি করে রাখা মর্জি মালিকের। পাখা ঝাপটিয়ে চলতে হয় জীবনের পথে।

'তাই তো বলি পাখি নাকি আমরা?' হালিমা বলে মুখোমুখি জানালায় দাঁড়িয়ে, 'তাড়া খেয়ে খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব? গাছের ডালে বাসা বানাব?'

'আর বোলো না ভাই,' ইন্দিরা বলে, 'মাথা ঘুরচে কদিন থেকে। এসব কী কাণ্ড। এ্যাঁ কী রাঁধলে?'

তেমন প্রাণখোলা আলাপ কিন্তু নয়, কদিন আগের মতো। গলায় মৃদু অস্বস্তির সুর দুজনেরই; চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে জানালা দুটির একটি করে পাট খুলে কথা কইছে, কাজটা যেন অনুচিত, আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। দুজনের বাড়িতেই আচমকা আশ্রয় নিতে আত্মীয়স্বজনের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই নয় শুধু, বাড়ির মানুষ বারণ করে দিয়েছে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা—অন্তত সাময়িকভাবে।

'কী যে হবে ভাবছি।'

'দুধে নাকি বিষ মেশাচ্ছে গয়লারা। দুধ জ্বাল দিয়ে আগে বেড়ালটাকে খানিকটা খাওয়াতে হয়, ছেলেপিলেরা খিদেয় কাঁদে, দেওয়া বারণ। আধঘণ্টা বেড়ালটা কেমন থাকে দেখে তবে ওরা পায়। রুটি আনা বন্ধ করেছেন। রুটি যারা বানায় তাদের মধ্যে তোমরাই

নাকি বেশি। এক টুকরো রুটি আর চা জুটত সকালে, এখন শুধু একটু গুড়ের চা খেয়ে থাকো সেই একটা–দুটো পর্যন্ত।'

'এত লোক বেড়েছে, ডাল তরকারি ছিটেফোঁটা এক রোজ থাকে, আর এক রোজ একদম সাফ। ভাতেও টান পড়ে।'

'আজ চিঁড়ে খেয়েছি নুন দিয়ে। গুড়ও নেই।'

চোখে চোখে চেয়ে খানিক মাথা নিচু করে থাকে দুজন। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় জানালার পাট দুটি।

ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেছে দুবাড়িতে। অন্য অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তারা বড়দের সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুখ চেনাচিনিও হয় নি বড়দের মধ্যে কিন্তু ছেলেমেয়েদের কে ঠেকিয়ে রাখবে? তাদের মেলামেশার দাবি রাজনীতির ধার ধারে না, আপস অনুমতির তোয়াক্কা রাখে না, জাতধর্মের বালাই মানে না। স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই, বেড়ানো নেই, বাড়ির এলাকার বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বারণ। বড়দের মুখে অন্ধকার, বাড়িতে থমথমে ভাব, মুমূর্ষু রোগী থাকলে ঘন ঘন ডাক্তার আসবার সময় যেমন হয়। ওরা তাই করে কী, হাবিব আর গীতার নেতৃত্বে নিজেরাই আয়োজন করে মিলেমিশে খেলাধুলো করার। বাড়িতে ঠাঁই নেই, নিজেরাই তৈরি করে নেয় খেলাঘর। হাঙ্গামা করতে হয় না বেশি, বাইরের প্যাসেজে দুপাশের দেয়ালে দুটো পেরেক পুঁতে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিতেই প্যাসেজের শেষের অংশটুকু পরিণত হয়ে যায় চারপাশ ঘেরা ছোটখাটো একটি ঘরে। কিছু চাল ডাল ডাঁটাপাতা জোগাড় হয়েছে। গীতা এনে দিয়েছে ছোট তোলা উনুনটি আর তেলমশলা! তরকারির অনটনে সবার মন খুঁতখুঁত করতে থাকায় হাবিব এক ফাঁকে বাড়ির ভেতর থেকে সরিয়ে এনেছে কিছু আলু পেঁয়াজ আর একটা আস্ত বেগুন। জোরালো পরামর্শ চলছে, সবকিছু দিয়ে এক কড়া খিচুড়ি রাঁধা অথবা খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি সবই রাঁধা হবে। রান্নার ভার নিয়েছে মেহের, তার বয়স ন–দশ বছর, এই বয়সেই বড়দের আসল রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করতে হয় বলে তার অভিজ্ঞতার দাবি সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু উনুনে তাদের আঁচও পড়ে না, রান্নাও শুরু হতে পায় না। টের পেয়ে হা হা করে ছুটে আসে দুবাড়ির বড়রা। মেহেরের বাপের নিকা–বৌ নুরুন্নেসা মেয়ের বেণি ধরে মাথা টেনে গালে চড় বসায়। পুষ্পর মাসিমা এক ঠোনায় রক্ত বার করে দেয় ভাগ্নির ঠোঁটে। কান ছাড়াতে হাতপা ছোড়ে গীতা, লাথি লাগে তারাপদর পেটে। হাবিব কামড় বসিয়ে দেয় নাসিরুদ্দীনের হাতে। বাচ্চাদের কাঁদাকাটা বড়দের হইচই মিলে সৃষ্টি হয় আওয়াজ। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কী হয়েছে জানতে চেয়ে বাধিয়ে নেয় রীতিমতো হল্লোড়, প্যাসেজের মুখে গলিতে জমে ওঠে লাঠি রড ইট হাতে ছোটখাটো ভিড়।

কয়েক মুহূর্ত, আর কয়েক মুহূর্তে স্থির হয়ে যাবে মেশাল পাড়ার ভাগ্য—জিইয়ে রাখা শান্তি অথবা অকারণে ডেকে আনা সর্বনাশ। কান্না তুলে বড় বড় চোখ মেলে ছেলেমেয়েরা চেয়ে দেখে বড়দের অর্থহীন কাণ্ড।

ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে পিস–কমিটির যুগ্মসম্পাদক দুজন ছুটে আসায় অল্পের জন্য হাঙ্গামা ঠেকে যায়। সম্পাদক দুজন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন।

ভিড়ে ভাঙন ধরে। দুচার মিনিটের মধ্যে ভলান্টিয়াররা ভিড় সাফ করে দেয়।

তখন যুগ্মসম্পাদক দুজন পরামর্শ করে ভলান্টিয়ারদের পাঠান পাড়ায় পাড়ায় সত্য ঘটনা প্রচার করতে। এমন স্পর্শকাতর হয়ে আছে মানুষের মন যে, এ রকম তুচ্ছ ঘটনাও

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে পারে মারাত্মক গুজব হয়ে।

বিকালে একটা লরি আসে পুলিশ ও সৈন্যের ছোট একটি দল নিয়ে। চারদিক তখন শান্ত। বুটের আওয়াজ তুলে কিছুক্ষণ তারা এদিক ওদিক টহল দেয়। এ বাড়ির দরজায় ঘা মেরে, এর ওর দোকানে ঢুকে, জিজ্ঞাসা করে কোথায় গোলমাল হয়েছিল। জবাব শোনে আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য, যে কোথাও গোলমাল হয় নি। ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট মনে হয় তাদের, আগমন কি তাদের অনর্থক হবে? গলির মোড়ে নিতাইয়ের দোকানের একপাশে তক্তপোশ পেতে চার জন সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে লরি ফিরে যায় বাকি সকলকে নিয়ে। নতুন এক সশঙ্ক অস্বস্তিবোধ ছড়িয়ে পড়ে মেশাল পাড়ায়। সাঁজবাতির আগেই বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট, মানুষ গিয়ে ঢোকে কোটরে, শূন্য হয়ে যায় পথ।

এ বাড়ি থেকে কথা শোনা যায় ও বাড়ির! কিন্তু কথার আদান প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। চুপিচুপি দু–এক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি জানালার পাটও একটু ফাঁক হয় না। এ বাড়ি ভাবে ও বাড়ির জন্য মিলিটারি এসে পাড়ায় গেড়ে বসেছে, কী জানি কখন কী হয়। ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ। ঘরের জেলে তারা কয়েদ।

ছাত ভাগ করা দেয়ালের এপাশ থেকে গীতা বলে, 'আসবি হাবিব?'

'মারবে যে?'

'না, পিসির ঘরে চুপিচুপি খেলব।'

'পিসি বকবে তো?'

'দূর। রান্না করে নেয়ে আসতে পিসির বিকেল বেজে যাবে।'

ছাতের সিঁড়ির মাঝে বাঁকের নিচু লম্বাটে কোটরটি পিসি বহুদিন দখল করে আছে, তার নিচে দোতলার কলঘর। লম্বা মানুষ এ ঘরে দাঁড়ালে ছাতে মাথা ঠেকবে। পিসির নিজস্ব হাঁড়িকুড়ি কাঠের বাক্স কাঁথা বিছানায় কোটরটি ভরা। কুশের আসন পেতে এ ঘরে পিসি আহ্নিক করে। আমিষ–রান্নাঘরে একবার ঢুকলে স্নান করে শুদ্ধ হবার আগে পিসি আর এ ঘরে আসে না।

ঘরের মধ্যে এভাবে লুকিয়ে চুপিচুপি কী খেলা করবে, হাবিবকে নিয়ে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দেবার উপায় নেই, ওদেরও ডাকা যায় না এখানে। তাই নতুন খেলা আবিষ্কার করে নিতে হয়।

'দাঙ্গা দাঙ্গা খেলবি?' গীতা বলে।

'লাঠি কই? ছোরা কই?' প্রশ্ন করে হাবিব।

গীতা বলে, 'দাঁড়া।'

গীতা চুপিচুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারাপদর ক্ষুর আর ছুরি। ক্ষুরটি পুরোনো, কামানো হয় না, কাগজ পেন্সিল দড়ি কাটার কাজেই লাগে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে গীতা ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি এঁটে দেয়। হাবিবের চেয়ে সে একটু ঢ্যাঙা।

'তুই আকবর আমি পদ্মিনী। আয়!'

খেলা, ছেলেখেলা। অসাবধানে কখন যে সামান্য কেটে যায় একজনের গা অপরের অস্ত্রে।

'মারলি?'

ব্যথা পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে প্রতিশোধ নেয় অপরের গায়ে। জেদি দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুজন, ব্যথায় রাগে অভিমানে দিশেহারা হয়ে কাটাকাটি হানাহানি শুরু করে ভোঁতা ক্ষুর আর ভোঁতা

ছুরি দিয়ে। সেইসঙ্গে চলে গলা ফাটিয়ে আর্ত কান্না। ইন্দিরা পিসিমারা ছুটে আসে কলরব করে। ছুটে আসে ও বাড়ির হালিমা নুরুন্নেসারা। তারা সিঁড়িতে উঠে পিসির কোটরের দরজার সামনে ভিড় করে থাকায় তারাপদ ও বাড়ির অন্য পুরুষদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিঁড়ির নিচে।

সদর দরজায় বাড়ির অন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীন হাঁকে, 'তারাপদ!'

দুটি মাত্র শিক বসানো ছোট্ট একটি খোপ আছে পিসির ঘরে, একসময় একজনের বেশি দেখতে পারে না ভেতরের কাণ্ড। একনজর ভেতরে তাকিয়ে ইন্দিরা আর্তনাদ করে ওঠে, 'মেরে ফেলল! মেয়েটাকে মেরে ফেলল গো।'

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায় : খোল! খোল! দরজা খোল! খুনে ছোঁড়া দরজা বন্ধ করে খুন করছে মেয়েটাকে! দরজা খোল!

হালিমাও একনজর তাকিয়ে অবিকল তেমনি সুরে আর্তনাদ করে ওঠে, 'মেরে ফেলল! ছেলেটাকে মেরে ফেলল!'

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায়! 'খোল! খোল! দরজা খোল! খুনে ছুঁড়ি দরজা বন্ধ করে খুন করছে ছেলেটাকে! দরজা খোল!'

পিসি চেঁচায়, 'হায় হায় হায়! সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলে গো!'

নিচে থেকে নাসিরুদ্দীন হাঁকে, 'তারাপদ! আমরা অন্দরে ঢুকব বলে দিচ্ছি।'

পিসিকে ঠেলে সরিয়ে ইন্দিরা আর হালিমা একসঙ্গে পাগলিনীর মতো খোপের ফোকর দিয়ে ভেতরে তাকাতে চায়, মাথায় মাথায় ঠোকাঠেকি হয়ে যায় দুজনের। আক্রমণে উদ্যত বাঘিনীর মতো হিংস্র চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

ভেতরে ততক্ষণে গীতা আর হাবিবের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। বাইরের হট্টগোলে চুপ হয়ে গেছে তারা। কিন্তু লড়াই থামায় নি, আগে কে হার মানবে অপরের কাছে! নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ে জড়াজড়ি কামড়াকামড়ি করে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় পিসির হাঁড়িকুড়ি।

'হায়, হায়! সব গেল গো, সব গেল!'

নাসিরুদ্দীনকে ওপরে ডেকে আনে তারাপদ।

সে-ই লাথি মেরে দরজা ভাঙে। দরজাটা ঠিক ভাঙে না, ছিটকিনিটা খসে যায়।

ওপর ওপর চামড়া কাটাকুটি হয়েছে খানিকটা, কিছু রক্তপাত ঘটেছে। নিজের নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ ইন্দিরা আর হালিমা ব্যাকুল দৃষ্টি বুলিয়ে যায় তাদের সর্বাঙ্গে। তারপর প্রায় একই সময় দুজনে মুখ তোলে চোখে অকথ্য হিংসার আগুন নিয়ে। দুজনেই যেন অবাক হয়ে যায় অপর কোলে আহত নির্জীব অপরের সন্তানটিকে দেখে, বহুকাল ভুলে থাকার পর দুজনেই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে অন্যজনও মা, তার সন্তানের গায়েও রক্ত।

বাইরে আবার ভিড় জমেছিল। আবার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সংঘর্ষ। তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন দু-বাড়ির এই দুই কর্তাকে পাশাপাশি সামনে হাজির করতে না পারলে পিস-কমিটি এবার কোনোমতেই ঠেকাতে পারত না সর্বনাশ।

আইডিন লাগিয়ে নাইয়ে খাইয়ে দুবাড়িতে শুইয়ে রাখা হয় হাবিব আর গীতাকে। ছুটির দিন, ঢিমেতালে সংসারের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে এমনিই দুপুর গড়িয়ে যেত আগে, এখন আবার বাড়তি লোকের ভিড়। বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ আগে পরে দু-বাড়িতে খোঁজ পড়ে ছেলেমেয়ে দুটির।

খোঁজ মেলে না একজনেরও।

আবার তন্নতন্ন করে খোঁজা হয় বাড়ি, আনাচ কানাচ, চৌকির তলা। গীতা বাড়িতে নেই। হাবিব বাড়িতে নেই।

শঙ্কায় কালো হয়ে যায় দু-বাড়ির মুখ। কিছুক্ষণ গমগম করে স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে মুখর গুঞ্জন।

এ বাড়ি বলে বুক চাপড়ে : শোধ নিয়েছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয় গুম করে রেখেছে, নয়—

ও বাড়ি প্রতিধ্বনি তোলে মাথা কপাল কুটে।

তারাপদ বলে, 'গীতা নিশ্চয় আছে তোমার বাড়িতে নাসির।'

নাসিরুদ্দীন বলে, 'হাবিবকে তোমরা নিশ্চয় গুম করেছ তারাপদ।'

এবার আর রোখা যায় না, আগুনের মতো গুজব আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও উসকানিদাতারা এ মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারে নি, এমনি একটি সুযোগের জন্য তারা যেন ওত পেতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে বাড়ি দুটির সামনে জড়ো হয় দু-দল উন্মাদ মানুষ। এরা ও বাড়িতে চড়াও হবে, ওরা এ বাড়িতে। কিন্তু দল যখন দুটি তখন আগে বাইরে রাস্তায় লড়াই করে অন্য দলকে হটিয়ে জয়ী হতে না পারলে কোনো দলের পক্ষেই বাড়ি চড়াও হওয়া সম্ভব নয়।

মারামারি হবেই। সেটা জানা কথা। আগেই বেধে যেত, পিস-কমিটির চেষ্টায় শুধু দু-দশ মিনিটের জন্য ঠেকে আছে।

যুগ্ম সম্পাদক বলেন, আমরা তল্লাশ করাচ্ছি বাড়ি।

জনতা সে কথা কানে তোলে না। তাদের শান্ত রাখতে গিয়ে গালাগালি শোনে, মারও খায় কয়েকজন ভলান্টিয়ার। তবু তারা চেষ্টা করে যায়। গলির মোড়ের সৈন্য চারজন চুপচাপ বসে আছে।

এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই যে হাবিব! ওই যে।'

আরেকজন চেঁচায়, 'ওই তো গীতা!'

সকলের দৃষ্টিই ছিল নিচের দিকে, এ অবস্থায় কে চোখ তুলে তাকাবে ওপরে। কারো নজরে পড়ে নি যে, নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়ির চিলেকুঠির ছাত থেকে কিছুক্ষণ ধরে পাশাপাশি একটি ছেলে ও মেয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে। ছাত ভাগ করা দেয়ালের দুপাশে দুবাটীর ছাতের সিঁড়ির চিলেকুঠি একটাই। কখন যে তারা দুজন চুপিচুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন কলরব করে ওঠে, 'পাওয়া গেছে। দুজনকেই পাওয়া গেছে!'

সবার চোখের সামনে হারানো ছেলেমেয়ে দুটোর অকাট্য জলজ্যান্ত আবির্ভাব হল বলেই যে মারামারি ঠেকানো যেত, তা নয়। হিংসায় উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে যারা খুনোখুনি করতে এসেছে, অনেকে তারা জানেও না ওদের দুটিকে নিয়েই আজকের মতো গণ্ডগোলের সূত্রপাত। হঠাৎ এই খাপছাড়া ঘটনায়, দু-দলেরই কিছু লোক চঞ্চল হয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠায়, ব্যাপারটি কী জানবার জন্য যে কৌতূহল জাগল জনতার মধ্যে; সঙ্গে সঙ্গে পিস-কমিটির সম্পাদক দুজন সেটা কাজে লাগিয়ে ফেলায় ঘটনার মোড় ঘুরে গেল।

জনতা সাফ হয়ে যাবার অনেক পরে আবার লরি বোঝাই মিলিটারি এল।

বহুক্ষণ সার্চ চলে নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়িতে, গুম করা ছেলেমেয়ে দুটির সন্ধানে। হালিমা আর ইন্দিরার গা ঠেসে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাই দেখতে থাকে গীতা আর হাবিব।

সখী

সদরের কড়া নড়তে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বিভা বলে, 'দ্যাখ তো রিণা কে, কাদের চায়।'

উপরে নিচে পাঁচ ঘর ভাড়াটে। উপরে তিন, নিচে দুই। বাইরে লোক এলে দরজা খুলে খোঁজ নেবার দায়িত্ব স্বভাবতই নিচের তলার ভাড়াটে তাদের উপর পড়েছে, বিভা এবং কল্যাণীদের। সদর থেকে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একরত্তি উঠানটুকু পর্যন্ত সরু প্যাসেজের এপাশের ঘরটা তাদের, ওপাশেরটা কল্যাণীদের। ভিতরে আরো একখানা করে ছোট ঘর তারা পেয়েছে—কিন্তু রান্নাঘর মোটে একটি। কল্যাণীরা রান্নাঘরের ভেতরে রাঁধে, বিভা রাঁধে বারান্দায়। তবে সুবিধা অসুবিধার হিসাব ধরলে লাভটা কাদের হয়েছে ঠিক করা অসম্ভব। রান্নাঘরখানা ঘুপচি, আলো-বাতাস খেলে না, উনান ধরলে একেবারে হাড়কাঁপানো দিনগুলি ছাড়া শীতকালেও ভাপসা গরমে বেশ কষ্ট হয়। নিশ্বাস আটকে আসে, মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের ফালিটুকুর দিকে মুখ তুলে হাঁপ ছাড়তে হয়। বারান্দায় আবার জায়গা এই এতটুকু, নড়াচড়া করতেও অসুবিধা হয়।

সাধারণত কল্যাণীরাই সদরের কড়া নাড়ায় বেশি সাড়া দেয়—তাড়াতাড়ি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে দেয়। বিভাদের বা উপরতলার ভাড়াটেদের কাছে লোকজন কদাচিৎ আসে, কল্যাণীরা নিজেরাও সংখ্যায় অনেক বেশি, দেখা করতে বেড়াতে বা কাজে বাইরের লোকও ওদের কাছেই বেশি আসে। অন্য ভাড়াটেদের তুলনায় বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ অনেক বেশি।

কল্যাণীরা সম্ভবত রান্নাঘরে খেতে বসেছে বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছে, বিভার রান্না খাওয়ার পাট অনেক আগেই চুকে যায়। দু-এক মিনিট দেখে ওদের কাছেই লোক এসেছে ধরে নিয়েও শোয়া রিণাকে তুলে সে খবর নিতে পাঠিয়ে দেয়। এটুকু করতে হয় এক বাড়িতে থাকলে।

ক্ষীণ অস্পষ্ট আশা কি জাগে বিভার মনে যে আজ হয়তো তার কাছেই কেউ এসেছে? কেউ তো একরকম আসেই না, যদিই বা কেউ আজ এসে থাকে!

একটু পরেই ফ্রক-পরা তিন বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে বিভার সমবয়সী একটি মেয়ে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'ভাবতে পেরেছিলি? কেমন চমকে দিয়েছি।'

তাকে দেখেই বিভা ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, ব্যাকুল ও উৎসুক কণ্ঠে সে বলে, 'রানী! ইস্, কী রোগা হয়ে গেছিস! কী চেহারা হয়েছে তোর?'

রানী যেন বেশ একটু ভড়কে যায়, মুখের হাসি খানিকটা মিলিয়ে আসে।

'তা যদি বলিস, তুইও তো কম রোগা হস নি। কালো হয়ে গেছিস যে, তোর অমন রং ছিল?'

দুই সখী ব্যাকুল ও প্রায় খানিকটা ভীতভাবে পরস্পরের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে। দুজনেরই ভাঙাচোরা অতীতের প্রতিবিম্ব নিয়ে যেন দুটি আয়নার মতো তারা পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন খারাপ হয়ে গেছে চেহারা, এত ময়লা হয়েছে রং, অমন ক্লিষ্ট হয়েছে চোখ? এতখানি উপে গেছে স্বাস্থ্যের জ্যোতি, রূপ–লাবণ্য? প্রতিদিন আয়নার সামনে তারা চুল বাঁধে, মুখে পাউডার, সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, নিজেকে রোগা মনে হয়, কখনো একটু আফসোস জাগে। কিন্তু আজ বন্ধুর চেহারা চেয়ে দেখার আগে পর্যন্ত তারা ধরতেও পারে নি কবছরে কী শোচনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে নিজের দেহেও, কীভাবে শুকিয়ে সিটকে গেছে।

'আয় রানী বোস। কটি হল?'

বিভা রানীর মেয়ের হাত ধরে কোলে টেনে নেয়।

'কটি আবার? এই একটি। তোর?'

কতকাল কেটেছে, কবছর? এই তো সেদিন তাদের বিয়ে হল, যুদ্ধ বাধার পর একে একে দুজনেরই। বছর পাঁচেক কেটেছে তাদের শেষ দেখা হবার পর। পাঁচ বছরে একটি মেয়ে হয়ে রানীর সেই আঁটো ছিপছিপে গড়ন, যা দেখে তার প্রতিদিন হিংসা হত, সে গড়ন ভেঙে এমন চাঁচাছোলা প্যাকাটির মতো বেঢপ হয়ে গেছে? কণ্ঠার হাড় উঁকি মারছে, চিবুকের ডৌল বুঝি আর খুঁজলেও মেলে না। অমন মিষ্টি কোমল ফরসা রং জলে ধোয়া কাটা মাছের মতো কটকটে সাদা হয়ে গেছে। বিভা ভাবে আর উতলা হয়, তার চোখে জল আসে। বিভার দুটি ছেলেই ঘুমোচ্ছিল, ছোটটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে রানী মৃদুস্বরে বলে, 'ওর কত বয়স হল?'

'দু–বছর।'

দুটি ছেলেই রোগা, ছোটটির পেট বড়, হাতপা কাঠির মতো সরু। ওদিকে দেখতে দেখতে রানী নিজের চেহারার কথা ভুলে গিয়েছিল। আচমকা সে বলে, 'কী আর করা যাবে, বেঁচেবর্তে যে আছি তাই ঢের। যা দিনকাল পড়েছে।'

'সত্যি! শেষ করে দেবে।'

বিভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে ভুলে গিয়েছিল কী ভয়ংকর দুর্দিনের মধ্যে কী প্রাণান্তকর কষ্টে তারা বেঁচে আছে, ভুলে গিয়েছিল কী অবস্থায় কী খেয়ে কত দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক বুকে নিয়ে তারা দিন কাটায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে আর অস্পষ্ট অনুভব করে করে মনের মধ্যে যে রহস্যময় ভীতিকর একটা চোরাবালির স্তর গড়ে উঠেছে, যার অতল বিষাদ আর হতাশায় মিছে মায়ার মতো দুদিনের অর্থহীন লীলাখেলার মতো জীবন যৌবন তলিয়ে যায়, সেটা আজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এই তবে জীবনের রীতিনীতি মানুষের বাঁধাধরা অদৃষ্ট যে এত তাড়াতাড়ি তারুণ্য আনন্দ উৎসাহ সব শেষ হয়ে যায়? জীবনের এই চিরন্তন নিয়মেই সে আর বিভা জীবনটা শুরু করতে না করতে মাত্র পঁচিশ–ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন হয়ে গেছে? রানী তাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে, না, তা নয়! জীবন অত ফাঁকিবাজি নয়, এমন ভঙ্গুর নয় দেহ। শুধু খেতে পরতে না পেয়ে, চিন্তায় ভাবনায় জর্জরিত হয়ে, হাসিখুশি আমোদ–আহ্লাদের অভাবে তাদের এই দশা।

'একা এসেছিস রানী?'

'একা কেন? ঘোড়ায় চেপেই এসেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'কী আশ্চর্য! তুই কী বল তো? এতক্ষণ বলতে নেই?'

অসহায়ভাবে বিভা পরনের কাপড়খানার দিকে তাকায়। রানী একখানা ভালো কাপড় পরে এসেছে, আগেকার দিনের সঞ্চিত তোরঙ্গে তোলা কাপড়ের একখানা, বিয়েবাড়ির মতো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া কেউ যা পরে না, পরলে মানায়ও না। এ রহস্যের মানে বিভা জানে, তারও একই অবস্থা। আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি যেতে, সিনেমা দেখতে, বেড়াতে বার হতে সাধারণ রকম ভালো কাপড় যা মানায় তার তোরঙ্গেও আগেকার পাঁচ-সাতখানা ছিল, বাড়িতে পরে পরে সে ভাণ্ডার শেষ হয়েছে। এ দুঃশাসনের শেষে দ্রৌপদীদের কাপড় টানাটানির শেষ নেই।

বিয়ের সময়ের দামি শাড়ি আর ঘরে পরার শাড়ির মাঝামাঝি কিছু নেই, রাখা অসম্ভব। ঘরেও তো উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না মেয়েমানুষ? ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে চোখ কান বুজে সাধারণ সামাজিকতা রাখার জন্য সাধারণ রকম ভালো দু-একটা কাপড় সে কিনেছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে এই প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার না করার কিন্তু সম্ভব হয় নি। চব্বিশ ঘণ্টা দেহ ঢাকতে হয়, বাসি কাপড় ছাড়তে হয়, স্নান করে ধুতে হয়, সাবান কেচে ধোপে দিয়ে ধোয়াতে হয়—নিত্যকার এই চলতি প্রয়োজনের দাবি সবচেয়ে কঠোর। তাই ভাবতে হয়েছে, এখনকার মতো পরে কটা দিন চালিয়ে দিই, উপায় কী, ধোপ দিয়ে এনে তুলে রাখব। তুলে রেখেছে কিন্তু বেশি দিন তুলে রাখা যায় নি।

আলনার শাড়ি দু-খানার একটি পরনের খানার মতোই ছেঁড়া, অন্যটি বড় বেশি ময়লা। বাক্স কি খোলা যায়? রানীর স্বামী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন কি অত সমারোহ করা চলে? হাত বাড়িয়ে সে ময়লা কাপড়খানাই টেনে নেয়।

কল্যাণী অমিয়কে জিজ্ঞাসা করছিল, 'কাকে চান?' কল্যাণী বিভার চেয়ে দশ বছরের বড় হবে, তার বেশি নয়। তার দুটি ছেলেমেয়ে, সংসারে এগারজন লোক। সেই চাপে তার লজ্জাশরম মুষড়ে গেছে। আঁচিয়ে উঠে সদরে মানুষ দেখে এক কাপড়ে সে অনায়াসে তার প্রয়োজন জানতে এসেছে, তার সংকোচ নেই দ্বিধা নেই অস্বস্তি নেই । দাসীর মতো দেখায় না রানীর মতো দেখায়, বাইরের অজানা লোকের চোখে কেমন লজ্জাকর ঠেকে এ চিন্তার অঙ্কুরও বুঝি আর গজায় না তার মনে, এমন শক্ত অনুর্বর হয়ে গেছে তার মধ্যবিত্তের অভিমান।

কিন্তু কী ভয়ানক কথা, নিজেও বিভা যে এগিয়ে এসেছে ব্লাউজ না গায়ে দিয়েই! এটা তারও খেয়াল হয় নি। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় বলে দশটা নাগাদ বাড়ির পুরুষরা আপিসে কাজে বেরিয়ে গেলেই সে ব্লাউজ খুলে ফেলে, বিকালে পুরুষদের ফেরার আগে একেবারে গা ধুয়ে আবার গায়ে দেয়। খালি গায়ে থাকাটা কি তারও অভ্যাস হয়ে গেল কল্যাণীর মতোই। দাসী চাকরানি মজুরনির মতোই? কান দুটি গরম হয়ে ওঠে বিভার।

'আমাদের এখানে এসেছেন,' সে কল্যাণীকে বলে, 'সেই যে রানীর কথা বলেছি আপনাকে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু? তার স্বামী।'

'আপনার অসুখ নাকি?' কল্যাণী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে।

'অসুখে পড়েছিলাম, এখন সেরে উঠেছি।'

কল্যাণী বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করে না, অমিয়র চেহারায় সেরে ওঠার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। কোনো রোগ সেরে গেলে এ রকম চেহারা হয় না মানুষের, রোগ বজায় থাকলেই হয়। কালিপড়া চোখে শুধু তার দৃষ্টিটা উজ্জ্বল ঝকঝকে।

'ওহ, মনে পড়েছে,' কল্যাণী আচমকা বলে, 'আপনারই গুলি লেগেছিল। কাগজে পড়ে বিভা বলেছিল আপনার কথা।'

এত বড় কথাটা ভুলে যাবার জন্য কল্যাণী অপরাধীর মতো হাসে।

'অসুখও হয়েছিল।' অমিয় বলে।

দশ মিনিটের বেশি অমিয় বসে না। কাজে যাবার পথে সে রানীকে শুধু পৌঁছে দিতে এসেছে। বেচারির গুলিও লেগেছে, সরকারি দপ্তরের চাকরিটিও গেছে। বন্ধুরা একটি কাগজে মোটামুটি একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাগজটি আবার সরকারবিরোধী, কাগজটাই কবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই।

কিন্তু অমিয়কে বিশেষ শঙ্কিত মনে হল না। বরং কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে।

'কি জানেন সব উনিশ আর বিশ,' সে বিভাকে বলে, 'ও ছাতার চাকরি থেকেই বা কী এমন স্বর্গলাভ হচ্ছিল? ঘরে বাইরে চাকরির মর্যাদা রাখতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নিজের মনটাও মানে না, যেমন হোক চাকরি তো করি, মাস গেলে মাইনে তো পাই যা হোক, একদম মিনিমাম ভদ্রলোকের স্ট্যান্ডার্ড তো অন্তত রাখতে হবে? সে এক ছুঁচো গেলার অবস্থা, পেটও ভরতে পারি না, না-খেয়ে মরতেও পারি না। এখন শালা বেশ আছি, হয় এসপার নয় ওসপার; ব্যস!'

অনায়াসে বিনা দ্বিধা সংকোচে সে বিভার সামনে শালা শব্দটা উচ্চারণ করে। সত্যই করে। কী ছোটলোক হয়ে গেছে শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রসন্তান! পাশে কোথায় রেডিওতে মিষ্টি অলস সুরে গান বাজছে, উঠোনে এঁটো বাসনের ঝনঝনানি। কল্যাণীদের বাসনের সঙ্গে দোতালার এঁটো বাসনও উঠোনে এসে জড়ো হচ্ছে। একসঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদছে তিনটে অথবা চারটে, সংখ্যাটা ঠিক ধরা যায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় বলে, 'আপনার চিঠি পাবার পর থেকে বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া করার জন্য কোমর এঁটে বসেছিল, আমার অসুখের জন্য দেরি হয়ে গেল।'

'কিসের ঝগড়া?'

'বলে নি? চিঠিটা পড়ে কেবলি বলত, দেখলে? ছেলেবেলার বন্ধু, কত ভাব ছিল, কাগজে গুলি লাগার খবর পড়ে একটা চিঠি লিখে দায় সেরেছে। কর্তাটিকে পাঠিয়েও তো খবর নিতে পারত?'

'ওহ এই ঝগড়া!—বিভা সত্যই বিব্রত বোধ করে,—যাব মনে করেছিলাম। ওঁকে তাগিদ দিয়েছি, এক মাসের ওপর যাব যাব করছেন—'

'কিন্তু যেতে পারেন নি।' কোটরে বসা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সোজা বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে দশ মিনিটে গড়া আশ্চর্য অন্তরঙ্গতায় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিয় সহজ সহানুভূতির সায় জানিয়ে বলে, 'আপিস, ছেলে পড়ানো, বাজার, রেশন, কয়লা, ওষুধ, ডাক্তার—কী করেই বা পারবেন?'

'এখানো ছুঁচো গেলার অবস্থা।'—বিভা প্রাণ খুলে হাসে।

অমিয় চলে গেলে বিভা সহজভাবে বলে,. 'নে কাপড়টা ছেড়ে হাতপা এলিয়ে বোস, সং সেজে থাকতে হবে না।'

সত্য কথা বলতে কী, রানীকে এতক্ষণ সে প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারে নি, ভিতরে একটা আবিষ্ট ভাব বজায় থেকে গিয়েছিল। খুশি হলেও সে আনন্দে খাদ ছিল। হোক সে ছেলেবেলার সখী, মাঝখানে অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে চারদিকে ও তার নিজের জীবনে। কে বলতে পারে তাকে কী রকম দেখবে কল্পনা করে এসেছে রানী, তার কাছে কী রকম ব্যবহার আগে থেকে মনে মনে চেয়ে এসেছে? হয়তো অনেক কিছু অন্য রকম দেখে তার ভালো লাগছে না—হয়তো সে ভুল বুঝছে তার কথা ও ব্যবহার, আরো হয়তো ভুল বুঝবে! এই একখানা আর পাশের আধখানা নিয়ে দেড়খানা ঘরে কত দিকে যে বিষিয়ে গেছে জীবনটা, সে নিজেই কি খানিক খানিক জানে না? রানী এসে দাঁড়ানো মাত্র তার ফ্যাকাশে ম্লান চেহারা দেখে উতলা হওয়ার সঙ্গে প্রাণটা তার ধক করে উঠেছিল বিপদের আশঙ্কায়!

তার সখী এসেছে, এককালে দিনে অন্তত একবার যাকে কাছে না পেলে সে অস্থির হয়ে পড়ত, এতদিন পরে সেই সখী এসেছে তার ঘরের দরজায়—আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে তো সে অভ্যর্থনা করতে পারবে না, হেসে কেঁদে অনর্গল আবোল-তাবোল কথা যা মনে আসে বলে গিয়ে প্রমাণ দিতে পারবে না সে কৃতার্থ হয়েছে! সে সাধ্য তার নেই, হাজার চেষ্টা করেও বেশিক্ষণ সে আনন্দোচ্ছ্বাস বজায় রাখতে পারবে না, ঝিমিয়ে মিইয়ে তাকে যেতেই হবে। কী ভাববে তখন রানী? কী বিশ্রী অবস্থা সৃষ্টি হবে?

আরো ভেবেছিল: বিকাল পর্যন্ত যদি থাকে, চায়ের সঙ্গে ওকে কী খেতে দেব? ওর মেয়ে যদি দুধ খায়, দুধ কোথায় পাব? শ্রান্তিতে যদি ওর হাই ওঠে, বিছানায় কী পেতে দিয়ে ওকে আমি শুতে দেব?

দশ মিনিটের মধ্যে অমিয় তাদের সখিত্বকে সহজ করে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। বিভার আর কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই, সংকোচও নেই। কারণ, কোনো অভাব, কোনো অব্যবস্থার জন্য রানী তাকে দায়ী করবে না, তার মেয়ে দুধের খিদেয় কাঁদলে সে যদি শুকনো দুটি মুড়ি শুধু তাকে খেতে দেয়, তাতেও নয়! চাদরের বদলে ময়লা ন্যাকড়া পেতে দিলেও গা এলিয়ে রানী তাকে গাল দেবে না মনে মনে।

এটুকু অমিয় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

ময়লা শাড়িখানা পরে রানীও যেন বাঁচে।

'একটা পান দে না বিভা?'

'কোথা পাব পান? ত্যাগ করেছি। মাসে তিন-চার টাকা খরচ—কী হয় পান খেয়ে? একটি লবঙ্গ মুখে দিলে মুখশুদ্ধি হয়। নে।' বিভার বাড়ানো হাতে প্ল্যাসটিক্‌সের চুড়ি নজর করে রানী হাসে। 'তুইও ধরেছিস? ভাগ্যে এ ফ্যাশনটা চালু হচ্ছে—সোনা না দেখে লোকে কিছু ভাবে না।'

'ফ্যাশন কি এমনি চালু হয়? যেমন অবস্থা, তেমন ফ্যাশন। সোনা নেই তোর?'

'টুকটাক আছে। তোর?'

'চারগাছা চুড়ি, সরু হারটা আর কানপাশা। ও বছর টাইফয়েডের এক পালা গেল, তারপর আমার কপাল টানল হাসপাতালে। মরবে জেনেও কেন যে পেটে আসে বুঝি না ভাই। আমাকেও প্রায় মেরেছিল, কী যে কষ্ট পেলাম এবার। অথচ দ্যাখ, এ দুটোর বেলা ভালো করে টেরও পাই নি। দিনকাল খারাপ পড়লে কি মানুষের বিয়োনের কষ্টও বাড়ে?'

'বাড়ে না? খেতে পাবে না, মনে শান্তি থাকবে না, গায়ে পুষ্টি হবে না; বিয়োলেই হল?'

দুই সখী অদ্ভুত এক জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চোখে চোখে তাকায়, দুজনের মনে একসঙ্গে একই অভিজ্ঞতা একই সমস্যা জেগেছে, আজ দুজনের নিরিবিলি দুপুরে কাছাকাছি আসার সুযোগে পরস্পরের কাছে প্রশ্নটা তাদের যাচাই করে নিতেই হবে। জানতে হবে, খাপছাড়া অদ্ভুত একটা ফাঁদে পড়ার যে রহস্যময় ব্যাপারটা নিয়ে যন্ত্রণার অন্ত নেই, সেটা শুধু একজনের বেলাই ঘটেছে না দুজনেরই সমান অবস্থা। বুঝতে হবে কেন এমন হয়, এমন অঘটনের মানে কী?

রানী বলে, 'বল না? তুই আগে বল।'

আগেও ঠিক এমনিভাবেই জীবনের গহন গভীর গোপন রহস্যের কথা উঠত, কেউ একজন মুখ খোলার আগে চোখমুখের ভাবভঙ্গি দেখেই দুজনে টের পেত যে জগতের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা শুধু তাদের দুই সখীর প্রাণের কথা বলাবলি হবে।

'বিভা বলে, কিছু বুঝতে পারি না ভাই। এ রকম যাচ্ছেতাই শরীর, কী যে খারাপ লাগে

বলার নয়, তবু আমার যেন বেশি করে ভূত চেপেছে। বিয়ের পর দু-এক বছর সবারই পাগলামি আসে; ও বাবা, এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তখন রীতিমতো সংযমী ছিলাম বলা চলে। আগে ভাবতাম ও বেচারির দোষ, ঝগড়া করে ও-ঘরের ঘুপটির মধ্যে বিছানা করে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তখন টের পেলাম কী বিপদ, আমারও দেখি মরণ নেই! ঘুম আসবে ছাই, উঠে এসে যদি ডাকে ভেবে কী ছটফটানি আমার। বিশ্বাস করবি? থাকতে না পেরে শেষে নিজেই এলাম।'

রানী একটু হাসে, 'উঠে এসে বললি তো একা শুতে ভয় করছে?'

'তোরও তবে ওই রকম?'—বিভা যেন স্বস্তি পায়।

'কী তবে? তোর একরকম আমার অন্যরকম?'

দুই সখী আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রানী বলে, 'তবে আমার আজকাল কেটে গেছে, অন্যদিকে মন দিতে হয়। তোরও কেটে যাবে।'

একটু ভেবে রানী আবার বলে, 'আমার মনে হয় এ একটা ব্যারাম। ভালো খেতে না পেলে ভাবনায় চিন্তায় কাহিল হলে এ রকম হয়। ছেলেপিলেকে দেখিস না পেটের ব্যারাম হলে বেশি খাই খাই করে, চুরি করে যা-তা খায়?'

'চুরি করেও খাস নাকি তুই?'

দুই সখী হেসে ওঠে।

সেই এক মুহূর্তের হাসির ক্ষীণ শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যায় শিশুর কান্না বাসন নাড়ার শব্দ মেশানো দুপুরের স্তব্ধতায়। শুধু শিশুর কান্না নয়, এ বাড়ির দোতলাতেই মেয়েলি গলায় একজন সুর করে কাঁদছে। উপরতলায় একজন ভাড়াটে রমেশ, তার বুড়ি মা। রমেশের ছোট ভাই অশেষ, সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির ধান্ধায় ঘুরতে শুরু করেছিল, কদিন আগে টিবি রোগে সে মারা গেছে।

'এই সেদিন দেখেছি চলাফেরা করছে,' বিভা হঠাৎ শিউরে উঠে বলে, 'দিনরাত ঘুরে বেড়াত। ওর সঙ্গে তর্ক করত আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কি না। এই বিছানায় বসে একদিন রাত্রে কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করল, এক ঝলক রক্ত উঠে চাদরে পড়ল। কী রকম ভ্যাবাচেকা খেয়ে যে চেয়ে রইল ছেলেটা। আগে একটু আধটু রক্ত পড়েছে গ্রাহ্যও করে নি, সেদিন প্রথম বেশি পড়ল। নিজের শরীরটাকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না, কী যে হয়েছে আজকালকার ছেলেরা—'

আনমনে কী যেন ভাবে, একটু ম্লান হেসে বলে, 'প্রথমে ঠিক হয়েছিল চাদরটা পুড়িয়ে ফেলব। কিন্তু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চাদর কিনতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাই—'

এ কথাটাও বিভা শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারে না, আবার আনমনা হয়ে যায়।

'কী ভাবি জানিস রানী? শুধু শাক-পাতা আর পচা চালের দুমুঠো ভাত খায়, না একফোঁটা দুধ না একফোঁটা মাছ। এই খেয়ে আপিস করা, রাত নটা পর্যন্ত ছেলে পড়ানো। একদিন যদি ওইরকম কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করে আর—'

এ কথারও শেষটা মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব।

রানী অসম্ভবকে সম্ভব করে যোগ দেয়,—'রক্তে বিছানা যদি লাল হয়ে যায়? আমিও আগে এ রকম আবোল-তাবোল কত কী ভাবতাম। রক্তে একদিন রাস্তাই লাল হয়ে গেল। আর ভাবি না। কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করার? সংসারে কুলি-মজুরও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।'

সিঁড়ি

একতলার উত্তর প্রান্ত থেকে দোতলা আর তিনতলার মধ্যস্থতা অতিক্রম করে সিঁড়িটা তেতলার খোলা ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদে পৌঁছানোর জন্যে সাধারণ নিয়মে চৌষট্টিবার একটি পায়ের জোরে মাধ্যাকর্ষণের বিরোধিতা করতে হয়। তবে সাধারণ নিয়ম সকলের জন্য নয়। এমন মানুষও জগতে আছে যারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার সময় দুটো তিনটে ধাপ একেবারে ডিঙিয়ে যায়। এরা মানুষ হয়েও ঠিক মানুষ নয়,—মহামানব। মহামানব এইজন্যে যে এ জগতে মহামানবী নেই, কারণ মেয়েরা কোনোদিন দুটো তিনটে ধাপ ডিঙিয়ে ওপরে ওঠে না। ক্ষমতাও নেই, বাধাও আছে।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটাকে ঢাকা দেবার ছাদটুকুর উপরে পাতলা দেয়াল আর টিনের চালের একটি চিলেকুঠি আছে এ বাড়িতে। পথ থেকে বাড়ির ভিটেয় উঠবার জন্য আর একতলার বারান্দা থেকে উঠানে নামবার জন্য এ বাড়িতে ধাপের ব্যবস্থা মোটে একটি করে; কিন্তু চিলেকুঠিতে ওঠানামার জন্য ধাপ আছে দুটি, তাই এও একটা সিঁড়ি। দুটি একের সমষ্টি যখন দুই এবং ধাপের সমষ্টি মাত্রেই সিঁড়ি, চিলেকুঠিটিকে সিঁড়ি থাকার গৌরব না দিয়ে উপায় নেই।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটিকে বাড়ির ছায়াই শীতল করে রাখে, চিলেকুঠির সিঁড়ি কিন্তু চিলেকুঠির ছায়া পায় শেষ বেলায়, গ্রীষ্মকালেও সূর্য যখন নিস্তেজ। মেঘলা দিন বাদ দিয়ে শীতের দুমাস পরেও দুপুরবেলা চিলেকুঠিটি হয়ে থাকে শীতার্ত মানুষের স্বর্গ আর সিঁড়িটি হয়ে থাকে আগুন। শীতগ্রীষ্ম নির্বিশেষে যে শীতার্ত, তারও পায়ের পাতা পুড়িয়ে দেয়।

ডান পায়ের চেয়ে ইতির বাঁ পা-টি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি ছোট। হ্রস্ব পা-খানি প্রথম ধাপে নামিয়েই সে তুলে নেয়। ব্যাপারটা মানবকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁতের ফাঁকে সজোরে শব্দ করে, 'ইস!'

মানব বলে, 'গরম বুঝি?'

ইতি বলে, 'আগুন হয়ে আছে।'

ঘরে কুঁজোয় জল ছিল, একতলা থেকে মানবের নিজের বয়ে আনা জল। কুঁজো কাত করে মানব সিঁড়িতে জল ঢেলে দেয়। যতক্ষণ সে জল ঢালতে থাকে ইতি কথা বলে না, সবটুকু জল মানব ঢেলে দেয় কি না দেখবার জন্য চুপ করে থাকে। কুঁজো খালি হয়ে গেলে মানবের হাত চেপে ধরে বলে, 'সব জল ঢেলে দিলে? একটু খেতাম আমি, তেষ্টা পেয়েছে।'

'এতক্ষণ খাও নি কেন?'

'এতক্ষণ কি মনে ছিল? জল দেখে খেয়াল হল।'

মানব একটু হাসে। চল্লিশ বছরের পুরোনো মুখখানায় সাত দিনের দাড়িগোঁফ জমেছে,

বাঁ দিকের গালটি কবে যেন চিরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। ঘাম মুছে মুছে মাজা বাসনের মতো কপাল চিকচিক করছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঠোঁট দুটি কালো। দাঁতে আর মুখে বেহিসেবি পান খাওয়ার ইতিচিহ্ন। শান্ত নির্মল হাসিটুকু তাই আরো অপূর্ব মনে হয়,—ইতির মুখও সলজ্জ হাসিতে ভরে যায়, ব্রণের ছোট ছোট গর্তভরা দুটি গালেই টোল পড়ে সৃষ্টি হয় দুটি বড় গহ্বরের।

মানব বলে, 'চলো নিচে যাই। তুমি জল খাবে আমি কুঁজোটা ভরে নিয়ে আসব।'

ইতি বলে, 'তোমার তেষ্টা পায় নি?'

মানব বলে, 'পাবে পাবে, ভাবছ কেন?'

ধাপ দুটি ভাসিয়ে কুঁজোর জল ছাদে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল, নালির কাছাকাছি একসঙ্গে মিলে এতক্ষণে নালি দিয়ে নিচে ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ছাদে শুকনো শ্যাওলা, আর কয়েকটি দুপুরের রোদ পেলেই আলগা হয়ে উঠে জাগবে আর সন্ধ্যার পর মানবের পায়চারিতে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কুঁজো হাতে এক ধাপ নেমেই বোধ হয় আগামী সন্ধ্যায় নিজের পায়চারি করার দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে ওঠে মানবের, মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'সন্ধ্যার সময় আসবে একবার?'

'না এলে রাগ করবে?'

'রাগ? আর কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি? এবার থেকে অভিমান করব।'

'তা হলে আসব না।'

মানব খুশি হয়ে বলে, 'সেই ভালো। আজ একা একা তারা গুনে অভিমান করব, কাল তুমি এসে আমার অভিমান ভাঙাবে। আমার এমন ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে করছে ইতি! কী রকম যে লাগছে আমার কী বলব!'

'আমারও।'

দৃষ্টির একটু গভীরতা এসেছে বৈকি মানবের, মনটি তো অন্তত শান্ত হয়েছে। দুজনেই যখন ছাদে নেমেছে, সে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো ইতি?'

'না গো, না। কিসের কষ্ট?'

সন্ধ্যার পর না এসে ইতি তাকে অভিমান করার সুযোগ দেবে, পরামর্শ হচ্ছে এই। এখনই যেন মানবের অভিমান হয়, মুখখানা গম্ভীর করে সে বলে, 'তোমার চেয়ে আমি অনেক বড় কিনা, তাই বলছি।'

'আমিই বা কী এমন আকাশের পরী!'

অভিমান গাঢ় হয়; মানবের চোখ পর্যন্ত যেন ছলছল করে।

'আকাশের পরী হলে তুমি আমার দিকে তাকিয়েও দেখতে না তো?'

'কী ছেলেমানুষ তুমি।'

আকাশে রোদ, ছাদ গরম। আবার মানবের মুখ হাসিতে ভরে যায়, ইতির কাঁধে মুখ রেখে কথা বলতে গিয়ে কিছু না বলাই সে ভালো মনে করে। কথা বলার চেয়ে কঠিন হাসি হেসে ইতিকে তাই হাসির জবাব দিতে হয়। এ কী আশ্চর্য যে নিচে নামবার কথা ভুলে যাওয়ার মতো ভঙ্গিতে দুজনে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? পায়ের তলার ছাদটুকু ছাড়া আর সব যেন অনাবশ্যক হয়ে গেছে। অনেক উঁচুতে এই ছাদ—দামি একটা হাউই পৃথিবী ছেড়ে যত উঁচুতে উঠতে পারে হয়তো তত উঁচুতে নয়, কিন্তু কে আর সে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে বসবে দামি হাউই ছেড়ে? আশপাশের বাড়িগুলো তো এত উঁচু

নয়, এ বাড়ির মতো ইট বের করা নয় বলে কেবল দেখতে সুন্দর। কিন্তু সেটুকুও এ বাড়ির ছাদে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদেরই ভালো লাগে, চোখ মেললেই সমগ্রভাবে চোখে পড়ে। তা ছাড়া পাওয়া যায় আচ্ছন্ন, অভিভূত হওয়ার একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা।

'ইস।'

এবার মানবের চমক লাগে।

'গরম বুঝি?'

'আগুন হয়ে আছে।'

মানব আফসোস করে বলে, 'তোমাকে আজ খালি কষ্ট দিচ্ছি।'

'দিচ্ছই তো। খালি খালি কষ্ট দেওয়ার কথা বলছ।'

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়ির ছায়াতে নেমে যাওয়া মাত্র দুজনে যেন আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মানব বলে, 'সিঁড়িটা তো বেশ ঠাণ্ডা!'

ইতি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'গরম থেকে এলে কিনা। এতক্ষণ কিন্তু বুঝতেই পারি নি তোমার ঘরটা কী গরম।'

ধীরে ধীরে ইতি নামতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে এলিয়ে পড়তে চাওয়ার মতো অলস অনিচ্ছুক পদে। সিঁড়ির মুখের কাছে তাপ ও আলো মেশার ফলে ছায়া একটু কম শীতল, কম ম্লান, প্রত্যেক ধাপ নামার সঙ্গে যেন বুঝতে পারা যায় ছায়া গাঢ় হচ্ছে, শীতলতা বাড়ছে। কিন্তু এই গরমে কোনো ছায়াই এমন শীতল হতে পারে না যে একটু আরাম দেওয়ার বেশি কিছু দিতে পারবে, ইতি কিন্তু একবার শিউরে ওঠে। জ্বরের রোগীর গায়ে কেউ যেন হঠাৎ বরফের ছেঁকা দিয়েছে।

তেতলার বারান্দায় বছরখানেকের ছেলে কোলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটি চুষছিল চুষিকাঠি আর মেয়েটি চুষছিল ছেলেটির গোটা তিনেক আঙুল। সিঁড়ির মাঝামাঝি বাঁকের ধাপটি একটু প্রশস্ত, সেখানে দাঁড়িয়ে ইতি শিহরনটুকু সামলায়, তারপর ফিরে যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু উপক্রম করেই ক্ষান্ত হয়। ছুটে পালানোর এই আকস্মিক প্রেরণার জন্যই বোধ হয় মুখখানা একটু অপ্রসন্ন ও ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, ততক্ষণে মানবও এদিকে ভদ্রতা করে ফেলেছে।

'মায়ে-পোয়ে কী হচ্ছে?'

মেয়েটি মাথার কাপড় তুলে দেয়, মুখ থেকে ছেলের আঙুল খসে পড়ে। অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইতির দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'নরেন আজ কখন আপিস চলে গেল, জানতেও পারি নি।'

'উনি ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন, আমার বোনের বাড়ি হয়ে আপিস যাবেন। আজ ধীরেসুস্থে রান্নাবান্না করেছি, একেবারে রাঁধবই না ভেবেছিলাম, হঠাৎ আমার দেওর এসে পড়ল কিনা, তাই রেঁধেছি। রেঁধেবেড়ে না খাওয়ালে নিন্দে করত তো? গিয়ে বলত, ভাইকে তো পর করেইছি, বাড়িতে এলে একবেলা খেতেও বলি না,—এই মাত্র চলে গেল। কেন এসেছিল জানেন? টাকা চাইতে! এদিকে আমার নিন্দে ছাড়া মুখে কথা নেই, দাদাকে বাড়ি না পেয়ে আমার কাছে দিব্যি দশটা টাকা চেয়ে বসল। আমি বললাম আমি টাকা কোথায় পাব, দাদার কাছ থেকে নেবেন।—তুই ছাতে কী করছিলি ইতি?'

ইতি বলে, 'বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়েছিলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় তো ইতি, সেই জন্য।'

ছেলের ভার ডান হাত হতে বাঁ হাতে গ্রহণ করে আবার মেয়েটি অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে ইতির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ একটা ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়বার ভঙ্গিতে বলে, 'ও, হ্যাঁ—আমাদের ভাড়ার টাকাটাও তো দেওয়া হয় নি। কী করেই বা দেব, কাল তো মোটে মাইনে পেলেন। আজ দিতে বলে গেছেন। একটু দাঁড়ান, টাকাটা এনে দিই, কেমন? খোকাকে একটু ধরবি ভাই ইতি?'

ইতির কোলে ছেলে দিয়ে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছায় বার কয়েক ঝনাৎ করে শব্দ তুলে ঘরের ভিতরে মেয়েটি বাক্স খোলে। গোটা দুই বাক্স মোটে তার সম্পত্তি কিন্তু চাবির গোছায় চাবি যেন আঁটে না, আঁচল ছিঁড়ে পড়তে চায়। বাক্স খোলা আর বন্ধ করতেও কত যে অনাবশ্যক শব্দের সে সৃষ্টি করে বলবার নয়।

মানব নিচু গলায় ইতিকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের ভাড়া দিতে এসেছিল নাকি?'

ইতি বলে, 'না, ওর কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে হবে তো?'

ইতিকে খোকা অনেকদিন থেকে চেনে, প্রায় আজন্ম। কিন্তু ইতি কোনোদিন তার হাতের আঙুল মুখে পুরে চোষে না বলেই বোধ হয় ইতির কোলে থাকতে তার ভালো লাগে না। চুষিকাঠিটা প্রথমে নিচে পড়ে যায়, এদিক ওদিক চেয়ে খোকা মুখ বাঁকায়, তারপর মানব তার গালে একটা টোকা দেওয়া মাত্র সে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বাক্সে চাবি দিতে দিতে মেয়েটি আনন্দে গদগদ হয়ে বলে, 'আসছি রে আসছি, দুষ্টু কোথাকার। এক মিনিট আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি না, আচ্ছা ছেলে হয়েছিস তো তুই!'

ভাড়ার টাকা, স্বামীর লিখে রাখা রসিদ আর এক কলম কালি নিয়ে খোকার মা বারান্দায় আসে, মানবকে টাকা গুনে দিয়ে রসিদে তার সই নেয়, তারপর ছেলেকে কোলে করে বলে, 'এত টাকা ভাড়া তো পান, কী করেন টাকা দিয়ে? সমস্ত বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এই গরমে একা একা চিলেঘরে কী করে থাকেন আপনি! আমি হলে তো পারতাম না।'

মানব ভাড়ার টাকা কোমরে গুঁজে বলে, 'না পেরে উপায় কী, খোকার বাবার মতো আমি তো চাকরি করি না।'

খোকার মা চোখ বড় বড় করে বলে, 'আপনার আবার চাকরি! এক মাসে আপনি যা সুদ পান, ওঁর মাইনের তা কগুণ কে জানে! একটু শুইগে খোকাকে নিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ে তো তোকে ডাকব ইতি। পাখিটার ঠোঁট আর পা দুটো ভালো হচ্ছে না একটু দেখিয়ে দিস। কটি করে ঘর বুনতে বলেছিলি ভুলে গেছি ভাই, যা দুষ্টুমি করে খোকা!'

মানব বলে, 'আরেকজন দুষ্টুমি করে না?'

'করে না?'—ফিক করে হেসে ফেলে পাক দিয়ে ঘুরেই খোকার মা ঘরের ভিতরে চলে যায়। কুঁজোটা তুলে নিয়ে মানব সিঁড়ির এক ধাপ নেমে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইতি নীরবে আসে। সমতল বারান্দায় ছোট-বড় পা নিয়ে চলার ভঙ্গিটি তার বেশ। অন্য সব মেয়ে যেন শুধু চলে। ইতি একটা অজানা ছন্দে দুলে দুলে চলে। কোলে ছেলে নেই ইতির, আঁচলে নেই চাবির ভার, তবু বুকে পিঠে কাঁখে ছেলে যেন আছে তার অনেকগুলি, আঁচলে বাঁধা আছে সে যত ভার বইতে পারে না তার চেয়ে বেশি ভারি চাবির গোছা।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মানব বলে, 'তোমাদের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি আছে।'

'হ্যাঁ।'

মানব রসিকতা করে বলে, 'অন্য কোনো ভাড়াটে হলে কবে তুলে দিতাম।'

'হ্যাঁ।'

'রাগ হল নাকি, ভাড়ার কথা বললাম বলে?'

'না, না, রাগ কিসের?'

সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় নামার শিথিল এলায়িত ভঙ্গি এখন দোতলায় নামার সময় স্খলিত পদে নামার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাও যেন কম পরিশ্রমের কাজ নয়।

মানব মুখ ভার করে বলে, 'অত হিসেব করে কথা বলা আমার আসে না। যা মনে আসে বলে ফেলি। কী এমন বললাম যে তোমার মুখ ভার হয়ে গেল?'

ইতি একটু হাসে। হাসলে মুখের ভার হালকা হয়।

'মুখ আবার ভার হল কোথায়? কী ছেলেমানুষ তুমি! তোমার কথায় কি আর মুখ ভার করেছি, মুখ ভার করেছি তেতলার ওই লক্ষ্মীছাড়ির কথায়। খোকার বাবা তো এদিকে মাইনে পায় তেষট্টি টাকা, অহঙ্কারে যেন ফেটে পড়ছে!'

সুতরাং মানবও হাসে। ইতির কথায় স্ত্রী–চরিত্রের একটি স্থূল দিক ফুটে উঠেছে আর নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে সেটা ধরতে পেরেছে বলে গর্ব আর আমোদ অনুভব করে। ইতিকে নাড়া দিয়ে স্ত্রী–চরিত্রের আরো দুটো দিক আবিষ্কারের আশায় বলে, 'কেন, নরেশের বৌ বেশ লোক।'

'বেশ না ছাই। সুখে আছে তাই, আমার মতো পোড়াকপাল তো নয়।'

'তোমার পোড়াকপাল নাকি?'

দুজনেই থমকে দাঁড়ায়। ইতি পিছনে হেলে যায় সাপের ফণা ধরার মতো, বলে, 'কী বলছেন?'

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোমার পোড়াকপাল বলছ, আমার জন্য তো?'

সাপের ফোঁস করার মতোই ইতি সজোরে নিশ্বাস ছাড়ে, কিন্তু ছোবল মারার বদলে বয়স্কা নারীর চিরন্তন ক্ষমা করা আর প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'তোমার সঙ্গে আর পারলাম না। মা বাবা ভাই বোনেদের কথা ভেবে ও কথা বলেছি, কী কষ্টে আছে সবাই বলো তো? নইলে, আমি তো আজ রাজরানী। অবিশ্যি, দেখতে শুনতে রাজরানী নই, তোমার জন্যে রাজরানী।'

তেতলায় মানুষ আছে, দোতলায় মানুষ আছে, সিঁড়িতে আর কেউ নেই—তবু ইতি জোর করে গলা একেবারে খাদে নামিয়ে দেয়। বলে, 'তুমি আমার রাজা।'

দুজনে দোতলায় নামামাত্র উপরের যে ঘরটিতে খোকাকে নিয়ে খোকার মা শুতে গেছে ঠিক তার নিচের ঘর থেকে বার হয়ে আসে মাঝবয়সী একটি মহিলা। মহিলাটি এত মোটা যে পদক্ষেপে মেঝে না কাঁপলেও দুমদাম শব্দ হয়। তবে এখন পা ফেলার শব্দটা তার একটু জোরালো, হয়তো একটু বেশি জোরেই সে এখন পা ফেলছে।

'কোথায় ছিলি ইতি?'

'তেতলায় ছিলাম, খোকার মার কাছে।'

'ছাই ছিলি, তিনবার ওপরে নিচে তোকে খুঁজে এসেছি।'

'তখন হয়তো চিলেঘরে গেছলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় তো ইতি, সেইজন্য। এতক্ষণ তো খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম, জিজ্ঞেস করে আয় খোকার মাকে। খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম না মানববাবু?'

মানব বলে, 'করছিলে বৈকি।'

ইতি আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি বললেন না কুঁজোয় জল ফুরিয়ে গেছে? আমি

বললাম না, চলুন নিচে গিয়ে কুঁজোতে জল ভরে দিচ্ছি?'

মানব মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মোটা মেয়েটির রং খুব ফরসা! এতক্ষণ মুখখানা তার লাল হয়েছিল, এবার ধীরে ধীরে লালচে ভাবটা কমে যেতে আরম্ভ করে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরো জোরে দুমদাম পা ফেলে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে, দরজা বন্ধ করে দড়াম করে খিল তুলে দেয়।

পরক্ষণে খিল খুলে আবার বের হয়ে আসে।

'তুই মর ইতি, মর তুই, গোল্লায় যা। পা না তোর খোঁড়া? খোঁড়া পায়ে তুই না সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না? সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না তো, যমের বাড়ি যাস না কেন তুই?'

মানব বলে, 'সুধা, আজ হাসপাতালে যাও নি?'

সুধা বলে, 'দেখতে পাচ্ছ না, যাই নি?'

মানব আবার বলে, 'আজ ডিউটি নেই বুঝি?'

সুধা হঠাৎ কাঁদ–কাঁদ হয়ে বলে, 'ডিউটি থাক বা না থাক, তোমার কী?'

মানব শান্তভাবে বলে, 'না, এমনি বলছি। ভাড়ার টাকা দেবে নাকি আজ কিছু?'

সুধা স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের চারদিকের অতিরিক্ত মাংস ফেলে ছোট ছোট চোখ দুটিকে বড় করবার চেষ্টা করে।

'ভাড়া চাইচ? ভাড়া!'

মানব মৃদু একটু হেসে বলে, 'তুমিই তো বলেছিলে আজ কিছু দেবে।'

'এখনো মাইনে পাই নি।'

'বেশ মাইনে পেলে দিও। নগেনকে ফিরে আসবার জন্যে খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছ, না সুধা?'

সুধা মুখ সাদা করে বলে, 'কে বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি?'

'কাগজে দেখলাম। বেশ বিজ্ঞাপন দিয়েছ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একা আর কতকাল চালাব, আমার জন্যে না হোক ওদের কথা ভেবে ফিরে এসো, ইতি তোমার সুধা। তোমার বিজ্ঞাপন যদি চোখে পড়ে সুধা, যেখানে থাক নগেন ছুটে আসবে।'

সুধা আর কথা বলে না, আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এবার তার পদক্ষেপের শব্দও হয় কোমল, দরজা বন্ধ করার শব্দও হয় মৃদু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করে ইতি বলে, 'সিঁড়ি যেন আর ফুরোতে চায় না।'

'কষ্ট হচ্ছে?'

'থাক, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই। সুধাদির কমাসের ভাড়া বাকি আছে?'

'কমাস আবার, দু–এক মাস। কী করবে বলো বেচারি, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চারদিকে অন্ধকার দেখছে। নার্সগিরিতে কি পয়সা আছে?'

'তুমি দেও না কেন?'

'আমি কেন দেব? আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? আর দু–মাস দেখব, ভাড়া যদি না মেটায়, পষ্ট বলে দেব বিনা ভাড়ায় যে বাড়িতে থাকতে পাবে সেখানে থাকো গে, আমার এখানে ওসব চলবে না।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামার স্খলিত ভঙ্গি ইতির এবার নিজের হঠাৎ মুচড়িয়ে ভেঙে পড়বার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে সিঁড়িও ফুরিয়ে আসছে, প্রাণপণ চেষ্টায় মানবের বাহুমূলে আস্তে একটি চড় মেরে মৃদু হেসে সে তাই বলে, 'কী দুষ্টুই তুমি ছিলে!'

তেতলায় খোকার মা খোকাকে যেমন করে দুষ্টু বলেছিল, ঠিক তেমনি করে বলে! তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করে, 'কই দিলে না?'

মানব বলে, 'কী?'

'মা যে দশ টাকা ধার চেয়েছে? ভাড়ার টাকা তো পেলে, তাই থেকে দাও না?'

মানব মৃদু হেসে কোমরের গোঁজা টাকা বার করে ইতিকে দশটা টাকা দেয়। ইতি ঘাড় গুঁজে নামতে থাকে।

একতলার বারান্দায় নেমে দেখা যায় : বারান্দায় মাদুরে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ইতির মা ঘুমোচ্ছে, পাশে পড়ে আছে বছর তিনেকের একটা উলঙ্গ ছেলে, সর্বাঙ্গে তার অনেকগুলি পাঁচড়া। বারান্দার অপর প্রান্তে এঁটো বাসন পড়ে আছে। ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভালো না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটা মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে আর উচ্ছিষ্ট ভালো না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।

ইতির মার ঘুম ঠিক ঘুম নয়, চোখ বুজে থাকা। মটকা মেরে নয়, শ্রান্তিতে আর দুর্বলতায়।

চোখ মেলে ইতির মা বলে, 'ইতি এলি?'

বলে মানবের মুখের দিকে চেয়ে ইতির মা বলে, 'সকালবেলা এক কুঁজো জল নিয়ে গেলেন, ফুরিয়ে গেছে? ইতি, যা তো মা, কুঁজোয় জল ভরে দিয়ে আয়। ওসব কি পুরুষমানুষের কাজ!'

মানব বলে, 'সিঁড়ি ভাঙতে ইতির কষ্ট হয়, আমিই নিয়ে যেতে পারব।'

ইতির মা এ কথা শুনতে পায় না। মেয়ের পদমূলে চোখ রেখে বলে, 'তোর গায়ে রক্ত কিসের লো ইতি?'

ইতি নিশ্চিন্তভাবে বলল, 'পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।'

মানব বলে, 'তোমার পাঁচড়া হয়েছে ইতি?'

প্রশ্ন শোনবামাত্র ইতি বিনা ভূমিকায় খেপে যায়। আর্তনাদ করার মতো বলতে আরম্ভ করে, 'হ্যাঁ হয়েছে, একশটা হয়েছে। কী করবে তুমি? ঘেন্না করোবে? করগে যাও, কে তোমার ঘেন্নাকে কেয়ার করে? দেখছ না ভাইয়ের গায়ে পাঁচড়া, জান না ভাইকে আমি কোলে নিই? পাঁচড়া হবে না তো কী হবে আমার?'

তাড়াতাড়ি কুঁজোটা নামিয়ে রাখতে সেটা গড়িয়ে উঠোনে পড়ে ভেঙে যায়। মানব সেদিকে চেয়েও দেখে না।

'ঘরে যাও ইতি, সুধাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বলে একেবারে তিন–চারটা ধাপ ডিঙিয়ে মহামানবের মতো মানব উপরে উঠতে আরম্ভ করে।

একান্নবর্তী

চার ভাই, বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেন। পরিবারের লজ্জা ও কলঙ্ক সেজ ভাই হীরেন। সে কেরানি। বীরেন ডাক্তার, ধীরেন উকিল, নীরেন দুশ টাকায় শুরুর গ্রেডে সরকারি চাকরি পেয়েছে আর বছর। হীরেন সাতাশ টাকার কেরানি, যুদ্ধের দরুন পাঁচ-দশ টাকা বোনাস এলাওন্স বুঝি পায়। হীরেনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু শরম লাগে ভাইদের। চার ভাই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তবু।

বাপের তৈরি বাড়িটাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাজার করে রেঁধে বেড়ে, ঝি চাকর ঠাকুর, শুধু নিজেদের ভালোমন্দ সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তিনটি অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো তারা বাস করে। হঠাৎ টান পড়লে একটু চিনি, দু-পলা তেল বা এক খাবলা নুন ধার নেওয়া হয়, এ সংসার থেকে ও সংসারে দান হিসাবে নয়। দু-চার দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রেশনের বা কালোবাজারের মাল আনা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত মাপে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বড় দু-ভাইয়ের বৌদের তরফের কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিশেষ কোনো উপলক্ষে খাবারটাবার মাছটাছ এমন জিনিস যদি এত বেশি পরিমাণে আসে যে নিজেরা খেয়ে শেষ করবার আগেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়তিটা ভাগ করে দেওয়া হয়। হীরেনদেরও দিতে হবে। কেরানি বলে তার বৌ এসেছে গরিব পরিবার থেকে, তার বাপের বাড়ির দিক থেকে কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেবার মতো, কখনো কিছু আসে না পাঁচজনকে দেখানোর মতো, কখনো আসবেও না, তবু উপায় কী। এটাই আসল কথা তাকে নিয়ে লজ্জা পাবার। একেবারে অনাত্মীয় ভাড়াটের মতো বাস করুক, বাস তো করে একই বাড়িতে, সবাই তো জানে সে তাদের ভাই, আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শি সকলে । সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না কোনোমতেই।

বিশেষত বুড়ি মা আছেন হীরেনের দলে। প্রায়ই তিনি অসুখে ভোগেন, সর্বদা জপতপ নিয়ে থাকেন। খান তিনি নিজের খরচে, কিন্তু তাঁর দুধটুকু জাল দেওয়া, দইটুকু পেতে রাখা, চাল ডাল তরকারিটুকু সিদ্ধ করে দেওয়া, এসব করতে হয় হীরেনের বৌকে। অসুখেবিসুখে ব্রত পার্বণে বাড়তি দরকারের জন্য বৌদের ডেকে হুকুম দেন কিন্তু রোজকার খুঁটিনাটি সেবা গ্রহণ করেন শুধু হীরেনের বৌয়ের কাছ থেকে। তাঁর রেশন কার্ড, কার্ডের মাল হীরেন পায়, মাসে দেড় মণ দুমণ কয়লার দাম তিনি দেন, ঠিকা ঝির আট টাকা বেতনের দুটাকা দেন আর সাধারণভাবে সংসার খরচের হিসাব দেন দশ টাকা।

হীরেন ছাড়া সব ছেলের কাছে তিনি ভরণপোষণের মাসিক খরচও নিয়মমতো আদায় করেন কড়াকড়িভাবে। বীরেনের পসার বেশি, সে দেয় তিরিশ টাকা। ধীরেনের পসার হচ্ছে, সে দেয় কুড়ি টাকা । চাকরি হবার পর নীরেন বিশ বা পঞ্চাশ মা যা চাইতেন তাই দিত, আজকাল বড় বৌয়ের পরামর্শে দায়টা মাসিক পঁচিশ টাকায় বেঁধে দিয়েছে। নীরেনের

বৌ নেই। এখনো বিয়ে করে নি।

ভাইরা যখন ভাগ হয়, এক বাড়িতে উনান জ্বালাবার আয়োজন করে তিনটে, চটে লাল হয়ে গিয়েছিল নীরেন, লজ্জায় দুঃখে দাপাদাপি করে গালাগালি দিয়েছিল দাদাদের, বিশেষভাবে বড় দুজনকে। তখনো তার চাকরি হয় নি। তার খাওয়া-পরা, পড়াশোনার খরচ দেওয়ার দায়িত্ব এড়াতে বিশেষ করে ভাইরা ভিন্ন হচ্ছে মনে করে আঁতে তার ঘা লেগেছিল। আরো তার পড়বার ইচ্ছা ছিল, বিলাত যাওয়ার কথাটাও নাড়াচাড়া করছিল মনে মনে। এ সময় এ রকম পারিবারিক বিপর্যয় ঘটাতে তার আঁতকে ওঠার কথাই।

হীরেন তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, 'কেন, এ তো ভালোই হল! রোজ বিশ্রী খিটখিটে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। একটু দুধ, একটু করে মাছ, এই নিয়ে কী মন কষাকষি বল তো? দাদার আয় বেশি, তিনি ভালোভাবে থাকতে চান। মেজদার ভালো উপার্জন হচ্ছে তিনিও খানিকটা ভালোভাবে থাকতে চান। আমি সংসারে মোটে চল্লিশটা টাকা দিয়ে মজা করব, ওরা কষ্ট করবেন সেটা উচিত নয়। ভাই বলে কি কেউ কারো মাথা কিনেছে নাকি যে খাওয়াখাওয়ি কামড়াকামড়ি করেও একসাথে থাকতে হবে ভাই সেজে? তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে সদ্ভাবে ভাইয়ের বদলে ভদ্রলোকের মতো থাকাই ভালো।'

'তোমার চলবে?'

'চলবে না? কষ্ট করে চলবে। তবে অন্য দিকে লাভ হবে। মাথা হেঁট করে থাকতে হবে না, যাই খাই খুদকুঁড়ো হজম হবে।'

'নিজে ভিন্ন হলেই পারতে তবে এতদিন।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে কিনা কথাটা হল এই যে—'

দুঃখী অসহায় গরিব কেরানি ভাইকে দয়া বা শ্রদ্ধা করে নয়, বড় বড় দুভাইয়ের ওপর নিদারুণ অভিমানের জ্বালায় নীরেন আরো পড়েশুনে আরো পরীক্ষা পাস করে বড় কিছু হবার কল্পনা ছেড়ে চাকরির চেষ্টায় নেমেছিল। মার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হীরেনের সংসারে।

চাকরি হবার পরেও, দুশ টাকার শুরুর গ্রেডের সরকারি চাকরি হবার পরেও প্রায় দুমাস হীরেনের সংসারে ছিল।

তিন সংসারের পার্থক্য ততদিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বড়বৌ পুলকময়ী আর মেজবৌ কৃষ্ণপ্রিয়া চটপট অদল-বদল করে নিজের নিজের সংসার সেজে ঢেলে গুছিয়ে নিয়েছে। আগেকার সর্বজনীন ভাঁড়ারঘরটা ভেঙেচুরে নতুন জানালা দরজা তাক বসিয়ে পুলক করে নিয়েছে ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো, আলো-বাতাস ভরা বড় আধুনিক রান্নাঘর। দেখে বুক ফেটে গেছে কৃষ্ণপ্রিয়ার আফসোসে। সে যদি চেয়ে নিত ভাঁড়ারঘরটা রান্নাঘর করার জন্য। উনান টুনান বসানো নতুন তৈরি রান্নাঘরটা পেয়ে ভেবেছিল, খুব জেতা জিতে গেছে, ভাবতেও পারে নি দিন কয়েক বারান্দায় তোলা উনানে রান্নার কষ্ট সহ্য করে ভাঁড়ারঘরকে এমন সুন্দর রান্নাঘর করা চলে। সেজবৌ লক্ষ্মীও তাকে ঠকিয়ে জিতে গেছে পুরোনো নোংরা রান্নাঘরটা পেয়ে। মেঝেতে ফাটল আর গর্ত কালি-ঝুল মাখা চুন-বালি খসা দেয়াল, একটু অন্ধকার কিন্তু ঘরটা মস্ত বড়, মিস্ত্রি লাগিয়ে কিছু পয়সা খরচ করলে ওই ঘরখানা দিয়েই বৌকে হারানো যেত।

চাকর বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, পুলকময়ী ঘরদুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে আর ছেলেমেয়েকে সাজায়, পাড়া বেড়ায়, নিন্দে করে কেরানি দেওর আর তার বৌয়ের। ধীরেন বাজার করে, ঠাকুর ভাত রাঁধে, কৃষ্ণপ্রিয়া সস্তা চটকদার আসবাব ও শাড়ি কিনে বড় বৌয়ের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেবার চেষ্টায়, নিজের ঘরদুয়ার

সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, নিজে সাজে, মেয়েটাকে সাজায়, অর্গ্যান বাজিয়ে গান করে, কেঁদেকেটে চিঠি লিখে ঘনঘন বড়লোক মামা-মামি মামাতো ভাইবো নদের দামি মোটরে চাপিয়ে বাড়ি আনায় পাড়ার লোকের কাছে নিজেকে বাড়াবার জন্য, ফরসা রং আর থলথলে মাংসল যৌবনের গর্বে মাষ্টারনির মতো পাড়ার মেয়েদের কাছে বর্ণনা করে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে বৌয়ের শোচনীয় রূপের অভাব, বানিয়ে বানিয়ে যা মুখে আসে বলে যায়, শাশুড়ি ননদ জা দেওরদের বিরুদ্ধে।

তবু, পুলকময়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না বলে জ্বলেপুড়ে মরে যায়। যুদ্ধের বাজারে বীরেনের পসার বড় বেশি বেড়েছে, দুটাকার বদলে আট টাকা ফী করেও গাদা গাদা কল পাচ্ছে, ঘরে এনেছে দামি আসবাব, পুলককে দিয়েছে শাড়ি গয়না, মোটর কিনেছে সেকেন্ডহ্যান্ড, জমি কিনেছে সেকেন্ডহ্যান্ড, জমি কিনে আয়োজন করছে বাড়ি করবার। ধীরেনেরও ওকালতিতে পসার বেড়েছে বেশ, তবে বীরেনের ডাক্তারি পসারের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

ভেবেচিন্তে কৃষ্ণপ্রিয়া হাত বাড়াল নীরেনের দিকে। মাসে চারশ পাঁচশ টাকা আনছে ছেলেটা মাইনে আর উপরিতে, বিয়ে করে নি, বৌ নেই।

নীরেনও যেন তার হাত বাড়ানোর জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল। হীরেনের সংসারের অশান্তি, উদ্বেগ আর অভাবের সঙ্গে একটানা লড়াই, মার গুমখাওয়া একগুঁয়ে সেকেলে ভাব জীবনে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। প্রায়ই তাকে বাজার করতে হয়, প্রায়ই তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় রেশনের লাইনে, মার আবদার আর হুকুম সমানে চলেছে তারই ওপরে, আর যেন তার ছেলে নেই। তাছাড়া, সব বড় ভোঁতা, বড় নোংরা। বড়বৌ আর মেজবৌয়ের প্রায় চার বছর পরে বৌ হয়ে এসেছে লক্ষ্মী, তার ছেলেমেয়ের সংখ্যা ওদের দুজনের ছেলেমেয়ের সমান। সারাদিন সে শুধু রাঁধছে বাড়ছে, ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, বুড়ি শাশুড়ির সেবা করছে, গাদা গাদা জামাকাপড় সিদ্ধ করছে, কপালকে দোষ দিচ্ছে, সর্বদা বলছে : 'মরলে জুড়োব, তার আগে নয়।' ঘর-সংসার সে সাজায় গোছায় অতি যত্নে, পুরোনো বাক্স পেঁটরা, রংচটা খাট-চেয়ার, ছেঁড়া কাপড়-জামা, ময়লা কাঁথাকানি নিয়ে যতটা সাজাতে গোছাতে পারে। রান্নাঘর ধোয়ায় দুবেলা—নোংরা রান্নাঘর, এ ঘরে রান্না করা ডাল ভাত মাছ তরকারি খেতে ঘেন্না করে নীরেনের। খেতে বসলে আবার প্রায়ই পুলক বা কৃষ্ণপ্রিয়ার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে ঘি মাংস পেঁয়াজ এলাচের গন্ধ।

'ঠাকুরপো, কাল তোমার নেমন্তন্ন। নিজে রেঁধে খাওয়াব।'

কৃষ্ণপ্রিয়া বললে একদিন হাসিহাসি মুখে। সহজে সে হাসে না, তার দাঁতগুলি খারাপ।

'এমন অগোছালো কী করে থাক ঠাকুরপো? ছি, ছি, চারদিকে ঝুল, খাটের নিচে নরক হয়েছে ধুলো জমে। কী ছড়িয়ে ভড়িয়ে রেখেছ সব। এতগুলো টাকা ঢালছ মাসে মাসে, ঘরটাও কি কেউ একটু সাফসুরত করে দিতে পারে না তোমার?'

তখন তখন নিজের ঝিকে নিয়ে ঝুল ঝেড়ে ধুয়েমুছে সাফ করে কৃষ্ণপ্রিয়া, ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আগে থেকেই সে ঠিক করে এসেছিল এটা সে করবে, নীরেন বুঝতে পারে। স্নান করতে যাওয়ার ঠিক আগে এসেছে পরদিন খেতে বলতে। ধুলো ঘেঁটে ঝুল মেখে ঘর সাফ করে সাবান মেখে স্নান করবে। খুশিই হয় নীরেন টের পেয়ে। খাতির পেয়ে অসুখী হবার কী আছে।

খেয়ে আরো খুশি হয় নীরেন। সব রান্নাই প্রায় ঠাকুরের, দুটি বিশেষ জিনিস শুধু কৃষ্ণপ্রিয়া রেঁধেছে। লক্ষ্মীর কোনোমতে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দায়সারা একঘেয়ে রান্না

নয়। চব্বিশ ঘণ্টা ছেলেমেয়ের নোংরামি ঘাঁটা কোনো মানুষের রান্না নয়, অপরিষ্কার স্যাঁতসেঁতে ঘরে পুরোনো মলিন পাত্রে মটকাহীন মরচেধরা টিনের কৌটার মসলার রান্না নয়। পরিবেশনে বারবার ব্যাঘাত নেই অন্য ঝামেলার, পরিবেশকের ভাবভঙ্গিতে নেই খাইয়ে দিয়ে আরেকটা হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার অধীরতা। পরিবেশক মাইনে-করা ঠাকুর। বসে বসে ধীরেসুস্থে হাসিগল্পের সঙ্গে একসাথে খাওয়া।

কৃষ্ণপ্রিয়া চালিয়ে যায় টানার আয়োজন, ওদিকে এতদিন পরে হীরেন আর লক্ষ্মীর সঙ্গে নীরেনের বাধতে থাকে খিটিমিটি।

মাসের শেষে আরো কয়েকটা টাকা সংসারে দরকার হলে নীরেন বলে, 'আমি টাকা দিতে পারব না। যা দিয়েছি আমার একার জন্য তার সিকিও লাগে না।'

হীরেন বলে, 'তা লাগে না। কিন্তু তুই একা মানুষ কী করবি অত টাকা দিয়ে?'

'যাই করি না।'

লক্ষ্মীর সঙ্গে বাধে অন্যভাবে, অনেকভাবে।

'ছুটির দিন একটু দেরি করেও খেতে পারব না খুশিমতো?'

'ঠাকুর রেখে দাও, যত খুশি দেরি করে খেও। চোখ নেই তোমার ঠাকুরপো? দেখতে পাও না সেই কোন ভোরে উঠে জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছি? দেড়টা বাজে, এখনো বলছ রান্নাঘর আগলে বসে থাকতে?'

'আমি যে টাকা দিই—'

'টাকা দাও বলে বাঁদী কিনেছ আমায়?'

এই দোষ লক্ষ্মীর, খাতির করে না, এতগুলি করে টাকা নীরেন ঢালে তার সংসারে, তবু। হীরেনও যেন কেমন ভাব দেখায়, ঠিক ছোট ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে তার সঙ্গে। মাসে মাসে এতগুলি টাকা সাহায্য করে ও সংসার সে চালু রেখেছে, একটু যে বিশেষ নম্রতার সঙ্গে একটু বিশেষ মিষ্টি সুরে কথা বলবে তার সঙ্গে সে চেষ্টাও নেই। মোটেই যেন কৃতজ্ঞ নয়, অনুগত নয় দুজনে। হাড়ভাঙা খাটুনি আছে, অভাব অনটন চিন্তাভাবনা আছে, ঝঞ্ঝাট আছে অঢেল, কিন্তু সেইজন্যেই তো তাকে বেশি করে খাতির করা উচিত। তার সাহায্য বন্ধ হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে ওরা কি ভাবে না? এত ভাবে, এ কথাটা ভাবে না। নীরেন নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় ভেবে।

পরের মাসের পয়লা থেকে নীরেন ভিড়ে গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার সংসারে। হীরেনকে কিছু কিছু সাহায্য করবার ইচ্ছা তার ছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে সে ইচ্ছাকে ফাঁসিয়ে দিল। বুড়ি মাকে মাসে মাসে সে চল্লিশ টাকা দেবে ঠিক হয়েছে। বুড়ি কি খাবে ও টাকাটা? হীরেনকেই দেবে। ও চল্লিশ টাকা একরকম সে হীরেনকেই দিচ্ছে। সোজাসুজি আরো দেবার কি দরকার আছে কিছু? না সেটা উচিত? ওরা তো যত পাবে ততই নেবে, কিছুতেই কিছু হবে না ওদের।

'তলে তলে টাকা জমাচ্ছে। বাইরে গরিবানা। বুঝলে না ঠাকুরপো?'

কৃষ্ণপ্রিয়াকে নিজের জন্য খরচের টাকা দিয়ে প্রতিদানে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা পেয়ে পুলক বোধ করে নীরেন। মাসে মাসে লক্ষ্মীর হাতে খরচের টাকা দিয়েছে, খরচ করে যা বেঁচেছে ব্যাংকে জমা দিয়ে এসেছে, লক্ষ্মী নির্বিকারভাবে আঁচলে বেঁধেছে নোটগুলি, ব্যাংকের লোকেরা যেন তাকে গ্রাহ্যও করে নি। কৃষ্ণপ্রিয়ার হাতে নোটগুলি দিতেই আনন্দে সে এমন বিহ্বল হয়ে যায়! কথা বলতে গিয়ে এমন করে তোতলায়।

হেস্তনেস্ত যা হবার তা হল, পৃথিবীজোড়া মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে তাদের পারিবারিক যুদ্ধ পর্যন্ত। যার যা দখল সে তা নিয়েছে, যে যেভাবে যার সাথে বাঁচতে চায়, সে সেইভাবে তার সাথে বাঁচবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেনা জমিটাতে এবার বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবে ভাবছে বীরেন। ইট বালি চুন সুরকি পাওয়া যাচ্ছে, লোহা এবং সিমেন্টও পাওয়া যাচ্ছে তলায় তলায়, কিছু বাড়তি খরচ আর ধরাধরি করার বিশেষ চেষ্টায়। কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ে খুঁজছে নীরেনের জন্যে, বাংলাদেশে একটিও মেয়ে মিলছে না পছন্দমতো, মেয়েদের যেন মেয়ে রেখে যায় নি যুদ্ধটা। মা জপতপ কমিয়েছেন। ভাবছেন তীর্থে যাবার কথা। ডাক্তার জোর দিয়ে বলেছে, গাড়ির কষ্ট আর বিদেশের অনিয়ম তাঁর সইবে না, মরে যাবেন।

'মরতেও পাব না আমি। এ হতভাগার জন্য মরবারও জো নেই আমার।' দুর্বল ক্ষীণস্বরে বুড়ি মা কাতরিয়ে কাতরিয়ে আফসোস করেন, হঠাৎ গুম খেয়ে আশ্চর্যরকম শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি মরলে তো না-খেয়ে মরবি তোরা, গুষ্টিসুদ্ধ?'

হীরেন বাহাদুরি দেখায় না, ক্ষীণ দুর্বল সুরে বলে, 'কেন অত ভাবছ বলো তো মা? অত সহজে কি মানুষ মরে? দুর্ভিক্ষে দেখ নি, একটু খুদ একটু ফ্যান খেতে পেয়ে কত লোক বেঁচে গেছে। তুমি এখন মরলে যেটুকু ভদ্রভাবে বাঁচছি তা থাকবে না বটে, ভদ্রত্ব ছাড়লে কি মানুষ বাঁচে না তাই বলে? চারটে ছেলেমেয়ের জন্য রোজ একপো দুধ, হপ্তায় দুদিন একপো মাছ, তাও নয় বন্ধ করব, রেশনের চাল আর চার পয়সার পুঁইশাক রেঁধে খাব। আমি বাঁচব, তোমার বৌটা বাঁচবে, ছেলেমেয়ে কটাও বাঁচবে দেখো। তবে হ্যাঁ, এ কথা সত্যি, এভাবে বাঁচার কোনো মানে হয় না।'

'কী বললি?'

'বললাম বাঁচা কষ্ট বলে কি সাহেবের গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরব? সাহেবের টুঁটিটা কামড়ে ধরে মরব। অত ভাবছ কেন? মরব না। কেউ আমরা মরব না।'

বুড়ি মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, তীর্থে যাবার ছুতো করে এবার মরলে কেমন হয়? ভাবতে ভাবতে সামান্য একটা অসুখ হয়ে, চার ছেলের চেষ্টা বিফল করে, চৌষট্টি টাকা ফী-র ডাক্তারের ওষুধকে তুচ্ছ করে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মারা গেলেন। তখন আরো শোচনীয় হয়ে পড়ল হীরেনের অবস্থা।

পুলকময়ীর ও কৃষ্ণপ্রিয়ার শাড়ি গয়না ঠাকুর চাকর, নিশ্চিত নির্ভর চালচলন, অবসর, শৌখিনতা, ভালো ভালো জিনিস খাওয়া, হাসি আহ্লাদ করা সবকিছু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশা হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতিবক্ষত করেছে লক্ষ্মীর মন। মনে সে এই ভাবনার মলম দিয়ে সামলে থেকেছে যে বেশ্যারা পরম সুখেই থাকে। স্বামী পুত্র বুড়ি শাশুড়ির জন্যে জীবনপাত করে খাটা, শাক-পাতা ডাল-ভাত পেটে গুঁজে কাজ করা, এ গৌরব ওরা কোথায় পাবে। নিজের মনে সে গজরগজর করছে, মরণ কামনা করছে শুধু গোপনে নিজেকে শুনিয়ে, হীরেনের ওপর ঝাঁজ ঝেড়েছে শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরদিনের চলিত দাম্পত্য কলহের মধ্যে।

কিন্তু এবার আর সইল না।

চারটি ছেলেমেয়ের দুটি বড় হয়েছে, তারা শাক-পাতা ডাল-ভাত খেতে পারে, অন্য দুটিকেও তাই খাওয়ানো যায় কিছু কিছু, কিন্তু একটু তো দুধ চাই? একপো দুধ আসত, সেটা বন্ধ হল। সপ্তাহে দুদিন মাছের আঁষটে গন্ধ নাকেমুখে লাগত, তা আর লাগে না। যে সায়াটা ন্যাকড়ার কাজে লাগাতে হয়েছে, কৃষ্ণপ্রিয়ার মতো থলথলে যৌবন না থাক সেও তো যুবতী, বয়স তো তার মোটে সাতাশ বছর, সায়াহীন ছেঁড়া কাপড়ে দেহ ঢেকে তাকে চলতে

ফিরতে হচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবাই। কী এক কলকৌশল জেনেছে হীরেন, অভয় দিয়ে বলছে যে ভয় নেই আর ছেলেমেয়ে হবে না। এসব কি সত্যি? কখনো হতে পারে সত্যি মানুষের জীবনে? এসব ফাঁকি, এসব যুদ্ধের বোমা, এসব ভূমিকম্পের দিশেহারা পাগলামি, বাঁচতে হলে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে হবে, নইলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। ছাতের আলসেয় উঠবার সময় হীরেন তাকে আটকায়। এত এলোমেলো কথার পর এতরাত্রে তাকে ছাতে যেতে দেখে আগেই সে খানিকটা অনুমান করেছিল।

'আমি যদি মরি তোমার তাতে কী?' লক্ষ্মী বলে ঝাঁজের সঙ্গে ছাড়া পাবার জন্য লড়তে লড়তে হীরেনের বাহুমূলে কামড় বসিয়ে দিয়ে। হীরেন জানে লক্ষ্মীকে, ভালোভাবেই জানে, সে তার চারটি সন্তানের মা।

কাঁদ-কাঁদ হয়ে সে বলে, 'তুমি খালি নিজের কথাই ভাবছ লক্ষ্মী।'

চমকে থমকে যায় লক্ষ্মী। 'নিজের কথা ভাবছি? আমি মরলেই তো তোমার ভালো।'

'ভালো? তুমি মরলে আমি বাঁচব?'

'বাঁচবে না? আমি মরলে তুমি বাঁচবে না? দাঁড়াও বাবু, ভাবতে দাও।'

বাঁচবে না? সে হার মেনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরলে হীরেনও মরবে অন্য কোনো রকমে। তাই হবে বোধ হয়। যে কষ্ট আর তার সইছে না সেই কষ্ট তো লোকটা তারই সঙ্গে সমানভাবে সয়ে আসছে আজ দশ-এগার বছর। তাই বটে। লোকটা অন্য সব দিকে অপদার্থ হোক, এই এক দিকে খাঁটি আছে।

'আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। কতকাল জেগে আছি বলো তো। একটু ঘুমাব আমি।'

ঘরে ফিরে গিয়ে চাদরহীন তুলো গিজগিজ করা ছেঁড়া তোশকে হীরেনের বুকে মাথা রেখে সে জেগে থাকে। হীরেনের কথা শোনে।

'সাতটা দিন সময় দেবে আমাকে লক্ষ্মী? আমি বুঝেও বুঝি নি। যা করা দরকার করেও করি নি। মাছিমারা কেরানি তো। এইরকম স্বভাব আমাদের। যাই হোক, তুমি আমায় সাতটা দিন সময় দাও।'

'ওমা, কিসের সময়?'

'তুমি কিছু করবে না, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বে না—'

'আমি গিয়েছিলাম নাকি লাফিয়ে পড়তে?' লক্ষ্মী রাগ করে বলে, 'আমি যাই নি। কিসে যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমায়।'

সাত দিন সময় চেয়ে নেয় হীরেন, কিন্তু ব্যবস্থা সে করে ফেলে একদিনের মধ্যে। লজ্জায় লাল হয়ে দুঃখে ম্লান হয়ে লক্ষ্মী শুধু ভাবে যে, এত দুঃখের মধ্যে একটা খাপছাড়া পাগলামি করে বসে না জানি মনে কত দুঃখ বাড়িয়েছে সে লোকটার।

রাত নটায় হীরেন বাড়ি ফেরে। কচু সিদ্ধ আর ঝিঙে চচ্চড়ি দিয়ে দুজনে একসাথে বসে ভাত খেয়ে ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রাত এগারটার সময়। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলে?'

'পাড়াতেই ছিলাম। রমেশ, ভূপেন আর কানাই আমারই মতো কেরানি, চেন তো ওদের? ওদের বাড়িতে। ভালো কথা, কাল ভোরে ওদের বৌরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

লক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।—'বুঝেছি। তোমার তিন বন্ধুর তিন বৌ আমাকে কাল বোঝাতে আসবে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়া কত অন্যায়।'

'না ওরা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে আসবে, ওদেরও যাতে তেতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বার দরকার না হয়।'

মোরগ-ডাকা ভোরে এল লতিকা, মাধবী আর অলকা। সঙ্গে এল এগারটি কাচ্চাবাচ্চা। আর বাজারের থলিতে ভরা চাল ডাল তরিতরকারি, বোতলে ভরা সরষের তেল, ভাঙা টি-পটে নুন, বস্তায় ভরা আধ মণ কি পৌনে এক মণ কয়লা। কচিদের মাই দিয়ে ছড়া গেয়ে গা চুলকে থাপড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রাখা হল হীরেনের শোবার ঘরে! বাড়তি ছোট ঘুপচি ঘরখানা সাফ করে রাখা হল চাল ডাল তেল নুন তরিতরকারি। লতিকা উনানে আঁচ দিল, হীরেনদের রাত্রের এঁটো বাসন মাজতে গেল কলতলায়।

উনানে প্রথমে কেটলিটা চাপিয়ে সেটা নামিয়ে নিয়ে মাধবী চাপাল বড় স্যাসপ্যানটা।

'আমাদেরই কম পড়ত এক কেটলি চায়ে, দুজন ভাগীদার বেড়েছে। তুমি চা খাও তো ভাই লক্ষ্মী? জানি খাও। কে না খায় চা?'

লক্ষ্মী জিভ কামড়ায়, জোরে কামড়ায়। ঘুমিয়ে না হয় স্বপ্ন দেখে আবোল-তাবোল অনেক কিছু, জেগেও স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন সে করে না। দুর্বোধ্য যা-তা কথার ব্যাখ্যা শুনে বুঝতে তার ইচ্ছা হয় না। এরা সবাই তার চেনা। আশপাশে থাকে। তার মতো গরিব কেরানির বৌ। চা রুটি খাওয়া থেকে ডাল-ভাত খাওয়ার সব ব্যবস্থা এরা নিয়ে এসেছে। তার চিনিটুকু, চালটুকু কালকের বাড়তি তরকারিটুকু, তেল নুনটুকু নিয়ে বাড়তি ছোট ঘরটায় জমা করেছে, নিজেদের সঙ্গে আনা জিনিসের সঙ্গে।

লতিকা বলে, 'বাঁচলাম ভাই। তিন বাড়ির খাওয়ার জিনিস বাসনপত্র—জায়গা পাই না, সব ছড়িয়ে থাকে, এ ঘরটা ছোট হোক ঘুপচি হোক, খাসা ভাঁড়ারঘরের কাজ দেবে।'

মাধবী বলে, 'মস্ত রান্নাঘর। দুশ লোকের রান্না হয়। বাঁচা গেল।'

অলকা বলে, 'ভালোই হল, তুমিই দলে এলে ভাই লক্ষ্মী। তিনজনে মিলে খরচ কমিয়েছিলাম, এবার আরো কমবে। পালা করে রাঁধব বাড়ব তারও একটা জায়গা নেই ভালোমতো, না ভাঁড়ার না রান্নাঘর, কী যন্ত্রণা বলো দিকি।'

অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে লক্ষ্মীর। সারাদিন চুপচাপ থেকে রাত্রে সে হীরেনের কাছে জবাব চায়।

'লাগবে না? চার বাড়ির চারটে উনানে কয়লা পোড়ার বদলে একটা উনানে পুড়ছে। চার বাড়ির এক দিনের কয়লা খরচে চার দিন না চলুক, তিন দিন তো চলবে? চারটের বদলে একটা ঝিতে চলবে। চার জনের বাজার যাওয়ার বদলে পালা করে এক জনের গেলেই চলবে। চার জনের রাঁধার বদলে এক জনের রাঁধলেই চলবে—চার দিনে তিন দিন ছুটি। এমন তো নয় যে অনেক দূর থেকে ভাত খেতে আসতে হবে কাউকে? চার-পাঁচ হাত উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ডাল ভাত খাওয়ার বদলে দশ-বিশ হাত রাস্তা পেরিয়ে এসে খাওয়া এইটুকু তফাত। তার তুলনায় সুবিধা কত।'

লতিকা আজ রাঁধবে। একা যখন ছিল, নিজের বাড়িতে রোজ রাঁধতে হত, এখন এক দিন রেঁধে সে তিন দিন ছুটি পায়। এক দিন মানুষের খাওয়ার মতো কিছু যদি রাঁধত তো দুদিন কী রাঁধবে, কার পাতে কী দেবে ভেবে পেত না, আজ সে ভালো মাছ তরকারি রাঁধতে পেরেছে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই।

তিন দিন পরে এই চার অনাত্মীয় পাড়াপড়শি একান্নবর্তী পরিবারের জন্য রান্না করার ভার পায় লক্ষ্মী। বিয়ের পর একটানা তিন দিন বিশ্রাম ভোগ করা তার জীবনে এই প্রথম

জুটেছে। ছেলে বিয়োতে আঁতুড়ে গিয়ে রান্নাবান্না না করতে হওয়াটা ছুটি নয়, ছেলে বিয়োনোর খাটুনি ঢের বেশি রান্নাবাড়ার চেয়ে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, 'লতিকা, মাধবী, অলকা তোরাই আমায় বাঁচালি।' লতিকার ছেলে, মাধবীর মেয়ে, অলকার ভাই, এই তিন জনের সঙ্গে নিজের বাচ্চা দুটোকে সে দুধ খাওয়ায়। ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনীর মতো বাঁচতে শুধু সে রাজি নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।

প রি শে ষ

জীবনপঞ্জি

জন্ম

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫; ১৯শে মে ১৯০৮। স্থান : সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস : বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতৃদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক-নাম : মানিক। পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯৫৮—মানিকের মৃত্যুর বছর দুয়েক পরে)। মাতা—নীরদা দেবী (মৃত্যু ১৯২৪—টাঙ্গাইলে)। পিতামাতার ১৪ সন্তানের মধ্যে পঞ্চম পুত্র মানিক। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত আত্মজীবনী পাওয়া গেছে। পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সেটেলমেণ্ট বিভাগের কানুনগো এবং পরে সাবডেপুটি কালেক্টার। পিতার চাকরিসূত্রে মানিক পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন ও থেকেছেন। চঞ্চল দুরন্ত যুবা মানিক প্রথম যৌবনে এসেছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'র সংস্পর্শে।

শিক্ষা

কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষারম্ভ। পরে পড়েন বিভিন্ন স্কুলে—টাঙ্গাইলে, কাঁথি মডেল হাই স্কুলে, মেদিনীপুর জেলা স্কুলে। মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯২৬)। তারপর বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন থেকে প্রথম বিভাগে আই.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৮)। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি. ক্লাসে ভর্তি। কিন্তু তত দিনে সাহিত্যচর্চার নেশা জমে উঠেছে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দেই লেখক হিশেবে আত্মপ্রকাশ—'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'অতসী মামী' নামক গল্প প্রকাশিত (পৌষ ১৩৩৫)। ফলে বি. এস-সি. পরীক্ষায় দু বারই অকৃতকার্য হন (১৯৩১, ১৯৩২)। সাহিত্যকর্মে এমনভাবেই লিপ্ত হয়ে পড়েন যে একাডেমিক শিক্ষার ইতি ওখানেই ঘটে।

কর্ম

সাহিত্যই ছিল মানিকের উপার্জনের উপায়। দু-একবার সাহিত্যসম্পৃক্ত দু-একটি কর্ম থেকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। ১৯৩৪ সালে কয়েক মাস ১০/ বি পঞ্চানন ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত 'নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে কাজ করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিশেবে কাজ করেন (তৎকালীন সম্পাদক : কিরণকুমার রায়)। ১৯৩৯ সালে অনুজ সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস' নামে প্রেস ও প্রকাশনসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই মানিকের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ "বৌ" প্রথম প্রকাশিত হয়—প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) আটটি গল্প ছিল, দ্বিতীয়

সংস্করণে (১৯৪৬) যুক্ত হয় আরো পাঁচটি গল্প। প্রেস চালাতে পারেননি। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের পাবলিসিটি এ্যাসিসট্যাণ্ট পদে কয়েক মাস অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখাই ছিল মানিকের মূল পেশা। ১৯৪৩ সালে 'ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদস্য। ১৯৪৪ সালে ফ্যা-বি-লে-ও-শি-সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ১৯৪৫ সালে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র (ফ্যা-বি-লে-ও-শি-স-এর পরিবর্তিত নাম) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৪৬ সালে মানিক ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা। ১৯৪৯ সালে সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন।

বিবাহ — ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। চার পুত্র-কন্যা : শান্তা ভট্টাচার্য, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থ — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় উপন্যাস-গল্প-নাটক-গ্রন্থাবলি মিলিয়ে ৫৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থ "জননী" উপন্যাস, ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত; সর্বশেষ গ্রন্থ, "মাশুল" উপন্যাস, ১৯৫৬ সালে, মৃত্যুর এক মাস আগে প্রকাশিত। মানিকের মৃত্যুর পরে তাঁর উপন্যাস-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-রচনাবলি মিলিয়ে অন্তত ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তেরো খণ্ডে প্রকাশিত "মানিক গ্রন্থাবলী" (১৯৬৩-৭৬) এবং "অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" (১৯৭৬)। এই গ্রন্থাবলির বাইরেও মানিকের বহু অগ্রন্থিত রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে আজো।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনা — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমকালীন সব ধরনের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী', 'পূর্বাশা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'সত্যযুগ', 'প্রবাসী', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'নরনারী', 'নতুন জীবন', 'বসুমতী', 'গল্পভারতী', 'মৌচাক', 'পাঠশালা', 'রংমশাল', 'নবশক্তি', 'স্বাধীনতা', 'আগামী', 'কালান্তর', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'দিগন্ত', 'সংস্কৃতি', 'মুখপত্র', 'প্রভাতী', 'অনন্যা', 'উল্টোরথ', 'এলোমেলো' 'ভারতবর্ষ', 'মধ্যবিত্ত', 'চতুষ্কোণ', 'ক্রান্তি', 'হিমাদ্রি', 'শারদশ্রী', 'মুখপত্র', 'অগ্রণী', 'সংবাদ', 'শারদী', 'সোনার বাংলা', 'বঙ্গশ্রী', 'আগামী', 'অনন্যা', 'সচিত্র ভারত', 'কৃষক', 'পূর্ণিমা', 'রূপান্তর', 'স্বরাজ' প্রভৃতি পত্রিকায়।

অসুস্থতা — ১৯৩৫ সালে, যে-বছর মানিক গ্রন্থকার হিশেবে প্রথম আবির্ভূত হন, সে-বছরই আক্রান্ত হন মৃগী রোগে। এই রোগ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি সঙ্গী ছিল। তাঁর ডায়েরিতে এই রোগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতেন মানিক।

কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান — ১৯৪৪ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁর লেখায় একটি বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৪৭ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে এক সাহিত্যিক বিতর্কে অবতীর্ণ হন।

আধ্যাত্মিকতা–ধার্মিকতা

কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ঠিক দশ বছর পরে, ১৯৫৪ সালে, মানিকের ডায়েরিতে আধ্যাত্মিকতার সূচনা হয় : 'কোনো প্রতীক অবলম্বন না করলে প্রণামের সময় মন বিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রতীক প্রতীক— মা কে বা কেমন জানি না।' (২৮–৪–৫৪) লেখায় অবশ্য আধ্যাত্মিকতার ছাপ পড়েনি কখনো। হয়তো মাত্র ৪৮ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ না–করলে রচনায় আধ্যাত্মিকতার স্বাক্ষর পড়ত।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

লেখাই ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উপজীবিকা। ফলত , দারিদ্র্য ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। ক্রমাগত বিশ্লেষণাত্মক গল্প–উপন্যাস রচনা, অসুখ, অর্থাভাব, সামাজিক–রাজনৈতিক ক্লিষ্টতা মানিককে বিপর্যস্ত করে দেয়—হয়তো সে-সব বিস্মরণের জন্যেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যা থেকে—অনেক চেষ্টা করেও—শেষপর্যন্ত মুক্তি পাননি। নির্জনস্বভাব, বন্ধুহীন, একাকী মানুষ ছিলেন মানিক। তাঁর কোনো গ্রন্থ কোনো প্রিয়জনকে উৎসর্গ করেননি মানিক। একটিমাত্র উৎসর্গ, "স্বাধীনতার স্বাদ" (১৯৫১) উপন্যাসের, উৎসর্গপত্রটিও মানিকের রচনার মতোই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর : 'সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম—জনসাধারণই মানবতার প্রতীক'। ১৯৫৬ সালের ৩০শে নভেম্বর মানিক অজ্ঞান হয়ে যান, ২রা ডিসেম্বর নীত হন নীলরতন সরকার হাসপাতালে, ৩রা ডিসেম্বর মৃত্যু।

মৃত্যুত্তর শ্রদ্ধার্ঘ্য

৭ই ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বিশাল শোকসভা। 'অগ্রণী', 'নতুন সাহিত্য' ও 'পরিচয়'— এই তিনটি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে (পৌষ ১৩৬৩)। 'উল্টোরথ' ও 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকাও একগুচ্ছ শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা প্রকাশ করে (পৌষ ১৩৬৩)। 'কবিতা' ও 'শনিবারের চিঠি'র মতো বিপরীতধর্মী পত্রিকাও স্মারক রচনা প্রকাশ করে (পৌষ ১৩৬৩)।

গ্রন্থপঞ্জি

উপন্যাস

১। জননী (১৯৩৫)
২। দিবারাত্রির কাব্য[১] (১৯৩৫)
৩। পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) (দ্বি সং ১৯৩৯) (প সং ১৯৫১) (ষষ্ঠ সং ১৯৫৪)
৪। পুতুলনাচের ইতিকথা[২] (১৯৩৬)(দ্বি সং ১৯৪৭) (তৃ সং ১৯৫০) (চ সং ১৯৫২) (প সং ১৯৫৬)
৫। জীবনের জটিলতা (১৯৩৬)
৬। অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮) (দ্বি সং ১৯৫০)
৭। সহরতলী (প্রথম পর্ব) (১৯৪০)
৮। সহরতলী[৩] (দ্বিতীয় পর্ব) (১৯৪১) (দ্বি সং ১৯৫৩)
৯। অহিংসা[৪] (১৯৪১)
১০। ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১) (দ্বি সং ১৯৪৭)
১১। চতুষ্কোণ (১৯৪২)
১২। প্রতিবিম্ব (১৯৪৩) (দ্বি সং ১৯৪৭)
১৩। দর্পণ[৫] (১৯৪৫) (দ্বি সং ১৯৫১)
১৪। চিন্তামণি[৬] (১৯৪৫)
১৫। সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬) (দ্বি সং ১৯৫৩)
১৬। চিহ্ন (১৯৪৭)
১৭। আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭)
১৮। জীয়ন্ত[৭] (১৯৫০)
১৯। পেশা (১৯৫১)
২০। সোনার চেয়ে দামী (প্রথম খণ্ড : বেকার) (১৯৫১)
২১। স্বাধীনতার স্বাদ[৮] (১৯৫১)
২২। ছন্দপতন (১৯৫১)
২৩। সোনার চেয়ে দামী (দ্বিতীয় খণ্ড : আপোষ) (১৯৫২)
২৪। ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২) (দ্বি সং ১৯৫৬)
২৫। পাশাপাশি (১৯৫২)
২৬। সার্বজনীন (১৯৫২)
২৭। নাগপাশ (১৯৫৩)
২৮। ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)
২৯। আরোগ্য (১৯৫৩)

৩০। চালচলন (১৯৫৩)
৩১। তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩)
৩২। হরফ (১৯৫৪)
৩৩। শুভাশুভ (১৯৫৪)
৩৪। পরাধীন প্রেম[৯] (১৯৫৫)
৩৫। হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)
৩৬। মাশুল (১৯৫৬)

মরণোত্তর প্রকাশ

৩৭। প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান[১০] (১৯৫৬)
৩৮। মাটি-ঘেঁষা মানুষ[১১] (১৯৫৭)
৩৯। মাঝির ছেলে[১২] (কিশোর–উপন্যাস, ১৯৬০)
৪০। শান্তিলতা (১৯৬০)
৪১। মাটির কাছের কিশোর কবি[১৩] (কিশোর–উপন্যাস)
৪২। মশাল[১৪] (কিশোর–উপন্যাস)

ছোটগল্প

১। অতসী মামী (১৯৩৫)
২। প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)
৩। মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)
৪। সরীসৃপ (১৯৩৯)
৫। বৌ (১৯৪০) (দ্বি সং ১৯৪৭)
৬। সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) (দ্বি সং ১৯৪৫)
৭। ভেজাল (১৯৪৪)
৮। হলুদপোড়া (১৯৪৫)
৯। আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)
১০। পরিস্থিতি (১৯৪৬)
১১। খতিয়ান (১৯৪৭)
১২। মাটির মাশুল (১৯৪৮)
১৩। ছোট বড় (১৯৪৮)
১৪। ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)
১৫। ফেরিওলা (১৯৫৩)
১৬। লাজুকলতা (১৯৫৩)

নাটক

১। ভিটেমাটি (১৯৪৬)

প্রবন্ধ

১। লেখকের কথা (১৯৫৭)

কবিতা

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৭০)

রচনাসংগ্রহ

১। মানিক গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ, ১৯৫০)
২। মানিক গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৫১)
৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাচার্য–সম্পাদিত, ১৯৫০) (দ্বি সং ১৯৫৩)
৪। স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫৬)
৫। গল্প–সংগ্রহ (১৯৫৭)
৬। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৮)
৭। উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ (১৯৬৩)
৮। মানিক গ্রন্থাবলী : প্রথম খণ্ড (১৯৬৩)
৯। মানিক গ্রন্থাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৭)
১০। মানিক গ্রন্থাবলী : তৃতীয় খণ্ড (১৯৭০)
১১। মানিক গ্রন্থাবলী : চতুর্থ খণ্ড (১৯৭০)
১২। মানিক গ্রন্থাবলী : পঞ্চম খণ্ড (১৯৭১)
১৩। মানিক গ্রন্থাবলী : ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৭১)
১৪। মানিক গ্রন্থাবলী : সপ্তম খণ্ড (১৯৭২)
১৫। মানিক গ্রন্থাবলী : অষ্টম খণ্ড (১৯৭৩)
১৬। মানিক গ্রন্থাবলী : নবম খণ্ড (১৯৭৩)
১৭। মানিক গ্রন্থাবলী : দশম খণ্ড (১৯৭৩)
১৮। মানিক গ্রন্থাবলী : একাদশ খণ্ড (১৯৭৪)
১৯। মানিক গ্রন্থাবলী : দ্বাদশ খণ্ড (১৯৭৫)
২০। মানিক গ্রন্থাবলী : ত্রয়োদশ খণ্ড (১৯৭৬)
২১। কিশোর বিচিত্রা (১৯৬৮)
২২। চারটি উপন্যাস (১৯৭১)
২৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (যুগান্তর চক্রবর্তী–সম্পাদিত, ১৯৭১)
২৪। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর চক্রবর্তী–সম্পাদিত, ১৯৭৬)
২৫। বাছাই গল্প (নির্মাল্য আচার্য–সম্পাদিত, ১৯৮১)

---

১ "দিবারাত্রির কাব্য" উপন্যাসের নামপত্রে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ ছিলো : '(একটি বস্তুসংকেতের কল্পনামূলক কাহিনী)'।

২ "পুতুলনাচের ইতিকথা" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার পরিকল্পনা ছিলো মানিকের; হয়নি।

৩ "সহরতলী" উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব লেখার পরিকল্পনা ছিলো মানিকের।

৪ "অহিংসা" উপন্যাস 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশকালে 'প্রথম ভাগ' বলে উল্লেখ ছিলো। দ্বিতীয় ভাগ লেখা হয়নি।

৫ "দর্পণ" উপন্যাসের শেষে লেখা আছে 'প্রথম ভাগ'। অর্থাৎ লেখকের আরো খণ্ড রচনার অভিলাষ ছিলো। "দর্পণ" উপন্যাসটি 'প্রভাতী' পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়েছিলো "জাগো জাগো" নামে। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে লেখক নাম পরিবর্তন করেন।

৬ "চিন্তামণি" উপন্যাসটি "রাঙামাটির চাষী" নামে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো।

৭ "জীয়ন্ত" উপন্যাস 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশকালে শেষ কিস্তির শেষে 'প্রথম ভাগ' কথাটি লেখা ছিলো। দ্বিতীয় ভাগ পরে আর লিখিত হয়নি। "জীয়ন্ত" উপন্যাসের প্রথম কিস্তি 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো "কলম-পেষার ইতিকথা" নামে। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত "জীয়ন্ত" উপন্যাসের শেষ পাঁচটি কিস্তি (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, পৌষ ১৩৫৫, মাঘ ১৩৫৫, ফাল্গুন ১৩৫৫ এবং চৈত্র ১৩৫৫) গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে বর্জিত হয়।

৮ "স্বাধীনতার স্বাদ" 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে নাম ছিলো "নগরবাসী"।

৯ "পরাধীন প্রেম" উপন্যাসের একাংশ 'অনন্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো "বাস্তবিক" নামে।

১০ "প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান" 'উল্টোরথ' পত্রিকায় 'প্রাণেশ্বর' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো।

১১ "মাটি-ঘেঁষা মানুষ" লেখকের অকালমৃত্যুর ফলে অসম্পূর্ণ থাকে। "একটি চাষীর মেয়ে" নামে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়েছিলো। সম্পূর্ণ করেন কথাশিল্পী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

১২ "মাঝির ছেলে" লেখকের একমাত্র সম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাস।

১৩ "মাটির কাছের কিশোর কবি" অসম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

১৪ "মশাল" লেখকের অসম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাস।